ভ্রমণ ও সাধুসঙ্গ

(চতুর্থ খণ্ড)

শিবশংকর ভারতী

॥ ভাস্বতী ॥
১০৩সি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা- ৭০০ ০০৯

Vraman-O-Sadhu Sangha / Sibsankar Bharati

প্রকাশক ঃ ২. ২.৫৯
কে. ব্যানাজী
ভাস্বতী
১০৩সি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ অলংকরণ ঃ রতন সেন
ছবি ঃ দীপক ভট্টাচার্য
লেখকের ছবি ঃ ডাঃ প্রদীপ দাস
'ইনসেট' ছবি ঃ শ্যামগোপাল বসাক

মুদ্রাকর ঃ
পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য
লক্ষ্মী প্রেস
৯/৭বি, প্যারীমোহন সুর লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

আমার চরম দুঃখ দারিদ্র্য ও দৈন্যময় জীবনে আমাকে আপন করে
নিয়ে জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা দিয়ে সাংসারিক দৈন্যতার মুক্তি
এবং অপার্থিব পথের গুরুলাভে সহায়তা করে
সমস্ত দুঃখের অবসান ঘটিয়েছেন পরম পূজনীয়
শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীশুকদেব গোস্বামী—তাঁরই
পাদপদ্মে অর্পণ করলাম।

—শিবশংকর

এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে

ভ্রমণ পিয়াসী ও অধ্যাত্ম-পিপাসু গুণগ্রাহী পাঠক পাঠিকারা আগের তিনটি খণ্ড গ্রহণ করেছেন পরম সমাদরে—অবগত হয়েছেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অধ্যাত্ম-ধারা বহনকারী আজকের পথচলতি সাধুসন্ন্যাসীদের অন্তরঙ্গ জীবন ও তাঁদের নানা চিন্তাভাবনা এবং প্রাচীন ভারতের লুপ্তপ্রায় অনেক গোপন কথা। তবে আগের খণ্ডগুলিতে সাধুসন্ন্যাসীদের বিষয়ে যে সব কথা অপূর্ণ ছিল—চতুর্থ খণ্ডে তার অনেক কথাই হয়েছে সম্পূর্ণ। ফলে এই খণ্ডে আলোচিত বিষয় বস্তুর দিক থেকেও আগের তিনটি খণ্ডকে এগিয়ে দিয়েছে অনেক বেশী। সাধুসন্ন্যাসীদের জীবনপথ দীর্ঘ—বিচিত্র। তাঁদের অক্ষয় অমৃত কথা মানুষের মনকে সুন্দর, সজীব করে—আরও নতুন করে এগিয়ে নিয়ে যাবে ভারতের অধ্যাত্ম-ধারার উৎসমুখে—এ-বিশ্বাস আমার আছে।

সাধুসন্ন্যাসীদের জীবনভাবনার নানাদিক আর তাঁদের বলা শাস্ত্র-কথা লিখেছি—যা বলে গেছেন প্রাচীন ভারতের ঋষি, সাধক ও মহাপুরুষেরা—তাই নতুন কোন কথা নয়, নতুন কিছু লিখিনি। এ-দেশের অধ্যাত্ম-ধারার ধারক ও বাহক সাধুসন্ন্যাসীদের বৈচিত্র্যময় জীবনভাবনার কথা লিখে শেষ করা যাবে না কোনদিনই। কারণ পাঁচবার মথুরা বৃন্দাবনে গিয়ে মোট ২৩৯ জন নানা শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসীদের সঙ্গ করেছি, অথচ এখানে লেখা হলো মাত্র কয়েকজনের কথা। একই সঙ্গে আমার জীবনজিজ্ঞাসার অনেক কথার উত্তর পেয়েছি সাধুদের কথায়। তবে তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা বা আলোচনা করতে পারিনি পরিসরের কথা ভেবে। তা সত্ত্বেও পুণ্যাত্মা সাধুমহাত্মাদের কণ্টকর অভিনব জীবনের এক আনন্দময় উপলব্ধির কথা লিখেছি—যতটা সম্ভব হলো।

এই খণ্ডে থাকছে বিভিন্ন কঠোরতপা সাধুসন্ন্যাসীদের কথা—নানা ধরনের তপস্যা এবং সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কথা—যেসব কথা অনেকেরই অজানা কথা—ভারতের লুপ্তপ্রায় শাস্ত্রের অনেক গোপন অজ্ঞাত কথা—যে সব কথা আগের খণ্ডগুলিতে ছিল অনালোচিত। একটা বিষয় বেশ বুঝেছি, সাধুসঙ্গ যেমন নিজেকে সংশোধন করতে সহায়তা করে, তেমনই মুক্ত করে অধ্যাত্ম-জীবন পথে অগ্রসরতার বাধা—যা পাঠক পাঠিকারা সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন আগের লেখা গ্রন্থগুলি থেকে—এই খণ্ডও তার এতটুকুও ব্যতিক্রম ঘটাবে না।

আমার দেখা উত্তর ভারতের দর্শনীয় স্থানগুলির বর্ণনা এবং ভ্রমণপথের বিবরণ এমন সাবলীল করে লিখতে চেষ্টা করেছি—যাতে পথে বেরিয়ে সুন্দরভাবে ঘুরে দেখে আসতে কারও অসুবিধা না হয়। একই সঙ্গে দর্শনীয় তীর্থস্থানগুলির মাহাত্ম্য কথার পাশাপাশি পথচলতি সাধুমহাত্মা আর ভারতের সাধক মহাপুরুষদের সেই

স্থানের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা জীবনের ছোট ছোট ঘটনা, পৌরাণিক কাহিনী এবং ঐতিহাসিক পশ্চাদপট লেখার চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য।

হিন্দুবিশ্বাস, ব্রজ চুরাশী ক্রোশ পরিক্রমা করলে শুনেছি জীবনের বন্ধন মুক্ত হয়—মানুষ মুক্তিলাভ করে। এখানে আছে সেই পরিক্রমা পথের বিস্তারিত বিবরণ, স্থান প্রসঙ্গে পুরাণের কথা, প্রকৃতি ও স্থান বর্ণনা—পাঠক পাঠিকারা এ-সব পাঠে বৃন্দাবনের এক অনাস্বাদিত ভাবরস সহজেই অনুভব করতে পারবেন বলে আমার মনে হয়।

সব শেষে বলি, এত কথা লেখা, এত কথা বলা সত্ত্বেও সাধুদের সম্পর্কে রয়ে গেল অনেক না বলা কথা। তাই পাঠক সমাজকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলি, এর পর পঞ্চম খণ্ডও প্রকাশিত হবে—অনেক অ-বলা কথা নিয়ে।

—**শিবশংকর ভারতী**

এ-টুকু না বললেই নয়

'ভ্রমণ ও সাধুসঙ্গ'-এর চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হলো। ইতিপূর্বে প্রকাশিত তিনটি খণ্ডই বিভিন্ন সময়ে দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, বসুমতী, সানন্দা এবং উদ্বোধন প্রভৃতি বাংলার বিভিন্ন সংবাদপত্র ও পত্রিকা সমূহের বিশিষ্ট সমালোচকদের সমালোচনায় পেয়েছে উচ্চ প্রশংসা ও আন্তরিক অভিনন্দন। সত্যি কথা বলতে কি, বাংলার পাঠক সমাজের কাছেও সাদরে গৃহীত হবে—ভাবিনি। সাম্প্রতিককালে ভ্রমণ সাহিত্যে এমন জনপ্রিয়তা আর কোন গ্রন্থ পেয়েছে বলে আমার অন্তত জানা নেই।

প্রাচীন ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণরস বয়ে নিয়ে আসা আজকের পথচলতি আশ্রয়হীন সাধু-মহাত্মারা অধ্যাত্ম-জীবনের এক মহান আত্মমগ্ন সাধন-শিল্পী। তাঁদেরই রম্য জীবনী ও অন্তরঙ্গ গোপন জীবনকথা পূর্বের মতো এই খণ্ডেও রচনা করেছেন লেখক তাঁর অতীতের সাধুসঙ্গের অভিজ্ঞতা থেকে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসীদের আত্মিক বিশ্লেষণ এবং লেখকের প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তিতে 'ভ্রমণ ও সাধুসঙ্গ'-এর প্রতিটি অধ্যায় যেমন হয়ে উঠেছে সজীব, প্রাণবন্ত—তেমনই সমাজের দৃষ্টির আড়ালে পড়ে থাকা এক শ্রেণীর অবহেলিত সাধু-মহাত্মারা একের পর এক লেখকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এসে ধরা দিয়েছেন আমাদের সামনে। ফলে 'ভ্রমণ ও সাধুসঙ্গ' হয়ে উঠেছে এক অনন্যসাধারণ গ্রন্থ—যা অতি অল্প সময়ে বাংলার ভ্রমণ সাহিত্য এবং অধ্যাত্মবাদের আলোচনা-আসরে নিজগুণে অধিকার করে নিয়েছে স্থায়ী আসন।

পরিশেষে বলি, অন্যান্য খণ্ডগুলির মতো এই খণ্ডটিতেও ভ্রমণ আর দুর্লভ সাধুর সঙ্গ—এ-দুটিকে রাখা হয়েছে পাশাপাশি। এই খণ্ডটির বিশেষত্ব হলো, লেখক মুক্ত মন নিয়ে করেছেন ভারতবর্ষের গুরু-শিষ্য পরম্পরায় ধরে রাখা অত্যন্ত গোপন সাধন-পথের কথা, দীক্ষাপ্রসঙ্গ আর গুরুবাদ সম্পর্কে বিতর্কিত আলোচনা। একই সঙ্গে রয়েছে সমগ্র ব্রজভূমির এক প্রায় নিখুঁত সংকলন—যা মুহূর্তের জন্যে হলেও অনাস্বাদিত এক অধ্যাত্ম ভাবরস সঞ্চার করবে পাঠক মনে।

—প্রকাশক

কোন পাতায় কি আছে

১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্থানী শিল্প-আদলে বৃন্দাবনের এই গোবিন্দজীর মন্দির নির্মাণ করেন মহারাজা মানসিংহ—যেটির চূড়া থেকে তিনটিতলা ভেঙে দেন ঔরঙ্গজেব।
—লেখক
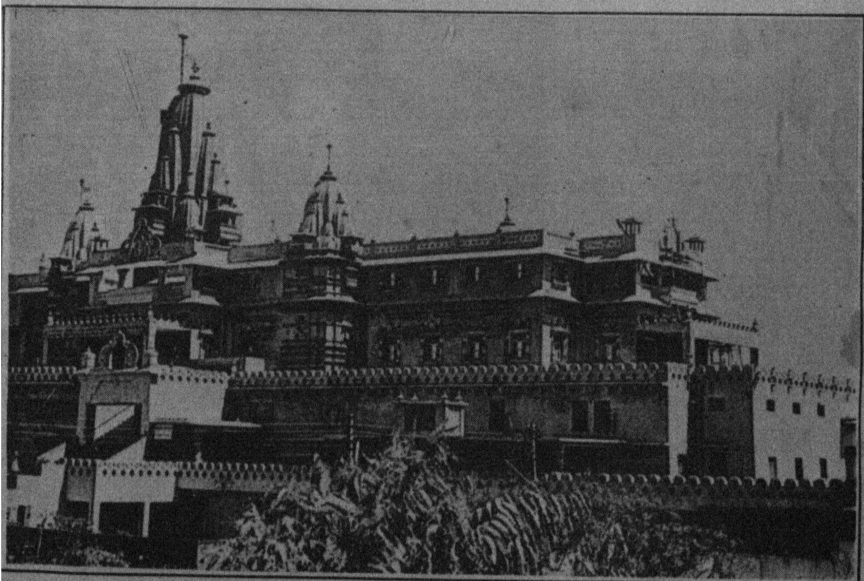
মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমির উপর প্রায় দু-কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত শ্রীভাগবত ভবন।
—শ্রীকৃষ্ণ সেবা সংস্থান, মথুরা, প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে।
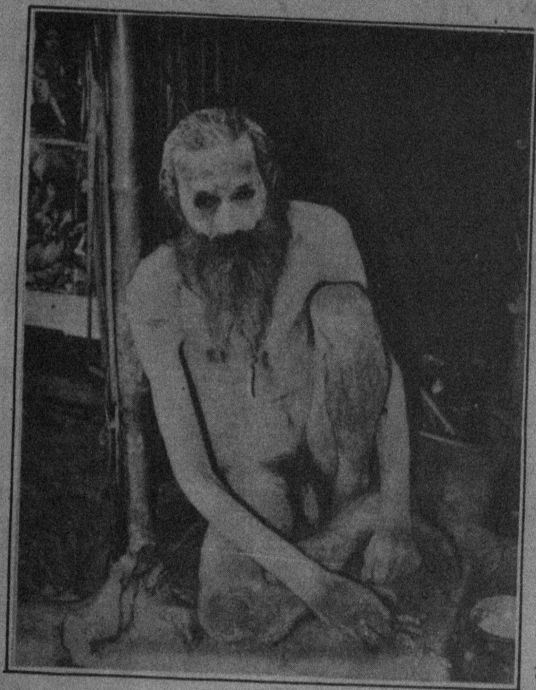
গিরি গোবর্ধনের একটি অস্থায়ী ডেরায় ভস্ম মেখে বসে আছেন জনৈক নাগাসন্ন্যাসী। —লেখক

গোকুলে পোৎরা কুন্ডের কাছে একটি অস্থায়ী ডেরায় ভস্মমাখা অবস্থায় জনৈক নাগা সন্ন্যাসী। —লেখক
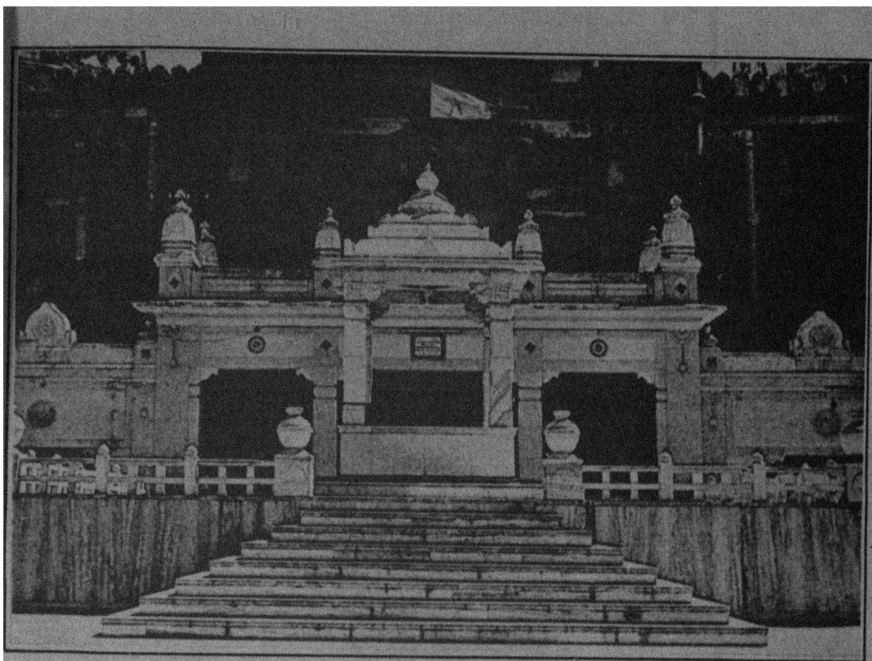
মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমির উপর স্থাপিত 'শ্রীকৃষ্ণ চবুতরা'। একদা এখানেই ছিল কংসের কারাগার।
—শ্রীকৃষ্ণ সেবা সংস্থান, মথুরা, প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে।
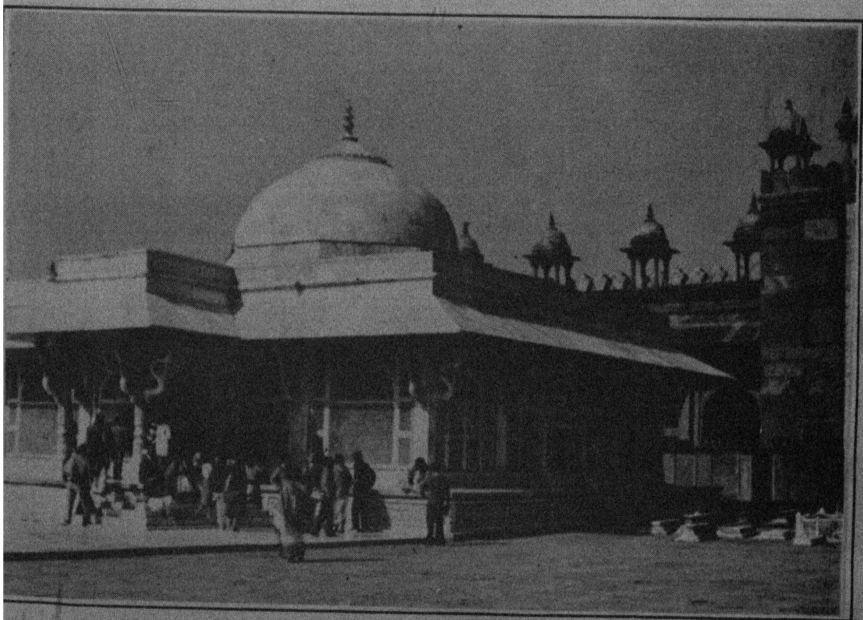
মোঘল স্থাপত্যে এক যুগান্তকারী সৃষ্টি সাদা মার্বেল পাথরে নির্মিত ফতেপুর সিক্রিতে সেলিম চিস্তির সমাধি।
—লেখক

বৃন্দাবনের সুপ্রসিদ্ধ শাহজী মন্দিরের প্রবেশ-তোরণ।

—লেখক
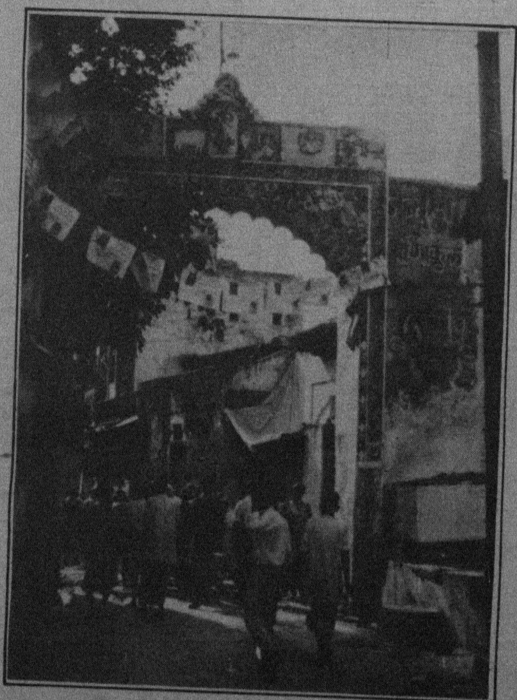
গোকুলে নন্দরাজার নন্দালয়ে যাওয়ার পথে প্রথম প্রবেশ-তোরণ—নন্দদ্বার।

—লেখক
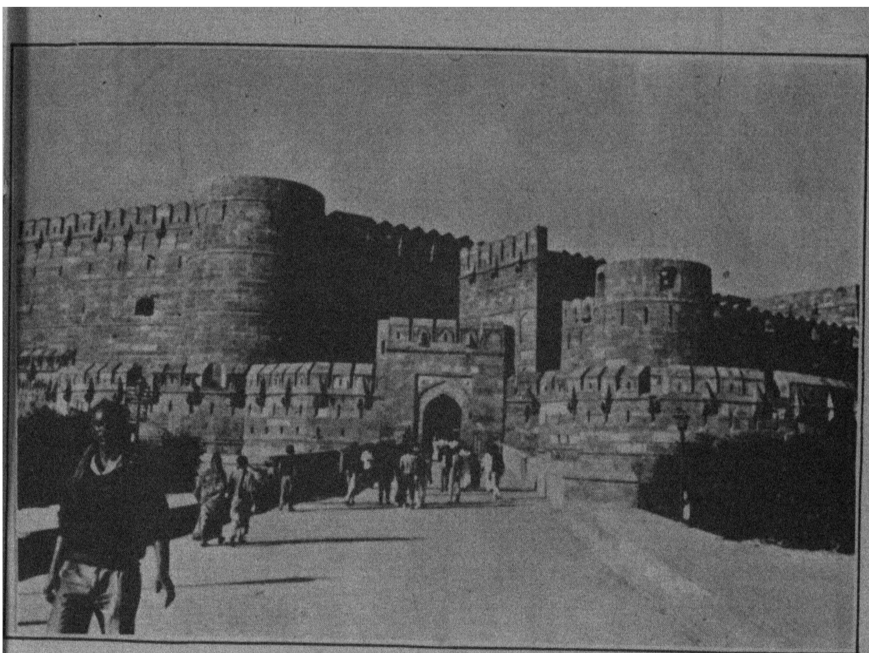
১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবর নির্মিত মোঘল স্থাপত্যের এক অনবদ্য উদাহরণ আগ্রা দুর্গ।
—ডাঃ প্রদীপ দাস
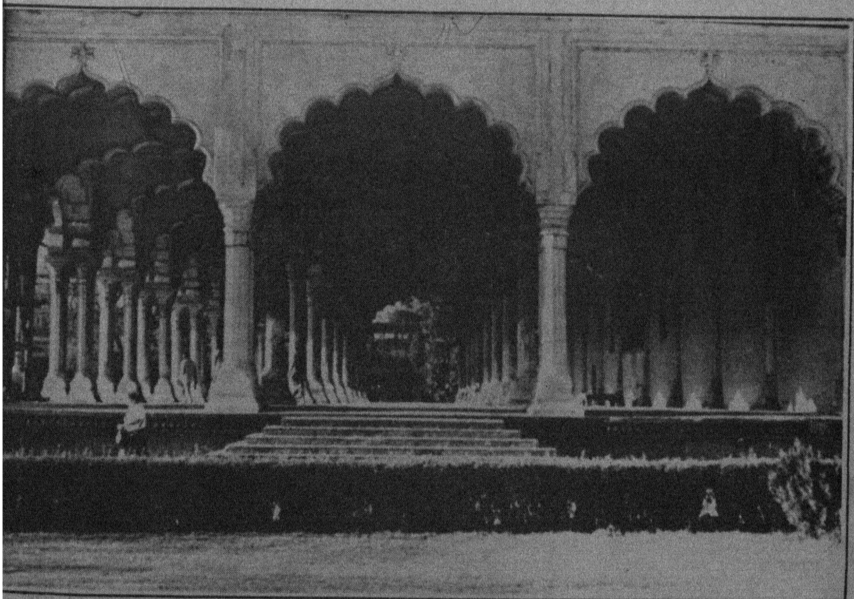
আগ্রাদুর্গের দিওয়ান-ই-আম—যেখানে বসে বাদশা শুনতেন প্রজাদের অভাব অভিযোগের কথা।
—ডাঃ প্রদীপ দাস
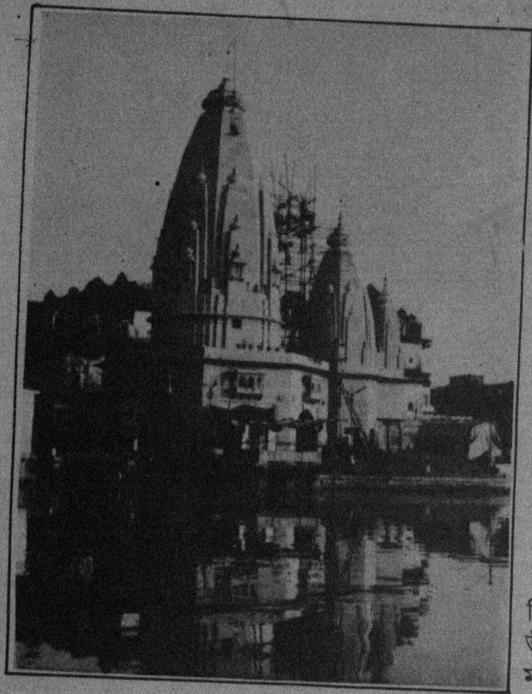
গিরি গোবর্ধনে মানসীগঙ্গা তীরে প্রতিষ্ঠিত গোবর্ধন মন্দির। —লেখক
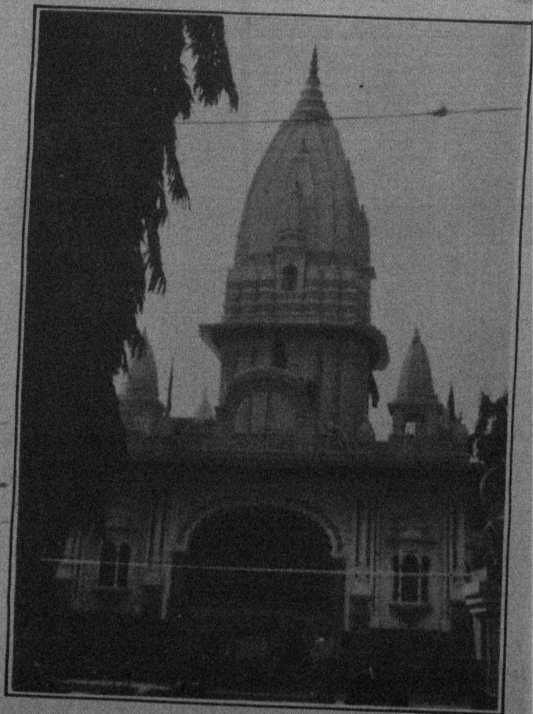
বৃন্দাবনে সর্বজনবিদিত এই মন্দির—যেটি শাহজী মন্দির নামে প্রসিদ্ধ। —লেখক
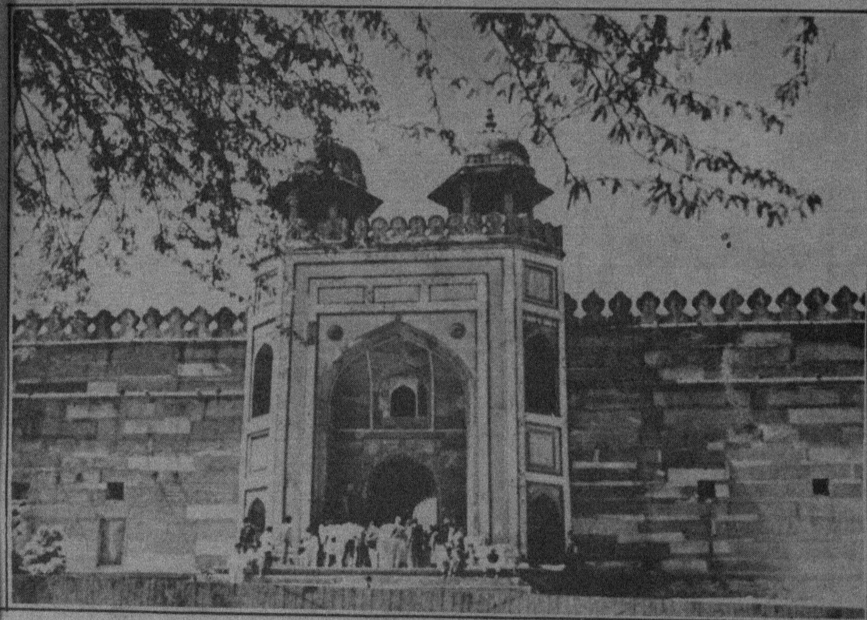
মোঘল স্থাপত্য কলাশিল্পের উৎসাহী জনক সম্রাট আকবর নির্মিত ফতেপুর সিক্রির প্রবেশ-তোরণ।

—ডাঃ প্রদীপ দাস

ফতেপুর সিক্রিতে আকবর-পরিবার এবং অন্তঃপুরের মহিলাদের জন্য নির্মিত সমাধিক্ষেত্র —জানানা রৌজা।

—লেখক
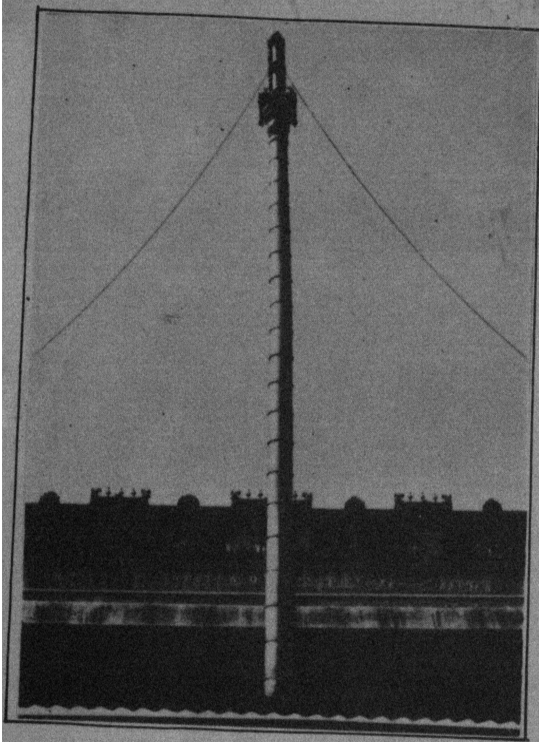
বৃন্দাবনে রঙ্গজী মন্দির-চত্বরে সাড়ে বারো মণ সোনা দিয়ে নির্মিত ৬০ ফুট উঁচু প্রসিদ্ধ সোনার তালগাছ। —লেখক
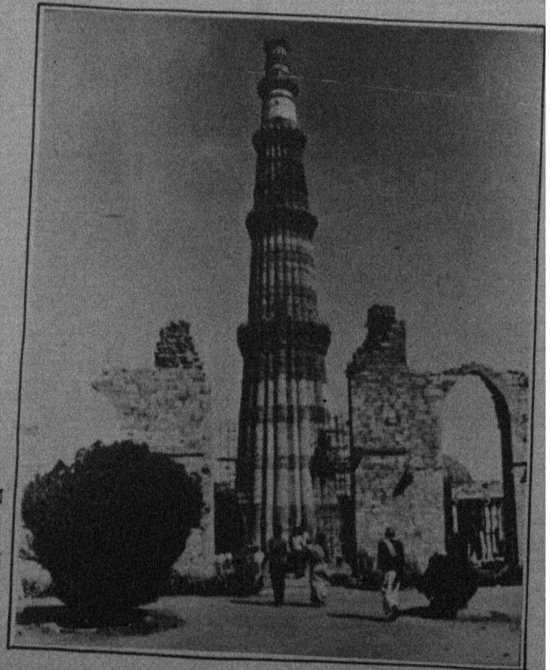
কুতুব-উদ্-দিন আইবকের ভারত বিজয়ের স্মৃতি ২৩৪ ফুট উঁচু ভারতের উচ্চতম স্তম্ভ —কুতুবমিনার।

—ডাঃ প্রদীপ দাস

সম্রাট আকবরের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের স্মৃতির প্রতীক ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত ভারতের সবচেয়ে উঁচু তোরণ—বুলন্দ দরওয়াজা। —লেখক
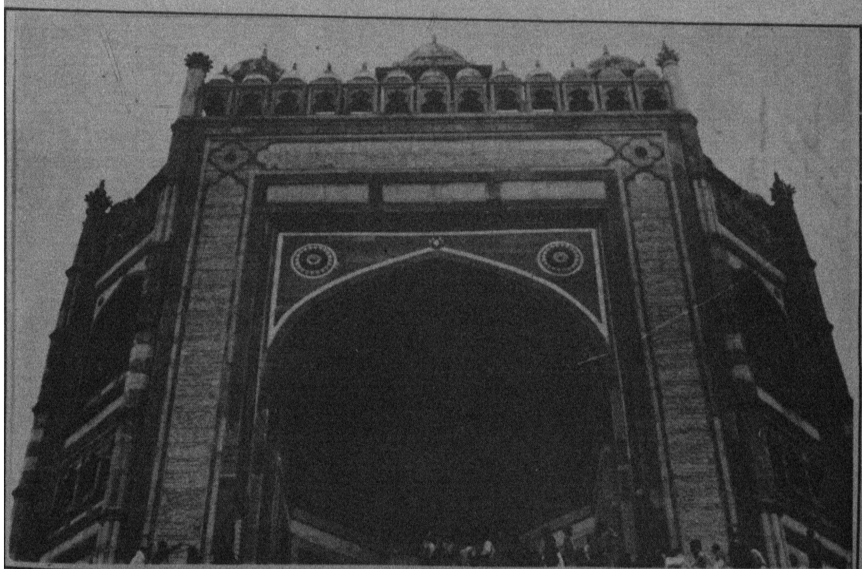
ফতেপুর সিক্রিতে পারসীয় স্থাপত্যের অনুকরণে সম্রাট আকবর নির্মিত যোধবাঈ প্রাসাদ। —ডাঃ প্রদীপ দাস
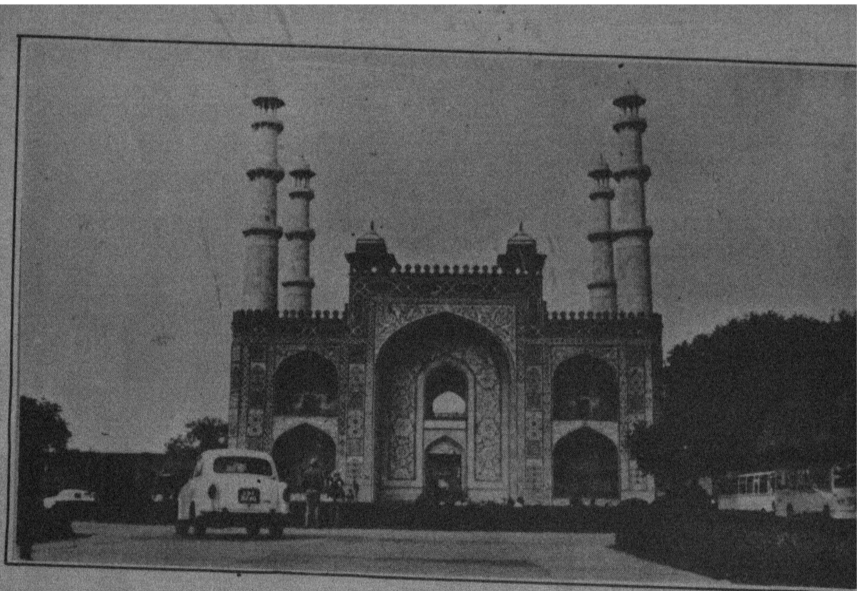
সম্রাট আকবরের সমাধিক্ষেত্র সিকান্দ্রা-র কারুকার্যখচিত লাল বেলে পাথরে নির্মিত প্রবেশ-তোরণ।

—লেখক

সিকান্দ্রা—যেখানে ধর্মনিরপেক্ষ মোঘল বাদশা আকবর চির-শয্যায় শায়িত রয়েছেন আজও।

—লেখক
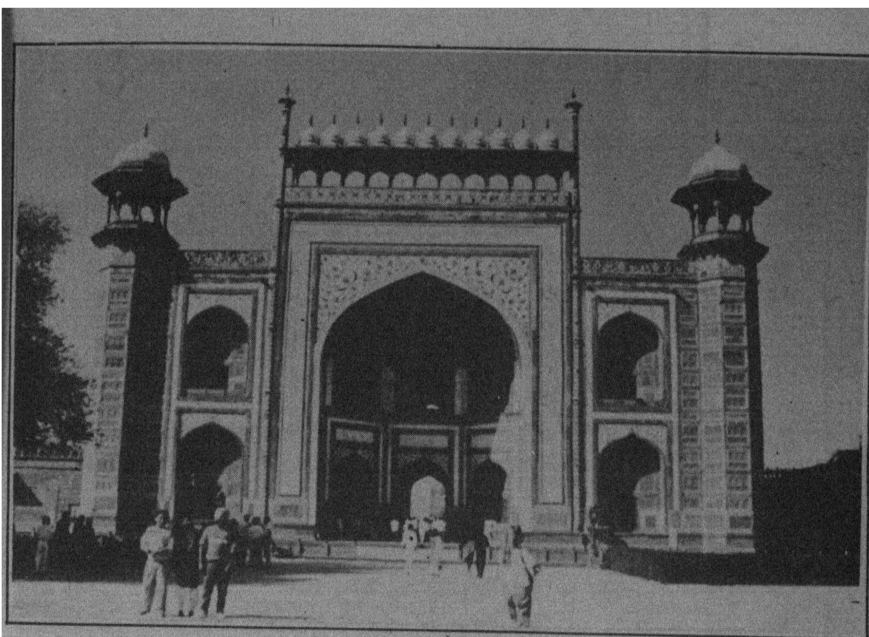
লাল পাথরের এই প্রবেশ-তোরণ—তাজ দেখার আগেই মুগ্ধ হতে হয় এই 'তাজ গেট' দেখে।
—ডাঃ প্রদীপ দাস
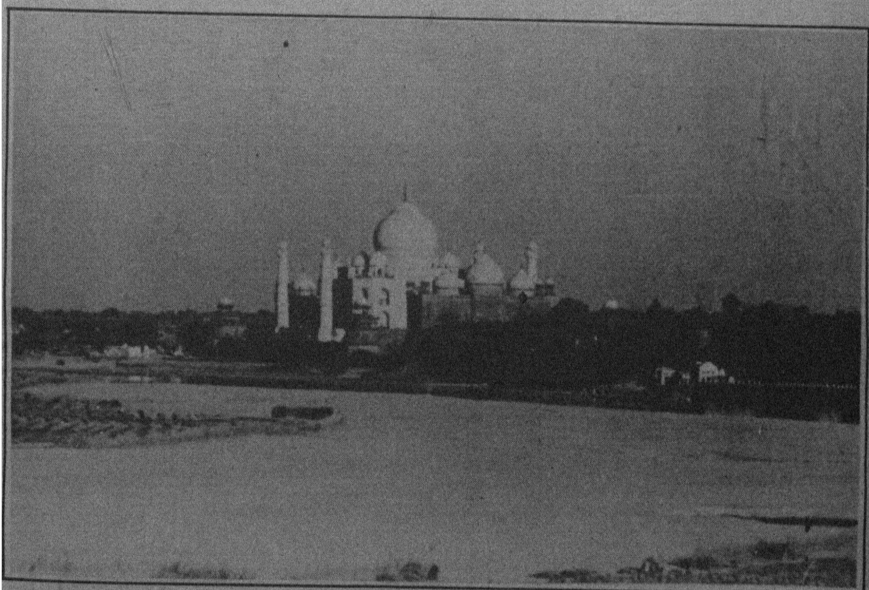
'ভারতে আর যদি কিছু না থাকে তাহলে এই তাজ একাই যাতায়াতের খরচ পুষিয়ে দেবে।'
—বিয়ার্ড টেলার।
—ডাঃ প্রদীপ দাস
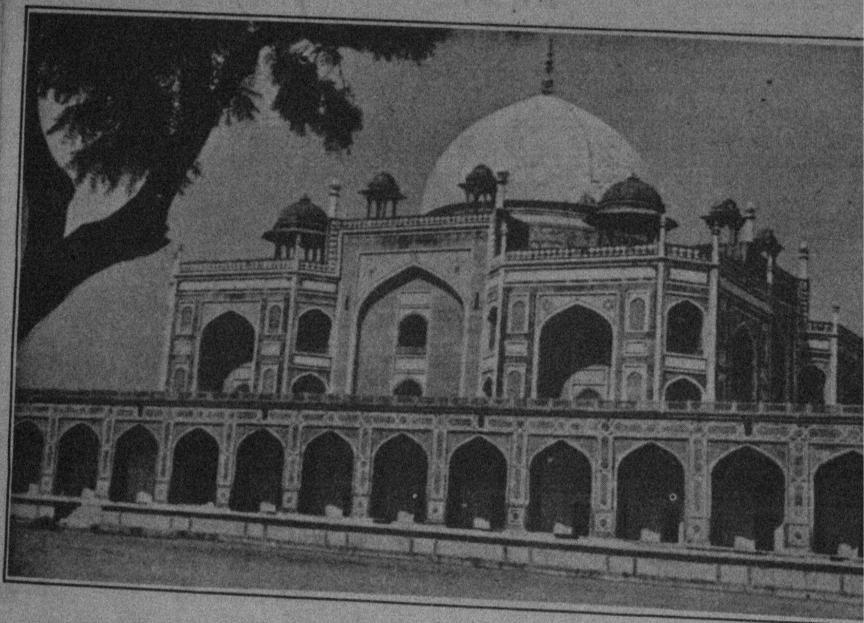
মোঘল সম্রাট হুমায়ুনের মৃত্যুর নয় বৎসর পর ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধিক্ষেত্র। —*পুরাতত্ত্ব বিভাগ প্রকাশিত 'দিল্লী অউর উসকা অঞ্চল' থেকে সংগৃহীত।*
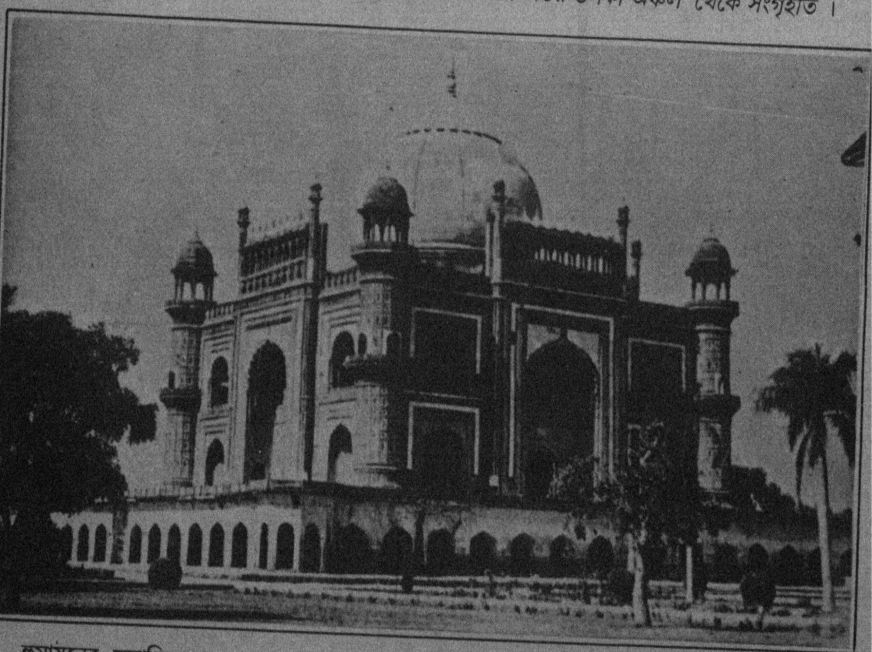
হুমায়ুনের সমাধির অনুকরণে ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত সফদর জং-এর সমাধিক্ষেত্র। —*পুরাতত্ত্ব বিভাগ প্রকাশিত 'দিল্লী অউর উসকা অঞ্চল' থেকে সংগৃহীত*

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির—যেটি দিল্লীর বিড়লা মন্দিব নামে প্রসিদ্ধ।
—ডাঃ প্রদীপ দাস
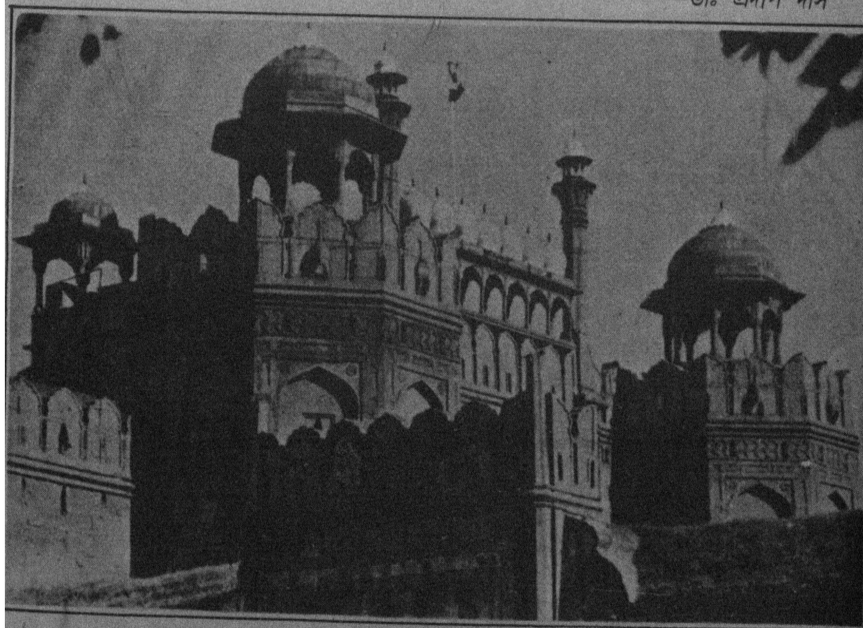
১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাজাহান লালকেল্লার নির্মাণ শুরু করে শেষ করেন ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল।
—পুরাতত্ত্ব বিভাগ প্রকাশিত 'দিল্লী অউর উসকা অঞ্চল' থেকে সংগৃহীত।
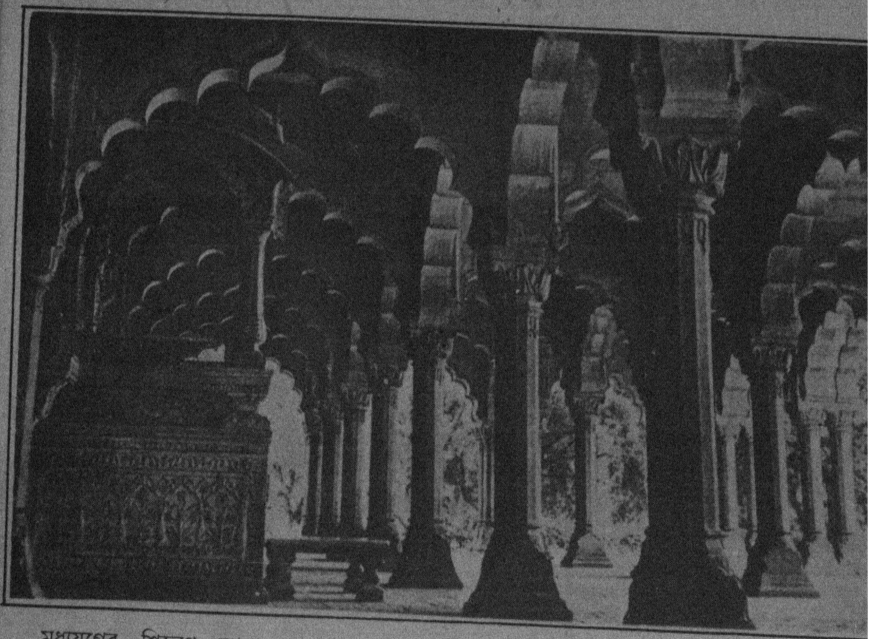
মধ্যযুগের শিহরণ জাগানো লালকেল্লায় ভাস্কর্য ও কারুকার্যখচিত সম্রাট শাজাহানের দিওয়ান-ই-আম। —পুরাতত্ত্ব বিভাগ প্রকাশিত 'দিল্লী অউর উসকা অঞ্চল' থেকে সংগৃহীত।

লালকেল্লায় রত্নখচিত স্তম্ভযুক্ত দিওয়ান-ই-খাস—একদা এখানেই ছিল ঐতিহাসিক ময়ূর সিংহাসন। বাঁদিকে সুদৃশ্য মতি মসজিদ। —পুরাতত্ত্ব বিভাগ প্রকাশিত 'দিল্লী অউর উসকা অঞ্চল' থেকে সংগৃহীত।
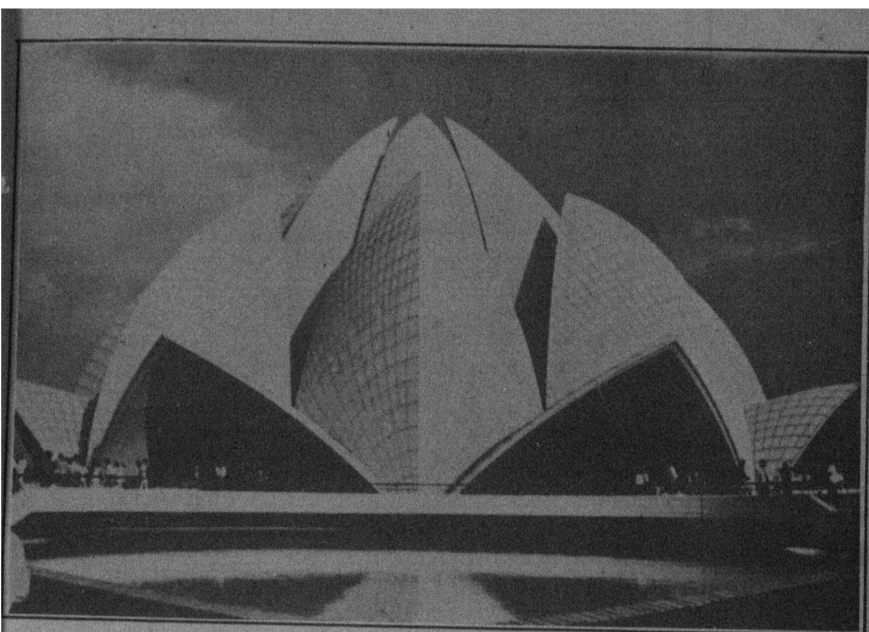
বাহাই সম্প্রদায় কর্তৃক নির্মিত প্রার্থনা মন্দির—যেটি দিল্লীর 'লোটাস টেম্পল' নামে প্রসিদ্ধ।
—ডাঃ প্রদীপ দাস
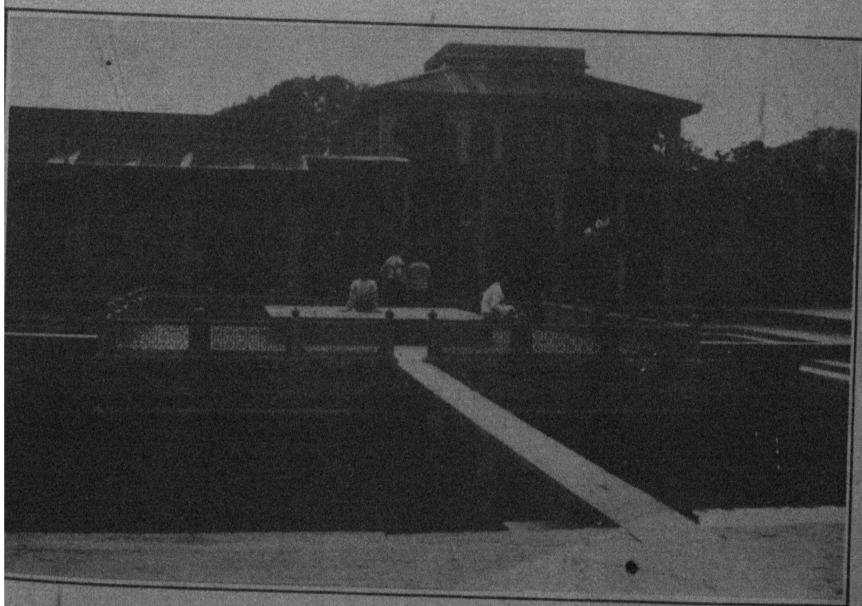
ফতেপুর সিক্রিতে তানসেন বারাদরি—একদা এখানে বসেই সম্রাট আকবরকে সঙ্গীত শোনাতেন সঙ্গীত সম্রাট তানসেন।
—লেখক
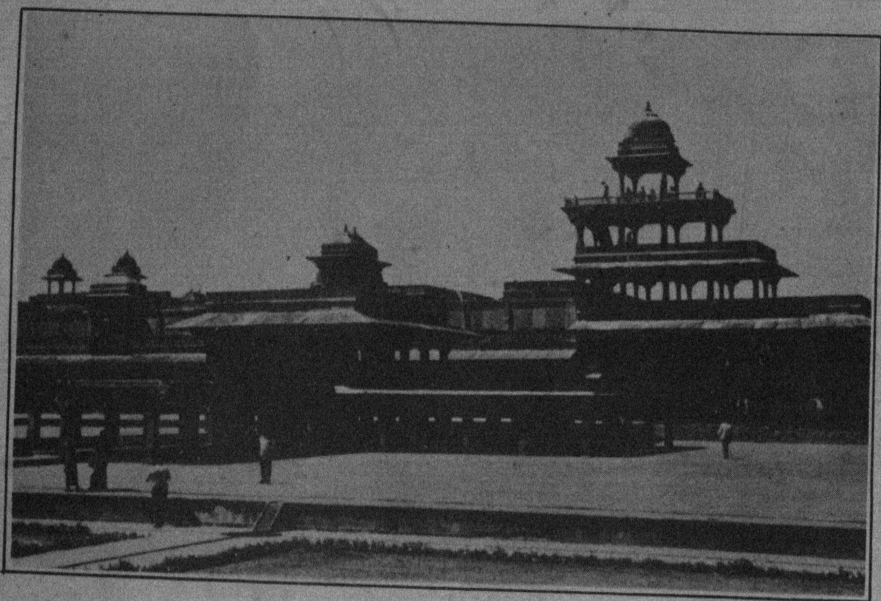
সম্রাট আকবরের অমরকীর্ত্তি ফতেপুর সিক্রির পাঁচমহল।

—ডাঃ প্রদীপ দাস

মোঘল স্থাপত্যকলার একটি বিশেষ রূপ—ফতেপুর সিক্রির প্রবেশ-তোরণের পিছনের একটি দৃশ্য।

—লেখক

শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্রে বৃন্দাবনের পথে

হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়লো তুফান এক্সপ্রেস। চলেছি মথুরা বৃন্দাবন। কলকাতার যাত্রীদের এই ট্রেনে যাওয়ার সুবিধে অনেক বেশী। পথে দুটো রাত ট্রেনে কাটিয়ে এলাম টুণ্ডলা জংশনে।

এই টুণ্ডলা জংশন থেকেই একটা পথ চলে গেছে মথুরা আগ্রা হয়ে দিল্লী, আর একটা গেছে সরাসরি দিল্লী। সুতরাং দিল্লীগামী যে কোন মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেনে এসে টুণ্ডলা নামলেই হলো। এখান থেকে বাস, টাঙ্গা, অটো, রিক্সা সবই যায় বৃন্দাবনে।

আবার মথুরা জংশন থেকেও যাওয়া যায় বৃন্দাবনে। তুফান এক্সপ্রেস দাঁড়ায় মথুরায়। এখান থেকে যাওয়া যায় বাস টাঙ্গা ট্যাক্সী রিক্সায়। মথুরা থেকে বৃন্দাবনের রেলপথের দূরত্ব ১৩ কি. মি.। হাওড়া থেকে মথুরা ১২০৮ কি. মি. আর মথুরা থেকে আগ্রার দূরত্ব মাত্র ৫৬ কি. মি.। মথুরা একটি গুরুত্বপূর্ণ রে: জংশন, তাই ভারতের যে কোন প্রান্তের সঙ্গে রেল যোগাযোগটা এর সঙ্গে পাকাপাকিভাবে রয়েই গেছে।

তবে টুণ্ডলায় নেমে বৃন্দাবনে গেলে যেমন সময় বাঁচে তেমনই বাঁচে সামান্য কিছু পয়সা। যারা আগে মথুরা দেখে পরে বৃন্দাবন ঘুরতে চায়—তাদের মথুরা জংশনে নামাই ভালো।

এ তো গেল রেলপথে বৃন্দাবনে যাওয়ার কথা। এবার বলি আমার কথা। এর আগেও বৃন্দাবনে এসেছি চারবার—এই নিয়ে পাঁচবার হলো। একবার এসেছিলাম কলেজ থেকে দিল্লী আগ্রা মথুরা বৃন্দাবন হয়ে আরও অনেক জায়গা—দুবার এসেছি ভ্রমণকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, একবার এক বন্ধুর সঙ্গে—এবারও সঙ্গী আমার এক বন্ধু। এই পাঁচবারে দেখা মথুরা বৃন্দাবন আর অভিজ্ঞতার উপরেই এই লেখা।

স্টেশন চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। কিছুটা হেঁটে এসে বাসে উঠতেই দেখলাম জায়গা দখল। সিটের উপর কোথাও রুমাল, কোথাও ব্যাগ ছাতা গামছা, কোথাও বা জায়গা রাখা হয়েছে খবরের কাগজ দিয়ে। সুতরাং দাঁড়িয়ে রইলাম ঘোড়ার মতো একটা পা ভেঙে—কৃষ্ণের মতো বাঁশি ধরে নয়, বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে। অন্যদের কথা বলতে পারবো না, তবে বাঙালীরা যে কৃষ্ণের অনুসরণকারী—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমিও এর ব্যতিক্রম নই। কোথাও কোন বাঙালীকে সোজা হয়ে বসতে, ঠায় দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে দেখিনি—শেখেনিও। যেমন ভারতের কোনও মন্দিরে এবং ছবিতে শ্রীকৃষ্ণ দু-পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এমনটা

দেখা যায় না কোথাও। এক পায়ে কাঁচি মেরে নইলে হাঁটু ভেঙে হামাগুড়ি দিয়ে হাসি হাসি মুখে যেন বলতে চাইছেন, 'সাবাস বেটা, মহাজনের পথই অবলম্বন করো—অনুসরণ করো। আমি যা বলি তা করো না, আমি যে ভাবে হামাগুড়ি দিয়ে চলি, এক পায়ে দাঁড়াই, সেই ভাবে তোমরাও চলো—দাঁড়াও।'

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, পনেরো থেকে শুরু করে পঁচাশী বছরের পাঁচসিকের চুপ্‌সে যাওয়া বেগুনের মতো মুখের বুড়ো বুড়ি—কি ছেলে কি মেয়ে—শিক্ষিত অশিক্ষিতেরও কোন ভেদ নেই—ভারতের যে কোন প্রান্তে গেলেই দেখা যায় ট্রেনে বাসে বসার জায়গা নিয়ে মিউজিক্যাল চেয়ারের মতো প্রতিযোগিতা। বিবাহিতা মহিলা হলে তার ছেলে মেয়ে স্বামীর—বিবাহিত পুরুষ হলে তার চোদ্দগুষ্টির, বন্ধু হলে বন্ধুর জায়গা রাখে। শুধু সামনে হলেই চলবে না—জানলার ধারে হওয়া চাই। আগের থেকে জায়গা দখলের ব্যাপারে প্রায় সবাইকেই দেখেছি একটা হুড়োহুড়ি করতে। দলবন্ধ ভ্রমণে—খেতে বসে নাকে মুখে দুটো গুজেই ছুটে চলেছে বাসে জায়গা রাখতে। ভাবটা এমন যেন বাপের সম্পত্তি—দখল হয়ে যাবে।

এই নিয়মের বাইরে যারা—তাদের দেখেছি, জানলার ধারে অথবা বসার ভালো জায়গা না পেলে মুখটা হয়ে যায় মা মরা ছাগলের মতো। অদ্ভুত ব্যাপার, সামান্য কয়েক ঘণ্টার ভ্রমণ অথচ অকারণ ভোগ করে মানসিক অশান্তি—কেউ কম কেউ বেশী।

যেমন ভারতীয় রেল মানেই জাতীয় সম্পত্তি। এতে আপনার আমার ঠাকুরদার, যথা নামগোত্রের আছে পূর্ণ অধিকার। তবে একশ্রেণীর যাত্রীদের কাছে এটা বাপের সম্পত্তি। প্ল্যাটফরমে ট্রেন ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই জানলা দিয়ে হাত গলিয়ে রুমাল ব্যাগ অথবা কাগজ ইত্যাদি দিয়ে জায়গা রাখে। অর্থাৎ এটা আমার জায়গা। অন্য কারও অধিকার নেই।

আবার এটাও দেখেছি, একজনের বসার জায়গা মেরে আর সকলে এমনভাবে এলিয়ে বসে যেন বিয়ের বাড়ীতে রান্না করতে বসেছে। একটু সরে বসতে বললে—কোথায় সরবো বলুন তো?

আরও একটা কৌশল দেখেছি, নিজের ব্যাগটা বসার সিটের পাশে রেখে—এখানে একজন আছে, বাইরে গেছে, এখনই আসবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে দেখবেন, সে আর আসছে না—যমালয়ে গেছে। ট্রেন ছাড়লে তখন ব্যাগটা তুলে কোলে নইলে সিটের নীচে রাখে।

এছাড়াও লক্ষ্য করেছি, বসার জায়গা ম্যানেজ করার চেণ্টা করে বিফল মহিলা পুরুষ যাত্রীদের মুখখানা। তখন ভাবটা এমন—এই জায়গা দখলের মতো ছোটলোকি ব্যাপারটাকে ঘৃণা করেন তিনি। আসলে অনেক ব্যাপারে সুযোগের অভাবে অথবা সম্মান নষ্টের ভয়ে অনেকেই ভালো সেজে বসে আছে। আর এইশ্রেণীর জীবগুলিই

ঘৃণা করে অপরকে—করে পরসমালোচনা। বাস কিংবা ট্রেন ভ্রমণে জায়গা রাখা আত্মসর্বস্ব স্বার্থপর এই সব মহিলা ও পুরুষযাত্রীরা কবে যে রাজভবন, রাইটার্স, তাজমহল কিংবা লালকেল্লার দেওয়ান-ই-আমে একটা রুমাল ফেলে দাঁড়িয়ে থাকবে—একমাত্র বৃন্দাবনের ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তা জানেন।

টুণ্ডলা থেকে বাস ছেড়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে এলো বৃন্দাবনে। উঠলাম লোই বাজারে বাসন্তীবাঈ ধর্মশালায়। থাকার জায়গার অভাব নেই রাধার কোল এই বৃন্দাবনে। অসংখ্য ধর্মশালা আর আশ্রম, গেস্ট হাউস ছড়িয়ে আছে এখানে। যেমন, শাহজী মন্দিরের কাছে অগ্রবাল ধর্মশালা, রেতিয়া বাজারে দিল্লীবালে ধর্মশালা, গো-শালার কাছে মির্জাপুর ধর্মশালা, দুসায়ত মহল্লায় জয়পুরিয়া ভবন, লোই বাজারে রাধাকান্ত মন্দির, বল্লীগঞ্জে যুগলবিহার, মণিপাড়ায় দিল্লীবালে ধর্মশালা, বৃন্দাবন রেলস্টেশনের কাছেই পচ্চীসিয়া ধর্মশালা।
এছাড়া ভারত সেবাশ্রম সংঘ তো আছেই। সারা ভারতে এদের অবদান কম নয়। বৃন্দাবন স্টেশন থেকে হাঁটা পথে মাত্র কয়েক মিনিট—ঠিক পিছনেই। ভারতের যে কোন প্রান্ত থেকে আগে চিঠি দিয়ে যোগাযোগ করে ভারত সেবাশ্রম সংঘে নিশ্চিন্ত মনে যাওয়া যেতে পারে। এই সংঘের প্রধান কার্যালয় কলকাতায়। ঠিকানা—২১১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা-১৯। বৃন্দাবনে—ভারত সেবাশ্রম সংঘ, পোঃ-বৃন্দাবন, জেলা-মথুরা. উত্তরপ্রদেশ।
বৃন্দাবন ছাড়াও বেনারসের ঠিকানা, বিদ্যাপীঠ রোড, সিগরা, বারাণসী-১, উত্তর-প্রদেশ। হরিদ্বারে—পোঃ-হরিদ্বার, জেলা-সাহারাণপুর, উত্তরপ্রদেশ। গয়াতে—স্বরাজ্যপুরী রোড, জেলা-গয়া, বিহার। গয়া স্টেশনেও এই সংঘের অফিস আছে। পুরীতে—স্বর্গদ্বার রোড, পুরী, উড়িষ্যা। আর আছে নবদ্বীপে—আমফুলিয়া পাড়া, পোঃ-নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া।
অল্প ভাড়ায় মাঝারী একটা ঘর পেলাম ধর্মশালায়। বিছানা-পত্র কিছু নেই। তবু ভালো যে কিছু নেই। অনেক ধর্মশালায় যা আছে তা ভিখিরীদেরও ব্যবহারের অযোগ্য। কম্বল আমার সঙ্গী তাই অসুবিধে হলো না। ধর্মশালা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তবে বারোয়ারী পায়খানা বাথরুম। এমনটা অধিকাংশ ধর্মশালায়। সকালে লাইন পড়লে গালে হাত দিয়ে কৃষ্ণ- চন্তা ছেড়ে পরকালের চিন্তা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না যাত্রীদের। বিশেষ করে মেয়েদের যে কি অসুবিধে হয় তা একমাত্র রাধাই জানেন! তার উপরে যদি যুবতী কিংবা বিগত যৌবনা না হয়। তবে ধর্মশালার পায়খানা বাথরুমে যাওয়ার সময় বুড়ি দিদিমাদের মধ্যে কৃষ্ণের মতো বাৎসল্যভাবের অভাব দেখিনি কোথাও।

একটু ভালোভাবে দেখতে হলে অন্ততঃ কয়েকটা দিন থাকতে হবে বৃন্দাবনে। ছুটি, নোট, ইংলিশ মিডিয়াম, ব্যবসা—এ-সব চিন্তা নিয়ে বৃন্দাবনে গেলে দেখা হবে না কিছুই। সুতরাং এদের না যাওয়াই ভালো। তাহলে সব কুলই বাঁচবে। কারণ, বৃন্দাবন—এ এমনই এক নগরী, যেখানে কৃষ্ণপদরজে প্রতিটি ধূলিকণা বৃক্ষলতা পবিত্র—যেখানে ত্রিলোচন মহাদেব গোপীরূপ ধারণ করে দেখেছিলেন দুর্লভ দর্শন রাসলীলা—যেখানে ব্রহ্মা নিজ জন্মলাভের আশায় চোখের জলে সৃষ্টি করেছিলেন সরোবর—যেখানে একদা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ প্রেমবিহ্বল হয়ে গড়াগড়ি দিয়েছিলেন ব্রজের পথে পথে—যেখানে রূপ সনাতন শ্রীজীব প্রমুখ গোস্বামীগণ প্রাণত্যাগ করেছিলেন কৃষ্ণপ্রেমের সুধারস পান করতে করতে—যেখানে ভারতের প্রায় প্রতিটি সাধকই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তাঁদের জীবন-সাধনায়। অতএব বৃন্দাবনকে দেখতে হলে, জানতে হলে, থাকতে হবে কয়েকটা দিন।

এখন শীতকাল। চড়া রোদের বালাই নেই। সকালে উঠেই বেরিয়ে পড়লাম সঙ্গীকে নিয়ে অসংখ্য মহাপুরুষ আর শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত বৃন্দাবন দর্শনে।

এখানকার সমস্ত রাস্তাই পাকা। কোথাও পীচের, কোথাও সিমেণ্টে বাঁধানো। আর রিক্সা এখানে অগুণতি। প্রায় সব রিক্সাওয়ালাই বাঙালী। পেটের দায়ে এরা এসেছে পশ্চিমবাংলা থেকে। এদেরই একজনের সঙ্গে কথা হলো, বৃন্দাবনে রিক্সায় করে যেখানে যাওয়া সম্ভব এবং যা যা দেখার আছে, তা দেখাবে—বেলা যতই হোক না কেন। আমি আর সঙ্গী উঠলাম রিক্সায়—চললো বাসন্তীবাঈ ধর্মশালার কাছ থেকে।

বাঁধানো রাস্তা ধরে চললো রিক্সা। খুব বেশী চওড়া রাস্তা নয় তবে যাতায়াতে কোন অসুবিধে নেই। পথের দু-পাশে পাকা বাড়ী—ছোট বড় দোকান। বৃন্দাবনে প্রতিটি বাড়ীকে বলে কুঞ্জ।

বৃন্দাবন নাম হওয়ার পিছনে কিংবদন্তী আছে দুটি। কেদার নামে এক রাজা ছিলেন পৌরাণিক যুগে। তাঁর কন্যার নাম ছিল বৃন্দা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত হরিভক্তিপরায়ণা। সংসার জীবন ছেড়ে এক সময় বৃন্দা গৃহত্যাগ করে চলে যান বনে। কঠোর তপস্যা করে করেন কৃষ্ণমন্ত্রের সাধন। যেখানে বসে তিনি তপস্যা করেন—সেই ক্ষেত্রটিই আজ বৃন্দাবন নামে প্রসিদ্ধ। আবার কারও মতে, শ্রীমতী রাধার নাম আছে মোট ষোলটি। তার মধ্যে অন্যতম নাম একটি বৃন্দা। তাঁরই লীলা বা ক্রীড়াকুঞ্জ বলে নাম হয়েছে এর বৃন্দাবন। বৃন্দা দেবীই বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

ব্রজ নামে কোন স্থান নেই ভৌগোলিক মানচিত্রে। একমাত্র এই নামের উল্লেখ আছে শ্রীমদ্‌ভাগবতে। তবে ব্রজের আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে একটা—আছে নিজস্ব বিশেষ সংস্কৃতি, ভাষা (ব্রজবুলি) আর অনুপম সাহিত্য।

১২টি বন, ২৪ টি উপবন আর ৫টি পর্বত নিয়েই প্রাচীন ব্রজ। মথুরা, গোকুল, বৃন্দাবন, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গিরিগোবর্ধন প্রভৃতি স্থানই ব্রজমণ্ডল নামে প্রসিদ্ধ। তবে ব্রজধামের কাল্পনিক বিস্তার আরও অনেক বেশী জায়গা জুড়ে—যে বিস্তার ভক্ত সাধক সুরদাসজীর গানের কলিতে পাওয়া যায়—'ব্রজ চুরাশী ক্রোশে নিরন্তর খেলা করেন বনমোহন।'

আমাদের নিয়ে রিক্সা দেখতে দেখতে এসে দাঁড়ালো লালাবাবুর মন্দিরের সামনে। রিক্সা থেকে নেমে পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালাম নাট মন্দিরে। বিশাল এই মন্দিরটি পাথরে নির্মিত। বড় বড় থাম। ঝকঝক করছে মন্দির প্রাঙ্গণ, নাট মন্দির। সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত না হলেও এই মন্দিরের সৌন্দর্য মোহিত করে দেয়ার মতো। পাথরের বাঁধানো বেদীতে আকর্ষণীয় সুদর্শন মূর্তিটি রাধাকৃষ্ণের। এর ডানদিকে স্থাপিত বিগ্রহটি ললিতা সখীর। সারা বৃন্দাবন যেন আলোকিত করে আছে বিগ্রহ—মন্দিরও।

বিশাল এলাকা নিয়ে স্থাপিত হয়েছে এই মন্দিরটি। এরই প্রাঙ্গণে রয়েছে দান ও অতিথিশালা। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মাণ করে লালাবাবু শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপন করেন মন্দিরে। এই মন্দির নির্মাণে তৎকালীন ব্যয় হয় আনুমানিক ২৫ লক্ষ টাকা।

এখন ভ্রমণ মরশুম। দলে দলে আসছে তীর্থযাত্রী, ভ্রমণকারী। তবে এই ভ্রমণকারী বা তীর্থযাত্রীদের মধ্যে দেখছি বৃদ্ধ বৃদ্ধার সংখ্যাই বেশী। যুবকের চেহারা প্রায় চোখেই পড়ছে না। মাঝ বয়েসীও আছে প্রচুর। হিন্দী ভাষাভাষীর গ্রাম্য নারী-পুরুষের যেন ঢেউ বয়ে চলেছে এখানে। চেহারায় আর সাজ-পোশাকে আর্থিক প্রাচুর্যের প্রকাশ না থাকলেও ঈশ্বরে বিশ্বাস ভক্তির প্রকাশ রয়েছে পূর্ণমাত্রায়। দেখছি, দলের পর দল আসছে, পুজো দিচ্ছে—চলে যাচ্ছে। যেন আনন্দের ঢেউ বয়ে চলেছে এই সাত সকালে—লালাবাবুর মন্দিরে।

বৃন্দাবন তথা সারা ভারতে লালাবাবু এক অবিস্মরণীয় নাম। ভক্ত সমাজ এক ডাকে যাঁকে চেনেন সেই লালাবাবু জন্মগ্রহণ করেন আনুমানিক ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকৃত নাম ছিল কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। জীবনের কোন একদিন একটি বিশেষ সময়ের কথা। কাছারি বাড়ীর কাজ কর্ম শেষ হয়ে গেছে। তাই আর বসে রইলেন না জমিদার লালাবাবু। ফিরে চলেছেন তাঁর নিজের প্রাসাদে। পাইক বরকন্দাজ আর ভৃত্যের দল রয়েছে তাঁর তাঞ্জামের পিছনে।

শীতকাল। পড়ন্ত বেলা। ভাবলেন, গঙ্গাতীরে একটু বেড়িয়ে তারপর ফিরবেন প্রাসাদে। বাহকেরা তাঁর আদেশ মতো নিয়ে এলেন গঙ্গাতীরে। তাঞ্জাম নামালেন

একটি গাছের তলায়। সঙ্গেই রয়েছে হুকাবরদার। নরম তাকিয়ায় হেলান দিয়ে কল্কেতে তামাকু চাড়িয়ে ফরসীর নলটি মুখে পুরে দিলেন তিনি। রমণীয় হয়ে উঠলো জমিদার লালাবাবুর কাছে আলস্য মন্থর শীতের প্রায় সন্ধ্যা। মন তাঁর উধাও হয়ে গেল সুগন্ধী অঙ্গুরী তামাকের ধোঁয়া কুণ্ডলীর সঙ্গে।
ঠিক এমনই এক মুহূর্তে হঠাৎ একটি ছোট মেয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো লালাবাবুর কানে, 'বাবা, বেলা যে যায়। ওঠো এবার। দিন যে শেষ হয়ে এলো।'
চমকে উঠলেন লালাবাবু, যেন বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হলেন। তির্যক গতিতে এ-ব্যাকুল আহ্বান বিদ্ধ হলো একেবারে অন্তরের মর্মমূলে। একটা ঝাঁকুনি খেলেন। হাত থেকে খসে পড়লো ফরসীর নল। এক অদ্ভূত আলোড়ন জেগে ওঠে সর্বসত্তায়। একের পর এক প্রশ্ন আসে অন্তরে। সত্যিই তো বেলা যে যায়। অস্বীকার করার কোন উপায়ই নেই এই যাওয়াকে। মনের চোখে ভেসে ওঠে পরম সত্যরূপ। গঙ্গার পর-পারে ধূসর সন্ধ্যা যেমন ঘনিয়ে আসছে—তেমনই ধীরে ধীরে নেমে আসছে চিরবিরতির যবনিকা তাঁর নিজের জীবনপ্রান্তে—আসছে সমস্ত এ-সৃষ্টির জীবজগতের মাঝে। কেবল এই একই ধ্বনি অনুরণিত হতে থাকে লালাবাবুর অন্তরসত্তায়—'বেলা যে যায়, বেলা যে যায়।'
তাঞ্জাম ছেড়ে লালাবাবু তখনই ছুটে গেলেন ধীবর কন্যার কাছে। সজল চোখে বললেন, 'মা, আজ আমার বন্ধনমুক্তি হয়েছে তোর কথায়। তোর এ-ঋণ কখনও শোধ করতে পারবো না আমি। সত্যিই জীবনের বেলা যে যায়। রাধারাণীই ডেকেছেন তোর মুখ দিয়ে। ডাক দিয়েছেন বৃন্দাবনে যাওয়ার। সেখানেই চলে যাব চিরতরে। চিরসুখী হয়ে থাক্ মা।'
মুহূর্তে আমূল পরিবর্তন ঘটে যায় লালাবাবুর জীবনে। আকস্মিক আহ্বানে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় মোহনিদ্রা। অপরূপ এক রূপান্তর ঘটে যায় এই মহাভোগীর জীবনে। ফিরে এলেন প্রাসাদে।
বিপুল ধনৈশ্বর্য, অফুরন্ত বিলাস, বৈভব ও মর্যাদায় লালাবাবু তখন পূর্বভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মহাপরাক্রান্ত ভূম্যাধিকারী মহাবিলাসী রাতটুকু কাটালেন কোনরকমে। স্ত্রীপুত্র আত্মীয় পরিজনের সমস্ত অনুরোধ উপেক্ষা করে, সর্বস্ব ত্যাগ করে কাঙাল-বেশে চলে গেলেন ইষ্টধাম বৃন্দাবনে। পরবর্তীকালে তিনি নির্মাণ করেন ইষ্টদেবের বিশাল মন্দির। মহাসমারোহে মন্দিরে স্থাপন করেন মুরলীধরের নয়নাভিরাম বিগ্রহ। নিত্য ধ্যান জপ তপে থেকে—একই সঙ্গে দান আর তীর্থের সংস্কার করে তিনি দিন কাটাতে লাগলেন দীনহীন কাঙালের বেশে।
এইভাবে জীবনের শেষ ভাগটা এখানেই অতিবাহিত করেন লালাবাবু। রাধাকৃষ্ণ লীলার অনন্ত বৈচিত্র্য দর্শন করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বৃন্দাবনেই। মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি তুলসী মঞ্চের মধ্যে সেই মহাত্মার সমাধি-মন্দিরটি অতীত ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে আজও।

●

লালাবাবুর মন্দির দর্শন করে এসে বসলাম রিক্সায়। আবার শুরু হলো চলা। অসংখ্য বৃদ্ধারা কেউ যমুনায় স্নান করে ফিরছেন—কেউ চলেছেন স্নানে। এদের কোন কোন দল চলেছেন কীর্ত্তন করতে করতে। মাঝে মাঝেই কানে ভেসে আসছে একটিই ধ্বনি—'জয় রাধে—জয় রাধে।' রাধা নামে মুখরিত হয়ে আছে বৃন্দাবন। এখানে কারও সঙ্গে প্রথম দেখা হলে বা সকালে প্রথম দর্শনেও কথা শুরু হয় 'জয় রাধে' বলে। আবার এটাও দেখেছি, একদিন এক দোকানদারের সঙ্গে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল আর এক দোকানদারের। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা মুখ থেকে চলে গেল হাতাহাতিতে। তখন দেখলাম, একজন ঘুষি চালাচ্ছে জয় রাধে বলে। মার খেয়ে প্রতিপক্ষও ঘুষি চালালো মুখে জয় রাধে বলে। বেশ খুশীই হয়েছিলাম রাধা নামের মাহাত্ম্য দেখে।

তবে আর যাইহোক না কেন, বৈষ্ণব ধাম এই বৃন্দাবন সম্বন্ধে বিখ্যাত বৈষ্ণব সিদ্ধ-সাধক চরণদাস বাবাজী তাঁর ভক্তদের বলতেন, শুধুমাত্র মাধুর্য্যের ধাম বলে বৃন্দাবনকে চিহ্নিত করা ঠিক নয়। কারণ পুতনা বধ থেকে শুরু করে কালীয়দমন এবং গিরি গোবর্ধন ধারণ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের যে ঐশ্বর্যের প্রকাশ রয়েছে বৃন্দাবনে—তার প্রতিও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন তৎকালীন বৈষ্ণব সাধকদের।

সাইকেল রিক্সা এসে দাঁড়ালো গোদাবিহার মন্দিরের সামনে। এখানকার দর্শনীয় স্থানগুলির একটার থেকে আর একটার দূরত্ব মোটেই বেশী নয়। রিক্সায় ওঠার পর একটা মন্দির থেকে আর একটা মন্দিরে যেতে সময় লাগে মাত্র কয়েক মিনিট।

প্রধান ফটক পেরিয়ে কিছুটা মন্দির চত্বর—তারপরেই এলাম মূল মন্দিরে। অবাক হয়ে দেখলাম বিশাল এক লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তি। এত বড় মূর্তি আমি সারা ভারতে এর আগে কোথাও দেখিনি। সুদর্শন এই মূর্তি দেখলে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। মূল বিগ্রহকে কেন্দ্র করে অসংখ্য কৃষ্ণলীলার মূর্তি সাজানো রয়েছে মন্দিরের দুপাশে—ডাইনে, বাঁয়ে।

মোট নয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে মন্দিরের ভিতরে। যেমন, রঘুবংশ দর্শন, আচার্য পীঠ, মহাপুরুষ দর্শন, ব্রহ্মা কক্ষ, বৈকুণ্ঠদ্বার, তপোবন, শিবলোক ইত্যাদি। এই মন্দিরে প্রায় শ-তিনেক বিগ্রহ আছে—বিভিন্ন দেবদেবী, ঋষি, মহর্ষি, রাজর্ষি এবং সাধকের। আর রয়েছে নবগ্রহের বিগ্রহ, সূর্যরথ। দেয়ালের পাশে বাঁধানো কাচের শো-কেসের মধ্যেই রয়েছে এই বিগ্রহগুলি। বিষ্ণুর দশ অবতারের মূর্তি-গুলিও বড় সুন্দর।

ধীরে ধীরে সমস্ত বিগ্রহগুলি দেখে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসার সময় বাঁ-পাশে পড়লো সারি সারি—গোরক্ষনাথ, মহাবীর স্বামী, গুরুনানক, চট্টাচার্য, নিম্বার্কাচার্য্য, সুরদাস, শংকরাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, রামানন্দ, সুদর্শন স্বামী, বল্লভাচার্য্য, তুলসীদাস, রামদাস, দাদুদয়াল, মীরাবাঈ, জ্ঞানেশ্বর, শ্রীহরিদাস, স্বামী হরিবংশজী প্রমুখ মহাপুরুষের মূর্তি। এগুলি সব মাঝারী আকারের।

এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে দক্ষিণ এবং উত্তর ভারতের মন্দিরশৈলীর সংমিশ্রণে। এটি নির্মাণ করেন স্বামী বলদেবাচার্য্য। লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তিটি উচ্চতায় ১৮ ফুট। আরও দুটি আকর্ষণীয় মূর্তি রয়েছে এই মন্দিরে—গড়ুড় এবং মহাবীরজী। এরাও উচ্চতায় কম নয়। প্রত্যেকেই ১১ ফুট করে। প্রায় ছয় বিঘে জমি নিয়েই স্থাপিত হয়েছে এই গোদাবিহার মন্দির। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির স্থাপনে আর্থিক সহায়তা করেন মধ্যপ্রদেশের বিজাবরের রাজা সামন্ত সিং।
এই মন্দির থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটেই চলে এলাম কাচ মন্দিরে। সামান্য একটু পথ। একেবারে কাছেই। বাঁধানো মন্দির চত্বর ছেড়ে ঢুকলাম মন্দিরের ভিতরে। একেবারে চমকে যাওয়ার মতো মন্দির। শত শত টুকরো কাচ আর বেলজিয়াম গ্লাস দিয়ে নির্মিত হয়েছে এটি। তাতে রয়েছে নানা চিত্রকলার বাহার। চারজন সখীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ এবং রূপার সিংহাসনের উপর পাল্কীতে শুয়ে আছেন বালগোপাল—এই দুই রূপের বিগ্রহ রয়েছে মন্দিরে। এখানে দেখতে বেশী সময় লাগলো না। বেরিয়ে এলাম মন্দির থেকে।
রিক্সাওয়ালা ওর নিজের সুবিধে মতো পথ ধরেই নিয়ে চলেছে এ-মন্দির থেকে সে-মন্দিরে। কখনও পড়ছে সরু রাস্তা আবার কখনও মাঝারী চওড়া। পথের দু-পাশেই বাড়ী আর দোকান। তামা কাঁসার বাসন খেলনা ফটো তো আছেই—আর আছে অসংখ্য খাবারের দোকান। অন্যান্য তীর্থে যেমন দেখা যায়—বৃন্দাবনেও তার ব্যতিক্রম নেই।
এবার রিক্সা সোজা নিয়ে এলো আমাদের ব্রহ্মচারী মন্দিরে। বিশাল এই মন্দিরের প্রাঙ্গণ ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে এলাম নাট মন্দিরে। এর বিশালতাই আকর্ষণ করে মনকে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নাট মন্দির—মন্দির প্রাঙ্গণও। মন্দির মধ্যে রয়েছে শ্রীরাধাগোপাল, শ্রীহংসগোপাল আর নৃত্যগোপাল নামে তিনটি বিগ্রহ। এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন গোয়ালিয়রের রাজা জিয়াজীরাও সিন্ধিয়া—১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। রাজার গুরুজী গিরিধারী দাস ব্রহ্মচারীর উপদেশেই এটি নির্মিত হয়। ব্রহ্মচারীজী নিজহাতেই প্রতিষ্ঠা করেন তিনটি বিগ্রহ। সমগ্র বৃন্দাবনে এই মন্দির প্রসিদ্ধি-লাভ করেছে ব্রহ্মচারীর মন্দির নামে।

রিক্সায় ওঠা বসা নামা আর দেখা—এই চলছে সমানে। চলতে শুরু করলো রিক্সা। ভাবছি প্রাচীন বৃন্দাবনের কথা। মহাভারতীয় যুগ—আনুমানিক ৪৪৩৮ বছরেরও আগের বৃন্দাবনের এক মনোরম বর্ণনায় শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্দের ১৫শ অধ্যায়ে শুকদেব বলেছিলেন রাজা পরীক্ষিৎকে—যখন শ্রীকৃষ্ণের বয়েস ছিল মাত্র ছয়—
"…রাম ও কৃষ্ণের ছয় বৎসর বয়স হলে ব্রজে সখাদের সঙ্গে গাভী চরাতে চরাতে ইতস্তত চরণস্পর্শের দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনকে পবিত্র করতে লাগলেন। একদিন শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে মিলে নিজের বশগায়ক গোপগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে বাঁশি বাজাতে

বাজাতে গাভীদের আগে নিয়ে ফুলে-ভরা এক বনে প্রবেশ করলেন। মহারাজ, বৃন্দাবন অতি মনোহর। মধুর গুঞ্জনকারী অলি, মৃগ ও পাখীতে সর্বদা তা পরিপূর্ণ। সেখানে মহতের মনের মত পূর্ণ সরোবরের স্বচ্ছ জলে বাতাস বয়ে যায় আর প্রস্ফুটিত পদ্মের সৌরভে সে বাতাস ভরপুর হয়। আদিপুরুষ ভগবান ঐ বনে বেড়াতে বেড়াতে দেখলেন যে এক জায়গায় ফল-ফুলের ভারে অবনত হয়ে গাছের মাথাগুলো তাঁদের চরণ স্পর্শ করেছে। তা দেখে বিস্মিত এবং আনন্দিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে সম্বোধন করে বললেন, দেববর, এইসব গাছগুলো ফুল-ফল উপহার নিয়ে তাদের মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছে। যে পাপে এদের তরুজন্ম হয়েছে এরা সে পাপের শাস্তি প্রার্থনা করছে। হে অনঘ, হে আদিপুরুষ, এইসব ভ্রমর তোমার সর্বলোকপাপন যশোগান করতে করতে তোমার অনুগামী হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে এরা তোমার সেবকপ্রধান মুনি, তুমি এদের অভীষ্ট দেবতা। বনে তুমি প্রচ্ছন্ন এরা তোমায় ত্যাগ করছে না অর্থাৎ তুমি মানুষের বেশ ধরায় মুনিরাও ভ্রমরবেশে তোমার উপাসনা করছেন। ময়ূর তোমাকে দেখে আনন্দে নৃত্য করছে, গোপীদের মতো হরিণীরা মধুর দৃষ্টি দ্বারা এবং কোকিলগুলি সুমধুর কুহু রবে তোমার সন্তোষ জন্মাচ্ছে। সাধুদের স্বভাবই এই যে তাঁদের নিজেদের যা কিছু থাকে গৃহে আগত মহাজনকে তার সবই সমর্পণ করেন। তোমার চরণ স্পর্শে আজ এই বৃন্দাবন ও এর তরুলতা ধন্য হল, তোমার নখস্পৃষ্ট তরুলতাকেও ধন্য বলে প্রশংসা করি। এখানকার নদ, নদী, পর্বত, এমনকি হরিণ, পাখী প্রভৃতিরাও তোমার সদয় দৃষ্টিপাতে ধন্য। আর এই গোপীরা ধন্য, কারণ লক্ষ্মীও এক সময় যাঁর স্পৃহা করেছিলেন সেই তোমার বক্ষঃস্থল অনায়াসে তাঁরা লাভ করছেন। ১-৮

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের শোভায় প্রীত হয়ে পর্ব্বতের কাছে, নদীর তীরে পশুচারণ করতে করতে সঙ্গীদের নিয়ে আনন্দে বিহার করতে লাগলেন। কোথাও অলিকুল মধুপানে মত্ত হয়ে গুন্ গুন্ শব্দে গান করলে বলদেবের সঙ্গে মিলে তিনিও সে রকম গান করেন। সঙ্গীরা সে সময় তাঁর লীলা-মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। কোথাও মধুর কূজনকারী শুকের সঙ্গে তিনি স্বর মেলালেন। কখনও কোকিলের কুহু রবের অনুরূপ মনোহর ধ্বনি করতে থাকেন। কলহংসদের সঙ্গে মধুর রব করছেন, কখনও বয়স্যদের হাসিয়ে ময়ূরের সঙ্গে নৃত্য করছেন। কখনও বা গাভী ও গোপদের নাম ধরে মেঘগম্ভীর স্বরে দূরের পশুদের ডেকে আনতে লাগলেন। কখনও চকোর, বক, চক্রবাক, ভরদ্বাজ (ভারুই পাখী) ও ময়ূরের অনুকরণ করে শব্দ করতে করতে ইতস্তত ছুটে বেড়ালেন, কখনও বা ভান করে দেখালেন অন্য পশুদের মতো বাঘ সিংহ দেখে ভয় পেয়েছেন। কোথাও বিহারে শ্রান্ত বলরামকে গোপবালকের কোলে শুইয়ে দিয়ে নিজে পাদ মর্দনাদি দ্বারা তাঁর সেবা করেন। কোথাও দুই ভাই হাত ধরাধরি করে হাসতে হাসতে নাচ, গান ও লাফালাফি করতে করতে মল্লযোদ্ধা গোপবালকদের প্রশংসা করেন। কোথাও বাহুযুদ্ধে পরিশ্রান্ত হয়ে দুর্বলের

মতো ভাব করে গাছের নীচে ঝরাপাতার শয্যায় গোপবালকদের কোলে মাথা দিয়ে শয়ন করেন। শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে শয়ন করলে কয়েকজন গোপবালক তাঁর পদসেবা ও কয়েকজন পুণ্যশালী বালক পাতার পাখা দিয়ে তাঁকে হাওয়া করতে থাকে। কেউ স্নেহার্দ্রচিত্ত হয়ে তাঁর মনোহর কণ্ঠস্বরের নকল করে ধীরে ধীরে গান করে। মহারাজ, লক্ষ্মীদেবী যাঁর পদসেবা করেন সেই হরি নিজের ইচ্ছাতেই আপন অচিন্ত্য মায়াশক্তিকে প্রচ্ছন্ন রেখে গোপবালকদের সঙ্গে তাঁদের মত হয়ে খেলা করেন। তবু অসুরবধ ইত্যাদি অলৌকিক কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর ঈশ্বরত্ব প্রকাশ পেত।" ৯-১৯

আজ থেকে একশো বছরেরও আগের—বাংলা ১২৯৭ সালের বৃন্দাবনের এক মনোজ্ঞ বর্ণনায় শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁর শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ নামক গ্রন্থে লিখেছেন,

"কালীদহ দর্শন করিয়া আমরা যমুনার তীরে তীরে যাইয়া শ্রীবৃন্দাবনের নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। বনের স্বাভাবিক শোভা দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ছোট বড় সমস্তগুলি গাছই অন্যান্য স্থানের গাছপালা হইতে ভিন্ন প্রকারের দেখিলাম। উচ্চ উচ্চ প্রাচীন ও বৃহৎ বৃক্ষসকলও সর্বত্রই নতশিরে রহিয়াছে। উহাদের শাখা প্রশাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইয়া ক্রমে ভূমিসংলগ্ন হইয়াছে। দেখিলেই মনে হয়, যেন শ্রীধামের রজস্পর্শমানসেই বৃক্ষসকল শাখাবাহু বিস্তার করিয়া উহা পাইবার জন্য সচেষ্ট রহিয়াছে। যে সকল প্রাচীন বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ভূমিসংলগ্ন হইয়াছে, তাহারাও যেন রজস্পর্শে পূর্ণকাম হইয়া স্থির সমাধি অবলম্বন করিয়াছে। বৃক্ষের এইপ্রকার আশ্চর্য্য শোভা এ জীবনে আমি আর কোথাও দেখি নাই। শ্রীবৃন্দাবনের ছোট বড় সমস্ত বৃক্ষলতারই শাখা প্রশাখা এমনকি পত্রাদি পর্য্যন্ত নতমুখ। বৃক্ষের এইপ্রকার অপূর্ব্ব-সৃষ্টি ও সৌন্দর্য্য একমাত্র এই স্থানেই দেখিলাম। এই সকল বনের মধ্যে স্থানে স্থানে সুন্দর সুন্দর ভজনকুটীর পরিত্যক্ত ও শূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে দেখিলাম। ঠাকুর (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী) বলিলেন, এক সময়ে এ সকল ভজনকুটীরে কত বৈষ্ণব মহাত্মারা সাধন ভজন করেছেন।···

আমরা ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনের ভিতর দিয়া চলিলাম। দুই পার্শ্বের ময়ূর ময়ূরী স্থানে স্থানে বিচরণ করিতেছে, খেলা করিতেছে, আনন্দে পেখম ধরিয়া নৃত্য করিতেছে, দেখিতে লাগিলাম। আমাদের ৫/৬ হাত তফাতে থাকিয়াও তাহাদের ভয়ের লেশ নাই, পালাইবার চেষ্টা নাই, স্ফূর্ত্তিরও বিরাম নাই। দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম। বনের হরিণগুলিও মানুষকে যেন মানুষই মনে করে না, তাহারা নির্ভীকভাবে স্বচ্ছন্দ মনে নিঃসঙ্কোচে মানুষের গা ঘেঁষিয়া চলাফেরা করে। ভগবানের রাজ্যের এই অপূর্ব্ব ব্যাপার প্রত্যক্ষ না করিলে কখনও বিশ্বাস করিতাম না। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'বনের হরিণ, উড়ো ময়ূর, এরাও এত নির্ভীক কেন?' ঠাকুর বলিলেন—'শ্রীবৃন্দাবনে যে হিংসা নাই, তাই এ স্থানের জীবজন্তু, পশুপক্ষী মানুষের নিকটেও এত নির্ভয়।'

আমরা শ্রীবৃন্দাবনের গভীর অরণ্যে পশুপক্ষী, বৃক্ষলতার এই সকল ভাব ও অসাধারণ অবস্থা দেখিয়া সন্ধ্যার পরে কুঞ্জে ফিরিয়া আসিলাম। শ্রীবৃন্দাবনে এই সকল স্থানে উপস্থিত হইলে, লোকালয়ে আর ফিরিয়া আসিতে প্রবৃত্তি হয় না। বোধ হয়, চিরজীবন এ সব স্থানে থাকিলেও ইহার নিত্য নতুনত্বের নিবৃত্তি ঘটে না।"

এখন বৃন্দাবনে লোকালয় বেড়েছে—বেড়েছে অসংখ্য যাত্রী সমাগম, তবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর ভগবদ্‌ভাবের এতটুকুও ঘাটতি চোখে পড়েনা কোথাও। অযোধ্যায় সীতারাম, কাশী যেমন হর হর মহাদেব গানে মুখরিত হয়ে আছে শত শত বছর ধরে, তেমনই রাধাকৃষ্ণের নামগানে সদা মুখরিত হয়ে রয়েছে কৃষ্ণপ্রেমের লীলাভূমি এই বৃন্দাবন। এখানকার যে পথে, যে গলিতে চলেছি—রাধাকৃষ্ণের নাম কানে আসেনি—এমন গলি-পথ পাইনি একটাও।
রিক্সায় ঘুরে ঘুরে চলছে আমাদের বিভিন্ন মন্দির আশ্রম পরিক্রমা। সামান্য সময়ের মধ্যেই এসে গেলাম রঙ্গজীর মন্দিরে। এই মন্দির বৃন্দাবনে শেঠের মন্দির নামে প্রসিদ্ধ। কাচ মন্দির থেকে রঙ্গজীর মন্দির একেবারেই কাছে।
রিক্সা থেকে নেমে এসে দাঁড়ালাম মন্দিরের প্রধান ফটকে। পায়ে পায়ে ফটক পার হতেই দেখলাম বিশাল মন্দির-প্রাঙ্গণ। উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। সবই বেলে পাথরের। দক্ষিণ ভারতের আদলে নির্মিত হয়েছে প্রধান ফটক বা গোপুরম। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে যেন একটা দুর্গ।
মূল মন্দিরের দু-পাশে পূজারী ব্রাহ্মণ এবং অতিথিদের থাকার জন্য সারি সারি রয়েছে ৫৪টি করে ঘর। পূজারী ব্রাহ্মণেরা সকলেই দক্ষিণ ভারতীয়। দক্ষিণী স্থাপত্য কলায় নির্মিত বিশাল এই মন্দিরটি শিল্প-সুন্দরের পরিচয় বহন করে আসছে আনুমানিক ১৮৫০/৫২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। এই মন্দিরটি নির্মাণ করতে সময় লেগেছিল এগারো বছর। বড় বড় ফটক আছে মোট সাতটি। রামানুজ সম্প্রদায়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এই মন্দির।
গোকুলদাস পারেখ ছিলেন গুজরাটি। নিঃসন্তান গোকুলদাস ছিলেন গোয়ালিয়রের রাজার কোষাধ্যক্ষ। শেষ জীবনে গুরুর উপদেশে আত্ম-মুক্তির জন্য গ্রহণ করেন বৈষ্ণব ধর্ম। একমাত্র সহোদর ছাড়া তাঁর আপন বলতে আর কেউই ছিলনা। আবার মনের মিলও ছিল না তাঁর সঙ্গে। কোন এক বিশেষ কারণে সহোদরের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে অন্তিমকালে তিনি সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দান করে দেন তাঁরই এক কর্মচারী জৈন ধর্মাবলম্বী মণিরামকে। সেই মণিরামের বংশধরেরা কালক্রমে বৈষ্ণব-ধর্মের মাহাত্ম্য অবগত হয়ে একে একে দীক্ষিত হলেন বৈষ্ণব ধর্মে। পরবর্তীকালে তাঁরাই ব্রজ মণ্ডলে প্রসিদ্ধিলাভ করেন শেঠ নামে।
এঁদের পৈত্রিক গুরু ছিলেন দ্রাবিড়ী রঙ্গাচার্য্য স্বামী। তাঁরই আদেশে শেঠ লক্ষ্মীচাঁদ জৈনের ভ্রাতা রাধাকৃষ্ণ এবং গোবিন্দ দাস বৃন্দাবনে এই মন্দিরটি

নির্মাণ করে নিজেদের কীর্ত্তি স্থাপন করেছিলেন। তৎকালীন এই মন্দির নির্মাণে ব্যয় হয় আনুমানিক ৪৩ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা।

আমার সঙ্গীসহ এসে দাঁড়ালাম নাট মন্দিরে। তিনটি মহলযুক্ত মন্দির। শেঠদের স্থাপিত মূর্তিটি শ্রীকৃষ্ণের। কালো কুচকুচ করছে। অপূর্ব সুন্দর বিগ্রহ। চোখ ফেরানো যায় না। পরিচ্ছন্ন মন্দিরের বাঁধানো বেদিতে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীকৃষ্ণ। এই কৃষ্ণের নাম এখানে রাখা হয়েছে শ্রীরঙ্গজী।

রঙ্গজীর মন্দির চত্বরে প্রবেশের মুখেই রয়েছে ৬০ ফুট লম্বা একটি সোনালী রঙের স্তম্ভ। বৃন্দাবনে এটি সোনার তালগাছ নামে প্রসিদ্ধ। সাড়ে বারো মণ সোনা দিয়ে নির্মিত হয়েছে এই স্তম্ভটি। তাছাড়াও ৮১ মণ সোনা আর সাড়ে ৩৬ মণ রূপার ব্যবহার হয়েছে মন্দিরের বিভিন্ন কাজে এবং বিগ্রহের অলংকারে। শোভায় ও সৌন্দর্যে শেঠের মন্দির শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে আছে সমগ্র বৃন্দাবনে।

রঙ্গজীর মূল মন্দিরের বাঁপাশে রয়েছে পরপর কয়েকটি মন্দির। প্রথমে তিরুপতি বা নারায়ণের মন্দির, পরে নৃসিংহ অবতার মূর্তি এবং মাঝারী আকারের শীশমহল। এর চারটে দরজার পর রয়েছে আবার বিষ্ণু বা রঘুনাথজীর মন্দির—তার ডাইনে লক্ষ্মীদেবী। দেয়ালের গা ঘেঁষে মাঝারী আকারের মন্দিরের মতো ঘরগুলি সব পরপর সারি দেয়া।

দেখতে দেখতে রঙ্গজীর মন্দির চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম প্রবেশ দ্বারের বাইরে মন্দির-প্রাঙ্গণে। এখানে পাথরে বাঁধানো রয়েছে একটি পুষ্করিণী—ব্রজেন্দ্র তালাও। পাশেই প্রাঙ্গণে আছে সাজানো একটি বাগান। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীরঙ্গজীর 'গজগ্রাহর' নামে এক লীলাখেলা উৎসব হয় এখানে।

প্রতি বছর চৈত্রমাসে এখানে ব্রহ্মোৎসব হয়। সেই সময় শ্রীরঙ্গজীর বিগ্রহটি মন্দির থেকে আনা হয় বাগানে। সাজানো হয় সুন্দর সাজে। চৈত্রের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথি থেকে ত্রয়োদশী পর্যন্ত এই বারো দিন উৎসব চলে মহা সমারোহে। তার মধ্যে পঞ্চমী ও দশমীতে বাগানের ভিতর বিগ্রহের সামনে বাজী পুড়িয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন সারা বৃন্দাবনবাসীরা।

সাধুসঙ্গ—গৃহীদের শান্তিলাভের উপায়

রঙ্গজী মন্দিরের প্রধান ফটকের ঠিক ডানপাশে দেখলাম এক সাধুবাবাকে। পাঁচিলের গায়ে বসে আছেন হেলান দিয়ে। দেখলে মনে হয় বেশ আরাম করেই বসে আছেন হাঁটু মুড়ে। বাবু হয়ে বসে নয়। হাঁটু দুটো রয়েছে থুতনির কাছে। বয়েসে সাধুবাবা বেশ বৃদ্ধ।

মন্দির-প্রাঙ্গণে না ঢুকে দাঁড়িয়ে গেলাম। ভাবলাম, সাধু না ভিখিরী? আমি

যেখানে দাঁড়িয়ে—সাধুবাবা সেখান থেকে বেশী দূরে বসে নয়। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম সাধুবাবার কাছে।

এবার দেখলাম পরিষ্কারভাবে। হ্যাঁ, সাধুবাবাই। একেবারে রোগা নয়—তবে রোগাই। পরনের বসনটা গেরুয়া নয়। সাদা কাপড় ময়লা হতে হতে শেষ অবস্থায় এসে দাঁড়ালে রঙটা যেমন হয়—তেমনই। একটা কাপড় মাঝামাঝি ছিঁড়ে এক টুকরো পরা—আর এক টুকরো গায়ে জড়ানো। গাল ভর্তি কাঁচায় পাকায় দাড়ি তবে বড় নয়, মানান সই। মাথায় লম্বা চুল রয়েছে—জটা নেই। অগোছালো রুক্ষ চুলগুলোর চেহারাটা ঝড়ো কাকের মতো। এলোমেলোভাবে কিছু সামনে, কপালে—আর বাকিটা ছড়িয়ে রয়েছে পিছনে। ময়লা রঙ। নাক চোখ মুখ সুন্দর তবে আকর্ষণীয় নয়। বাঁ-পাশে রয়েছে একটা কমণ্ডলু ঝুলি আর ভাঁজ করা একটা কম্বল।

সাধুবাবার আশপাশে আর কেউ নেই। একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটো টাঙ্গা। কোন যাত্রী হয়তো মন্দিরে গেছে তাই টাঙ্গাওয়ালা অপেক্ষা করছে তার আসার অপেক্ষায়। টাঙ্গার সামনে লাইন দিয়ে বসে আছে জনা দশেক ভিখিরী। কোন যাত্রী যখন রঙ্গজী মন্দিরে যাচ্ছেন তখন সকলেই তাকিয়ে রয়েছে তাদের মুখের দিকে। কেউ কখনও কিছু দিচ্ছেন—কেউ দিচ্ছেন না। কিছু না দেয়া যাত্রীদের সংখ্যাটাই বেশী। লক্ষ্য করলাম, এরা কেউ কিন্তু ভিক্ষা চাইছে না। তাকাচ্ছে শুধু মুখের দিকে। জানে, রাধার দয়া আছে, মায়া আছে—বৃন্দাবনবাসীদের উপর তার অপার করুণাও আছে—তাই কিছু না কিছু মিলবেই মিলবে। না খেয়ে থাকতে হবে না যখন—তখন অকারণ চেয়ে মুখ-নষ্ট করা কেন!

সাধুবাবা যেখানে বসে আছেন—জায়গাটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সাধুবাবার সামনে দাঁড়ানোর পর থেকে তিনি আমাকে লক্ষ্য করছেন—আর আমি লক্ষ্য করছি আর সব। দেখলাম, তাঁর বাঁ-পাশের ঝুলিটায় অসংখ্য তাপ্পিমারা। তাপ্পির কাপড়গুলো বিভিন্ন রঙের, নানা আকারের।

সাধুবাবার সামনে কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে নই। এসব দেখা আর ভাবনা আমার মুহূর্তেই। সামনে কোন কিছু দেখে ভাবতে যেটুকু সময়—সেটুকুই। একটু এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলাম। পায়ে হাত দিতেই তিনি নড়ে বসলেন—সোজা হয়ে। কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন। এই নড়াতেই বুঝলাম, আরাম করে বসে থাকার আরামটা কোথায় যেন চলে গেল। প্রথমে অবাক হয়ে তাকালেন আমার মুখের দিকে। তারপর হাসি হাসি মুখ করে হিন্দিতে বললেন,

—বোস বেটা, বোস। বৃন্দাবন দর্শনে এসেছিস্ বুঝি?

ঘাড় নেড়েও মুখে বললাম,

—হ্যাঁ বাবা, বৃন্দাবন দর্শন তো করবোই—মথুরা গোকুল গির্রি গোবর্ধনেও যাবো। এর আগেও এসেছি, আবারও এলাম।

কথাটা শুনে প্রসন্নতায় ভরে উঠলো সাধুবাবার মুখখানা। মনে হলো বেশ খুশী হলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করলেন,
—এর আগে আর কোথাও ঘুরেছিস্ ?
পথের ধুলোয় এবার বাবু হয়ে বসলাম বেশ যুত করে। বুঝলাম, অনেক কথা বলা যাবে এই সাধুবাবার সঙ্গে। উত্তরে বললাম,
—হ্যাঁ বাবা, ভারতের প্রায় সমস্ত জায়গায় ঘুরেছি আমি। বলতে পারেন অল্প কয়েকটা ছাড়া প্রায় সব জায়গায়ই আমার ঘোরা।
সঙ্গে সঙ্গেই সাধুবাবা বললেন,
—তা বেশ বেটা, বড় ভাগ্যবান তুই। ক-জনা এমন ঘুরতে পারে! টাকা থাকলেই হয় না বেটা, ভাগ্যে থাকা চাই। এবার বলতো বেটা, অনেক জায়গায় তো ঘুরেছিস্, অনেক কিছুই তো দেখেছিস্, কি পেলি এই পথে পথে—ঘুরে ঘুরে ?
হঠাৎ এমন একটা প্রশ্ন করে বসবেন সাধুবাবা—ভাবতেই পারিনি। ঘর দোর ছেড়ে যখন যেখানে মন চেয়েছে—বেরিয়ে পড়েছি। আজ থেকে বছর কুড়ি আগে একবার মায়ের কাছ থেকে মাত্র দুটো টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলাম পথে। দীর্ঘ একটা মাস পথে পথে কাটিয়ে ফিরে এসেছিলাম বাড়ীতে। কি পেয়েছি—কি পাওয়ার আশায়ই বা বেরিয়েছি তা তো কিছু ভাবিনি কখনও। কি খুঁজছি বা কাকে খুঁজছি তা তো নিজেও জানি না। সাধুবাবার এমন প্রশ্নে বেশ বিব্রতই বোধ করলাম। চট্ করে কোন উত্তর দিতে পারলাম না। ভাবছি, কি বলবো ? আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সাধুবাবা বললেন,
—কিরে বেটা, বল্ না কি পেলি ?
তবে একটা জিনিষ যে পেয়েছি তাতে তো আমার কোন সন্দেহ নেই। তাই সেই কথাটাই বললাম,
—বাবা, ভ্রমণ পথে আমি একটা জিনিষই পেয়েছি—সেটা আনন্দ।
কথাটা বলাতে এবার সাধুবাবা পিঠটা দেয়ালে ঠেকিয়ে একটু আরাম করে বসলেন। হালকা হাসির একটা রেখা ফুটে উঠলো মুখে। ভাবটা দেখে বুঝতে পারলাম, এমন কিছু সাধুবাবা হয়তো বলবেন—যে কথায় আমি বিব্রত হই। হলামও তাই। তিনি বললেন,
—পথে যে আনন্দ রয়েছে—সে তো আমি নিজেও বুঝি। কিন্তু তোর যে আনন্দ হয় বললি, সেটা কিসের—দেবালয় দর্শন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পরিবেশ অথবা নতুন কোন স্থান দেখার—কোনটা তোকে আনন্দ দেয় বেশী বা কোনটাতে তুই আনন্দ পাস বেশী ?
বেশ মুশকিলে পড়ে গেলাম। আসলাম সাধুবাবার হাঁড়ির খবর নিতে—এখন উল্টে একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছেন আমাকে। একটা অস্বস্তির সৃষ্টি হলো ভিতরে। তবুও বললাম,—বাবা, কোথাও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, কোথাও দেবতার মন্দির, কোথাও

নির্জনতা, কোথাও দেবতার বিগ্রহ, কোথাও বা শিল্পকলা আমাকে দিয়েছে অপার আনন্দ। আমার আনন্দ কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয় থেকে নয়। তবে আমাকে সবচেয়ে বেশী আনন্দ দিয়েছে ভ্রমণ পথে সাধুসঙ্গ।

এই পর্যন্ত বলে আমি আর সাধুবাবাকে সুযোগ দিলাম না। তাহলে আমার আসল উদ্দেশ্যটাই যাবে মাটি হয়ে। কোন প্রশ্ন করার আগেই প্রসঙ্গের মোড়টা ঘুরিয়ে দিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবার বয়েস কত হলো এখন ?

সহজ সরলভাবে উত্তর দিলেন,

—বেটা, আমার বয়েস কত হয়েছে—ঠিক বলতে পারবো না। কত আর হবে—সত্তর পঁচাত্তর।

জিজ্ঞাসা করলাম,

—কোন সম্প্রদায়ের সাধু আপনি ?

সম্প্রদায়ের কথা জিজ্ঞাসা করাতে সাধুবাবা আমার মুখের দিকে বেশ ভালো করে একবার দেখে নিলেন। তারপর এদিক ওদিক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন,

—আমি শংকরাচার্য প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের মধ্যে 'তীর্থ' উপাধিধারী সাধু। আমাদের সাতটি আখাড়া আছে। নিরবাণী, নিরঞ্জনী, অটল, আহ্বান, যুনা, আনন্দ এবং বড় আখাড়া। আমি বেটা, নিরঞ্জনী আখাড়ার সাধু। মঠ এবং আখাড়ায় অনেক পার্থক্য আছে। মঠ পরিচালিত হয়ে মোহন্তের দ্বারা। কিন্তু আখাড়া তা নয়। কয়েকটি সন্ন্যাসী সম্প্রদায় মিলিত হয়ে অথবা দশনামী সন্ন্যাসীরা একসঙ্গে মিলেমিশে আখাড়া তৈরী করে। এখানে কর্তৃত্ব থাকে সকলের। মোহন্তই সব নয়। যে কোন মত গ্রহণের ক্ষেত্রে আর সকলের বা মিলিত সম্প্রদায়ের মত ছাড়া মোহন্তের কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই। আখাড়ায় সন্ন্যাসীদের প্রত্যেকের কর্তৃত্ব থাকে পূর্ণ মাত্রায়। দশনামী সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসীরা ওই সাতটি আখাড়ার কোন না কোন একটির সঙ্গে যুক্ত থাকেই। এটাই এঁদের বড় পরিচয় সাধু সমাজে। এর কোনটির সঙ্গে কোন সন্ন্যাসী যুক্ত না থাকলে তাঁকে সন্ন্যাসীরা স্বীকৃতি দেয় না সন্ন্যাসী হিসাবে। ভিখিরী মনে করে। কোন উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে, সাধু জমাৎ-এ কুম্ভমেলায় স্থান দেয় না কোন আখাড়ায়—বুঝলি ?

সাধুবাবার সম্প্রদায়ের কথা শুনে বুঝে গেলাম, ইনি স্থানীয় সাধু নন। এখানে এসেছেন হয়তো দর্শনে। তবুও জানতে চাইলাম,

—বাবা, এখানে, এই বৃন্দাবনেই থাকেন, না অন্য কোথাও ?

মাথাটা একটু দুলিয়ে বললেন,

—না বেটা, এখানে থাকি না। আমি ঘুরেই বেড়াই। একমাস হলো এসেছি এখানে। রাধারাণীর পদধূলি, ব্রজরজ মেখে দেহ মনকে পবিত্র করে তুলতেই এসেছি এই বৃন্দাবনে।

জানতে চাইলাম,
—বাবা, গৃহত্যাগ করেছেন কত বছর বয়েসে ?
কথাটা শুনে মুখখানা অন্ধকার করে ফেললেন সাধুবাবা। হঠাৎ প্রসন্ন ভাবটা চলে যাওয়ায় একটু বিব্রত বোধ করলাম। কোন খারাপ কথা তো বলিনি আমি। তবে মুখখানা এমন মলিন হয়ে গেল কেন ? একটু অবাকই হয়ে গেলাম। সাধুবাবা চুপ করে রইলেন। কেটে গেল মিনিট পাঁচেক। কোন কথা বললাম না। তারপর মলিন মুখেই তিনি বললেন,
—বেটা, নিজের থেকে গৃহত্যাগ করিনি আমি। তিনিই করিয়েছেন। এ-জীবনে আসার পিছনে যে সব কথা তোকে বলবো—তা আমার গুরুজীর মুখেই শোনা। তখন আমি একেবারেই শিশু। উত্তরপ্রদেশেরই কোন এক গাঁয়ে আমাদের বাড়ী ছিল। শুধু মাথা গোজার ঠাঁইটুকু ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তখনকার দিনেই চরম দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়েই দিন কাটতো আমাদের। আমরা চার ভাই তিন বোন। সংসারে এত অভাব ছিল যে, একবেলা দুমুঠো অন্ন ভাই বোনেদের মুখে তুলে দেয়ার ক্ষমতা ছিল না বাবার। একদিন এক সাধুবাবা গেছিলেন আমাদের বাড়ীতে ভিক্ষে করতে। নিজেদের খাওয়া জোটে না ভিক্ষে দেবে কোথা থেকে ! সেই সাধু-বাবার হাতে ভিক্ষা হিসাবে তুলে দিলেন আমাকে। মা বাবার উদ্দেশ্য ছিল, না খেয়ে মরার চেয়ে দুটো খেয়ে অন্তত প্রাণে বাঁচুক। সাধুবাবা আপত্তি করেননি। সেই সাধুবাবাই আমার গুরুজী। তাঁর মুখেই শুনেছি, তখন আমার বয়েস বছর চারেক। এই হল আমার গৃহত্যাগের কথা।
এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা একটু চুপ করে রইলেন। আমি অকারণ আর কোন কথা বললাম না। নিজের থেকে যতটা বলে বলুক। তারপর তো প্রশ্ন আমার আছেই। সাধুবাবা একবার আমার দিকে তাকালেন—একবার চোখ দুটোকে ঘুরিয়ে দেখে নিলেন সামনে—ডাইনে, বাঁয়ে। তারপর বললেন,
—আট বছর বয়েসে দীক্ষা হলো আমার। গুরুজীর সঙ্গেই থাকতাম রুদ্রপ্রয়াগে। শীতের সময় নেমে আসতাম পাহাড় থেকে। তখন থাকতাম হরিদ্বারে। গুরুজীর সঙ্গে মানস সরোবর, কৈলাস, নারায়ণ সরোবর, এমন কি বেটা হিংলাজ মায়ের 'দর্শন ভি' করেছি। গুরুজীর সঙ্গে নর্মদা পরিক্রমাও করা হয়েছে। তখন আমার বয়স বছর কুড়ি হবে। তবে বেটা, এই বৃন্দাবন পরিক্রমাটা করা হয়নি আমার।
সাধুবাবার মুখের ভাবটা আগের ভাবেই এসে গেছে। মলিনতাও গেছে। প্রসন্নতায় ভরে উঠেছে মুখখানা। আনন্দে মনটা আমার ভরে উঠলো। ভাবতেই পারিনি এমন একজন সাধুর সান্নিধ্য পাবো—যাঁর এত বছরের জীবন-ঝুলি অভিজ্ঞতায় ঠাসা। একটা কথায় খট্‌কা ঢুকেছে আমার মাথায়। কথায় ছেদ পড়বে বলে জিজ্ঞাসা করিনি। এবার জানতে চাইলাম,
—বাবা, সারা ভারতের সমস্ত তীর্থদর্শন তো করেছেনই, দুর্গম তীর্থ—যেখানে

সাধারণ মানুষের প্রায়ই যাওয়া হয় না, সে সব তীর্থও পরিক্রমা করেছেন। এখন আপনার বয়েস পঁচাত্তর বছর ধরলে—সাধন ভজনে রয়েছেন গড়ে ধরুন সত্তর বছর। গুরুজীর কোলে পিঠেই আপনি মানুষ হয়েছেন মাতৃস্নেহে। অটুট ব্রহ্মচর্যের জীবন আপনার। এসব বিষয়গুলো খতিয়ে দেখলে আমার বিশ্বাস, আপনার এ-দেহ মনে অপবিত্রতার কণাটুকুও নেই। যদি সত্যিই তা থেকে থাকে তা হলে বুঝবো এত বছরের সাধন-জীবনটাই আপনার বৃথা গেছে। আমার বিশ্বাস অনুসারে আপনার এই পবিত্র দেহমনের কি এমন দরকার পড়লো যে রাধারাণীর পদধূলি ব্রজরজ মাখিয়ে পবিত্র করে তুলতে হবে দেহ মনকে?

কথাটা শুনে বৃদ্ধ সাধুবাবা হেসে ফেললেন। হাঁটু গুড়ে পাঁচিলে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। এবার সোজা হয়ে বসলেন বাবু হয়ে। তারপর হাসি হাসি মুখে বললেন,

—বেটা, আমার এ-দেহ মন কতটা শুদ্ধ পবিত্র হয়েছে তা যদি আমি জানতে পারতাম তা হলে তো সব হয়েই গেছিল। আমি তো মানুষ। মানুষের যে বিশ্বাস —সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই এখানে আসা। বেটা, স্থান মাহাত্ম্য এবং তার প্রভাব তো একটা আছেই। বাঈজী বাড়ীর নাচের আসরের যে প্রভাব দেহ মনে ক্রিয়া করে —সে প্রভাব কি ক্রিয়া করবে গোবিন্দজী বা রঙ্গজীর মন্দিরে দাঁড়ালে? তা করবে না—করেও না। সেই জন্যেই তো সাধুসন্ন্যাসীরা তীর্থকামী—ছুটে চলেন এক তীর্থ থেকে আর এক তীর্থে।

পকেট থেকে বিড়ি বের করলাম। একটা বিড়ি এগিয়ে দিতেই সাধুবাবা ইসারায় বললেন—চলবে না। আমিও আর ধরালাম না। এবার সাধুবাবার পাশে রাখা ঝুলিটা দেখিয়ে বললাম,

—বাবা, সারাটা জীবনই তো আপনার কেটে গেল সাধন ভজনে। পার্থিব জীবনের সব কিছুই তো ত্যাগ করেছেন। জীবনের প্রয়োজন বোধটাই তো গেছে ফুরিয়ে। ওতে তো কিছু নেই—থাকার কথাও নয়। তা হলে ওটা ত্যাগ না করে সঙ্গে রেখেছেন কেন? ঝুলিটা কি সাধু-মনে সঞ্চয়ের আশা, কিছু পাওয়ার আশার সৃষ্টি করে না?

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই 'জয় গুরু মহারাজ কি জয়' বলে কপালে হাত দুটো ঠেকালেন। মুহূর্তে মুখের ভাবখানা—কারও কাছ থেকে জোর করে কিছু কেড়ে নিলে যেমন হয়—ঠিক তেমন হয়ে গেল। একেবারে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে ঝুলির উপর বাঁ-হাতটা রেখে বললেন,

—নেহি নেহি বেটা, ইয়ে 'ঝুলি' নেহি—ঝুলি নেহি হ্যায়! ইয়ে মেরা গুরুজীকা আশীর্বাদ হ্যায়। সাধুসন্ত কো ঝুলি গুরুজীকা আশীর্বাদ হ্যায়।

কথাটুকু বলে আবার কপালে জোড় হাত করে গুরুজীর উদ্দেশ্যে নমস্কার করলেন। একেবারে অবাক হয়ে গেলাম কথাটা শুনে। বলেন কি সাধুবাবা! ছেঁড়া

তাপ্পিমারা নোংরা ময়লা একটা ঝুলি 'গুরুজীর আশীর্বাদ'—ভাবতেই পারছি না! কৌতূহলে মনটা অস্থির হয়ে উঠলো মুহূর্তে। এতটুকু দেরী না করেই বললাম,
—বাবা, সাধুসন্ন্যাসীদের ঝুলি গুরুজীর আশীর্বাদ বললেন—এর ভিতরে নিশ্চয়ই কোন মাহাত্ম্য আছে। দয়া করে বলবেন বাবা, এর রহস্যটা কি আর মাহাত্ম্যটাই বা কতখানি—যা আশীর্বাদ স্বরূপ।
প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত দেরী না করেই উত্তরে সাধুবাবা বললেন,
—বেটা, সাধুসন্ন্যাসীদের এই ঝুলির অনেক মাহাত্ম্য আছে। দীক্ষার পর গুরুজী ঝুলিটা দিয়ে আশীর্বাদ করে বলে দেন, 'এই ঝুলি যতদিন তোর কাছে থাকবে ততদিন ক্ষুধার অন্ন, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র, পথের প্রয়োজনে যেটুকু অর্থের প্রয়োজন—তার অভাব হবে না মৃত্যু পর্যন্ত।' বেটা, ঝুলিটা এখানে উপলক্ষ্যমাত্র। আসলে আশীর্বাদই মূল। তুই একটু খোঁজ করলে দেখতে পাবি, গৃহত্যাগী সাধুসন্ন্যাসী যাঁরা—আশীর্বাদ স্বরূপ ঝুলির মাহাত্ম্যে তাঁরা পথে অর্থ অন্ন আর বস্ত্র কষ্ট পান না কখনও।
একটু থেমে আবার হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন,
—বেটা, একটা কথা মনে রাখিস্, গুরু অথবা সাধুসন্ন্যাসীদের কেউ নিজ হাতে কাউকে কিছু দিলে—সে দ্রব্য যদি তোর কাছে থাকেও, তবুও তা প্রত্যাখান করতে নেই। এঁরা হাতে করে যা দেন—তা জানবি কোন দ্রব্য নয়—নিশ্চিত জানবি তা আশীর্বাদ—যার মূল্য অর্থে মাপা যায় না। ওটা প্রত্যাখান করা মানে আশীর্বাদ প্রত্যাখান করা। তাই সাধুসন্ন্যাসীর ঝুলি থাকে তাঁদের আমরণ সঙ্গী হয়ে।
ঝুলির অন্তর্নিহিত মাহাত্ম্য কথা শুনে কৌতূহল গেল। হঠাৎ একটা প্রশ্ন এলো মাথায়। জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, সাধুসন্ন্যাসীদের মৃত্যু হলে তাঁদের পারলৌকিক ক্রিয়াদি কিভাবে নিষ্পন্ন করা হয়? গৃহীদের যেমন শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করা হয়—সাধুদেরও কি সেইভাবে কিছু করতে হয়?
এমন একটা প্রশ্ন শুনে একটু অবাক হয়ে সাধুবাবা আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। বুঝলাম, ভাবছেন হয়তো—এ সব প্রশ্ন কেন? আমি চোখের উপর থেকে চোখ দুটো সরিয়ে নিয়ে একটু ওদিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার যেই সাধুবাবার মুখের দিকে তাকিয়েছি—অমনি তিনি বললেন,
—বেটা, এসব কথায় তোর কি দরকার—কি হবে এসব জেনে?
আমি আমার বাঁধাগতে জানালাম,
—বাবা, সাধুসন্ন্যাসীদের জীবন সম্পর্কে জানার কৌতূহল আমার অদম্য। এই কৌতূহল যে কেন তা আমি নিজেও জানি না। তাই দয়া করে যদি বলেন তবে আমি খুব খুশী হই।
আমার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না সাধুবাবা। প্রশান্ত চিত্তে বললেন,

—বেটা, সাধুসন্ন্যাসীদের সংসার ত্যাগের পর স্বজন বলতে থাকে না কেউই। দল ছুট সাধুসন্ন্যাসী হলে তাঁদের পারলৌকিক ক্রিয়া বা অন্য কোন অনুষ্ঠান করার কোন প্রশ্নই থাকে না। তা না হয়ে যদি কোন আখাড়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে তা হলে কোন সন্ন্যাসীর মৃত্যু হলে তাঁর দেহ মাটিতে সমাধি অথবা জল সমাধি দেয়া হয়। এই সমাধি দেয়ার পর তিন দিনের মাথায় দেহত্যাগী সন্ন্যাসীর শিষ্য বা অন্য সাধু-সন্ন্যাসীরা মিলে আখাড়ায় তাঁর উদ্দেশ্যে রোঠ ভোগ দেয়। রোঠ হলো চিনি আটা আর ঘি এক সঙ্গে মিশিয়ে ভালো করে গুড়ো করা হয়—যাতে চিনিটা মিশে যায়। জলে ভেজানো হয় না। শুকনোই থাকে। এবার মৃত্যুর পর থেকে তেরো দিনের দিন সাধুদের পঙ্গত্ দেয়া হয়। অর্থাৎ মৃত সাধুর আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে দেয়া হয় সাধুভোজন। অবশ্য এ-সবই করা হয় আখাড়ায় মৃত্যু হলে অথবা অন্য কোথাও মৃত্যু হলে সেখান থেকে আখাড়ায় খবর এসে পৌঁছালে।

সাধুসন্ন্যাসীদের পারলৌকিক ক্রিয়াদির বিষয়টা জানা ছিল না। বৃন্দাবনে এসে উত্তর পেলাম। অবশ্য এর আগেও এবিষয় মনে পড়েনি কখনও। এবার বললাম,

—বাবা, জীবনে অনেকটা পথই তো চললেন, দেখলেনও তো অনেক। আপনার সারা-জীবনে চলা আর দেখার মধ্যে থেকে নিজের অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলুন।

সাধুবাবা এতক্ষণ বাবু হয়ে বসেছিলেন। এবার পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে বললেন,

— পথকে আশ্রয় করে ভগবানকে সম্বল করে যে সব সাধুসন্ন্যাসীরা পথ চলেছেন—তাঁরা অনেক বেশী শান্তিতে আছেন। তীর্থ ভ্রমণকালে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন মঠ আশ্রমে আমাকে থাকতে হয়েছে। দেখেছি পথই ভালো—খোলা আকাশের নীচে গাছের তলায় অনেক শান্তি। কারণ প্রায় প্রতিটি মঠ আশ্রমে এখন আর শান্তি নেই। সাধুসন্ন্যাসীদের মধ্যে দলাদলি, হিংসা ক্ষমতা দখল আর প্রতিষ্ঠার লড়াই। বেটা, যুগধর্ম যাবে কোথায়? কলি যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে সাধুসন্ন্যাসীদের মধ্যে। তাই তো তাঁদেরও শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। এর মধ্যে থেকে যাঁরা একটু দূরে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পেরেছেন বা পারছেন—তাঁরাই ভগবানের সান্নিধ্যে যেতে পারছেন বলেই আমার বিশ্বাস। যাঁরা পারছেন না—তাঁরা এপথে এসেও পরকালের পথ রুদ্ধ করছেন!

সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করলাম,

—বাবা, সাধু হয়ে সাধুদের নিন্দা করছেন কেন?

মাথাটা বেশ করে নাড়িয়ে বললেন,

—না না বেটা, সাধুদের নিন্দা করছি না আমি। যা দেখেছি নিজের চোখে—তাই-ই তোকে বললাম। সাধুদের জীবন শান্তির জীবন। এঁদের জীবনের শান্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখে বড় দুঃখ হয়। তাই তোকে বললাম। নিন্দা করিনি আমি।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, এটা কি রোধ করা যায় না ?
হাতটা নেড়ে মাথাটা নাড়িয়ে বললেন,
—না বেটা, এটা রোধ করা যায় না। কালের প্রভাবকে কেউ রোধ করতে পারে না—পারবেও না কখনও। কালের ইচ্ছাতেই হচ্ছে। কালের ইচ্ছাতেই কালে কালে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে—তবে সময় লাগবে।
এবার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,
—সাধু জীবনে আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত—দীর্ঘ এই জীবনে আপনার কি বোধ বা উপলব্ধি হলো, দয়া করে বলবেন ?
এ-কথার উত্তর সাধুবাবা চট্ করেই দিলেন না। বসে রইলেন চুপচাপ। কেটে গেল এক মিনিট দু-মিনিট করে প্রায় আট মিনিট। লক্ষ্য করলাম, মুখের ভাবটা বেশ গম্ভীর হয়ে এলো। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন,
—বেটা, (হাজার হাজার শব্দের এই সরোবরে ভগবদ্ প্রসঙ্গ, ঈশ্বরের নামরূপ শব্দ-টুকু ছাড়া আর সমস্ত শব্দ-জলই বড় অপবিত্র, মলিন। ওই জলে স্নান করলে না মনের মলিনতা দূর হয়, না পবিত্রতা আসে দেহের। সাধন জীবনে এই সামান্য বোধটুকুই আমার হয়েছে।)
এবার জানতে চাইলাম,
—বাবা, সংসারে শান্তি নেই—এ কথা সাধু মহাত্মারা বলেছেন। আর আমরা যারা সংসারে আছি তারা তো হাড়ে হাড়েই টের পাচ্ছি। তাই বলে আপনাদের মতো তো আর নেংটি পরে ঘর ছাড়াও তো সম্ভব নয়। আমার জিজ্ঞাসা, আমাদেরা মতো গৃহী যারা—তারা কি করলে একটু স্বস্তি, একটু শান্তি পেতে পারে ? আপনারা তো আছেন শান্তিতে, পরমানন্দে। আমাদের পথটা একটু বলুন ! গৃহীদের দেখে কি আপনাদের মনে এতটুকুও দুঃখ হয় না ?
কথাটা শোনা মাত্রই দেখলাম সাধুবাবার প্রসন্ন মুখখানা বেদনায় ভরে উঠলো। অমন মুখখানা দেখে আমি নিশ্চিত বুঝলাম, সাধুবাবার সাধন ভজনের ফলে তাঁর ইষ্টের স্থিতি হয়েছে পাকাপাকি ভাবে। সাধুসঙ্গের অভিজ্ঞতায় আমি জানি, সাধন ভজনশীল মানুষের মধ্যে ইষ্টের স্থিতি না আসলে তাঁর মধ্যে দয়া মায়া বা করুণার উদ্রেক হয় না। সে মানুষ কখনও অন্যের দুঃখে নিজেও ব্যথিত হয় না। যার মধ্যে স্থায়ীভাবে ইষ্টের স্থিতি হয়নি—তার মধ্যে যেটুকু দয়া মায়া বা অন্যের প্রতি করুণা করার যে প্রয়াস—সেটা করুণাপ্রার্থীর ইষ্ট তাৎক্ষণিকভাবে করুণা-কারীর মধ্যে আবির্ভূত হয়ে করুণা করে অন্তর্হিত হন। এখন করুণাভরা মুখে সাধুবাবা বললেন,
—(বেটা, সংসারে যারা আছে তারা একটা জিনিষ করতে পারলে আর যাইহোক—শান্তি পাবে নিশ্চয়ই। সংসার হলো সন্তাপক্ষেত্র। কখনও কোনও বিষয়ে সন্তাপ করতে নেই। সংসারে ঘটে যাওয়া দুঃখদায়ক ঘটনাই মানুষের মনে সৃষ্টি করে

সন্তাপ। প্রতিটি মানুষ প্রতি মুহূর্তে যে সব কাজ করছে তার অধিকাংশই সন্তাপ সৃষ্টিকারী। এবং তা প্রতি মুহূর্তেই অতীত হয়ে যাচ্ছে। এসব করছে কখনও জ্ঞানত আবার কখনও তার নিজেরই অজান্তে। বর্তমান—সেই মুহূর্তের অতীত হয়ে যাওয়া সন্তাপের বিষয় নিয়ে ভোগ করছে কষ্ট। এতে প্রথমেই শান্তি নষ্ট হয় মনের। তারপর একে একে নষ্ট হয় রূপ, দেহ ও মনের শক্তি, সমস্ত জ্ঞান ও বুদ্ধি। ধীরে ধীরে রোগ জন্মে দেহে। ফলে সংসারে জীবিত থেকেও মৃত ব্যক্তির মতো জীবন যাপন করে।

এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা একটু থামলেন। একটু নড়ে চড়ে, এদিক ওদিক তাকালেন। তারপর আবার বললেন.

—বেটা, সন্তাপকে রোধ করতে হলে একটাই মাত্র পথ আছে। সেটা হলো, যেটা হয়ে গেছে—'গোলি মারো।' ব্যাস আর ভাববার দরকার নেই। এ-টুকু করতে পারলেই সংসারের সব বাঁচবে। সংসারীও বাঁচবে। এটা না করতে পারলে সন্তাপ মৃত্যুর পরও কিন্তু পিছু ছাড়ে না। সন্তাপ রোধ করাটা একদিনে সম্ভব নয়। এটা অভ্যাস যোগ। 'যা হয়ে গেছে তা গেছে—কি হবে অকারণ ভেবে'—এই ভাবনাটা মনে গেঁথে ফেলতে পারলেই সংসারের প্রতি মুহূর্তের অতীত হয়ে যাওয়া সন্তাপ আর কোন ভাবেই স্পর্শ করতে পারবে না মনকে। ফলে শান্তি থাকবে তার সারাজীবন ব্যাপী অবিচল হয়ে।

কথাটুকু বলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সাধুবাবা। তাকালেন আমার মুখের দিকে। তাকালাম আমিও। ভাবছি মনে মনে, কি কঠিন কাজ অথচ কি সুন্দর সহজ করে বলে গেলেন সাধুবাবা। এবার আমার ভাবনার রেশটা ধরেই তিনি বললেন,

—হ্যাঁ বেটা, কাজটা বেশ কঠিন। তবে এখানে কথা আছে। সংসারে থেকে যে সব গৃহীরা সাধন ভজনশীল—তাদের পক্ষে এ কাজটা খুব একটা কঠিন নয়। একটু চেষ্টাতেই তৈরী হয়ে যায় সন্তাপ দূর করবার মনটা। আসলে তিনিই করিয়ে দেন অলক্ষ্যে। আর যারা ভজনশীল নয়—তাদের হাজার চেষ্টাতেও হবার নয়। সংসারে সাধন ভজনে আগ্রহী মানুষের সংখ্যাটাই কম। তাই সব কিছু থাকা সত্ত্বেও শান্তিহীন সংসারীদের সংখ্যাটা অসীম।

এবার সাধুবাবার কাছে জানতে চাইলাম,

—বাবা, আমরা সংসারী। সাধন ভজনে মন নেই। বিষয় আর সংসার চিন্তা গ্রাস করে রেখেছে মনকে। সাধন ভজন ছাড়া আর কিভাবে মানুষ ভগবানের সান্নিধ্যে যেতে পারে—অবশ্য তিনি যদি সত্যিই থেকে থাকেন।

কথাটা শুনে একটু মলিন হয়ে গেল সাধুবাবার মুখখানা। বুঝলাম, দুঃখিত হয়েছেন সাধুবাবা। এবার তিনি দু-হাত জোড় করে একেবারে বিনীত কণ্ঠে বললেন,

—অমন করে ভগবানের কথা বলতে নেই বেটা। অশ্রদ্ধা অবিশ্বাসের এতটুকু ভাব নিয়ে তার কথা মুখে উচ্চারণও করতে নেই। বেটা, ভগবান যে আছেন তার প্রমাণ তো তুই নিজেই। তাঁর কত করুণা, কত দয়া তোর উপরে। কত ভাগ্য তোর। তাঁর করুণা তোর উপরে আছে বলেই তো আজ এই বৃন্দাবনের পবিত্র রজে বসে তুই কথা বলতে পারছিস। বেটা অমন করে তাঁর কথা বললে তাঁর করুণা, তাঁর দয়া থেকে বঞ্চিত হয় মানুষ।

এমন সুরে, এমনভাবে কথাগুলি বললেন, দেখলাম, চোখদুটি সাধুবাবার জলে ভরে উঠেছে। আমিও সঙ্গে সঙ্গে সাধুবাবার দু-পায়ে হাতদুটো রেখে বললাম,

—বাবা, আমার এই বাক-অপরাধের জন্য ক্ষমা করে দিন আমাকে। চেষ্টা করবো আর কখনও যেন এমন কথা মুখ থেকে না বেরোয়—অন্তর আমার ঈশ্বর বিশ্বাস করুক বা না করুক।

সাধুবাবা ডানহাতটা অভয় সূচক করে বললেন,

—বেটা, ভগবানের করুণা বঞ্চিত মানুষ বনে গিয়ে কাঠ পায় না, তৃষ্ণায় সরোবরে গিয়েও পানের জল পায় না, আর ধনবান হয়েও অভুক্ত উপবাসী হয়ে থাকে—রান্না করা দু মুঠো অন্নও তার কপালে জোটে না।

এই পর্যন্ত বলে মিনিট খানেক থেমে সাধুবাবা বললেন,

—এবার বেটা তোর আসল কথায় আসি। বিষয়ী মন সাধনভজন চায় না—এটা ঠিক কথা। কিন্তু সাধন ভজন ছাড়া ভগবানের সান্নিধ্যে যাওয়ার সরাসরি কোন পথ নেই। বেটা, প্রথম অবস্থায় দরকার নেই সাধনভজন জপতপ আর তাঁকে ডাকার। হাজার কাজের মধ্যেও একটু সাধুসঙ্গ করলে তার ফল হয় অনেক অ-নে-ক বেশী। আর এ-ফলের কোন মার নেই। কেন জানিস্—ভগবানের দরবারে সাধুরা হলেন দরবারী। ঠিক যেমন আদালতে জজসাহেব আর পেশকারবাবু। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সাধুসঙ্গ করলে সাধুরাই তাঁর দরবারে সাধুসঙ্গকারীকে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেন। কেমন করে সেটা সম্ভব? সংসারীদের বিষয়ের ব্যাধি দূর হয় ক্রমাগত সাধুসঙ্গ করলে। মন ধীরে ধীরে বিষয় ব্যাধি মুক্ত হয়ে ভজনে লিপ্ত হয়। ফল তখন অপার আনন্দ আর শান্তি। এক সময় নিজেরই অজান্তে পৌঁছে যায় তাঁর দরবারে—বুঝলি?

এবার সাধুবাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, সাধুদের কোন্ জীবনটা সাধনের পক্ষে ভালো—আশ্রম কিংবা মঠে থেকে, না পথ চলতি জীবন—কোনটা?

একটু হাসিমাখা মুখে বললেন,

—বেটা, অনেক সময় বিভিন্ন তীর্থে গিয়ে আমি কয়েকদিনের জন্য কোন কোন আশ্রম বা মঠে রাত কাটিয়েছি। আর পথ তো আমার সম্বল আছেই। তবে আমি দেখেছি এবং বুঝেছি—সাধুসন্ন্যাসীদের আশ্রম জীবনটা বন্ধ জীবন। এই জীবনে

নাম হয়, যশ হয়, সাধুসন্ন্যাসীদের যথেষ্ট অর্থও হয়—যেটার কোন মূল্যই নেই এই ত্যাগের জীবনে। তবে যে উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়ে পড়া অর্থাৎ পরম শান্তি—সেটা কিন্তু হয় না বেটা আশ্রম বা মঠবাসী সাধুসন্ন্যাসীদের জীবনে। চার দেয়ালের বাইরের জীবনে দেহের কিছু কষ্ট হয় ঠিকই তবে শান্তির অভাব হয় না এতটুকুও।

একের পর এক প্রশ্ন করছি সাধুবাবাকে অথচ বিরক্তির কোন চিহ্নই নেই প্রশান্ত মুখখানায়। কত সংযম, কতটা মনের উন্নতি হলে তবেই এমনটা হয়। ভাগ্যিস আধুনিক বাপ মায়েদের কাছে এই সাধুবাবা লেখাপড়া শেখেন নি। নইলে আর যাই হোক বিরক্তি প্রকাশ আর দাঁত খিচুনীটা তা হলে ভালোই রপ্ত হতো। এবার জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, দেহটা যখন মানুষের তখন সারাজীবন ব্যাপী সুখদুঃখ নিয়েই আপনি মানুষ। এত বছরের এই সাধুজীবন আপনার। সুখ দুঃখ তো কিছু আছেই। সে ব্যাপারে দয়া করে বলবেন কিছু ?

এমন একটা কথায় সাধুবাবার মুখখানা হঠাৎ কেমন যেন খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠলো। হাঁটুর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন,

—বেটা, যে সারাজীবন সংসারের মুখই দেখেনি তার আবার দুঃখ কিসের ? আর সুখ তো আমার সারাজীবন ধরেই চলেছে। শিশুকালে যাকে তার গুরু কোলে করে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছেন—কোলে করে নিয়ে চলেছেন এক তীর্থ থেকে আর এক তীর্থে—পায়ে পাথর কাঁকর ফুটে যাবে এই ভয়ে যাকে পাহাড়ী পথে চলতে দেননি—বর্ষায় নিজে ভিজে যাকে ভিজতে দেননি—রোদে আচ্ছাদন দিয়েছেন—ভিক্ষান্ন আগে আমাকে খাইয়ে পরে নিজে খেয়েছেন—অসুস্থ হলে বুকে জড়িয়ে ধরে শুয়েছেন—যে গুরু আজ দেহে না থেকেও কোল ছাড়া করেননি—তার সুখ ছাড়া দুঃখ হয় নাকি ?

কথাটুকু এক নিঃশ্বাসে বলে ডুকরে কেঁদে উঠলেন সাধুবাবা। আঝোরে জল ঝরতে লাগলো দুচোখ দিয়ে। গুরু অন্ত প্রাণ এই সাধুবাবার আনন্দের আবেগধারা দেখে আমার মনটাও ভরে উঠলো এক অপার্থিব আনন্দে। মনে মনে বললাম, সাবাস সাধুবাবা—ভাগ্য করেছিলে বটে ! এমন ভাগ্য ক-জনার হয় ? এই মুহূর্তে কথা বলে সাধুবাবার ভাবটা নষ্ট করলাম না। মিনিট খানেক এইভাবে কাটার পর সাধুবাবা আবেগটা সামলে নিয়ে বললেন,

—বেটা, গর্ভবতী মা যেমন আঘাতের ভয়ে গর্ভস্থ সন্তান সযত্নে রক্ষা করে—তেমনই গুরুজী আমাকে গর্ভিনী মায়ের মতো রক্ষা করেছেন সেই শিশুকাল থেকে—করে চলেছেন আজও। দেহ মনে কাঁটা আর পাপের আঁচড় পড়তে দেননি এতটুকুও।

এবার প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞাসা করলাম,

—এত বছরের সাধুজীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনা যে আপনার ঘটেছে—এবিষয়ে

আমি নিশ্চিত। তার মধ্যে এমন কোন ঘটনা কি আছে যা আজও আপনার স্মৃতিতে স্পষ্ট হয়ে আছে ?
কথাটা শুনে একটু ভেবে সাধুবাবা শুরু করলেন,
—হাঁ বেটা, একটা ঘটনার কথা বলি শোন। তখন আমার বয়েস বছর পয়তাল্লিশ কি তারও একটু বেশী হবে। সেই সময় আমার গুরুজী আর দেহে নেই। বহুবারই কেদার বদ্রী যমুনোত্রী গঙ্গোত্রীতে গেছি আমি। গুরুজীর দেহরক্ষার পর মনটা আমার ভালো ছিল না। ভাবলাম, যাই একবার, বদরীনারায়ণ দর্শন করে আসি। হাঁটা পথে চলে গেলাম। সেই সময় ওখানে ছিলাম প্রায় মাসখানেক। তারপর ওখান থেকে আসার মাত্র দিন কয়েক আগে এক বৃদ্ধ মহাত্মার সঙ্গে আমার পরিচয় আর ঘনিষ্টতা হয়। কথায় কথায় আমি হরিদ্বারে ফিরে আসবো বলে সেই মহাত্মাকে জানালাম। আমার আসার ব্যাপারে স্থির করা দিনটার কথা জানাতে ওইদিন তিনিও হৃষিকেশে আসবেন বলে জানালেন। এতে আমি খুব খুশীই হলাম। পাহাড়ী পথে একজন সঙ্গী থাকলে দেহ মনের ক্লান্তি অনেকটা লাঘব হয়—এই ভেবেই খুশী হলাম।
এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা একটু থামলেন। এদিক ওদিক একবার দেখে নিয়ে এবার সরাসরি আমার চোখে চোখ রেখে বললেন,
—আসার দিন বেশ ভোরেই উঠলাম। অলকানন্দায় স্নান সেরে নারায়ণ দর্শন করে একটু তুলসী প্রসাদ মুখে দিয়ে সেই মহাত্মার কাছে গেলাম। তিনি থাকতেন একটা আশ্রমের বারান্দায় ধুনি জ্বালিয়ে। গিয়ে দেখলাম মহাত্মা সব গুছিয়ে নিয়ে বসে আছেন আমারই অপেক্ষায়। দেখামাত্রই নেমে এলেন বারান্দা থেকে। তারপর আমরা দুজনে হাঁটতে শুরু করলাম। তবে যে পথে পায়ে হেঁটে এসেছি—সে পথে নয়। মহাত্মা আমাকে নিয়ে অন্য পথে কিছুটা হেঁটে এলেন একটু নির্জনে। এবার আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তুই আমার হাতটা ধর্। চলার সময় কথা বলবি না। যতক্ষণ না হাত ছাড়তে বলবো—ততক্ষণ ছাড়বি না। এইটুকু খেয়াল রাখিস্।' আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। এর পর চলতে শুরু করলাম দু-জনে। আমার আজও বোধ আছে বেটা, মাটিতে পা দিয়েই আমি হেঁটেছি। বেটা, তুই বিশ্বাস করবি কিনা জানি না, বদরীনারায়ণ থেকে হৃষিকেশ এলাম মাত্র দু-ঘণ্টায়। (পাঠকের জ্ঞাতার্থে জানাই, বাস পথে বদরীনারায়ণ থেকে হৃষিকেশের দূরত্ব ৩০১ কি. মি.)। হৃষিকেশে এসে আমার হাতটা ছেড়ে দিতে বললেন। ছেড়ে দিলাম। মহাত্মা ওখান থেকে কোথায় যাবেন সে বিষয়ে আমাকে কিছু বললেন না। আমি প্রণাম করে ধরলাম হরিদ্বারের পথ।
সাধুবাবার জীবনে ঘটে যাওয়া এই ঘটনার কথা শুনে বিস্মিত হয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, এতখানি পথ বাসে করে গেলে কোথাও বাধা না পেলে বদরীনারায়ণে যেতে

সময় লাগে প্রায় বারো ঘণ্টা। বেশ কয়েকটা দিন লাগে ওই পাহাড়ী পথে হেঁটে গেলে। আপনারা দু-ঘণ্টায় এতটা পথ এলেন কেমন করে?
সাধুবাবা আমার বিস্ময়ে বিস্মিত না হয়েই বললেন,
—বেটা, ওই মহাত্মা উচ্চমার্গের কোন যোগী ছিলেন। এটা তাঁর যোগ প্রভাবেই সম্ভব হয়েছে। আমি কিন্তু তাঁর সঙ্গ করার সময় বা আসার সময় এক মুহূর্তের জন্যেও বুঝতে পারিনি তাঁর ওই অসাধারণ শক্তির কথা। বিবশভাবেই ঘটনাটা ঘটেছিল আমার ক্ষেত্রে। যখন আমি বুঝতে পারলাম তাঁর অসাধারণ শক্তির কথা—তখন তিনি একেবারেই চলে গেছেন আমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে।
এর পর সাধুবাবার সঙ্গে আরও কথা হলো। অনেক কথা হলো। শেষ কথা হলো এই ভাবে,
—বাবা, ঈশ্বর-কে লাভ করার উপায় তো আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে—যেহেতু আপনি আছেন এপথে। যদি অনুগ্রহ করে বলেন—তাহলে আমরা গৃহী যারা—তারা চেণ্টা করবো তাঁকে লাভ করতে।
কথাটা শোনা মাত্রই আনন্দ-বিগলিত কণ্ঠে বৃদ্ধ সাধুবাবা বললেন,
—হাঁ বেটা, তাঁকে লাভ করার পথ আমার জানা আছে। শুধু সাধুসন্ন্যাসী কেন, গৃহীরাও তাঁকে লাভ করতে পারবে—দেহকে মন্দির করে, মনকে বিগ্রহরূপে সেই মন্দিরে স্থাপন করলেই তাঁকে 'মিলবে'। বেটা, সব কিছুই 'মিলবে'—'জরুর মিলবে।')

আমরা মন্দির দর্শনে গেলে রিক্সাওয়ালা বসেই থাকে তবে পাহারা দেয় রেখে যাওয়া চটি। এসে বসলে আবার শুরু হয় চলা। এখন বেলা বেড়েছে—রোদের তাপও বেশ বেড়েছে। মাঝারী চওড়া বাঁধানো রাস্তা ধরে চলতে লাগলো রিক্সা।
বৃন্দাবন তথা ব্রজতে যত স্থান আছে—সবই শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল। এখানকার সব কিছুতেই ব্যাপ্ত রয়েছে ভগবদীয় পুণ্যভাব। তাই তো বছরের পর বছর দেশ বিদেশ থেকে ছুটে আসে লক্ষ লক্ষ নর-নারী অদৃশ্য আধ্যাত্মিকতার এক অজ্ঞাত আকর্ষণে। সারা বছরই উৎসব লেগে আছে এই বৃন্দাবনে। বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ায় বিহারীজীর চরণ দর্শন, বৈশাখী পূর্ণিমায় রাধারমণজীর মহাভিষেক, জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়াতে রাতের বেলায় বৃন্দাবন পরিক্রমা, শ্রাবণ মাসে বিহারীজীর 'হিণ্ডোলা' দর্শন, জন্মাষ্টমীতে বৃন্দাবনের প্রতিটি মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন এবং রঙ্গজীর মন্দিরে পাঁচ ছয়দিন ধরে বিশেষ উৎসব, রাধা অষ্টমীতে উৎসব, অক্ষয় নবমীতে বৃন্দাবনবাসীদের মথুরা, গড়ুড়গোবিন্দ ও বৃন্দাবন পরিক্রমা, মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে শাহজী মন্দিরে বাসন্তী কামরার দর্শন ও বসন্তোৎসব আর ফাল্গুন মাসে সারা বৃন্দাবনে হোলী উৎসব তো আছেই। বৃন্দাবনের এই উৎসবগুলিতে, ঝুলন এবং রাসপূর্ণিমাতে আগমন ঘটে লক্ষ লক্ষ

ভক্তপ্রাণ তীর্থ-যাত্রীর। আনন্দে মেতে ওঠে এখানকার প্রতিটি বৃক্ষলতা, পশুপাখী এবং ব্রজবাসী—আর যারা আসে এখানে।

মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে এ রাস্তা সে রাস্তা করে রিক্সা এসে দাঁড়ালো মাঝারী একটা গলির মধ্যে। রিক্সাওয়ালা বললো, বাবু নেমে দেখে আসুন—গোপেশ্বর মহাদেব মন্দির।

রাস্তার একেবারে পাশেই দেখলাম মাঝারী আকারের একটি মন্দির। রিক্সা থেকে নেমে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম মন্দির চত্বরে। এই মন্দিরের চত্বর বেশী জায়গা জুড়ে নয়। দরজা দিয়ে ঢুকলাম গর্ভমন্দিরে। দেখলাম, পিতলের বাঁধানো একটা চৌবাচ্চা—ঠিক বেনারসে বিশ্বনাথ মন্দিরের মতো। তার মধ্যে রয়েছে একটি শিবলিঙ্গ। প্রাচীন এই মন্দিরটি পাথরে নির্মিত। বৃন্দাবনের জাগ্রত এবং অনাদিলিঙ্গ এই গোপেশ্বর মহাদেব। প্রবাদ আছে, বৃন্দাবনে এসে এই মহাদেবের পুজো না দিলে ব্রজমণ্ডল দর্শনের সমস্ত তীর্থ-ফল তিনি হরণ করেন।

প্রেম ও ভক্তিরাজ্যে আহ্বান আছে—নেই শুধু বিসর্জন। সেইজন্য একদা মহাদেব এসেছিলেন বৃন্দাবনবিহারীর রাজ্যে। এখানে তিনি সদাসর্বদা যেন মেতে আছেন কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে।

একদা ব্রজবালাদের সঙ্গে মহারাস লীলায় মত্ত ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর আদেশ ছিল, কোন পুরুষ যেন এই লীলাদর্শন এবং লীলাক্ষেত্রে প্রবেশ না করে। কিন্তু ব্রজলীলার এই আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারলেন না মহাদেব দেবাদিদেবের একান্ত বাসনা হলো শ্রীকৃষ্ণের এই লীলাদর্শনের। অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে মায়ার প্রভাবে গোপিনীর বেশ ধারণ করে মহাদেব রাসলীলা প্রাঙ্গণে ঢুকে দেখতে লাগলেন রাসলীলা—অনুভব করতে থাকেন দুর্লভ আনন্দ। কিন্তু স্বয়ং মায়াময় কৃষ্ণ, তাই তাঁর কাছে ধরা পড়ে যায় মহাদেবের মায়া। কাছে ডেকে কৃষ্ণ তাঁরই লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবনে স্থান দিলেন মহাদেবকে। সেই থেকে মহাদেব এখানে প্রতিষ্ঠিত হলেন গোপীরূপ ধারণ করার জন্য গোপেশ্বর নামে।

যে রাসলীলার আকর্ষণে মহাদেব বৃন্দাবনে এসে পরে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন—সেই রাসলীলা প্রসঙ্গে শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০ম স্কন্দের ৩৩শ অধ্যায়ে ব্যাসপুত্র শুকদেব গোস্বামী রাজা পরীক্ষিৎকে বলেছেন,

"মহারাজ, অতিশয় কোমলচিত্ত গোপীগণ ভগবানের এরকম সান্ত্বনাবাক্য শুনে তাঁর হস্ত ও চরণ গ্রহণ ও তাঁকে আলিঙ্গন করে পূর্ণকাম হয়ে বিরহজনিত সন্তাপ দূর করলেন। সেখানে গোবিন্দ পরস্পর বাহুপাশে আবদ্ধ আনন্দিত গোপীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাসক্রীড়া আরম্ভ করলেন। গোপীমণ্ডলে অলঙ্কৃত রাসোৎসব আরম্ভ হল। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের প্রত্যেক দুজনের মধ্যে প্রবেশ করে তাঁদের কণ্ঠধারণ করলে তাঁরা সকলেই কৃষ্ণকে নিকটে মনে করেছিলেন। সেই সময়

তা দেখার জন্য সস্ত্রীক উপস্থিত দেবগণের শত শত বিমানে আকাশ আচ্ছন্ন হল। তারপর আকাশে দুন্দুভি বাজতে লাগল ও সেখান থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। গন্ধর্বপতিরা পত্নীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নির্মল যশোগান করতে লাগলেন। রাসমণ্ডলে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত গোপীদের বালা, নূপুর ও কিংকিণীর তুমুল ধ্বনি উত্থিত হল। ১-৬

সুবর্ণমণির মধ্যস্থিত মহামরকত নীলমনি যেমন শোভা পায়, গোপীগণ বেষ্টিত ভগবান দেবকীনন্দন রাসমণ্ডলে সেরকম শোভা পেতে লাগলেন। চরণবিন্যাস, হস্ত-সঞ্চালন, হাস্যময় ভ্রূভঙ্গী, স্বাভাবিক কৃশতা হেতু ভগ্নপ্রায় ক্ষীণ কটিদেশ, চঞ্চল স্তনবসন এবং দোদুল্যমান কুণ্ডলগুলি দ্বারা শোভিত কৃষ্ণসমন্বিতা গোপীদের বদন-কমল স্বেদবিন্দুতে আপ্লুত হল। তাঁদের কবরী ও চন্দ্রহার শিথিল হয়ে গেল। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করতে করতে মেঘশ্রেণীতে বিদ্যুৎচমকের মত শোভা পেতে লাগলেন। নানারাগে অনুরঞ্জিত কণ্ঠ যাঁদের সেই কৃষ্ণানুরাগক্রিয়া গোপীগণ কৃষ্ণঅঙ্গ স্পর্শে আনন্দিত হয়ে নৃত্য করতে করতে উচ্চস্বরে গান করতে লাগলেন। সেই গানে ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হল। কোন গোপী মুকুন্দের সঙ্গে স্বর না মিশিয়েই ষড়্‌জ প্রভৃতি স্বরের আলাপ করতে লাগলেন। তাতে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীত হয়ে সাধুবাদ জানিয়ে প্রশংসা করতে লাগলেন। অন্য এক গোপী ঐ স্বরালাপকেই ধ্রুবতালে পরিণত করে গান করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকেও অনেক সম্মান প্রদান করলেন। ৭-১০

রাসক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত কোন গোপীর হাতের বালা ও খোঁপার ফুলগুলি শ্লথ হয়ে পড়েছিল। তিনি কৃষ্ণের পাশে গিয়ে তাঁকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করলেন। তার মধ্যে আর এক গোপী নিজের কাঁধে স্থাপিত, চন্দনচর্চিত ও পদ্ম-গন্ধযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের বাহু আঘ্রাণ করে রোমাঞ্চিত হয়ে তা চুম্বন করতে লাগলেন। কোন গোপী নৃত্যে দোলায়মান কুণ্ডলের প্রভায় সমুজ্জ্বল গণ্ডস্থল শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডে স্থাপন করলে তিনি তাঁকে চর্বিত তাম্বুল প্রদান করলেন। নৃত্যগীতপরায়ণা কোন গোপীর নূপুর ও কটিভূষণের ধ্বনি হচ্ছিল। পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি পার্শ্বস্থ শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলপ্রদ হস্ত নিজের স্তনের উপর ধারণ করলেন। লক্ষ্মীদেবীর একান্ত প্রিয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পেয়ে ও তাঁর বাহুর আলিঙ্গন পেয়ে গোপীরা তাঁরই গুণগান করতে করতে বিহার করতে লাগলেন। বালা, নূপুর ও কিঙ্কিণীর ধ্বনি করতে করতে সেসব গোপীই রাসসভায় ভগবানের সঙ্গে নৃত্য করলেন। তখন তাঁদের নিজ নিজ কেশকলাপ থেকে মালা খসে পড়ছিল এবং কর্ণোৎপল, কুন্তলে অলংকৃত গণ্ডস্থল ও স্বেদবিন্দু দ্বারা তাঁদের মুখমণ্ডল এক অপূর্ব শোভা ধারণ করল। এই অনুপম রাস-সভায় ভ্রমরনিকরই গায়ক হয়েছিল। বালক যেমন নিজ প্রতিবিম্বের সঙ্গে খেলা করে, সেরকম লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণও গোপীদের সঙ্গে পরস্পর আলিঙ্গন, করমর্দন, প্রণয়, অবলোকন, উদ্দাম বিলাস ও হাস্যমুখর হয়ে ক্রীড়া করছিলেন। আসলে

শ্রীকৃষ্ণ নিজেরই সর্বকলা-কৌশল এবং সুগন্ধলাবণ্য, মাধুর্য—এসব ব্রজাঙ্গনাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে তাঁদের সঙ্গে ক্রীড়া করলেন। ১১-১৭

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে অঙ্গে গোপীদের প্রকৃষ্ট প্রীতি জন্মাল, তাতে তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলি এমন বিবশ হল যে মালা ও অলংকারাদি খসে পড়ল। তাঁরা কেশরাশি, পরিধানের বসন ও বক্ষাবরণী আর ধরে রাখতে পারলেন না। শুধু যে গোপীরা ব্যাকুল হলেন এমন নয়, দেবাঙ্গনারাও শ্রীকৃষ্ণের রসকেলি দেখে কামপীড়িতা হয়ে বিমোহিতা হলেন, আর নক্ষত্রগণের সঙ্গে চন্দ্রও বিস্ময়ান্বিত হলেন। যতসংখ্যক গোপী সেই রাসমণ্ডলে বিহার করছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মরূপকে তত সংখ্যক করে তাঁদের মধ্যে নানারকম বিলাসে বিহার করতে লাগলেন। গোপীরা অতি বিহারজনিত পরিশ্রমে শ্রান্ত হলে করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ সপ্রেমে তাঁর মঙ্গলপ্রদ করকমল দ্বারা তাঁদের মুখ স্পর্শ করলেন। শ্রীকৃষ্ণের নখাদি স্পর্শে হৃষ্টচিত্ত গোপীরা সুধাক্ষরিত হাসি ও প্রেমপূর্ণ কটাক্ষ দ্বারা সেই সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে সম্মান জানিয়ে তাঁর পবিত্র গুণগাথা গান করতে লাগলেন। ১৮-২২

পরিশ্রান্ত গজরাজ হস্তিনীদের সহ যেমন জলে প্রবেশ করে, শ্রীকৃষ্ণ সেরকম শ্রম দূর করার জন্য গোপীদের সঙ্গে যমুনায় প্রবেশ করলেন। সে সময় গোপীদের অঙ্গ সংমর্দিত ও স্তনলিপ্ত কুস্কুমে অনুরঞ্জিত মালায় আকৃষ্ট হয়ে গন্ধর্বশ্রেষ্ঠদের মত ভ্রমরকুল গান করতে করতে অনুগমন করছিল। যুবতীরা বারবার শ্রীকৃষ্ণকে যমুনার জলে সিঞ্চিত করলেন ও প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁকে দেখলেন। বিমানচারী দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন। আত্মারাম হয়েও তিনি গজরাজের মত ক্রীড়াপরায়ণ হয়ে যমুনাসলিলে সখীদের সঙ্গে বিহার করতে লাগলেন। মত্ত হস্তী যেমন হস্তিনীদের সঙ্গে ভ্রমণ করে, সেভাবে শ্রীকৃষ্ণ জলজ ও স্থলজ কুসুমের সৌরভে আমোদিত যমুনাতটের উপবনে ভ্রমর ও গোপীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বিচরণ করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যসংকল্প। সুতরাং গোপীগণ তাঁর প্রতি যতই অনুরক্ত হোন না কেন, তাঁর চরমধাতু অঙ্গ থেকে নির্গত হয়নি। কাব্যেবর্ণিত শরৎকালীন যাবতীয় রসের আশ্রয় পূর্ণচন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল সেই রাত্রিগুলিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করেছিলেন। ২৩-২৬

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন, ভগবান, ধর্ম-সংস্থাপন ও অধর্ম-বিনাশের জন্য ভগবান জগদীশ্বর অংশের (বলরামের) সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং ধর্ম-সেতুর বক্তা, কর্তা ও রক্ষক হয়ে কি ভাবে ধর্মবিরুদ্ধ পরস্ত্রী সম্ভোগ করলেন? যদুপতি আপ্তকাম হয়েও কি অভিপ্রায়ে এই নিন্দিত কর্ম করলেন? আমাদের এই সংশয় নিবারণ করুন।

শুকদেব বললেন, মহারাজ, অগ্নি সর্বভুক্ হয়েও যেমন দোষলিপ্ত হয় না, ঈশ্বরদেরও সে রকম ধর্মমর্যাদা লঙ্ঘন ও সাহস দেখা গেলেও তা দোষণীয় নয়। যারা ঈশ্বর নন, তাঁদের এরকম আচরণ কল্পনা করাও দোষণীয়। রুদ্র ছাড়া অন্যে সমুদ্র মন্থনে

উত্থিত বিষপান করলে বিনষ্ট হত। ঈশ্বরদের বাক্য সত্য, আচরণও কোন কোন সময় সত্য। অতএব, বুদ্ধিমানেরা ঈশ্বরদের যে আচরণ তাঁদের উপদেশের অনুরূপ মাত্র সেই আচরণই করবে। প্রভু, ঐ সব ঈশ্বরদের কোন অহংকার নেই, মঙ্গলানুষ্ঠানে তাঁদের ইহলোকে বা পরলোকে কোন ফলের সম্ভাবনা নেই, পাপাচরণেও তাঁদের কোন অনর্থ হয় না। তাই, যিনি পশুপক্ষী, মানুষ ও দেবতা সমস্ত বিশ্বজীবের নিয়ন্তা, যিনি সমস্ত ঐশ্বর্যের পতি সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের কুশল ও অকুশলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, এতে আর আশ্চর্য কি? ২৭-৩৪

যার চরণপদ্ম সেবায় ভক্ত পরিতৃপ্ত, যোগবলে যাঁকে পেয়ে যোগীরা কর্মবন্ধন মুক্ত হন এবং যাঁর তত্ত্ব জেনে জ্ঞানীরা বন্ধনশূন্য হয়ে স্বেচ্ছায় বিচরণ করেন, নিজ ইচ্ছায় লীলা বিগ্রহধারী সেই শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন কিভাবে হবে? যিনি গোপীদের, তাঁদের স্বামীদের ও সমস্ত দেহীর অন্তরে বিরাজ করছেন, যিনি বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী, তিনি লীলার জন্য দেহধারণ করেছিলেন। জীবের মঙ্গলের জন্য মানুষের মূর্ত্তি গ্রহণ করে তিনি ঐভাবে নানারকম ক্রীড়া করে থাকেন যা শ্রবণ করে যে কেউ ভগবৎপরায়ণ হতে পারে। মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হয়ে ব্রজবাসীরা স্ত্রীদের নিজ নিজ পাশে অবস্থিত মনে করে তাঁর প্রতি হিংসা করেননি। তারপর ভগবৎপ্রিয় গোপীরা ব্রাহ্ম-মুহূর্তের সময় তাঁর অনুমোদনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। ব্রজবধূদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এই রাসক্রীড়া যিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ ও কীর্ত্তন করবেন, তিনি ভগবানের অচলা ভক্তিলাভ করে ধীর চিত্তে অবিলম্বে কামরূপ মানসিক পীড়া থেকে মুক্ত হতে পারবেন।" ৩৫-৪০

গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দির থেকে এসে বসলাম রিক্সায়। এখান থেকে যমুনা একেবারেই কাছে। রিক্সা চলতে শুরু করলো সেইদিকেই। এ-রাস্তাটা বাঁধানো বটে তবে প্রায় গলিরই মতো।

আজকের এই বৃন্দাবন সেই বৃন্দাবন নয়—যেখানে ব্রজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজ দিব্যলীলা দিয়ে স্থাপন করেছিলেন এক অপূর্ব পারমার্থিক প্রেম-ভক্তির বিশাল নগরী—এ-কথা বলেন কিছু পণ্ডিতেরা। তাঁরা পৌরাণিক বৃন্দাবনের বর্ণনার উপর ভিত্তি করে বলেন যে, বৃন্দাবনের কাছেই গোবর্ধন পর্বতের উল্লেখ আছে পুরাণে, যা এখনকার বৃন্দাবন থেকে অনেকটাই দূরে। পণ্ডিতদের একটা অংশ রাধাকুণ্ডকে, আবার কেউ কেউ কাম্যা বা কাঁমাকে মনে করেন আদি বৃন্দাবন বলে। কারণ হিসাবে তাঁদের মত, যমুনা প্রাচীন যুগে বয়ে যেত ওই স্থানের উপর দিয়ে। শত শত বছর ধরে ধীরে ধীরে যমুনা বদলাতে লাগল তার গতি প্রবাহ—ফলে বৃন্দাবনও যমুনা তটের সঙ্গে সঙ্গে স্থান বদল করতে থাকে। প্রাচীন বৃন্দাবন লুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর আজকের বৃন্দাবনেই স্থাপন করা হয় নতুন বৃন্দাবন। কাম্যাতে ৮৪টি তীর্থ

এবং বৃন্দাদেবীর মন্দির (ব্রজ ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমার পথে পড়ে) থাকায়—কাম্যকেই অধিকাংশ পণ্ডিতেরা প্রাচীন বৃন্দাবনের প্রমাণ বলে মনে করেন।

পনেরো-ষোলশো শতাব্দীর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত হয়েছিল মদন মোহন, গোপীনাথ, গোবিন্দজী, রাধাবল্লভজীর মন্দিরগুলি। ঔরঙ্গজেবের শাসন কালে শুধু বৃন্দাবনেই নয়—ব্রজমণ্ডলের আর অনেক মন্দিরেরই ক্ষতিসাধন করা হয়েছিল। ফলে সেই সময় অনেক মন্দিরের বিগ্রহকে স্থানান্তরিত করা হয় জয়পুরে। এমনকি বৃন্দাবনের নাম মোমিনাবাদও রাখার চেষ্টা করেছিলেন তৎকালীন মুসলমান শাসকেরা—যা প্রচলিত হতে পারেনি। শুধুমাত্র কাগজপত্রের ভিতরেই সীমিত থেকে গেছে।

১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আটজন রাজার আধিপত্য ছিল এই ব্রজমণ্ডলে। তার মধ্যে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আহমেদ শা ব্রজমণ্ডলে মথুরা মহাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলির সঙ্গে লুটতরাজ চালিয়েছিলেন বৃন্দাবনেও। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ব্রজমণ্ডলের অনেক স্থানেই চালু হয়ে যায় ইংরেজ শাসন। তখনই বৃন্দাবনের পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ এসেছিল বলে অনেক পণ্ডিতের ধারণা।

তখন সেকেন্দার লোদীর রাজত্বকাল। প্রাচীন বৃন্দাবন ধ্বংস হয়ে পরিণত হয়ে রয়েছে এক দুর্গম বনভূমিতে। মথুরা বৃন্দাবনে যাওয়ার ইচ্ছা মহাপ্রভুর বহুদিনের। তিন তিনবার চেষ্টা করলেন, নানা বাধাবিঘ্ন এসে উপস্থিত হলো। কিছুতেই আর যাওয়া হয়ে উঠলো না। এবার আর বাধা পড়লো না। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে একটি মাত্র সেবক বলভদ্রকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন নীলাচল থেকে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে। পায়ে হেঁটে সারাটা পথ অতিক্রম করলেন অতি কষ্টে। তারপর বৃন্দাবনে এসেই কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন মহাপ্রভু। প্রেমাবশে শুরু করলেন নৃত্যকীর্তন। এক-একটি পুণ্যময় কৃষ্ণলীলা বিজড়িত স্থান দর্শন করেন আর আনন্দে হয়ে যান আত্মবিস্মৃত। কখনও গাভীর ডাক শুনে, কখনও বা ময়ূর ময়ূরীর নাচ দেখে মহাপ্রভুর অন্তরে জেগে ওঠে কৃষ্ণলীলার উদ্দীপনা—মহাভাব। হারিয়ে ফেলেন বাহ্যজ্ঞান। লুটিয়ে পড়েন ব্রজরজে। এইভাবেই তাঁর দিন কাটতে থাকে বৃন্দাবনে।

এই সময়েই তিনি দিব্য ভাবাবেশে আবিষ্ট হয়ে পুনরুদ্ধার করেন সমগ্র ব্রজমণ্ডলের বহু প্রাচীন লুপ্ততীর্থ। আচার্য শংকর যেমন ভারতের বিভিন্ন লুপ্ততীর্থের উদ্ধার করেছিলেন, তেমনই সমগ্র বৃন্দাবনই যে শ্রীকৃষ্ণের লুপ্ত লীলাক্ষেত্র—তা মহাপ্রভুই প্রকট করেন আবরণ সরিয়ে। জ্ঞাননেত্রে প্রতিভাত হয়ে ওঠে হাজার হাজার বছর আগে হারিয়ে যাওয়া তীর্থগুলি। মহাপ্রভুর বৃন্দাবনে পদার্পণের পর আ.. কখনও হারিয়ে যায়নি বৃন্দাবন। কৃষ্ণলীলার ধারা ভক্তমনে বয়ে চলেছে আজও। প্রেমভক্তিধর্মের উজ্জীবনে উত্তরভারতে মহাপ্রভুর এ-অবদানের মূল্য একেবারেই

অপরিসীম। তিনিই প্রথম বৃন্দাবনের বন-পরিক্রমা করেছিলেন কৃষ্ণের অন্বেষণে। মহাপ্রভুর এই পরিক্রমা বনযাত্রা বা বনভ্রমণ নামে প্রসিদ্ধ। মহাপ্রভুর পর বৈষ্ণবদের মধ্যে বনযাত্রার প্রচলন করেছিলেন নারায়ণ ভট্ট।
কৃষ্ণপ্রেমে আত্মবিস্মৃত মহাপ্রভুর বৃন্দাবনে যেখানে যে ভাবের উদয় হয়েছিল, সেখানে সেই ভাবানুযায়ী সেই স্থানের নামকরণ করেছিলেন তিনি। সেই সময় তিনি যে বিগ্রহগুলি দর্শন করেছিলেন তার মধ্যে আছে শেষশায়ীর নারায়ণ বিগ্রহ, নন্দগ্রামে শিশুকৃষ্ণের বিগ্রহ, গোবর্ধনে হরিদেব আর মথুরায় কেশবদেব—যে বিগ্রহগুলির বয়স আজ পাঁচশো বছরেরও বেশী হয়ে গেল। এক কথায় শ্রীকৃষ্ণের এ বৃন্দাবন মহাপ্রভুরই দান।
তবে কৃষ্ণদাস নামে এক রাজপুতও ছিলেন মহাপ্রভুর সঙ্গে। পরে মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছয়জন গোস্বামীও বৃন্দাবনের অনেক ভক্তিরহস্য উদ্ঘাটন করে পূর্ণতা এনেছিলেন এই মধুর বৃন্দাবনের।

মাঝারী চওড়া একটা গলির মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে এসে রিক্সা দাঁড়ালো যমুনা তীরে বংশীবট মন্দিরে। মাঝারী আকারের মন্দির। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠে দেখলাম রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। কোন আড়ম্বর নেই বিগ্রহে—মন্দিরেও।
বহু প্রাচীন একটি বটবৃক্ষ দাঁড়িয়ে রয়েছে মহাকালের সাক্ষী হয়ে। আজকের ভাঙাচোরা ঘাট আর রুগ্ন যমুনার তেমন কোন আকর্ষণ না থাকলেও এক সময় উচ্ছল যৌবনা যমুনার কলতান শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর তালের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে ব্রজবালাদের মনে সৃষ্টি করেছিল এক অপূর্ব প্রেমের মাধুর্যরস। হাজার হাজার বছরের জনশ্রুতি আছে, এখানকারই বৃক্ষের নীচে বসে বাঁশী বাজাতেন শ্রীকৃষ্ণ —যে সুরে মোহিত হয়ে ছুটে আসতেন শত শত গোপিনীরা। নন্দলালের প্রিয়স্থান এই বংশীবটে যত গোপী তত কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে একদা করেছিলেন মহারাসলীলা।
এখান থেকে রিক্সায় সামান্য সময়ের মধ্যেই এলাম যমুনাতীরে—কেশীঘাটে। রাজ ঘাট, বরাহ ঘাট, কালীদহ ঘাট, প্রস্কনন্দন ঘাট, বিহার ঘাট, শিঙ্গারবট ঘাট, গোবিন্দ ঘাট, আদিত্য ঘাট, চীর বা বস্ত্রহরণ ঘাট, ভ্রমর ঘাট, যুগল ঘাট আর কেশী ঘাট—এই বারোটি ঘাট নিয়েই বৃন্দাবন।
সুন্দর এই কেশী ঘাটটি পাথর বাঁধানো। সারি সারি সিঁড়ি নেমে গেছে যমুনায়। রিক্সা থেকে নেমে এলাম ঘাটে। মহাদেবের একটি মন্দির রয়েছে ঘাটের পাশে। মাঝারী আকারের মন্দিরে স্থাপিত আছে শিবলিঙ্গ। নিম আর অশ্বত্থ গাছও রয়েছে মন্দিরের কাছে। গাছের গোড়া বাঁধানো। এখানে এবং ঘাটে বসে অনেকেই করছেন দেখলাম পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি। লোকবিশ্বাস, এখানে পিণ্ডদান করলে গয়াধামের সমান ফললাভ হয়।
কেশীঘাটে দাঁড়িয়ে পিছন দিকে তাকালে দেখা যায় পুরনো শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর

মন্দিরের চূড়া। এই ঘাটের পাশেই রয়েছে একটি শ্মশান। কোন ব্রজবাসী অথবা কোন তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হলে সৎকার করা হয় এই ঘাট সংলগ্ন শ্মশানে। কথিত আছে, এই ক্ষেত্রটিতেই একদা শ্রীকৃষ্ণ বধ করেছিলেন কেশী নামে এক দৈত্যকে। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধের ৩৭শ অধ্যায়ে কেশী দৈত্য বধের কাহিনীটি শুকদেব বর্ণনা করেছেন রাজা পরীক্ষিৎকে এইভাবে,

"মহারাজ, কংসপ্রেরিত দৈত্য কেশী বিশাল অশ্বমূর্তি ধরে হ্রেষারবে ও খুরের আঘাতে পৃথিবী বিদীর্ণ করতে করতে সকলের ত্রাস সৃষ্টি করল। সে তার কেশরের আঘাতে আকাশের মেঘ ও বিমানগুলিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করতে করতে নন্দের ব্রজমণ্ডলে প্রবেশ করল। সেই কেশীদৈত্যের চোখদুটি বিশাল, মুখগহ্বর বিকট, গলদেশ স্থূল ও দীর্ঘ, গাত্রবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায়। এই দুষ্ট দৈত্য কংসের মঙ্গল কামনায় নন্দরাজের ব্রজধাম কাঁপিয়ে উপস্থিত হল। কেশী তার হ্রেষারবে গোকুলকে ভীত এবং পুচ্ছ ও কেশরে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করে ভীমবেগে যুদ্ধের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করতে লাগল। তখন শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বেরিয়ে এসে সিংহের মত গর্জন করে তাকে আহ্বান করলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে সে আকাশ গ্রাস করার মত মুখব্যাদান করে তাঁর দিকে ছুটে এল। প্রচণ্ড বেগশালী দুরতিক্রম্য সেই অসুর পেছনের দুই পা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করতে এল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে সেই আঘাত এড়িয়ে গেলেন। তখন অসুর আবার আঘাত করতে চেষ্টা করলে তিনি দুই হাতে তার পা দুটি ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে, গড়ুড় যেমন সাপকে ছুঁড়ে ফেলে সে রকম অনায়াসে, তাকে শতধনু দূরে ছুঁড়ে ফেলে স্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অসুর কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে আবার উঠে পড়ল এবং ক্রোধে মুখবিকৃত করে অতিবেগে শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৌড়ে এল। তখন শ্রীকৃষ্ণও সাপের গর্তে প্রবেশের মত অনায়াসে পলকে তার মুখ-গহ্বরের মধ্যে নিজের হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তপ্ত লোহার স্পর্শের মত শ্রীকৃষ্ণের বাহুস্পর্শে তার দাঁতগুলি খসে পড়ল। অচিকিৎসিত স্ফীতোদর রোগের মত কেশীর মুখবিবরে কৃষ্ণ-বাহু ক্রমশ বেড়ে উঠতে লাগল। তাঁর ক্রম-বর্ধনশীল বাহুর চাপে অসুরের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। সে ঘর্মাক্ত দেহে, চোখ উপরে তুলে, পা ইতস্তত ছুঁড়ে ও বিষ্ঠা ত্যাগ করতে করতে প্রাণহীন অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেল। কাঁকুড় পাকলে যেমন আপনি ফেটে যায় কেশীর দেহও সেরকম বিদীর্ণ হল। মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ তার দেহ থেকে অনায়াসে নিজের হাত বের করে নিলেন। নিতান্ত অবহেলায় শত্রুসংহার করে শ্রীকৃষ্ণ নিরভিমানে অবস্থান করতে লাগলেন এবং দেবতারা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পুষ্পবৃষ্টি সহকারে স্তব করতে লাগলেন।" ১-৯

কেশীদৈত্যকে বধ করে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদের আনন্দ দিয়ে প্রসন্নচিত্তে গোপালদের সঙ্গে পশুপালন করতে লাগলেন। কেশীদৈত্যের নামানুসারেই এই ঘাটটির নাম হয়েছে কেশীঘাট।

প্রথম যে-বার বৃন্দাবনে গেছিলাম সে বারের কথা। কেশীঘাটের বাঁধানো চত্বরে রয়েছে একটা নিম আর বেশ বড় একটা অশ্বত্থ গাছ। গাছের গোড়াটা সান বাঁধানো। পাশেই মন্দির। কাছেই যমুনা বয়ে চলেছে কুলকুল করে। তবে যমুনার যৌবনের কোন উচ্ছলতা নেই এখানে। একেবারেই কামশীতল। অনেকেই চলেছেন স্নানে। পুরুষের সংখ্যা কম। মেয়েরাই বেশী। তার মধ্যে বৃদ্ধা আর মাঝ বয়সীর সংখ্যাটাই বেশী। তবে কেশীঘাটে এখন কোন কোলাহল নেই। অনেকটা জায়গা জুড়ে অশ্বত্থ গাছের শীতল ছায়া।

দূর থেকে দেখলাম, সান বাঁধানো গাছের গোড়ায় ডান হাতটা উপর দিকে তুলে অশ্বত্থ গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন একজন লোক। কাছে এগিয়ে যেতেই দেখলাম, সাধারণ লোক নয়—সাধুবাবা। মাথায় লম্বা লম্বা জটা পিছনে সটান নেমে গেছে প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি। গায়ের রঙ কালো। আমি কালো—সাধুবাবা আমার থেকেও কালো। কোন হৃষ্টপুষ্ট দেহ দীর্ঘকালের অনাহার অনিদ্রায় শেষ পর্যন্ত যেমন এসে দাঁড়ায় ঠিক তেমন চেহারাটা বলেই আমার মনে হলো। নাকটা খাড়া। চোখ দুটো বেশ বসে গেছে। তবে উজ্জ্বল। ভাঙা গালে মাঝারী লম্বা দাড়ি নেমে এসেছে বুক পর্যন্ত। তাতে কাঁচাও আছে। পাকাও আছে কিছু। একটা ছোট্ট ঝুলি পড়ে রয়েছে পায়ের কাছে। দেখেই বোঝা যায় ভিতরে কিছু নেই। আর আছে জল পানের জন্য ছোট একটা পিতলের বালতি। পরনে রয়েছে এক টুকরো নেংটি।

একেবারে কাছে এগিয়ে গেলাম। প্রণাম করে মুখের দিকে তাকাতেই দেখলাম, কেমন যেন একটা অস্বস্তিবোধ করলেন আমার আগমনে। সান বাঁধানো গাছের গোড়ায় বসলাম পা ঝুলিয়ে। হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বেশ অবাকই হলাম। এমনভাবে আর কোথাও কোনও সাধুবাবাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখিনি কখনও। বেশ কৌতূহল হলো। এবার পা দুটো তুলে বসলাম বাবু হয়ে। বললাম,

—বাবা, বসুন না, দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন ?

আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না। আনমনে তাকিয়ে রইলেন অন্যদিকে। এইভাবে কেটে গেল মিনিট পাঁচেক। আবার বললাম,

—বসুন না বাবা, একটু কথা বলি আপনার সঙ্গে।

কোন আমলই দিলেন না আমার কথায়। আগের ভাবেই রইলেন। বুঝলাম, এই সাধুবাবার মুখ খোলাতে মুশকিল হবে। বসেই রইলাম তাঁর মুখ চেয়ে। প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেল। একটা কথাও বললেন না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ডান

হাত তুলে। এতটুকুও নড়ছেন না। স্পন্দনহীন দেহ যেন। দেখলে মনে হবে যেন অনড় পাথরের মূর্তি। ভিতরে ভিতরে বেশ অস্থির হয়ে উঠলাম। ঘাড় তুলে আর কতক্ষণ এমন ভাবে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায়! তাই একবার সাধুবাবার মুখের দিকে তাকাচ্ছি আবার কখনও এদিক ওদিক—এইভাবেই কাটতে লাগলো সময় টা। স্নানার্থী বা দর্শনার্থীদের কোন ভ্রূক্ষেপই নেই এদিকে। তারা আসছে আর যাচ্ছে।

এবার আমার সাধুদের কথা বলানোর কৌশলটা কাজে লাগালাম। প্রথমে দেখে নিলাম কাছাকাছি কোন লোক আছে কি না? দেখলাম নেই। তারপর ঝপ্ করে পা দুটো ধরে বললাম,

—বাবা, আপনি কি মৌনী আছেন? আমার সঙ্গে কথা বলায় কি আপনার আপত্তি আছে? দয়া করে দু-চারটে কথা যদি বলেন তো খুশী হই।

সাধুবাবা বাঁহাত দিয়ে আমার মাথাটা সরিয়ে দিলেন। মুখখানা আমার নীচু করা ছিল। ঠিক হামাগুড়ির মতো। মাথায় হাত দিতেই তাকালাম মুখের দিকে। ইসারায় বসতে বললেন। বুঝলাম, কৌশলটা কাজে লেগেছে। একটু সরে বসে মুখের দিকে তাকিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলাম,

—এইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন বাবা—এটা কি ধরনের সাধনা?

একটু গম্ভীর সুরে সাধুবাবা বললেন হিন্দিতে,

—সে সব জেনে তোর লাভ নেই। আর কি বলবি বল্?

সঙ্গে সঙ্গেই বললাম,

—বাবা, অনেক জায়গায়ই ঘুরেছি তবে আপনার মতো এমন তপস্বী আমি দেখিনি কোথাও। আপনাকে দেখার পর আমার অসংখ্য প্রশ্ন এসেছে মাথায়। বেশী বিরক্ত করবো না। যদি দু-চারটে কথার উত্তর দেন তো খুশী হবো।

বলে সম্মতির জন্য মুখের দিকে তাকালাম। কোন উত্তর দিলেন না। বুঝলাম, আমার প্রশ্নের উত্তর পেতে দেরী হবে না। আমি আর এতটুকু দেরী না করেই জিজ্ঞাসা করলাম,

—আপনি কোন সম্প্রদায়ের সাধু?

সাধুবাবা বললেন,

—রামাৎ নিমৎ সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু আমি।

মুহূর্ত দেরী না করেই বললাম,

—ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন হাত তুলে—এটা কি ধরনের তপস্যা?

কোন উত্তর দিলেন না সাধুবাবা। বুঝতে দেরী হলো না, গোপন কথাটা তিনি বলতে চাইবেন না। এবার অনুরোধের সুরেই বললাম,

—বলুন না বাবা, এখানে তো আর কেউ নেই। তাছাড়া আপনার ক্ষতি তো কিছু হবে না। আমার জানাটা হবে। এই তো—আর কি?

মিনিট তিনেক কি যেন ভাবলেন—মুখের ভাবটা দেখেই মনে হলো। এবার তিনি বললেন,

—বেটা, এটা আমার একটা ব্রত। এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবো ঊর্ধ্ববাহু হয়ে। হাত নামাবো না—বসবোও না ততদিন পর্যন্ত যতদিন না আমার ইষ্টলাভ হবে।

কথাটা শুনে মাথাটা আমার ঘুরে গেল। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বলেন কি সাধুবাবা! হুট্ করে একটা কথাও বেরোলো না আমার মুখ থেকে। একটু ভেবে নিয়ে বললাম,

—এখন বয়েস কত হলো আপনার?

উত্তরে একটু আন্দাজ করেই সাধুবাবা বললেন,

—পঞ্চান্ন ষাট হবে। তবে এর থেকে কিছু বেশীও হতে পারে আবার 'থোড়া' কমও হতে পারে।

এবার জানতে চাইলাম,

—বাবা, আপনার ডানহাতটা তো অনেক সরু হয়ে গেছে বাঁহাতের তুলনায়। এইভাবে আর কিছুকাল থাকলে তো হাতটাই অকেজো হয়ে পড়বে। এই ব্রত বা তপস্যা আপনার কতদিন ধরে চলছে?

ভুরু দুটো একটু কোঁচকালেন। দেহ কিন্তু স্থির। এতটুকুও নড়াচড়া নেই। একটু ভেবে নিয়ে বললেন,

—প্রায় বছর পনেরো হলো—এই ব্রত গ্রহণ করেছি। আর এ দেহটা যখন থাকবেই না, তখন শুধু হাতটা নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই।

ভাবলাম, সাধুবাবার ইষ্টলাভ এখনও হয়নি। এই কঠোর কঠিন ব্রত ইষ্টলাভের জন্য। তা হয়ে গেলে তো ব্রত ভঙ্গই করে ফেলতেন। জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, গৃহত্যাগ করে সাধন জীবনে আসার পর থেকেই কি এই ব্রত গ্রহণ করেছেন, না তারও অনেক পরে?

সাধুবাবার দেহের কোন অংশই নড়ছে না—একেবারে স্থির। শুধু মুখটুকু নড়ছে কথা বলার সময়। তিনি বললেন,

—না বেটা, ঘর ছাড়ার অনেক পরে এই ব্রত গ্রহণ করেছি। ঘর ছেড়েছি তো সেই ছোট বেলায়।

সঙ্গে সঙ্গেই বললাম,

—ঘর ছাড়লেন কেন?

এবার সাধুবাবা একটু চটে গেলেন। বিরক্তির একটা ছাপ ফুটে উঠলো সারা চোখে মুখে। সে ভাবটা ফুটে উঠলো কণ্ঠস্বরেও। বললেন,

—কেন এখানে বসে আমার ভজনে বিঘ্নের সৃষ্টি করছিস্। নিজের কাজে যা না।

কথাটা বলে চোখদুটোকে নিবদ্ধ করলেন অশ্বত্থের একটা ডালে। সাধুদের এসব কথার কোন গুরুত্বই আমি দিই না। ওসব কথা আমার বহু শোনা আছে। তবে

বিরক্ত হয়েছেন দেখে চট্ করে আমার ওষুধটা প্রয়োগ করলাম। পা-দুটোতে হাত রেখে বললাম,

—রাগ করবেন না বাবা, আপনার মতো, আপনাদের মতো মহাত্মাদের জীবন-কথা শুনতে আমার ভালো লাগে—সেই জন্যেই জিজ্ঞাসা করা। দয়া করে বলুন বাবা, আপনার দুটো পায়ে ধরেছি।

মুহূর্তে মুখের পরিবর্তন ঘটে গেল। ওষুধে কাজ হয়েছে। আগুনে জল পড়েছে। এবার প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন,

—বেটা, সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে অতীত কথা জানতে চাইতে নেই। তারা তো ওটা ফেলে এসেছে—আবার কেন! তবুও যখন জিজ্ঞাসা করলি তখন বলছি। আমি যখন মায়ের পেটে তিন মাস—তখন বাবা গেল মরে। তারপর জন্ম হলো। অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে বড় করে তুললেন আমার মা। যখন বয়স আমার বছর পনেরো তখন মা-ও চলে গেল হঠাৎ অসুখে। আমিই একমাত্র সন্তান। বাড়ী ছিল গোরক্ষপুর। মা মারা যাওয়ার পর নিজের বলতে আর কেউই রইলো না। একদিন কি মনে হলো—বেরিয়ে পড়লাম ঘর ছেড়ে। তারপর আর ফিরে যাইনি ঘরে। পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এলাম গয়ায়। সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় বসেছিলাম বিষ্ণুর পাদপদ্ম মন্দির চত্বরে। তখন সন্ধ্যা লাগো লাগো। ক্লান্ত আর অবসন্ন দেহটা যে কখন এলিয়ে পড়েছে—জানি না।

এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন। আমি মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম হাঁ করে। সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, অনেক রাত্রে হঠাৎ কারও স্পর্শে ঘুমটা আমার ভেঙে গেল। উঠে বসলাম। দেখলাম এক সাধুবাবাকে। পাতায় করে কয়েকটা রুটি আর সব্‌জি আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'খা লে বেটা, সারাদিন তো কিছুই খাস্‌নি, খা লে।' কোন কথা না বলে রুটি আর সব্‌জি খেয়ে নিলাম গোগ্রাসে। তারপর সেই রাতেই আমাকে সাধুবাবা নিয়ে গেলেন ফল্গু নদীতে। আমাকে বললেন স্নান করে নিতে। অন্তঃসলিলা বলে পরিচিত ফল্গুর ক্ষীণ স্রোতে স্নান করলাম কোন রকমে। তারপর আবার নিয়ে এলেন বিষ্ণুর পাদপদ্ম মন্দির চত্বরে। তারপর দীক্ষা দিয়ে তিনি সেদিন আপন করে নিলেন আমাকে। এই সব কাজগুলি ঘটে গেল একের পর এক। আমার ইচ্ছাশক্তি তো কোন কাজই করেনি, উপরন্তু এ সবই করলাম আমি বিবশভাবে। এরপর আমার সহায় হলো, সঙ্গীও হলো। গুরুজীর সঙ্গেই চলতে লাগলো তীর্থ পরিক্রমা। দুঃখের দিনের চির অবসান হলো আমার।

এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা চুপ করলেন। মাথা নড়লো না কিন্তু চোখ দুটো ঘুরিয়ে দেখে নিলেন ডাইনে বাঁয়ে। এমন সময় কয়েকজন বৃদ্ধা যমুনায় স্নান সেরে আসার পথে এসে দাঁড়ালেন আমাদের সামনে। আঁচল থেকে কয়েকজন খুচরো পয়সা বের করে ছুঁড়ে দিলেন সাধুবাবার পায়ের কাছে। প্রণাম করলেন তবে স্পর্শ

করে নয়। দেখে মনে হলো এরা প্রত্যেকেই বাঙালী। সাধুবাবা তাকালেন তাঁদের মুখের দিকে। কোন কথা বললেন না। এবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, এইভাবে বছরের পর বছর দাঁড়িয়ে আছেন হাত তুলে। দাঁড়িয়ে পায়খানা, স্নান, খাওয়া সবই করতে হয়—বুঝতেই পারছি। কি অসম্ভব কঠিন ব্রতে লিপ্ত হয়েছেন আপনি! আমার জিজ্ঞাসা, রাতে বা দিনে ঘুম পেলে ঘুমোন কেমন করে?

এতক্ষণ পর এবার হাসি ফুটলো সাধুবাবার মুখে। হাসি হাসি মুখ করে তিনি বললেন,

—বেটা, যখন কোন তীর্থে যাই তখন আশ্রয় করি কোন গাছ অথবা মন্দিরের দেয়াল। যখন ঘুম পায় তখন গাছে অথবা মন্দিরের দেয়ালে কপালটা ঠেকিয়ে ঘুমিয়ে নিই। অসুবিধে কিছু হয় না।

সঙ্গে সঙ্গেই বললাম,

—ঘুমের ঘোরে হাতটা নিচে নেমে যায় না? দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পড়ে যাননি কখনও—ঘুমের ঘোরে পড়ে যান না?

হাসতে হাসতেই সাধুবাবা বললেন,

—না বেটা, তা হয়নি কখনও। অভ্যাস হয়ে গেছে। তবে এই ব্রত গ্রহণের পর প্রথম প্রথম কষ্ট হতো খুবই। তারপর ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে গেছে।

মনে মনে ভাবছি, বাপরে—কি কঠিন জীবন, কি শারীরিক কষ্ট! এইভাবে তপস্যা করার কথা ভাবতেই পারছি না। এই সব ভাবছি, সাধুবাবা হয়তো আমার মনের ভাবটা বুঝতে পেরেছেন। এবার নিজের থেকেই বললেন,

—বেটা, আমার এ তপস্যা আর কঠিন কিরে—একটা হাত রেখেছি খাওয়া এবং অন্যান্য কাজকর্মের সুবিধার জন্য আর একটা হাত তুলে রেখেছি সংকল্প করে। আমাদের মধ্যে এমন তপস্বীও আছেন—যাঁরা দুটো হাতই তুলে রাখেন উর্ধ্বদিকে। এবার তুই ভাব তাঁদের কথা। খাওয়াটা পর্যন্ত নিজের হাতে খেতে পারেন না কেউ খাইয়ে না দিলে। এঁরা উর্ধ্ববাহু তপস্বী।

একটু থেমে সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, এটা তো কিছুই না। এর চাইতেও আরও কঠিন তপস্যা আছে। শুনলে তোর মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে। তপস্যাটা কেমন জানিস্? ভোর বেলায় সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কোন নদী অথবা গঙ্গায় নেমে তপস্বী দাঁড়িয়ে থাকবে গলা জল পর্যন্ত। ওই অবস্থায় অন্তরে চলতে থাকবে ইষ্টনাম জপ। সারাদিন গলাজলে দাঁড়িয়ে এইভাবে চলতে থাকবে তপস্যা। সন্ধ্যার সময় অর্থাৎ সূর্য অস্ত গেলে উঠে আসবে জল থেকে। তারপর গ্রহণ করবে ভগবানের প্রসাদ। প্রতিদিন তাও একবেলা মাত্র। এটা একদিনের ব্রত নয়। নির্দিষ্ট একটা সংকল্প করে এই ব্রত পালন অনেক ক্ষেত্রে চলে মাসের পর মাস ধরে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—কোন ঋতুতেই

এই তপস্যা বন্ধ করা চলবে না সংকল্প করলে। এই তপস্যাকে জলশয্যায় তপস্যা বলে। যারা এই তপস্যা করেন তাঁদের জলশয্যী তপস্বী বলে।
জলশয্যী তপস্বীর কথা শোনামাত্রই মনে পড়ে গেল ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের কথা। তখন বয়েস কম ছিল তাই বুঝিনি অত—ভাবিনিও। গেছিলাম হরিদ্বারে, ছিলাম বেশ কয়েকদিন। একদিন বেলা প্রায় দশটা নাগাদ গেলাম কনখলে আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে! ওখান থেকে পাশেই গেলাম দক্ষরাজের মন্দিরে। তারপর ঘুরতে ঘুরতে গেলাম মন্দিরের পিছন দিকে। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। এক-আধজন লোক রয়েছে নিজের কাজে। পাশেই বয়ে চলেছে নীলধারা—গঙ্গা। গঙ্গার ওপারে পাহাড়। ছোট্ট একটা ঘাট। দেখলাম, একজন জটাধারী সাধুবাবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন গলাজলে। নভেম্বর মাস। বেশ ঠাণ্ডা। দেখলাম, সাধুবাবা চোখ বুজে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ঠাণ্ডা জলে। ভাবলাম, সাধুবাবা স্নান করতে নেমে হয়তো জপ করছেন। আমি ঘাটের কাছে এমনিই বসে রইলাম। দেখতে লাগলাম মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ আর তরতর করে বয়ে যাওয়া গঙ্গার নীল জলধারা।
এইভাবে কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। বসেছিলাম অন্যমনস্ক হয়ে। যখন ঘাট থেকে উঠে আসি তখনও দেখেছিলাম সাধুবাবা চোখ বুজে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন গলাজলে। তখন তো অত বুঝিনি। মন্দিরেরই কাজকর্ম করে একজনকে সাধুবাবার জলে দাঁড়িয়ে থাকার কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেছিলেন, উনি জলশয্যী তপস্বী। বহুদিন ধরেই আছেন এখানে। ব্যস, এইটুকুই। তখন এসব নিয়ে আর কিছু ভাবিইনি। ভাববার মতো মনটাও তখন আমার ছিল না। শুধু দর্শন হয়েছিল মাত্র। আজ সাধুবাবার কথায় জানতে পারলাম, কি কঠিন তপস্যারত ছিলেন সেই সাধুবাবা। মুহূর্তে সেদিনের ছবিটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। আবার সাধুবাবার কথায় ফিরে এলাম কনখল থেকে বৃন্দাবনে। তিনি বললেন,
—বেটা, এপথে মনটা যখন আছে তখন আরও অনেক তপস্বীরই সন্ধান তুই পেয়ে যাবি। আরও কিছু তপস্বীর কথা বলি শোন। এক ধরনের তপস্বী আছেন যাঁরা আকাশের দিকে মুখ করে তপস্যা করেন। এটাও একশ্রেণীর সাধু সন্ন্যাসীদের ব্রত। এঁদের ঊর্ধ্বমুখী বা আকাশমুখী তপস্বী বলে। এঁদের মধ্যে অনেকে আবার সূর্যের দিকে তাকিয়ে তপস্যা করেন। এটা খুব খু-উ-ব কঠিন তপস্যা।
সাধুবাবা থামলেন। আমার কি ভাগ্য—সাধুবাবার কাছ থেকে আজ জানতে পারছি কত ধরনের—কত কঠিনভাবে তপস্যারত সাধুসন্ন্যাসী রয়েছেন আমাদের এই তপোবন ভারতবর্ষে। অথচ যাঁদের আমরা সচরাচর দেখতে পাই না, দেখতে পেলেও আমাদের বিষয়ীমন ওইসব ত্যাগব্রতীদের বিষয়ে মনে কোন রেখাপাত ঘটায় না। অদ্ভুত মন আমাদের। সাধুবাবা বললেন,
—বেটা, একশ্রেণীর সাধুদের ব্রত আছে—যাঁরা কখনও নখ কাটেন না। মনে মনে

কোন সংকল্প করে তাঁরা এই ব্রত করেন। এঁদের নখী তপস্বী বলে। আবার একটা শ্রেণী আছে, যাঁরা দিবারাত্র দাঁড়িয়ে থাকেন—বসেন না কখনও। তবে ঊর্ধ্ববাহু সাধু নন। এঁরা চলা ফেরা করেন, কথাবার্তা বলেন—সবই করেন সাধন জীবনের, কিন্তু বছরের পর বছর এঁরা কখনও বসেন না। এটাও একটা ব্রত। এঁদের সঙ্গে বাঁশ বা লাঠি থাকে নিজের মাপ মতো। একটা ছোট আর দুটো বড়। ছোট টুকরোটা দুটো বাঁশের বা লাঠির মাথায় বেঁধে নিয়ে তার উপরে মাথা রেখে ঘুমান। বিশ্রামের প্রয়োজন হলে ওইভাবেই বিশ্রাম করেন। এই ব্রতে শোয়া বা বসার কোন উপায় নেই।

কোন কথা বলে ছেদ টানলাম না সাধুবাবার কথায়। একবার কথার তার কেটে গেলে অনেক সময় জোড়া লাগে না, আবার অনেক সময় জোড়া লাগতে সময় লাগে অনেক। সাধুবাবার পায়ে ধরার ফলটা দেখছি বেশ ভালোই হয়েছে। প্রশান্ত চিত্তে তিনি বলে চলেছেন,

—বেটা, মৌনব্রতী সাধুদের কথা তো তোর জানাই আছে। এঁরা সাধারণত নির্দিষ্ট একটা সংকল্প করে কেউ তিন বছর, কেউ ছয় বছর, কেউ বা এক যুগ—বারো বছর পর্যন্ত মৌনব্রত অবলম্বন করেন। এধরনের তপস্বীদের অনেকে মৌনীবাবা বা মৌনব্রতী তপস্বী বলে। একান্ত প্রয়োজনে এঁরা ইসারায় অথবা লিখে মনের ভাবটুকু প্রকাশ করে মিটিয়ে নেন নিজের প্রয়োজনীয় কাজটুকু।

সৌভাগ্যবশত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণকালীন—যেমন, কেদারনাথ, বদরীনারায়ণ, গঙ্গোত্রী, জ্বালামুখী, জম্মুতে বৈষ্ণবীদেবী, অমরনাথের পথে পহেলগাঁও, হরিদ্বার, নেপালের পশুপতিনাথ—এমন আরও অনেক জায়গায় বহু মৌনী সাধুর দর্শন পেয়েছি। তবে কোথাও কারও সঙ্গে লিখে বা ইসারায় কোন কথা হয়নি আমার—শুধু দর্শনই হয়েছে। বহুবছর আগে একবার পুরীতে এবং হিমালয়ের উত্তরকাশীর আশ্রমে দর্শন করেছিলাম শ্রীশ্রী ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথজীকে। ওই দুই জায়গাতেই তিনি তখন ছিলেন মৌনী অবস্থায়।

অনেকক্ষণ কথা বলতে না পেরে একটু হাঁপিয়ে উঠেছি ভিতরে ভিতরে। তাই এই মৌনব্রত প্রসঙ্গে এবার সাধুবাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, এই ব্রত পালনে সাধুসন্ন্যাসীরা কি ফল পেয়ে থাকেন—তা কি আপনার জানা আছে ?

প্রথমে ঘাড় নেড়ে পরে মুখে বললেন,

—হাঁ বেটা, আছে। যত কথা কম বলবি তত সত্য বজায় থাকবে—কথা বা বাক্যের শক্তি বাড়বে। জগতে যত শক্তি আছে তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও তীব্রশক্তি হচ্ছে বাক্যের। তাই সাধুসন্ন্যাসীরা মৌন থেকে বাক সংযমন করেন। বাক সংযমে দেহের শক্তি বাড়ে, মনের শক্তি বাড়ে—বাড়ে বাক্যের শক্তি। ফলে অস্থিরতা কমে। সাধনে মন একাগ্র হয়। যত বেশী কথা—তত বেশী মিথ্যা কথা—তত বেশী

বাক্যের অপচয়—শক্তিরও। বেটা, হার আর নূপুরের পার্থক্য যেমন—অল্পেতেই মুখরিত হয়ে ওঠে নূপুর—শব্দ করে। তাই তো তার স্থান মানুষের পায়ে। হার একেবারেই নিস্তব্ধ মৌন। সেই জন্যেই তো সে স্থান পেয়েছে মানুষের গলায়। সাধন জীবনে মৌনতা তাই হারের মতোই আদরণীয়।

এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা থামলেন। আমি সাধুবাবার কথাগুলো শুনছি কিন্তু লক্ষ্য করছি তাঁর দেহটাকে। সারা দেহের কোন অংশ এতটুকুও নড়ছে না—শুধু কথার সময় মুখটুকু ছাড়া। কি অদ্ভুত সংযম! এই মৌনতা প্রসঙ্গে আরও বললেন,

—বেটা, যখনই ইচ্ছা হবে তখনই কথা বলতে নেই। অকারণ বাক্যব্যয় করতে নেই। সব সময় জানবি, বাক্য তোর শক্তি। মানুষের শক্তি। যত ব্যয় তত শক্তির ক্ষয়। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা না করলে কারও বিষয়ে বাক্য ব্যয় করতে নেই। বাক্য সংযত করা অত্যন্ত কঠিন। তবুও সংযত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। বেটা, সব সময় সুন্দর মধুর বাক্য বলা উচিত। তাতে বিভিন্ন ভাবে, নানা বিষয়ে বাক্য মানুষের অশেষ মঙ্গল উৎপাদন এবং সাধন করে। কু-বাক্য, কটুবাক্য ক্ষতি আর অনর্থই ঘটিয়ে থাকে মানুষের। বেটা, গুরুজী আমার শাস্ত্রীয় উদাহরণ দিয়ে বলতেন, তীরবিদ্ধ অঙ্গের ক্ষত এক সময় না এক সময় শুকিয়ে যায়ই। তীর বিদ্ধ করে মানুষের দেহকে। কিন্তু বাক্য-বাণ শুধুমাত্র বিদ্ধ করে হৃদয়কে। ফলে ক্ষত, আহত হৃদয় মানুষের বছরের পর বছর দিবারাত্র যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। তাই কটুবাক্য, কু-বাক্য, অমঙ্গলের কথা মুখে আনবি না কখনও। যারা ধর্মে নিরত—তারা রুক্ষ এবং অকল্যাণকর বাক্যও সদা সর্বদা বর্জন করবে। পৃথিবীতে এমন কোন ডাক্তার বদ্যির জন্ম হয়নি—যিনি মানুষের কথার আঘাতের ক্ষত সারিয়ে তুলতে পারেন।

এমন সুন্দর কথা শুনে আনন্দে আবেগের বশে সাধুবাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। কোন বাধা দিলেন না। কিছু বললেনও না। মুখের দিকে তাকাতেই দেখলাম খুশীতে ভরে উঠেছে সাধুবাবার মুখখানা। মনটা এখন আমার আর কোন দিকেই নেই। আরও জানতে চাই—এমন কথা বলতে হলো না সাধুবাবাকে। তিনিই বললেন,

—বেটা, আর এক ধরনের তপস্বী আছে—যারা ভীষ্মের শরশয্যার মতো নিজে যতটা লম্বা ততটা লম্বা কাঠের পাটায় সুঁচালো পেরেক পুঁতে শয্যা তৈরী করে তার উপরে শুয়ে তপস্যা করেন। এ বড় কঠিন ব্রত। তবে এমন তপস্বীর সংখ্যা বেটা খুবই কম।

সাধুবাবা থামলেন। আমি চলে গেলাম অতীতে। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের কথা। কলেজ থেকে ভ্রমণে গেছিলাম দিল্লী আগ্রা হয়ে হরিদ্বারে। একদিন লছমনঝোলায় নৌকায় পার হয়ে ওপারে গেলাম গীতা ভবনে। সমস্ত দর্শনীয় যা কিছু

তা দেখে গঙ্গার পাড় ধরে সাজানা মনোরম ছায়াঘেরা বনের মধ্যে দিয়ে যখন লছমনঝোলা পুলের দিকে এগোচ্ছিলাম—তখন দেখেছিলাম একটা গাছের নীচে পেরেকের শয্যায় শুয়ে থাকা এক সাধুবাবাকে। তবে তাঁর সঙ্গে একটা কথাও হয়নি আমার। সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছিলামও অনেকক্ষণ ধরে। তিনি নিজেও উপযাচক হয়ে কারও সঙ্গে কথা বলেননি।

বিভিন্ন ধরনের কঠোর তপস্বীদের কথা শুনলাম সাধুবাবার মুখে। এবার আমার প্রশ্ন এলো মাথায়। জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, বিভিন্ন ধরনের কঠোরতপা সাধুসন্ন্যাসীদের কথা শুনলাম আপনার মুখে। এখন আমার প্রশ্ন আছে, সাধারণভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে জপতপ করলে ভগবানকে পাওয়া যায়—একথা আপনাদের মতো সাধু মহাত্মারাই বলেন। একথা যদি সত্য হয়—তা হলে এমন কঠিন তপস্যার উদ্দেশ্য বা কারণ কি? আপনার কথাই ধরুন না কেন! দীর্ঘকাল ধরে আপনি বসেন না। দাঁড়িয়ে রয়েছেন ডান হাতটা তুলে। এমন কঠোরতার প্রয়োজনটা কোথায়?

কথাটা শোনামাত্রই সাধুবাবা বেশ খুশীর ভাব নিয়েই বললেন,

—বেটা, গুরু মন্ত্র দিলেন আর সাধারণভাবে জপ করলাম—অমনি ভগবান এসে দেখা দিল—অত সহজ নয় বেটা। যে কোন নিয়ম মাফিক কঠোরতায় মনের একাগ্রতা আসে। কারণ রিপুর প্রভাব নষ্ট হয় কঠোর ব্রতের মাধ্যমে। রিপুই চঞ্চল করে তোলে মানুষের মনকে। চঞ্চল ঘোড়া আর চঞ্চল বালককে বশীভূত করতে যেমন শাস্তি আর ভালবাসা—এ-দুটোই প্রয়োগ করতে হয়, তেমনই দেহের শাস্তিরূপ কঠোরতা এবং ভালোবাসারূপ ইষ্ট নামের সাধন করলেই মন বশীভূত হয়। বেটা, তিন দিন একেবারে অনাহারে থাকা কোন পুরুষের কাছে কোন সুন্দরী রমণীকে এনে ভোগ করতে দিলে তার ভোগের কোন স্পৃহাই জাগবে না। মনে তিন দিনের না খাওয়ার কঠোরতাই তার রিপুর তাড়নাকে যেমন সংযত করবে, তেমনই এই সব কঠোর ব্রত সাধুসন্ন্যাসীদের রিপুর প্রভাব নষ্ট করে মনকে একাগ্র করতে সহায়তা করে। তাই অনেক সাধুসন্ন্যাসীরা এমন কঠোর ব্রত পালন করেন এই ভাবে। এটা তো আছেই, আবার অনেকে সাধনে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় বেঁধে সংকল্প করে এই ধরনের কঠোর ব্রতে লিপ্ত হন। তাতে সাধন সংযম দুই-ই হয়—যা তাঁকে লাভ করতে সহায়ক হয়। অনেকের আবার তা নয়—তাঁদের সংকল্প থাকে—তাঁকে লাভ না করা পর্যন্ত এই কঠোর ব্রত থেকে এতটুকুও সরবো না। তাতে এ-দেহ থাকে থাক্—যায় যাক্।

কথাটা শেষ হওয়া মাত্রই জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, সাধারণভাবে কোন গৃহীর পক্ষে ঈশ্বরলাভের জন্য সাধুসন্ন্যাসীদের মতো এমন কঠিন ব্রত পালন করা যে সম্ভব নয়—তা আপনি ভালো করেই জানেন। সংসারে থেকে তাদের ঈশ্বরলাভের উপায় কি?

মুহূর্ত দেরী না করেই সাধুবাবা বললেন,
—বেটা, সংসারে থেকে সৎভাবে জীবন যাপন করে নিষ্ঠা আর সংযমতার মধ্যে দিয়ে তাঁর নাম জপ করলেই তাঁকে লাভ করা যায়।
এ-কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সাধুবাবাকে কথায় চেপে ধরে বললাম,
—বাবা, এ-কথাই যদি সত্য হয় তা হলে আপনি বা আপনার মতো যাঁরা—তাঁরা কেন এমন কঠিন ব্রত নিয়েছেন তাঁকে লাভ করার জন্য ? সংযম এবং সৎ জীবন-যাপন করে জপ করলে আপনার তো ঈশ্বরলাভ হবে। তাহলে এমন কঠোর জীবনের প্রয়োজন হলো কেন ?
আমার কথায় এবার হেসে ফেললেন সাধুবাবা। হাসতে হাসতেই বললেন,
—বেটা, এর উত্তর আমার কাছে আছে তবে বলবো না। বললে মনটা তোর খারাপ হয়ে যাবে। আর এমন অপ্রিয় সত্য কথা যে তোর গায়ে লেগে যাবে। তুই সংসারীদের হয়ে কথাটা জিজ্ঞাসা করলি—আমার কথাটা তাদেরকে গিয়ে বললে তারাও ভালো মনে নেবে না।
সাধুবাবার কথায় কৌতূহল আমার দ্বিগুণ হয়ে উঠলো। আবার পা-দুটোতে হাত রেখে বললাম,
—বাবা, যত অপ্রিয় কথাই হোক না কেন, দয়া করে বলুন—অসহ্য হলেও শিক্ষাটা তো হবে।
হাত দুটো ইসারায় সরিয়ে নিতে বললেন পা থেকে। সরিয়ে নিলাম। সাধুবাবার মুখখানা দেখে বুঝলাম কি যেন একটা ভাবলেন। তারপর বললেন,
—বেটা, সংসারে থেকে সৎভাবে সংযমী জীবন যাপন আর সাধন ভজন করলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়—একথা সত্য। তবে হাজারে একজন গৃহীও তাঁকে লাভ করতে পারে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার। কারণ তাঁকে লাভ করতে হলে প্রথমে যেটা দরকার—সেটা হলো ইন্দ্রিয় সংযম। আমার গুরুজী বার বার বলেছেন ইন্দ্রিয় সংযমের কথা। এ যুগে যেটা কোন গৃহীর পক্ষেই সম্ভব হয়ে উঠছে না। যৌবনে পা দেয়ার পর থেকেই কাম রিপু উত্যক্ত করতে থাকে নারী পুরুষ উভয়কেই। এই রিপুর প্রভাবে কেউ বৈধ, কেউ অবৈধভাবে নিবৃত্ত করে দেহ সুখ। কুমার অবস্থায় বিকল্প পথ অবলম্বন করে পুরুষেরা আর বিবাহিত নারীপুরুষের কথা তো ছেড়েই দিলাম। আর অন্য সব রিপুর তাড়না ও প্রভাবের কথা বলে কোন লাভ নেই। এক কামের তাড়নাতেই জীবনের একটা বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত মানুষ অস্থির। অথচ তাঁকে লাভ করতে হলে নারী পুরুষ উভয়কেই কঠোরভাবে সংযমী জীবন পালন করতেই হবে।
এই পর্যন্ত বলে মিনিট খানেক থেমে আবার বললেন,
—বেটা, মনটা চায় শরীরের সুখ, হৃদয়ে বাসনা সন্তানলাভের অথচ সন্তান প্রসবে কষ্ট ভোগ করবো না—তা বললে কি আর মায়েদের সন্তান আপনা থেকে কোলে এসে

যাবে? বেটা, যৌবনের শুরু থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত—হাজার ছেড়ে দে, লাখে একটা দেহমনে সংযমী নারী পুরুষ তুই খুঁজেই পাবি না। বর্তমানের সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যেও এর সংখ্যা বড়ই কম। একেবারে নেই বলবো না—আছে, তবে খুব খু-উ-ব কম।

এই যদি সাধুবাবার কথা হয় তাহলে তো গৃহীদের পোড়া কপাল। তবে সাধুবাবার কথাগুলো যে সত্য তা তো চোখেই দেখতে পাচ্ছি—নিজের জীবন দিয়েও তো বুঝতে পারছি হাড়ে হাড়ে। বাপরে, কি কামনা বাসনার এ-দেহ মন নিয়ে বাইরে লোককে সৎ বলে জাহির করছি। আর ভিতরে কাম ক্রোধ লোভ পরচর্চা নিন্দার ঝুড়ি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি সব সময়। এতটুকু সহ্য শক্তি নেই। স্বার্থে একটু আঘাত লাগলেই হায় হায় করে মরছি। অথচ ভগবানের কথায় চোখ মুখের ভাবটা এমন করছি যেন আমার চেয়ে বড় ভক্ত আর কেউ নেই। স্বয়ং নারদের পর আমি। বাহ্যত ভদ্র সভ্য সৎ বলে জাহির করলেও মনটা যে কোন্ নরকে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে—তা বুঝতে আমার এতটুকুও দেরী হলো না। তবুও সাধুবাবার কথায় ছেদ টেনে বললাম,

—তা হলে তো বাবা সংসারীদের তাঁকে লাভ করা একেবারেই অসম্ভব!

ঘাড়টা নেড়ে মাথাটা দুলিয়ে তিনি সহজ ভাবেই বললেন,

—হাঁ বেটা, তুই ঠিকই বলেছিস্। তাঁর স্বরূপ দর্শন শুধু জপ করলেই পাওয়া যাবে না। সংযমই মূল এবং প্রধান। শুধু জপে তিনি ইন্দ্রিয় সংযম করিয়ে দেন ঠিকই—তবে সে জপ সংসারে থেকে পারে ক-জনা! তাই শুদ্ধ উচ্চারণে নিয়ম ম্যাফিক জপ আর সংযম—এ দুটোরই প্রয়োজন। সংযম বলতে সব বিষয়ে এবং সব ব্যাপারে—বুঝলি? এবার বলি তোর মূল প্রশ্নের উত্তর। এই সংযম করতে হলে যে কঠোরতার প্রয়োজন নারী পুরুষের—তা সংসারে থেকে একেবারেই সম্ভব নয়—কোনদিনই সম্ভব নয় বলতে পারিস্। সেই জন্যেই তো সারাটা জীবনই সাধুসন্ন্যাসীদের কাটাতে হয় কঠোরতার মধ্যে দিয়ে—শুধু মাত্র ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য। আর সেই কারণেই এই কঠোর ব্রত নিয়েছি—সাধুসন্ন্যাসীরা নিয়ে থাকেন। বেটা, ভগবানকে লাভ করা অত সস্তা না।

একটু থেমে, এদিক ওদিক চোখের মনি দুটো ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে বললেন,

—বেটা, আমার কথায় ঈশ্বর লাভের ব্যাপারে তোর মনে হতাশার সৃষ্টি হবে—এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে সত্য কথাটাই বললাম স্পষ্ট করে। হাজার হাজার দীক্ষিত নারী পুরুষ রয়েছে গ্রামে গঞ্জে শহরে। তুই তো সংসারে আছিস, একটু খোঁজ নিয়ে দেখে আয়—একটা লোকের মুখ থেকেও তুই শুনতে পাবি না তাঁর স্বরূপ দর্শন হয়েছে—তাঁকে লাভ করেছে। বেটা, একটা কথা বলি শোন, কাউকে বলবি না কখনও। আজকের সাধুসন্ন্যাসী যাঁদের তুই দেখছিস্—তাঁদের ক-জনার ভাগ্যে তাঁর দর্শন ঘটেছে? একেবারে মিথ্যাবাদী না হলে বলবে—'এ পথে আছি

বাবা তবে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি এখনও।' বেটা, আজকের সাধুসন্ন্যাসীদের মধ্যে হাজারে একজন তাঁর দর্শন পেয়েছে কিনা সন্দেহ।
কথাটা শুনে এতটুকুও রেখাপাত করলো না আমার মনে। তবে চরম সত্যটা সাধুবাবার মুখ থেকে শুনে খুশীই হলাম। এমন নির্মল সত্য এর আগে কোন সাধুসন্ন্যাসীর কাছ থেকে শুনিনি কখনও। তবে প্রশ্ন এলো। জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, আপনি সব সাধুসন্ন্যাসী গৃহীদের এইভাবে টেনে এনে জোর দিয়ে বলছেন কি ভাবে? কে পেয়েছে, না পেয়েছে তা আপনি জানছেন কি করে? কত মানুষ তাঁকে লাভ করেছেন—তার কোন হিসাব কি কিছু রেখেছেন আপনি?
কথাটা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন সাধুবাবা। এতক্ষণ পর সাধুবাবার সারাটা দেহ এবার কেঁপে উঠলো। হাসির রেশ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতেই তিনি বললেন,
—বেটা, কতজন তাঁর স্বরূপ দর্শন করেছেন তার হিসাব আমার কাছে নেই ঠিকই তবে আমি তোকে যে কথাকটা বললাম, স্থির মাথায় একটু চিন্তা করলে সহজেই উত্তরটা তুই পেয়ে যাবি। মা মা বলে, রাধে রাধে বলে, শংকর শংকর করে চেঁচিয়ে গলা ফাটালেই যে তাঁকে পাওয়া যায় না—তা আমি ভাগ্যক্রমে এ-পথে এসে বুঝেছি। বেটা, বেশ ভালোভাবেই বুঝেছি। সেই জন্যেই তো তোকে প্রথমেই বলেছিলাম, আমার কথাটা খুব অপ্রিয়—শুনতে ভালো লাগবে না। এখন বুঝলি তো!
কথাটা বলে আবার সাধুবাবা হাসতে লাগলেন নির্বিকারভাবে। কোন কথা বললাম না। ভাবতে লাগলাম কথাগুলো। কোথাও কোন ফাঁক পাচ্ছিনা সাধুবাবার কথায়। হাসিটা থামতেই তিনি বললেন,
—বেটা, ভগবানের মারের চোটে পিঠের চামড়া না উঠলে তাঁকে লাভ করা যায় না। এ সত্য আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি।
'চামড়া ওঠা' অর্থে যে অত্যন্ত কঠোর কঠিন সংযমী জীবনের কথা সাধুবাবা বলতে চাইছেন তা আমি বুঝেছি। এবার একটু হতাশার সুরেই বললাম,
—বাবা, একটা প্রশ্ন আছে এখানে। এই যে সাধুসন্ন্যাসী গৃহী যারা তাঁকে ডাকছেন, সেটা সংযম বা অসংযমে কিংবা সৎ বা অসৎ জীবন যাপনের মাধ্যমে—তার কি কোন ফলই নেই? তাঁকে ডেকে কি লাভ তাহলে? সাধুসন্ন্যাসীদের এই যে ধারা—মঠ মন্দির মিশন আশ্রমে যারা বাহ্যত সব ছেড়ে দিয়ে পড়ে আছে—গৃহীরা হাজার দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তাঁকে যেটুকু স্মরণ করে—তার কি কোন মূল্যই নেই?
আমার প্রশ্ন ও কণ্ঠে হতাশার সুর ফুটে উঠতেই সাধুবাবা বললেন,
—ঘাবড়াও মত্ বেটা, লাভ আছে—অনেক লাভ আছে বেটা, অনেক লাভ আছে। সাধারণ সাধন ভজনে (অসংযমে) তাঁর স্বরূপ দর্শন হবে না—একথা একেবারে নিশ্চিত সত্য, তবে জন্মান্তরের কর্মক্ষয় হবে নিশ্চিত ভাবে। এইভাবে চলতে চলতে

একদিন না একদিন মুক্তিলাভ হবেই। আর সেটা কার কবে হবে—কত জন্মে হবে, তা কারও বলার সাধ্য নেই। তবে নাম সাধনে মুক্তি অনিবার্য।
এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা থামলেন। এ-টুকু তাঁর কথায় বুঝলাম, (সৎভাবে জীবন যাপন করে কঠোর সংযমের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়দের বশে আনতে না পারলে ঈশ্বরের স্বরূপ দর্শন লাভ করা কোন গৃহী বা সাধুসন্ন্যাসীদের পক্ষেই সম্ভব নয়) তবে ঊর্ধ্বাহু এই সাধুবাবার কথা ভাববার আছে। উড়িয়ে দিলে চলবে না। একথা ভেবে এবার গেলাম অন্য প্রসঙ্গে। বললাম,
—বাবা, চলার পথে দেখেছি অনেক মঠ মন্দির আশ্রমে এবং অনেক গৃহীর বাড়ীতে চিৎকার করে, কখনও বা মাইক লাগিয়ে ভগবানের নামগান করা হয়। আবার অনেক ভিখারী এবং সাধুদেরও দেখেছি নাম গান করে ভিক্ষে করতে। এই বৃন্দাবনেই দেখুন না, ভোরে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই হাজার হাজার বিধবা মহিলা, সধবাও কিছু আছে—তাঁরা ছড়িয়ে যান বৃন্দাবনের মন্দিরে মন্দিরে। এঁদের কেউ স্বামী, কেউ সংসার পরিত্যক্তা আবার কেউ বা এসেছেন শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিজড়িত বৃন্দাবনের টানে। এঁদের একই সুরে বাঁধা জীবন। ভোর চারটে থেকে টানা চার ঘণ্টা আর সন্ধ্যা থেকে চারঘণ্টা ভগবানের নাম সংকীর্তন করে সামান্য মজুরি পায়—দেড় দুটাকা আর সামান্য কিছু চাল ডাল। এতে এঁদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় কিনা তা বৃন্দাবনের কৃষ্ণই জানেন। আমার প্রশ্ন, এইভাবে ঈশ্বরের উপাসনায় আধ্যাত্মিক জীবনের কতটা কল্যাণ হয়—কিভাবে হয় বা আদৌ হয় কিনা—না হলে কেন হয় না? এ ব্যাপারে দয়া করে কিছু বলবেন?
এই প্রশ্নটা করার সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করলাম সাধুবাবার মুখখানা বিরক্তিতে ভরে উঠলো। বিরক্তিভরা মুখে তিনি বললেন,
—সেই তখন থেকে একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছিস্—এতে আমার অযথা বাক্য ব্যয় করাচ্ছিস্। এসব কথায় তোর যেমন লাভ হবে না—আমারও নয়। যা বেটা, এখন যা তো! আর বিরক্ত করিস না।
মুহূর্ত দেরী না করেই আবার সাধুবাবার পায়ে হাত দুটো রেখে অনুরোধের সুরে বললাম,
—আপকা গোড় লাগে বাবা, সন্তানের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিন আপনার ভজনে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য। এসব কথা জানার আশা নিয়েই তো আমার পথে বেরোনো। প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিকতার ধারা বহনকারী আপনাদের মতো যাঁরা—তাঁদের কাছে এসব কথার উত্তর না পেলে কার কাছে পাবো বলতে পারেন? আপনারা যেটুকু জেনেছেন তা সম্পূর্ণই গুরু পরম্পরা। আপনাদের মতো যাঁরা আছেন এ-পথে—আমি মনে করি তাঁদের কথার মূল্য অনেক। তাই দয়া করে কিছু বলুন।
কথা কটা বলে হাতটা সরিয়ে নিলাম পা থেকে। আমি ঘাড় উঁচু করে দাঁড়িয়ে

থাকা সাধুবাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনিও তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। দেখলাম, বিরক্তির ছাপটুকু মুছে গেল ধীরে ধীরে। মুখখানা আবার ফিরে গেল আগের ভাবে। প্রশান্তির ছাপ ফুটে উঠলো চোখে মুখে। এবার বললেন,

—বেটা, তুই যাঁদের যাঁদের কথা বললি, যে নিয়মে তাঁদের ভগবানের নামগানের কথা বললি—তাঁদের কথা কিছু বললে তোর শুনতে ভালো লাগবে না। তবুও যখন তুই জানতে চেয়েছিস তখন বলছি। বেটা, সব সময় একটা কথা মনে রাখবি, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাঁর নাম মুখে আনলে কিছু কল্যাণ তো মানুষের হয়ই—এর মধ্যে কোন ভুল নেই। তবে শ্রদ্ধা বিশ্বাস আর ভক্তিতে তার নাম করা আর ওগুলো ব্যতিরেকে তাঁর নামগান করা—এই দুই প্রকারের মধ্যে ভগবানেরও করুণাভেদ আছে জানবি। এই জাতীয় উপাসনাকে তামসিক ধর্মাচরণ বলে। এইভাবে যাঁরা চিৎকার করে উপাসনা বা ভগবানের নামগান করে মঠ মন্দির আশ্রমে, কোন ধর্মসভায় কিংবা বাড়ীতে—তাঁদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অহংভাবটুকুই জাগরিত হয়ে ওঠে—ভক্তিভাব থাকে না এতটুকুও। যাঁর ভিতরে প্রকৃতই ভক্তির আবির্ভাব ঘটেছে—সে কখনই ওই দলে ভিড়ে তাঁর ভাব কিছুতেই নষ্ট করবে না। অহংভাবের প্রকট প্রকাশই হলো এই জাতীয় উপাসনা। 'আমি ভক্ত'—এইভাবটাই প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে যাঁরা এই জাতীয় অনুষ্ঠান করে এবং তাতে যাঁরা যোগ দেয়। এমন উপাসনায় দেহের শক্তি ক্ষয় হয়—মনের অস্থিরতা বাড়ে। লোকের কাছে বাহবা পাওয়া যায়—অহং বাড়ে, মনের উন্নতি কিছু হয় না। নিভৃতে তাঁর নামগান এবং গুরু প্রদত্ত বীজমন্ত্র সংযুক্ত ইষ্টনাম অন্তরে অবিরত জপ না করলে বেটা কাজের কাজ কিছুই হবে না। এই জাতীয় উপাসনায় সাধুসন্ন্যাসী বা গৃহীদের মধ্যে মূলত কাজ করে আবেগ। অধ্যাত্মজগতে আন্তরিক বিশ্বাস ভক্তি ছাড়া আবেগের কোন স্থানই নেই বেটা, বুঝলি? আমার কথাটা এবার শুনতে তোর আরও খারাপ লাগবে। এই জাতীয় উপাসক বা ভজনকারীদের সঙ্গে শৃগালের কোন তফাৎ দেখি না। গ্রামে দেখবি, দলবদ্ধভাবে শৃগালেরা সমানে কিছুক্ষণ ডাকার পর তারা যে যার মতো চলে যায় আহারের সন্ধানে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবি, এই জাতীয় তামসিক ধর্মাচরণকারী উপাসক বা ভজনকারীরা ভগবানের নামে চিৎকার করে তারপর যে যার মতো চলে যায় নিজের ধান্দায়।

এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা থামলেন। এখন তেমন শীত নেই এখানে। তবে যমুনার সুন্দর হওয়া বইছে হু হু করে। স্নানের যাত্রী আর দর্শনার্থীদের আনাগোনায় কোন বিরামই নেই এই কেশীঘাটে। তবে কোলাহল বলতে যা—তা নেই এখানে। এবার সাধুবাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কঠোর ব্রতের এই জীবন যাপন করছেন যে উদ্দেশ্য নিয়ে—সে উদ্দেশ্য কি সফল হয়েছে?

কথাটা শোনামাত্রই সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, গৃহত্যাগের পর থেকে বহু বছর ধরে সাধারণ নিয়মে জপতপ সাধনভজন করতাম। তাতে দেখলাম, দেহ ও মনের কোন পরিবর্তনই হচ্ছে না। ইন্দ্রিয়ের তাড়নারও উপশম হচ্ছে না কিছুই। তারপর এই ব্রত গ্রহণ করলাম। তাতে দেহের কষ্ট যত বাড়তে লাগলো ইন্দ্রিয়ের তাড়নাও তত কমতে লাগলো। এখন আমার কাম, ক্রোধ, লোভ—সবই গেছে। মোহ আর মায়া আমার কোন কালেই কারও উপর, কোন জিনিষের উপর কখনও ছিল না—আজও নেই। বেটা, একটা বিষয় আমি বেশ ভালোভাবেই বুঝেছি—দেহ যতদিন সুখ পাবে, এতটুকু আরাম চাইবে এবং সেই ভাবটা মনে তিল পরিমাণ থাকলে বুঝবি, ইন্দ্রিয় তোর বিন্দুমাত্রও বশে নেই। সাধনভজন জপতপে কিছুই এগোতে পারিনি। দীর্ঘদিন সাধারণ নিয়ম জপতপ করে এই উপলব্ধি যখন হলো, তখন থেকেই এই কঠিন ব্রতের পথ নিলাম। ধীরে ধীরে মনের সঙ্গে পরিবর্তন হলো দেহের। তবে যে পর্যায়ে মন পৌঁছালে সব লাভ হয়—সে পর্যায়ে পৌঁছাতে পারিনি এখনও।

অবাক হয়ে গেলাম সাধুবাবার কথা শুনে। এত বছর ধরে এই কঠিন ব্রত পালন করেও মন এখনও সেই পর্যায়ে পৌঁছায় নি—যেখানে গেলে ইষ্টদর্শন হয়। বছরের পর বছর ধরে অর্ধাহারে, অনাহারে, অনিদ্রায় জীবন কাটিয়ে, ইন্দ্রিয়ের বেগ সংহত করেও সাধুবাবার এখনও মনের কোথাও ফাঁক রয়ে গেছে! একটা কথাও মুখ থেকে সরলো না আমার। মাথাটা নীচু করেই বসে রইলাম। আকাশ পাতাল ভাবতে থাকলাম। সাধুবাবাও কিছু বলছেন না। এইভাবে মিনিট দশেক কাটার পর আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি বললেন,

—অবাক হওয়ার কোন কারণ নেই বেটা। আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কার্য রুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যে অবস্থায় মন পৌঁছালে ঈশ্বর দর্শন হয়—সেই অবস্থায় মন না পৌঁছানোর কারণও আমি খুঁজে পেয়েছি।

কথাটুকু বলে সাধুবাবা থামলেন। আমি মুখের দিকে তাকাতেই দেখলাম নির্বিকার মুখখানা নির্মল হাসিতে ভরে উঠেছে। না পাওয়ার এতটুকুও ক্ষোভ নেই ওই মুখমণ্ডলে। তিনি বললেন,

—বেটা, সদ্‌গুরুলাভ আমার হয়েছে। সিদ্ধ মন্ত্রও আমি পেয়েছি। ইন্দ্রিয়ের এতটুকুও বিকার নেই আমার এই দেহমনে। অন্তরে ইষ্টনামও চলেছে আমার অবিরত। শুধু মনে একটু ফাঁক রয়ে গেছে। সেটা কি জানিস্—এত বছর সাধন ভজন আর এই কঠোর জীবন যাপন করেও মন আমার ভগবদ্ উক্তিতে বিশ্বাস রাখতে পারছে না—সেইজন্যে আমার ইষ্টদর্শনও হচ্ছে না। তবে এই ব্রত থেকে আমি এতটুকুও সরবো না। যদি কখনও সেই বিশ্বাস তিনি দয়া করে দেন—সেদিনই তাঁকে লাভ করবো। তার জন্যে আমাকে আর কতকাল প্রতীক্ষা করতে হবে—তা আমি কিছুই জানি না।

এ-কথার পর আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করার রইলো না। প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই সাধুবাবা বাঁ-হাতটা মাথায় বুলিয়ে দিলেন স্নেহেরভাবে। আমি নির্বিকার নির্লিপ্ত এই সাধুবাবার অকপট স্বীকারোক্তির কথা ভাবতে ভাবতে কেশীঘাটের বাঁধানো চত্বর ছেড়ে ধীরে ধীরে নেমে এলাম নীচে।

এই ঘাট থেকে সামান্য দূরেই এলাম জানকীবল্লভ মন্দিরে। মাঝারী আকারের এই মন্দিরে স্থাপিত রয়েছে রাম লক্ষ্মণ এবং জানকীর বিগ্রহ। মন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন বেদান্তদেশিক আশ্রম। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পরমহংস স্বামী ভগবানদাস আচার্য। এই মন্দিরটি যুক্ত রয়েছে রামানুজ সম্প্রদায়ের সঙ্গে।
জানকীবল্লভ মন্দির থেকে রিক্সায় সামান্য এগোতেই পড়লো কেশীঘাটের কাছে যুগলকিশোর মন্দির। রিক্সা থেকে নেমে পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালাম মন্দির-প্রাঙ্গণে। বিশাল এই মন্দিরটির জগমোহন ৩২ বর্গ মিটার। গর্ভমন্দিরের বেদিতে স্থাপিত রয়েছে রাধাগোবিন্দের মনোহর মূর্তি। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নানকরণ চৌহান ঠাকুর—১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে।
মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে বসলাম রিক্সায়। এদিকের কোন রাস্তাই চওড়া নয়। প্রায় গলির মতো। কোথাও যখন দুটো রিক্সা মুখোমুখি হচ্ছে তখনই অনেক সময় একজন নেমে একটু সামনে পিছনে করে আর একজনকে পথ করে দিচ্ছে। সুতরাং বৃন্দাবনের বসতি এলাকায় রাস্তার অবস্থা এই রকম। আর প্রায়ই প্রত্যেকটি মন্দিরই বলা যেতে পারে বসতি এলাকার মধ্যে—বিশাল এবং বিখ্যাত কয়েকটি মন্দির ছাড়া। অবশ্য আজকের মন্দিরগুলি এককালে নির্জনেই ছিল। পরবর্তীকালে তীর্থমাহাত্ম্য আর লোকবসতি বেড়ে যাওয়ায় বৃন্দাবনের এই মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে জনবসতি। ফলে রাস্তাঘাট বাড়ীঘর দোকান-বাজার সবই অপরিকল্পিত। ধীরে ধীরে চলতে শুরু করলো রিক্সা।
বৃন্দাবন—নামেই ভরে ওঠে মনটা। একেবারে আধুনিক মন নিয়েই ঘুরি আমি এখানে সেখানে। তবুও এই বৃন্দাবনে যতবার এসেছি ততবারই মনটা ভরে উঠেছে এক অপার্থিব আনন্দে। প্রকৃত ভক্ত ও তীর্থযাত্রীদের মনও পরমানন্দে মেতে উঠবে এই বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লৌকিক লীলা স্মরণে।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য লীলাক্ষেত্র বলে ব্রজমণ্ডলের হৃদয় বলা হয় বৃন্দাবনকে। পদ্মপুরাণে একে ভগবানের সাক্ষাৎ শরীর এবং পূর্ণব্রহ্মের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের স্থান ও পরম সুখের আশ্রয় বলে অভিহিত করা হয়েছে। সেইজন্যেই তো ভক্তজনের কাছে শত শত বছর ধরে শ্রদ্ধা ভক্তির কেন্দ্র হয়ে আছে যমুনাতীরে মন্দিরময় নগর শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোরের স্মৃতিবিজড়িত বৃন্দাবন—সেইজন্যেই তো অসংখ্য ধর্মপ্রাণ নরনারীর কর্ম ও সংসার জীবনের অবসরে পরম আশ্রয় হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণপ্রিয় এই বৃন্দাবন। প্রতিদিন তাঁদের কেটে যায় সৎসঙ্গ, হরিনাম সংকীর্তন,

মন্দির পরিক্রমা আর ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠে। এমন মানুষের অভাব নেই এখানকার অসংখ্য মঠ মন্দির আশ্রম আর ধর্মশালায়।

মহাকবি কালিদাস 'রঘুবংশম্' গ্রন্থের ষষ্ঠ সর্গঃ-এর ৪৮ শ্লোকে যমুনার বর্ণনায় লিখেছেন—'মথুরার প্রান্ত-বাহিনী নীল সলিলা যমুনা জলে অন্তঃপুরবিলাসিনী-দিগকে লইয়া ইনি যখন জলবিহার করিতে অবতীর্ণ হন, তখন সেই সকল কামিনীর চন্দন-চর্চ্চিত স্তনমণ্ডলের চন্দন, নীল জলের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় মনে হয়, সুদূরে মথুরায় থাকিয়াও যমুনা যেন (প্রয়াগের) দুগ্ধধবল গঙ্গাতরঙ্গের সহিত মিশিয়া শোভা পাইতেছেন।"

এই প্রসঙ্গেই রঘুবংশম্-এর অনুবাদক এক জায়গায় বৃন্দাবন প্রসঙ্গে আলাদাভাবে লিখেছেন, "দিল্লীশ্বর আকবরের রাজত্বকালের চৌত্রিশ বৎসরে রাজা মানসিংহ কর্তৃক গোবিন্দজীর বিরাট এবং অপূর্ব স্থাপত্যজ্ঞাপক প্রাচীন মন্দির প্রস্তুত হয়। (Grows's Mathurs) কালিদাসের সময়েও বৃন্দাবনের শ্রীবৃদ্ধি যে কত অধিক ছিল তাহা বর্তমান শ্লোকাবলীতেই অনুমিত। খ্রীষ্টীয় ১০৮৫ শতকে সমুদ্ভূত মহাকবি বিহ্লন বৃন্দাবন পরিক্রমা করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ের চমৎকার বর্ণনাও তদীয় গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। (বিক্রমাঙ্ক দেব-চরিত সর্গ ১৮)। কতিপয় শতাব্দী-ব্যাপিনী বৌদ্ধ-প্রতিপত্তির অতিশায়িত প্রভাবে বৃন্দাবনের প্রায় সমস্ত তীর্থস্থলের চিহ্নই লুপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু পরে আবার বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ রূপ এবং সনাতনের চেষ্টায় ও অর্থে ঐ সমুদয়ের উদ্ধার হয়। বর্তমান বৃন্দাবন এবং পুরাণবর্ণিত বৃন্দাবন যে অভিন্ন—ইহা বলা কঠিন। কেন না, বর্তমান মথুরা নগরী হইতে ছয় মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত। কিন্তু পুরাণাদিতে পাওয়া যায়—দ্রুতগামী অশ্বের দ্বারা চালিত রথে, বৃন্দাবন হইতে সূর্যোদয়কালে রওনা হইয়া ভক্ত অক্রূর সূর্যাস্তকালে মথুরায় পৌঁছিয়াছিলেন। (ভাগবত, পৃঃ ১০ম অধ্যায় ৩৯ এবং ৫ম অধ্যায় ৪১, বিষ্ণু-পুরাণ ৫ম অধ্যায় ১৮ এবং ১৯ অধ্যায়) আবার অন্যত্র দেখিতেছি—শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা নন্দ, মথুরাপতি কংসের অত্যাচারের আশঙ্কায়, মথুরার ছয় মাইল দূরস্থিত "গোকুল" হইতে যমুনা পার হইয়া বৃন্দাবনে অপসৃত হইয়াছিলেন। (বিষ্ণুপুরাণ, ৫ম অধ্যায়)। সুতরাং ইহা অসম্ভব যে, নন্দ মথুরা হইতে ছয় মাইল দূরবর্তী যমুনার একই পারে অবস্থিত বৃন্দাবনে প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পাইবার প্রধান সহায় দুস্তর যমুনার পরপারে যাওয়াই স্বাভাবিক। বর্তমান বৃন্দাবনে তেমন কোনোই পর্বত নাই। অথচ পৌরাণিক বৃন্দাবনে বহু পর্ব্বত ছিল। (ভাগবত, ১০ম অধ্যায়, N. L. D.) ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না॥"

মাঝারী একটা গলির মধ্যে দিয়ে এসে রিক্সা দাঁড়ালো বহু পুরনো আমলের একটা বাড়ীর সামনে। প্রবেশদ্বারের উপরে সাইনবোর্ডে লেখা দেখলাম—'রাধা গোকুলানন্দ জিউর মন্দির'। এই লেখাটুকু না থাকলে কারও বোঝার উপায় নেই—এটা মন্দির।

ভিতরে ঢুকেই ডানদিকে পড়লো একটা ঘর। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম বেদিতে বসানো রয়েছে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আর শালগ্রাম শিলা। এখানকার এক পূজারী চৌকো মাটির (সম্ভবতঃ) একটা টুকরোর উপরে বুড়ো আঙুলের ছাপ বেদির পাশ থেকে বের করে এনে দেখিয়ে বললেন, 'চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর এই হস্তচিহ্ন দিয়েছিলেন রঘুনাথদাস গোস্বামীকে। প্রায় পাঁচশো বছরের উপর এটি সংরক্ষিত হয়ে আসছে আমাদের গুরু পরম্পরা।'

এই মন্দিরে তেমন কোন আকর্ষণীয় কিছু নেই, যাত্রী সংখ্যাও বেশ কম। একেবারেই সাদামাটা। তবে প্রাচীনত্বের ছাপ রয়েছে এর সারা অঙ্গে। গোকুলানন্দতে রয়েছে ভক্তিযুগের বিশিষ্ট মহাত্মা এবং অসংখ্য বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রণেতা নরোত্তম দাসের সমাধি। এই মন্দির এবং বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন মহাত্মা লোকনাথ গোস্বামী—যাঁর অকৃপণ পরিশ্রমের অবদান আজকের এই বৃন্দাবন।

অধুনা বাংলাদেশের যশোহর জেলার তালখড় গ্রামে জন্ম গোস্বামী লোকনাথের। জীবনের একটা পর্যায়ে এসে তিনি ব্যাকুল হলেন তাঁর ইষ্টদেব কৃষ্ণের অমোঘ হাতছানিতে। সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়লেন ঘর ছেড়ে। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে তৃতীয় দিনের মাথায় উপস্থিত হলেন শ্রীধাম নবদ্বীপে। দর্শন পেলেন মহাপ্রভুর। লোকনাথ শ্রীচৈতন্যের চরণবন্দনা করে উঠে দাঁড়াতেই প্রভু জড়িয়ে ধরলেন পরম স্নেহের আলিঙ্গনে। প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে বললেন, 'লোকনাথ, সত্যিই তুমি ভাগ্যবান। এখনই তোমাকে আত্মনিয়োগ করতে হবে আরাধ্য দেবতা কৃষ্ণেরই কর্মে। নবদ্বীপে তোমার থাকার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি চলে যাও বৃন্দাবনে। কৃষ্ণের প্রেম মাধুর্যে ভরপুর লীলা স্থানগুলি শতশত বছর ধরে আজও রয়ে গেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। সেগুলি গভীর অরণ্যে পরিণত হয়ে রয়েছে। এর উদ্ধারের ভার তুমি নাও। এখন থেকে বৃন্দাবনে তোমার দুটি কাজ হোক—কৃষ্ণলীলা তীর্থের উদ্ধার আর তাঁকে লাভ করার জন্য কঠোর কঠিন তপস্যা। লোকনাথ, আমার হৃদয় যে শ্রীধাম বৃন্দাবন। সেইজন্যেই তো তোমাকে পাঠাচ্ছি সেখানে স্থায়ীভাবে স্থাপন করতে। স্বয়ং কৃষ্ণই যে বলেছেন, "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।" সেখানে তুমি চিরদিন থাকবে কৃষ্ণসঙ্গী হয়ে—কৃষ্ণধ্যানে মাতোয়ারা, বিভোর হয়ে। যে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ আর বৃন্দাবনলীলা তোমার একমাত্র উপজীব্য—সেখানেই তো পাঠাচ্ছি তোমাকে।'

এখানেই থামলেন না মহাপ্রভু। গোস্বামী লোকনাথকে আরও বললেন, 'সিদ্ধ বৈষ্ণবদের আস্বাদের বস্তু হলো নিত্য-বৃন্দাবন। এই বৃন্দাবন সকলের জন্য নয়। যারা ভক্ত নরনারী তাদের আস্বাদ্য হলো ভৌম-বৃন্দাবন। এই ভৌম-বৃন্দাবনকেই জাগিয়ে তুলতে হবে তোমার কর্ম সাধনার দ্বারা। এক সময় আমিও যাবো বৃন্দাবনে। সঙ্গে যাবে আমার প্রাণপ্রিয়তম ভক্তরা। সকলে মিলে প্রকটিত করবো ব্রজের কৃষ্ণলীলার পবিত্র স্থানগুলি। জীবন ধন্য করবো কৃষ্ণলীলার মাহাত্ম্য প্রচার করে।'

এরপর দিনপাঁচেক নবদ্বীপে থেকে চিরদিনের জন্য বৃন্দাবনে চলে এলেন লোকনাথ—মহাপ্রভুর আন্তরিক ইচ্ছায় ও নির্দেশে। সঙ্গে নিয়ে এলেন গদাধর পন্ডিতের শিষ্য সহায় সম্বলহীন ভূগর্ভকে।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলাস্থলের পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে প্রথম পথিকৃৎ ছিলেন গোস্বামী লোকনাথ। দুর্গম অরণ্যের মধ্যে শুরু হয়েছিল অজস্র ভক্তের সমাগম তাঁরই একান্ত অক্লান্ত প্রচেষ্টায়। যদিও পরবর্তীকালে শ্রীজীব গোস্বামী, রূপ ও সনাতন গোস্বামী প্রমুখরা বৃন্দাবনে গড়ে তুলেছিলেন প্রেমধর্মের প্রাণকেন্দ্র—লোকনাথই প্রস্তুত করেছিলেন তার ক্ষেত্র। তিনি বৃন্দাবনে সাধন-আসন স্থাপন করেছিলেন ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে।

ভূগর্ভ পণ্ডিত ছিলেন লোকনাথের সদা সহচর—বিশ্বস্ত সহকারীও। এঁরা দুজনে মিলে শুরু করেন মথুরা ও ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ। একই সঙ্গে তাঁদের চলতে থাকে কৃষ্ণলীলাস্থলের অনুসন্ধান। বহু জায়গায় তাঁরা ঘুরতে থাকেন শাস্ত্র-পুরাণ আর জনশ্রুতির ইঙ্গিত গ্রহণ করে।

দিনের পর দিন নিঃসহায় বৈরাগী দুজন ঘুরে বেড়ান জঙ্গলে ভরা দুর্গম পথঘাট আর দস্যুদের দ্বারা উপদ্রুত অঞ্চল। স্থানীয় সাধুসন্ন্যাসীদের কাছে পুরাণ-বর্ণিত কিছু কিছু লীলাস্থানের সন্ধান পেলেন তাঁরা, তবে তা প্রমাণ করা কঠিন হয়ে পড়লো তাঁদের কাছে। এ-সব অসুবিধা সত্ত্বেও মহাপ্রভুর আদিষ্ট কর্ম উভয়েই সম্পন্ন করতে থাকেন ঐকান্তিক নিষ্ঠা আর অধ্যবসায় নিয়ে।

তবে আচার্য অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দ প্রভুও যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থের উদ্ধারের জন্যে। কিন্তু তাঁদের পক্ষে সেখানে তেমনভাবে অনুসন্ধান চালানো সম্ভব হয়নি। খুব কম দিনই তাঁরা ছিলেন বৃন্দাবনে। এখানে স্থায়ীভাবে বাস করেছিলেন লোকনাথ আর ভূগর্ভ পণ্ডিত। বহুদিন তাঁদের কেটেছে অনাহারে অনিদ্রায়। জনমানবহীন দুর্গম গভীর বনে কেটে গেছে তাঁদের অসংখ্য দিন ও রাত্রি কিন্তু কোন কিছুকেই ভ্রুক্ষেপ করেননি তাঁরা। যখন যেখানে যে জনশ্রুতি ও শাস্ত্রীয় ইঙ্গিতের সন্ধান পেয়েছেন—তা নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন লিপিবদ্ধ। একই সঙ্গে সেগুলির তথ্যনিরূপণ ও সনাক্তকরণ চালিয়েছেন তীর্থচারী সাধুমহাত্মাদের সাহায্য নিয়ে।

আনুমানিক ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনের প্রথম পথপ্রদর্শক তপঃসিদ্ধ মহাপুরুষ গোস্বামী লোকনাথ নরলীলায় চিরতরে ছেদ টানেন কৃষ্ণেরই পদরজে চির পবিত্র ব্রজেরই রজতে।

রাধাগোকুলানন্দ মন্দির থেকে বেরিয়ে এলাম। আবার চলতে শুরু করলো রিক্সা। বৃন্দাবনের এই সব মন্দিরগুলি অবশ্য পায়ে হেঁটেই ঘুরে দেখা যায় তবে সময় লেগে যাবে অনেকটা। সময় বাঁচিয়ে বেশী দেখতে হলে রিক্সার বিকল্প নেই। এ-সব দেখতে বাসের কোন ব্যবস্থা নেই। কিছু কিছু জায়গায় এমন গলি—যেখানে শুধু

রিক্সাই যাবে। আর এখানে এত মন্দির যে, কপালে একবার প্রণামের উদ্দেশ্যে হাত উঠালে নামানো যাবে না সারাদিন ঘুরেও।

ব্রজক্ষেত্র—এ-এমনই এক তীর্থ, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করে দেখিয়ে গেছেন তাঁকে লাভ করতে ভক্তিমার্গের পথ—চৈতন্য মহাপ্রভু দিয়ে গেছেন প্রেমের ভিত্তি—যে ভিত্তির উপর পরবর্তীকালে ভক্তির প্রাসাদ গড়ে তুলেছিলেন নিঃস্ব সিদ্ধ গোস্বামীরা। যার জন্যই তো বৃন্দাবনের ধর্ম আড়ম্বরহীন, সরল। এখানে অর্থের বিনিময়ে প্রেমভক্তি লাভ হয় না—এর জন্য প্রয়োজন নেই কোন সাধনারও। শুধু ব্রজরজে লুটালেই তা পাওয়া যায় সহজে—অনায়াসে।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলেছেন, "শ্রীবৃন্দাবনের মাটি নয়, রজ বল্‌তে হয়। ব্রজের রজ পরম পবিত্র। পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানের মাটির সহিত ইহার তুলনা হয় না। উচ্ছিষ্টাদি সমস্তই এই রজ লাগালে শুদ্ধ হয়, শ্রীবৃন্দাবনে জল অপেক্ষা রজেই অধিক পবিত্র হয়।"

"…মেখে দেখলেই বুঝতে পার। বিশ্বাস কর, আর নাই কর, বস্তুগুণ যাবে কোথায়?…'আরে বাপু, কত দেবদেবী, ঋষি মুনি এই শ্রীবৃন্দাবনের রজ পাবার জন্য লালায়িত! এস্থানে প্রত্যেকটি রজের কণায় মহাবিষ্ণু রয়েছেন।"

"…মহাপুরুষেরা কত স্থানে কত ভাবে অবস্থান করিতেছেন বলা যায় না। শ্রীবৃন্দাবনে রজলাভ মানসে, মহা মহা সিদ্ধমহাত্মারা বর্তমান সময়েও নানারূপে তথায় রহিয়াছেন।" এ বিষয়ে ঠাকুর (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী) একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"শ্রীবৃন্দাবনে কোন এক কুঞ্জে, সুন্দর একটি বৃক্ষ ছিল। কুঞ্জের কর্তা ঐ বৃক্ষটিকে কেটে ফেলতে অধীনস্থ লোকদের আদেশ করলেন। রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, একটি বৈষ্ণব বেশধারী ব্রাহ্মণ, তাঁকে এসে বললেন—'আমি তোমার কুঞ্জে ঐ বৃক্ষরূপে বহুকাল যাবৎ আছি। শ্রীবৃন্দাবনে রজলাভে ধন্য হওয়ার মানসেই, আমার বৃক্ষরূপ ধারণ। তুমি বৃক্ষটিকে ছেদন করে কখনও আমাকে এই রজস্পর্শ হতে বঞ্চিত করো না। তুমি ওরূপ করলে আমাকে আবার জন্মাতে হবে, তাতে তোমারও শুভ হবে না। স্বপ্ন অমূলক মনে করে, তুমি আমার এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করো না। তোমার বিশ্বাসের জন্য, কাল প্রত্যুষে আমি বৃক্ষের নীচে একবার দাঁড়াবো, ইচ্ছা করলেই আমাকে দেখতে পাবে।'

পরদিন ভোরে বৃক্ষের নীচে পণ্ডিতজী যথার্থই একটি ব্রাহ্মণকে দেখতে পেলেন কিন্তু, তাতেও তাঁর বিশ্বাস হলো না। গ্রাহ্যই করলেন না। তিনি বৃক্ষটিকে কাটালেন। যাঁরা এ সব কথা শুনেও বৃক্ষটিকে কাটলেন, ওলাওঠা হয়ে তাঁরা মারা গেলেন। পণ্ডিতজীর স্ত্রী পুত্রাদিও কয়েক দিনের মধ্যেই ঐ রোগে মারা পড়লেন। পণ্ডিতজী বৃন্দাবনে দর্শনশাস্ত্রে মহা বিদ্বান বলে, বিশেষ খ্যাত ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে হারা হয়ে বসে আছেন। পূর্বে সকলেই

তাঁকে কত সম্মান করতেন, কিন্তু এখন কেউ তাঁকে আর গ্রাহ্য করেন না।”…

“শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাকৃত ধাম, সেখানে সকলই অদ্ভুত! শ্রীবৃন্দাবন ভূমির বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, সমস্তই অন্য প্রকার। অন্য কোন স্থানের সহিতই উহার তুলনা হয় না। সেখানকার সমস্ত বৃক্ষেরই শাখাপত্র সকল নিম্নমুখী। অনেক স্থানে বড় বড় বৃক্ষ সকল, লতার মত রজসংলগ্ন হয়ে আছে। দেখলে পরিষ্কার মনে হয়, সাধুবৈষ্ণব মহাত্মারাই ব্রজরজ পাবার জন্য, বৃক্ষাকারে রয়েছেন।”…(শ্রীশ্রীসদগুরুসঙ্গ, দ্বিতীয়-খণ্ড, শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী)

দেখতে দেখতে রিক্সা এসে দাঁড়ালো রাধারমণ মন্দিরের সামনে। রঙ্গজীর মন্দিরের প্রধান ফটকের পশ্চিমদিকে যে রাস্তা গেছে—সেদিকে দিয়েও আসা যায় এই মন্দিরে। পাথরে বাঁধানো মন্দির চত্বর—মন্দিরও পাথরে নির্মিত। মাঝারী আকারের মন্দির। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি রয়েছে বাঁধানো বেদিতে। আকর্ষণ বলতে এইটুকুই। অনাড়ম্বর মন্দির—মন্দিরের দেবতাও। বৃন্দাবনের এই মন্দিরটি স্থাপন করেছিলেন শ্রীজীব গোস্বামী।

বহুকাল আগের কথা। বর্তমানের এই মন্দিরে নিত্য পূজিত হতো একটি শালগ্রাম শিলা। প্রবাদ আছে, একদা এক ধনবান জমিদার এসেছিলেন বৃন্দাবনে। তিনি এসে সমস্ত দেবালয়গুলির বিগ্রহের জন্য পাঠিয়েছিলেন বস্ত্র আর অলংকার। তাঁর এই অকৃপণ দান থেকে বাদ যায়নি এই রাধারমণজী। তাই যথা সময়ে এলো সুন্দর বস্ত্র আর সোনার অলংকার। এসব পেয়ে খুশী হলেন না মন্দিরের সেবাইত গোস্বামী। দুঃখিত মনে ভাবলেন, ‘এসব দিয়ে কি হবে? শালগ্রাম শিলার তো আর হাত পা নেই যে তাঁকে পরানো যাবে—সাজিয়ে দেখা যাবে তাঁর মনোহর রূপ!’ সেবাইতের ভাবনা এইটুকুই। সযত্নে রেখে দিলেন দান সামগ্রী।

সারাদিন কেটে গেল সময়ের নিয়মে। তারপর রাত কাটতেই দেখা গেল এক অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড। মন্দিরের দরজা খুলতেই সেবাইত দেখলেন, শালগ্রাম শিলা রূপান্তরিত হয়েছে দ্বিভুজ মুরলীধর মূর্তিতে। ভক্তের আশা পূরণ হলো। বিগ্রহের নাম হলো শ্রীরাধারমণ।

এখানকার প্রতিটি মন্দিরে একই মূর্তির বিভিন্ন নাম হয়েছে বিভিন্ন মন্দিরে। মাঝে মাঝে আমিই গুলিয়ে গেছি মন্দির এবং বিগ্রহ দর্শনের পর। যেমন, রাধারমণ, রাধাবল্লভ, রাধাগোবিন্দ, রাধাদামোদর থেকে আরম্ভ করে রাধামদনমোহন মন্দির পর্যন্ত। আর প্রবাদের শেষ নেই ভারতের যে কোন মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রে। যত মন্দির তার দশগুণ বেশী সেই মন্দিরের দেবতা বা ভক্তদের নিয়ে প্রবাদ। এই প্রবাদ-গুলির সত্যাসত্য নির্ভর করে দর্শনার্থী বা তীর্থযাত্রীর ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনার উপরে। ব্যক্তিগতভাবে বহুতীর্থের সঙ্গে জড়িত প্রবাদ আমার বিশ্বাস হয়েছে আবার কোথাও শোনা প্রবাদ একেবারেই মনে হয়েছে গালগল্প বলে। তবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন তীর্থে যে সব সাধকেরা জীবন কাটিয়েছেন—তাদের জীবনের যেসব

অলৌকিক কথা শুনেছি, পড়েছি—তার কোনটাতেই আমার অবিশ্বাস জন্মায়নি আজও। তবে লোকমুখে অনেক সত্য ঘটনা অনেক সময় অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়েছে—ব্যস, এটুকুই।

আমাদের রিক্সা সব সময় পথের নিয়ম মেনে পর পর দেখতে দেখতে যাচ্ছে না। কখনও এ-গলি সে-গলি—কখনও এ রাস্তা সে রাস্তা করে হুট্ করে এনে ফেলছে কোন একটি মন্দিরের সামনে নইলে যমুনার কোন ঘাটে। এইভাবে সকাল থেকে চলছে আমাদের মূল বৃন্দাবনে রিক্সায় মন্দির পরিক্রমা।

আজ আমরা চলছি—অতীত বৃন্দাবনে এপথেই এক সময় চলেছিলেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বিখ্যাত সাধক মহাপুরুষেরা। যেমন—

আসামের নওগাঁ শহর থেকে মাইল ১৬ দূরে অবস্থিত গ্রামটির নাম আলিপুকুরি। এই গ্রামেই ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের উপাসক শঙ্করদেবের জন্ম ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। ধনী জমিদারের ছেলে শঙ্করদেব একদা বিভিন্ন তীর্থপরিক্রমা করেছিলেন গৃহত্যাগ করে। তার মধ্যে মথুরা বৃন্দাবনেও তাঁর আগমন ঘটেছিল পদব্রজে।

ব্রজেশ্বর কৃষ্ণের পদধূলির জন্য যেমন ব্রজ ধন্য—তেমনই সাধক ধন্য ব্রজরজের জন্য। সেইজন্যই তো দূর-দূরান্তর থেকে সমাগম ঘটে সাধক মহাপুরুষের এই বৃন্দাবনে। বাংলাদেশের অন্তর্গত শিলেট শহরের অদূরেই একটি গ্রামে আনুমানিক ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন লোকবিশ্রুত মহাপুরুষ তিব্বতীবাবা। পূর্বাশ্রমে নাম ছিল তাঁর নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী।

একদা গৃহত্যাগের পর গুরু-অন্বেষণের নেশায় বিভিন্ন তীর্থ পরিভ্রমণ করতে করতে একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে পায়ে হেঁটে উপস্থিত হলেন বৃন্দাবন ধামে। বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ালেন তিব্বতীবাবা। ভক্তিরসে রসায়িত বৃন্দাবন ধামে গুরু অন্বেষণ করতে করতে একদা পড়েছিলেন এক কাপালিক তান্ত্রিকের খপ্পরে। কোন রকমে প্রাণে বেঁচে যান তিনি। কিন্তু গুরুর সন্ধান পেলেন না। বৃন্দাবনে আরও কিছুদিন কাটিয়ে তিনি আবার এখান থেকেই নতুন করে শুরু করেন তাঁর পরিব্রাজন।

এমন কত শত মহাপুরুষ যে এসেছেন এই বৃন্দাবনে তার কোন ইয়ত্তা নেই। যাঁরা এখানে ছিলেন তাঁদের অনেকের কথা জানা গেছে—আবার অনেকের কথা জানা যায়নি—যাঁরা আত্মগোপন করে চলে গেছেন নিজের সাধনার পরিসমাপ্তি করে। তাঁরা এসেছিলেন, আমারও এসেছি—আমাদের মতো এসেছেন অসংখ্য মানুষ। তাঁরা অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছিলেন কৃষ্ণের নিত্যলীলার বৃন্দাবন—আর আমাদের সে দৃষ্টি নেই তাই ঘুরে ফিরে দেখি শুধু ইট কাঠ আর পাথরে গড়া বৃন্দাবন। আসলে আমরা ওঁদের মতো কেউই যে দেখতে চাই না—তাই দেখি না।

সেই জন্যেই তো বাহ্য বৃন্দাবন দেখতে দেখতে এসে গেলাম মদনমোহন মন্দিরের কাছে। প্রবেশদ্বার পেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম মূল মন্দিরের সামনে। ভিতরে স্থাপিত

বিগ্রহটি রাধামদনমোহনের। মন্দিরটি আকর্ষণীয় নয় তবে প্রাচীনত্বের ছাপ রয়েছে এর সারা গায়ে। মহাত্মা সনাতন গোস্বামীর সাধনক্ষেত্র এবং তিনিই এর প্রথম স্থাপয়িতা। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং বিগ্রহের স্থাপন বিষয়ে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে—

অমর আর সন্তোষ—দুই ভাই। অমরের জন্ম ১৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। একদা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের দর্শন ও স্পর্শে দুজনের জীবনে ঘটে যায় এক আমূল আধ্যাত্মিক পরিবর্তন। মহাপ্রভু এঁদের নতুন নামকরণ করেন—অমর থেকে সনাতন আর সন্তোষ হলেন রূপ। উত্তরকালে এঁরা প্রসিদ্ধিলাভ করেন চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদরূপে। মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে আসার আগে এরা দুই ভাই-ই ছিলেন গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের দরবারের প্রিয়পাত্র ও রাজকর্মচারী। সুলতান তখন তাঁর একান্ত সচিব সনাতনের নাম দিয়েছিলেন দবীরখাস। রূপের নাম দিয়েছিলেন সাকর মল্লিক।

নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে হুসেন শাহের রাজকার্য ছেড়ে সনাতন মহাপ্রভুর আদেশে চলে এলেন শ্রীধাম বৃন্দাবনে। এখানে এসেই সাক্ষাৎ করলেন ভূগর্ভ পণ্ডিত, লোকনাথ গোস্বামী এবং সুবুদ্ধি রায়ের সঙ্গে। তারপর তিনি কাঙাল, দীনবেশে আশ্রয় নিলেন যমুনা পুলিনের আদিত্যটিলায়।

স্থানটি তখন ছিল গভীর অরণ্যময়। সাধন ভজনের একান্ত অনুকূল। প্রেমিক সাধক সনাতনের বড়ই ভালো লাগলো জায়গাটি। শুরু হলো তাঁর নিষ্ঠার সঙ্গে কৃষ্ণের স্মরণ মনন ও অনুধ্যান। এই সময় সাধননিষ্ঠ ত্যাগ ও বৈরাগ্যময় জীবন কেমন চলছিল সনাতনের—তা 'ভক্তপদাবলী' গ্রন্থে বলা হয়েছে এইভাবে—

"কভু কান্দে কভু হাসে প্রেমানন্দে ভাসে
কভু ভিক্ষা কভু উপবাস।
ছেঁড়া কাঁথা, নেড়া মাথা মুখে কৃষ্ণ গুনগাথা
পরিধানে ছেঁড়া বহির্বাস।
কখনও বনের শাক অলবণে করি পাক
মুখে দেয় দুই এক গ্রাস।"

একই সঙ্গে লোকনাথ গোস্বামীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে মহাপ্রভুর নির্দেশ মতো দিনের পর দিন সনাতনের চলতে থাকে ব্রজের লুপ্ত রাধাকৃষ্ণের এক একটি লীলাতীর্থের উদ্ধার।

তখন খুব কম লোকবসতিই ছিল বৃন্দাবনে। তাই সাধুদের ভিক্ষার জন্য যেতে হতো মথুরায়। এ থেকে বাদ যাননি সনাতনও। একদিন মাধুকরীতে বেরিয়ে খুলে গেল সনাতনের এক নতুন জীবনের দরজা। সেদিন মাধুকরীতে গেলেন মথুরার দামোদর চৌবের বাড়ীতে। চোখে পড়লো মদনমোহনের নয়নাভিরাম বিগ্রহ! দেখামাত্রই প্রেমাবেশে বিভোর হয়ে গেলেন সনাতন। ভাবাবিষ্ট সাধকের

অন্তরে দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে বিগ্রহ সেবার। কাউকে কিছু বললেন না। ফিরে এলেন আদিত্যটিলার কুটিরে।
এই মাধুকরী করতে গিয়ে ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে চৌবে পরিবারের সঙ্গে। মদনমোহনের প্রতি আকর্ষণ কিন্তু সনাতনের বেড়ে যায় দিনের পর দিন। প্রার্থনা জানাতে থাকেন মহাপ্রভুর কাছে দীন হীন কাঙাল বৈষ্ণব। অচিরেই আকুল প্রার্থনার ফল ফলে গেল সনাতনের জীবনে।
একদিনের কথা। সনাতন এসেছেন মাধুকরীতে। দামোদর-পত্নী সনাতনের কাছে এসে দাঁড়ালেন ম্লান মুখে। করুণা-বিগলিত কণ্ঠে সজল চোখে সনাতনকে বললেন, 'আজ থেকে বাবাজী আমার মদনমোহনের সেবার ভার তুমিই নাও। গোপাল এখন বড় হয়েছে। তাই আর মায়ের আচলের নীচে থাকতে চায় না। বায়না ধরেছে কোন এক কুটিরে যাবে বলে। কাল রাতে স্বপ্নে আমায় একথা বলেছে। তাছাড়া আমাদের সাংসারিক অবস্থাও এখন হয়ে পড়েছে বড় অস্বচ্ছল। ঠাকুর সেবায় পরে যদি অসুবিধে হয়, তাই বাবাজী আজই তুমি নিয়ে যাও এই বিগ্রহ।'
মনের একান্ত অভিলাষ পূর্ণ হলো। সনাতন মদনমোহনকে কোলে নিয়ে চৌবেজীর ঘর থেকে বেরিয়ে ফিরে এলেন বৃন্দাবনে যমুনা পুলিনের সাধন কুটিরে।
প্রাণপ্রিয় বিগ্রহকে পেলেন। নিজের ভজন কুটিরের মধ্যেই একটা ছোট্ট ঝুপড়ি বেঁধে সেখানেই পরম যত্নে সনাতন স্থাপন করলেন মদনমোহনকে। মাধুকরীতে সামান্য যেটুকু আটা পেতেন তাই মেখে আগুনে পুড়িয়ে দীনভক্ত প্রেমাপ্লুত হৃদয়ে ভোগ দিতেন ঠাকুরজীর। একই সঙ্গে টিলার নীচে অযত্নে বেড়ে ওঠা বুনো শাক তুলে আনতেন। সন্ধব লবণ প্রায়ই জুটতো না। বিনা লবণে শাক রান্না করে দিতেন ভোগের সঙ্গে। দিনের পর দিন এইভাবেই চলতে লাগলো সনাতনের।
একদিন মদনমোহন স্বপ্নে জানালেন, 'সনাতন, লবণহীন শাক আর আঙাকড়ি (আটার পিণ্ডপোড়া) আর যে গলা দিয়ে নামছে না। তুমি একটা অন্য কিছু ব্যবস্থা করো।'
সনাতনের চোখদুটি ভরে ওঠে জলে। তিনি জানালেন, 'প্রভু, আমি তোমার অধম কাঙাল সেবক। কোথা থেকে পাবো তোমার উপযুক্ত রাজভোগ। সারা জগত সংসারের রাজা তুমি। আটা পোড়া আর সিদ্ধ শাকে যদি তোমার রুচি না হয়, তাহলে প্রভু তোমার সেবার ব্যবস্থা তুমি নিজেই করে নাও।'
প্রভুর লীলাখেলা বড় জটিল, দুজ্ঞেয়। চৌবে গৃহিনীর বাৎসল্যভরা আদর আর নানা সুখাদ্য ছেড়ে এলেন এক টুকরো কৌপিন কাঙাল সাধুর কুটিরে। অথচ এখানে এসে রুচিকর আহারের জন্য বায়না ধরেছেন তিনি। কি করবেন সনাতন—ভেবে পান না। মদনমোহনের স্বপ্নের কথা চিন্তা করে অন্তরের তীব্র ব্যথায় দিনের পর দিন অঝোরে চোখের জলে বুক ভেসে যায় নিঃস্ব সনাতনের।
পাঞ্জাবের এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন রামদাস কাপুর। একদিন তিনি যমুনার

উপর দিয়ে নৌকায় করে চলেছেন বৃন্দাবনের পাশ দিয়ে। সঙ্গে রয়েছে মূল্যবান বাণিজ্যদ্রব্য। বিক্রি করবেন আগ্রা শহরে। হঠাৎ নৌকা এক বড় চড়ায় আটকে গেল আদিত্যটিলার নীচে সূর্যঘাটের কাছে। অনেক চেষ্টা করলেন মাঝি মাল্লারা। সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। এতটুকুও নড়লো না মালবোঝাই নৌকা।

গভীর রাত। ঘন জমাট অন্ধকারে ডুবে রয়েছে বৃন্দাবনের অরণ্য। বণিক রামদাস কাতর হয়ে পড়লেন দুশ্চিন্তায়। কিন্তু এত রাতে কে সাহায্য করবেন তাঁকে? কাত হয়ে আছে নৌকা। ডুবলে সর্বস্ব যাবে—না ডুবলে রয়েছে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা। তারপর অরণ্যে রয়েছে দস্যুদের আনাগোনা। হঠাৎ নজরে এলো দূরে টিলার উপরে ক্ষীণ আলো। আশার আলো জ্বলে উঠলো নিরুপায় রামদাসের অন্তরে। ভাবলেন, লোকবসতি আছে ওখানে—ব্যবস্থা একটা হবেই। তখনই সাঁতরে রামদাস তীরে এসে উঠলেন। দ্রুত পায়ে উঠে এলেন টিলার উপরে।

বণিক রামদাস দেখলেন ছোট্ট একটি পর্ণকুটির। ভিতরে আলো জ্বলছে মিটমিট করে। একপাশে দেখলেন নয়নাভিরাম কৃষ্ণের মূর্তি। তাঁরই সামনে ভজনে বসে আছেন সংসারের বিত্ত-বিভব, মান যশ ছেড়ে চলে আসা দৈন্যের প্রতিমূর্তি কাঙাল সনাতন। অন্তরে বয়ে চলেছে তাঁর কৃষ্ণপ্রেমের রসধারা। সনাতনকে দেখামাত্রই রামদাসের অন্তরে জেগে উঠলো দৃঢ়বিশ্বাস—এই সাধুই পারবেন তাঁর সমস্যার সমাধান করতে। কুটিরে ঢুকে তিনি প্রণাম করলেন ভক্তিভরে। তারপর কাতর কণ্ঠে জানালেন তাঁর আসন্ন বিপদের কথা। আন্তরিকভাবে নির্ভর করলেন সাধক সনাতনের কথায়।

আর্তের কাতর উক্তিতে দয়ায় বিগলিত হলো সনাতনের হৃদয়। অভয় দিয়ে রামদাসকে বললেন, 'তুমি যমুনার তীরে একটু অপেক্ষা করো। এ বিপদ থেকে তোমায় মুক্ত করবেন মদনমোহনজী। তোমাকে নিশ্চয়ই কৃপা করবেন তিনি।'

এই আশীর্বাদে শান্ত হলেন বণিক রামদাস। যাওয়ার সময় কথা দিলেন, বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে এবারকার লাভের টাকার সবটাই তিনি দিয়ে যাবেন মদনমোহনের সেবায়।

সনাতনের কুটির ছেড়ে যমুনাতীরে এলেন রামদাস। ঘটে গেল এক অদ্ভুত ব্যাপার। অলৌকিকভাবে যমুনার বুকে প্রবাহিত হলো নতুন স্রোতধারা। সনাতনের আশীর্বাদে সেই রাতেই বিপদমুক্ত হলেন রামদাস। চড়ায় আটকে যাওয়া নৌকা আবার এগিয়ে চললো তরতর করে।

বাণিজ্যে লাভ করলেন বণিক। ফেরার পথে চলে এলেন বৃন্দাবনে। সস্ত্রীক দীক্ষা নিলেন রামদাস। কথা রক্ষা করলেন সমস্ত লাভের টাকা মদনমোহনজীর সেবায় উৎসর্গ করে। সেই অর্থে নির্মিত হলো সুরম্য মন্দির। স্থায়ীভাবে ভোগ-সেবার ব্যবস্থা হলো প্রচুর ভূসম্পত্তি ক্রয় করে। তবে প্রতিদিন উৎকৃষ্ট ভোগ নিবেদিত হলেও মদনমোহন মন্দিরে আজও একই সঙ্গে নিবেদিত হয় পোড়া আটা-পিণ্ড অর্থাৎ

আঙাকড়ি আর লবণহীন শাক রান্না।

প্রবাদ আছে, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র ছিলেন মহারাজা ব্রজনাভ। ব্রজমণ্ডলে এক সময় অনুসন্ধান চালিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন আটটি প্রাচীন বিগ্রহ। এই মদনমোহন সেই আটটির অন্যতম একটি। মদনমোহন বিগ্রহের সেবা-পূজা করতেন কুব্জাদেবী। মথুরায় কংসের মৃত্যুর পর মূর্তিটি হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। এর অনেক অ-নে-ক পরে চৌবেজীর বাড়ীতে সেই মূর্তিটি অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়েছিলেন মহাত্মা সনাতন।

সমগ্র ব্রজমণ্ডলের মূল ও প্রসিদ্ধ ক্ষেত্রটি হলো বৃন্দাবন। মদনমোহন বিগ্রহ নিয়ে আরও একটি কিংবদন্তী আছে, একদা ইন্দ্রপ্রস্থ ও মথুরার রাজা ছিলেন ঊষা ও অনিরুদ্ধের পুত্র ব্রজনাভ। তিনি তাঁর মায়ের ইচ্ছাতেই শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি রক্ষার্থে গোবিন্দজী, গোপীনাথ এবং মদনমোহনের বিগ্রহ নির্মাণ ও স্থাপন করেন বৃন্দাবনে। এঁদের নিয়ে আছে আরও দুটি মূর্তি—রাধাবল্লভ আর যুগলকিশোর—বৃন্দাবনের প্রাচীনতম বিগ্রহ। তবে বর্তমান মন্দিরে সেই প্রাচীন বিগ্রহটি নেই—রয়েছে তার প্রতিমূর্তি। মদনমোহনের প্রাচীন বিগ্রহটি প্রথমে জয়পুরে, পরে স্থানান্তরিত করা হয় করৌলিতে—ঔরঙ্গজেবের বিগ্রহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।

আজকের মন্দিরটি নিয়ে কয়েকটি কথা আছে। অনেকে বলেন, সনাতনের পর্ণকুটির উপরে বণিক রামদাসের নির্মাণ করা প্রাচীন মন্দিরটি আর নেই। সেটি ভেঙে দিয়েছিলেন ঔরঙ্গজেব। তারই পাশে একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করে দেন যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতামহ রাজা গুণানন্দ। এর পরে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমানের মূল মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন মহাত্মা নন্দকুমার বসু। পাথরে নির্মিত বিশাল এই মন্দিরটি দেখতে অনেকটা মোচার মতো। কালীদহ ঘাট থেকে এর দূরত্ব সামান্যই।

বৃন্দাবন ছেড়ে আর অন্য কোথাও যাননি সনাতন গোস্বামী। ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ়ী পূর্ণিমায় জাগতিক সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে সনাতন প্রভু প্রবিষ্ট হন শাশ্বত লীলাধামে। শোকার্ত ব্রজবাসীদের সামনে, মদনমোহনজীর পূর্বের প্রাচীন মন্দির প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ করা হয় সনাতন গোস্বামীর মরদেহ। এখানকার মন্দিরে স্থাপিত রয়েছে নিতাই গৌরের বিগ্রহ। আজও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তদের অনেকেই সাধন ভজন করেন এখানে।

তবে চৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশে লুপ্ত বৃন্দাবন উদ্ধার করেন শুধু রূপ সনাতন নয় —তাঁদের আরও এক ভাই অনুপম। এঁদের সকলের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল আজকের এই শ্রীধাম বৃন্দাবন।

প্রেমিক কবি তুলসীদাসের জন্ম হয় প্রয়াগের কাছে বান্দা জেলার রামপুর গ্রামে। গৃহত্যাগের পর একবার নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করতে করতে তুলসীদাস এলেন বৃন্দাবনে। যেদিকে যান সেদিকেই শুধু শোনেন একই নাম—জয় রাধে, জয় রাধে।

রাধাকৃষ্ণ নামে মুখরিত হয়ে আছে বৃন্দাবন। রাম ছাড়া আর কিছুই জানেন না রামভক্ত তুলসীদাস। একের পর এক মন্দিরে যাচ্ছেন তিনি কিন্তু কোন মন্দিরেই তাঁর প্রাণপ্রিয় প্রভু রামের নাম কীর্তন নেই। এতে বড়ই ম্রিয়মান হয়ে পড়েন রামপ্রেমিক। একদিন দুদিন করে কেটে যায় দিনের পর দিন। প্রায়ই মনমরা হয়ে বসে থাকেন তিনি।

সেদিন বৃন্দাবনের মন্দিরে মন্দিরে উৎসব চলেছে মহাসমারোহে। আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে রাধাকৃষ্ণের নাম-গানে। প্রতিটি মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ সাজানো হয়েছে রমণীয় বেশে। এমন সময় গোস্বামী তুলসীদাসের এক ঘনিষ্ট বন্ধু এলেন তাঁর কাছে।

ম্রিয়মান তুলসীদাসকে উৎসাহের সঙ্গে নিয়ে গেলেন মদনমোহন মন্দিরে। ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন শ্রীবিগ্রহের সামনে। আরও একটু এগিয়ে গেলেন—একেবারে বেদির সামনে। কিন্তু শ্রীবিগ্রহ দর্শনে মন ভরে না তুলসীদাসের। প্রভু রামের যে রূপ, যে ভঙ্গির সঙ্গে নিরন্তর যোগ রয়েছে তুলসীদাসের—যে রামের লীলার স্মৃতি জড়িয়ে আছে তাঁর সর্বসত্তায়—সে রূপ কোথায়? আজ যে তিনি সে রূপেরই দর্শন প্রত্যাশী। চিরদিনের প্রিয় রঘুনাথ না হলে কিভাবে তাঁর ভক্তি জন্মাবে। ভক্তচূড়ামণি তুলসীদাস বংশীধারী মদনমোহন বিগ্রহের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে করজোড়ে বললেন—

"কহা কহোঁ ছবি আজকী ভলে বনো হো নাথ।
তুলসী মস্তক জব নবৈ ধনুষ বাণ লো হাত॥"

"হে প্রভু! আজকের এ সৌন্দর্যের কি বর্ণনা দেবো আমি? অপরূপ মনোহরণ সাজে সেজে রয়েছো তুমি। কিন্তু প্রভু, তুলসী যখন তোমার চরণে মাথা নোয়াবে তখন কিন্তু ধনুর্বাণ হাতে নিতেই হবে তোমাকে। বাঁশীতে আর চলবে না প্রভু।"

কথিত আছে, এমন সময় ঘটে গেলে এক অদ্ভুত কাণ্ড। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন মদনমোহন। ধীরে ধীরে মদনমোহন সেদিন প্রকটিত হলেন তুলসীদাসের সামনে ধনুর্ধারী প্রভু রামরূপে। এ-কথা রাম-অন্তপ্রাণ কবি তুলসীদাস নিজেই প্রমাণ স্বরূপ লিখে রেখে গেছেন—

"ক্রীট মুকুট মাথে ধর্‍্যো ধনুষ বাণ লিয় হাথ।
তুলসী নিজ জন কারণে নাথ ভয়ে রঘুনাথ॥"

"নিজ ভক্ত তুলসীদাসের আবদার রাখতে প্রভু সেদিন রঘুবীরজীর রূপে মাথায় মুকুট ধারণ করেন রাজমুকুট, হাতে তুলে নেন গাণ্ডীব।"

এমন অসংখ্য মহাপুরুষ এসেছিলেন বৃন্দাবনে—যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁদের প্রাণনাথের দর্শন। আর আমরা এসেছি তাঁদের পাদস্পর্শে পবিত্র ক্ষেত্রগুলি দর্শন করতে।

প্রাচীন মদনমোহন মন্দির ছেড়ে প্রায় গলির মধ্যে দিয়ে আবার চলতে শুরু করলো রিক্সা—চললো যমুনার দিকে।

কলিন্দ পর্বতের কন্যা যমুনা নদী। হিমালয়ের "বানরপুচ্ছ" নামের প্রত্যন্ত-পর্বতমালা উপকণ্ঠবর্তী স্থানের নাম কলিন্দ দেশ। ওই পর্বতপুঞ্জের অন্যতম কলিন্দগিরি থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে যমুনার নাম কালিন্দী বা কলিন্দপুত্রী। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের চল্লিশ অধ্যায়ে কলিন্দগিরিকে উল্লেখ করা হয়েছে 'যমুনা পর্বত' বলে। রিক্সা এই কালিন্দীতটের কালীদহ ঘাটের পাশে এসে দাঁড়ালো।

রিক্সা থেকে নেমে এলাম ঘাটের বাঁধানো চত্বরে। এখন আর ঘাটের কাছে যমুনা নেই। রয়েছে প্রাচীন তমাল আর একটি কদমগাছ। এক সময় তমালের নীচ দিয়ে ঘাটে চুমু খেয়ে বয়ে যেত যমুনা। এখন সেই যমুনাই বয়ে চলেছে অনেকটা দূর থেকে। তবে কালীদহের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আজও মনোরম। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলায় কালিয় দমনের সাক্ষী হয়ে আছে এই স্থানটি। লোকবিশ্বাস, এই কদম গাছ থেকেই কৃষ্ণ লাফিয়ে পড়েছিলেন কালিয়র মাথায়। বৃন্দাবনে কালিয়-দমন প্রসঙ্গে শুকদেব বলেছিলেন রাজা পরীক্ষিৎকে,

"মহারাজ, কালসর্প কালিয়র বিষে কালিন্দীর জল বিষাক্ত হয়েছে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই জল বিশুদ্ধ করবার জন্য সেই সাপকে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করেছিলেন।

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান্‌, শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীর অগাধ জলে কালিয় সাপকে কি করে দমন করেছিলেন আর সেই বা কি ভাবে বহুযুগ ধরে তার মধ্যে বাস করে আসছিল, তা বলুন। সর্বব্যাপী ভগবান নিজের ইচ্ছায় সর্বত্র বিরাজ করেন, গোপাল বেশে তাঁর যে উদার চরিত্র প্রকাশ হয়েছিল তা অমৃতের মত, সেই চরিতামৃত সেবার জন্য তৃষ্ণার শেষ নেই।

শুকদেব বললেন, মহারাজ, সেই কালিন্দীর মধ্যে আরো একটা হ্রদ ছিল। তার মধ্যেই কালিয় বাস করত। কালিয়ের বিষাগ্নিতে হ্রদের জল উত্তপ্ত হয়ে সব সময় ফুটত। তাই তার উপর দিয়ে পাখীরা উড়ে গেলেও তৎক্ষণাৎ বিষক্রিয়ায় হ্রদের জলে পড়ে মরত। ঐ হ্রদের জলকণায় তীরের বাতাসও এমন বিষাক্ত হয়েছিল যে সেই বাতাসের সংস্পর্শে কেউ এলে সেও মৃত্যুমুখে পতিত হত। শ্রীকৃষ্ণ খলের দমনের জন্য অবতীর্ণ হন। তিনি ঐ বিষধরের তীব্র বিষে হ্রদের জল অত্যন্ত দূষিত হয়েছে দেখে তীরের একটি কদমগাছে উঠলেন। যদিও কালকূট কালিয়র তেজে কালিন্দীর তীরের সব গাছপালাও শুকিয়ে গিয়েছিল, তবু ঐ একটা কদম গাছ শুকোয়নি। অমৃত-সংগ্রহ করে গড়ুড় ঐ গাছে বসেছিলেন বলে অমৃত-স্পর্শে সে গাছ অমর হয়। অথবা হয়তো শ্রীকৃষ্ণের চরণ লাভের জন্যই ঐ গাছ শুকোয়নি। শ্রীকৃষ্ণ শক্তভাবে মুখ বন্ধ করে দুই হাত প্রসারিত করে সেই উঁচু

গাছ থেকে লাফিয়ে বিষাক্ত জলে পড়লেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবানের পতনে বিষহ্রদ আলোড়িত হল, সাপেরা সংক্ষোভিত হয়ে উঠল। তখন তাদের বিষের তেজে হ্রদের জল ফুলে উঠল। গজরাজের মত বিক্রমশালী হরি সর্পহ্রদে খেলা করতে করতে হাত দিয়ে জলে আঘাত করলেন। তার শব্দ শুনে এবং নিজের রাজ্য আক্রান্ত হল দেখে সর্পরাজ তা সহ্য করতে না পেরে বেরিয়ে এল। মহারাজ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অতি সুকুমার, মেঘের মত উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, পীত বসনধারী, শ্রীবৎসশোভিত। তাঁর চরণ দুটি লাক্ষারসের মত লাল, ঈষৎ হাসিতে মুখমণ্ডল পরমসুন্দর। তিনি নির্ভয়ে হ্রদে খেলা করছিলেন। কালিয় বেরিয়ে এসেই তাঁর মর্মস্থানে দংশন করল এবং তাঁর শরীর আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। ১-৯

সাপ তাঁকে বেষ্টন করলেও তা থেকে মুক্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণের কোন চেষ্টা দেখা গেল না। তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে তাঁর প্রিয় সখা গোপদের অত্যন্ত দুঃখ হল। দুঃখে ও ভয়ে তাঁরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন।...১০-১৪

ভগবান বলরাম ছোট ভাইয়ের প্রভাব জানতেন। তাই তিনি সবাইকে ওরকম কাতর দেখে শুধু হাসলেন, কিছুই বললেন না। ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য করে পথ ধরে যমুনার তীরে পৌঁছালেন। মহারাজ, যোগীরা যেমন বেদমার্গে বিশেষ উপাধি পরিত্যাগ করে পরমতত্ত্বের সন্ধান করেন, তেমনি তাঁরা গাভীদের চরণচিহ্নের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজ, চক্র, অঙ্কুশ, পদ্ম ও যব চিহ্নিত পদরেখা চিনে তাড়াতাড়ি যমুনাতটে পৌঁছালেন। তারপর যখন দূর থেকে দেখলেন হ্রদে শ্রীকৃষ্ণ সাপবেষ্টিত হয়েও নিশ্চেষ্ট হয়ে রয়েছেন, গোপবালকেরা অচেতন হয়ে রয়েছে আর গাভীরা চারদিকে কেঁদে বেড়াচ্ছে, তখন সকলে অতি দুঃখে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। গোপীদের মন ভগবান অনন্তের প্রতি অনুরক্ত ছিল। তারা সব সময় তাঁর সৌহার্দ্য, সহাস্য দর্শন ও সুস্মিত বাক্য স্মরণ করতেন। তাই সেই প্রিয়তমকে সাপের কবলে দেখে দুঃখে ও প্রিয়বিরহে কাতর হয়ে তাঁরা ত্রিভুবন শূন্য দেখতে লাগলেন। যেখানে কৃষ্ণজননী সন্তানের জন্য বিলাপ করছিলেন তাঁরা তাঁর কাছে গিয়ে শোক প্রকাশ করতে করতে ব্রজপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণেরই কথা বলতে লাগলেন আর শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে মৃতের মত নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ-অন্তপ্রাণ নন্দ প্রভৃতি ঐ হ্রদে প্রবেশ করতে উদ্যত হলে বলরাম তাঁদের নিবারণ করলেন, কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব জানতেন। ১৫-২১

গোকুলবাসীর একমাত্র গতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জন্য স্ত্রীপুত্র সহ সমস্ত গোকুলকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখে সাপের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য শরীর প্রসারিত করতে লাগলেন। ভগবানের শরীরের প্রসারণে ব্যথা পেয়ে সাপ তাঁকে ত্যাগ করল। তারপর সক্রোধে ফণা তুলে সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। তার নাক থেকে বিষ ঝরতে লাগল, চোখ দুটো উত্তপ্ত কটাহের মত এবং মুখ অগ্নিময় মনে হতে লাগল। ভগবান হরি সেই সাপের চারদিকে ঘুরে খেলতে লাগলেন।

দ্বিধা-বিভক্ত জিহ্বা দিয়ে বারবার কালিয় দুই ওষ্ঠ-প্রান্ত লেহন করছিল, তার দৃষ্টি থেকে যেন ভয়ংকর বিষ ঝরে পড়ছিল। ভগবানই শুধু তার চারদিকে ঘুরতে লাগলেন। এইভাবে সে ক্লান্ত হলে তার উঁচু কাঁধ নামিয়ে এনে অখিল কলার আদ্যগুরু, আদিপুরুষ তাঁর মাথার উপর উঠলেন। তার মাথার রত্ননিকরের স্পর্শে ভগবানের পাদপদ্ম অপূর্ব তাম্রবর্ণ ধারণ করছিল। শ্রীকৃষ্ণ তার চঞ্চল মাথার উপরেও নাচতে লাগলেন।…কালিয় নাগের একশ মাথার যে যে মাথা নত হল না দুষ্ট দমন হরি নাচের ছলে পায়ের আঘাতে সেই মাথাগুলি নত করে দিলেন। শ্রীহরির চরণের আঘাতে মুখ ও নাক দিয়ে রক্ত বমন করে কালিয় অচেতন হয়ে পড়ল। আবার সে চক্ষু দিয়ে বিষ ঝরিয়ে ক্রোধে নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে লাগল। সে ফণা তোলামাত্র শ্রীকৃষ্ণ তার মাথার উপর নাচতে নাচতে পদাঘাতে তাকে দমন করলেন। সে সময় দেব ও গন্ধর্বগণ অনন্ত শয্যায় নারায়ণের মত যশোদা নন্দনকে নানা পুষ্পে পূজা করলেন। ২২-২৯

তাঁর ঐ রকম আশ্চর্য নৃত্যে কালিয়ের সহস্র ফণা ও শরীর একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।…প্রহারে বিধ্বস্ত কালিয়ের স্ত্রীরা শোকার্ত হল।…৩০-৩২

ভগবানের শাস্তি যে উপযুক্তই হয়েছে সেকথা স্বীকার করে নাগপত্নীরা বলতে লাগল, ভগবান, আপনি খলদের নিগ্রহের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। আমাদের স্বামী কালিয় খল, তিনি পাপ করেছিলেন, তাঁর যোগ্য শাস্তিই হয়েছে। হে প্রভু, শত্রু এবং মিত্রে আপনার সমান দৃষ্টি, ফলের বিবেচনা করে আপনি দণ্ড দিয়ে থাকেন।…হে নাথ, এই সর্পরাজ তমোগুণযুক্ত ও ক্রোধের বশবর্তী হয়েও সেই পদরজ লাভ করলেন, ইনি ধন্য।…৩৩-৩৬

শুকদেব বললেন, নাগপত্নীদের দ্বারা এইভাবে স্তুত হয়ে ভগবান সেই ভগ্নমুণ্ড ও মূর্ছিত নাগরাজকে শ্রীচরণের সামান্য আঘাত দিয়ে ছেড়ে দিলেন। দীন কালিয় ছাড়া পেয়ে ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়শক্তি ও প্রাণ ফিরে পেল এবং অতি কষ্টে নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে হাতজোড় করে শ্রীহরিকে বলল, ভগবান, আমরা জন্ম থেকে খল এবং তমোগুণী। আমাদের ক্রোধ অতিকষ্টেও শান্ত হয় না।…আমরা মোহাচ্ছন্ন, আপনার মায়া কি করে ত্যাগ করব ? একমাত্র সর্বজ্ঞ জগদীশ্বর আপনিই ঐ মায়া দূর করতে পারেন। তাই অনুগ্রহ বা নিগ্রহ আপনার যা ইচ্ছা হয় করুন। ৫৪-৫৯

…নররূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ সব কথা শুনে বললেন, সর্প, তুমি আর এখানে থেকো না। পুত্র, স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সব নিয়ে সমুদ্রে চলে যাও। দেরি করো না, কারণ গরু ও মানুষেরা নদীর জল পান করে, তুমি থাকলে তারা এখানে আসতে পারবে না। তোমার প্রতি আমার যে শাসন তা যে লোক স্মরণ করবে ও সকাল-সন্ধ্যায় কীর্তন করবে তোমরা কখনও তাকে ভয় দেখাবে না। আর যে সব লোক আমার লীলাস্থানরূপ এই হ্রদে স্নান করে দেবতাদের তর্পণ করবে ও

উপবাস করে স্মরণপূর্বক আমার অর্চনা করবে, তারা সব পাপ থেকে মুক্ত হবে।...

তারপর তাঁকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করে স্ত্রী-পুত্র-মিত্র সহ সমুদ্রের মধ্যে সেই রমণক দ্বীপে চলে গেল। মহারাজ, লীলার জন্য নিত্য মানুষ-রূপধারী ভগবান হরির অনুগ্রহে ঐ সময় থেকে যমুনা বিষহীন ও তার জল অমৃতের মত সুস্বাদু হয়েছে।" ৬০-৬৭ (শ্রীমদ্ ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ১৬শ অধ্যায়।)

বৃন্দাবনে প্রসিদ্ধ বারোটি ঘাটের মধ্যে কালীদহ ঘাট অন্যতম একটি। তবে ছোট বড় মিলিয়ে বর্তমানে ঘাটের সংখ্যা একত্রিশ। এর মধ্যে কয়েকটি ঘাটের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা এবং পৌরাণিক কাহিনী জড়িত আছে। আর সব ঘাটগুলি ঘুরে ঘুরে দেখা সম্ভব হয় না কোন যাত্রীরই। পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এমন ঘাটগুলিই দর্শন এবং সেই ঘাটে স্নান করে ফেরেন অনেক তীর্থযাত্রী। এক কথায় ঘাট বন উপবন আর কৃষ্ণপদরজ নিয়েই শ্রীধাম বৃন্দাবন। এই বৃন্দাবনের বৃক্ষলতাদি সম্পর্কে শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী বাংলা ১২৯৭ সালের ডায়েরী 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ' গ্রন্থে লিখেছেন--

"গত কল্য শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমার পথে বড় রাস্তার ধারে যে পুরাতন বটবৃক্ষটি দর্শন করিয়া আসিয়াছি, সেই বৃক্ষটি সম্বন্ধে দু-চার কথা তুলিতেই অনেক কথা হইতে লাগিল। শ্রীবৃন্দাবনে বৃক্ষরূপে কত মহাপুরুষ আছেন, বলা যায় না। গুরুদেব (প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী) নিজে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, বলিতে লাগিলেন— একদিন আমি বেড়াতে বেড়াতে রাধাবাগে গিয়ে উপস্থিত হইলাম। যমুনাতীরে একটু নির্জ্জন স্থান দেখে সেখানে একটি বৃক্ষের তলে স্থির হয়ে বসে রইলাম। একটু পরেই 'সর্ সর্' শব্দ আমার কানে আসতে লাগল। চেয়ে দেখি, সম্মুখে একটি গাছ কাঁপছে। দেখে বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হল। আমি বৃক্ষটির দিকে চেয়ে রইলাম। দেখলাম বৃক্ষ আর নাই, একটি পরম সুন্দর বৈষ্ণব মহাত্মা সেখানে দাঁড়ায়ে আছেন। তাঁর দ্বাদশাঙ্গে যথারীতি তিলক, গলায় কণ্ঠি, তুলসীর মালা, হাতেও জপের তুলসীমালা রয়েছে। আমি তাঁর বিষয়ে জানতে ইচ্ছা করায় তিনি আমাকে সমস্ত পরিচয় দিলেন,—আর বললেন, "এখানে আমি বৃক্ষরূপে আছি।" আরও অনেক কথা বলে তিনি তখনই আবার বৃক্ষরূপী হলেন। আমি একথা দু-একটি বৈষ্ণবকে বলায় তাঁহারা বিশ্বাস করতে পারলেন না, বরং উপহাস করে গৌর শিরোমণি মহাশয়কে গিয়ে বললেন। শিরোমণি মহাশয় আমাকে ওবিষয় জিজ্ঞাসা করাতে আমি সব তাঁকে পরিষ্কাররূপে বললাম। তিনি শুনে রজে গড়াতে লাগলেন, কাঁদতে লাগলেন, পরে আমাকে বললেন, "প্রভু, এসব কথা যাকে তাকে বলবেন না, বিশ্বাস করতে পারবে না, উপহাস করবে।"

শুনিলাম পরে গৌর শিরোমণি মহাশয়ও এই বৃক্ষরূপী বৈষ্ণব মহাত্মাকে দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন।···

আমি বলিলাম, বৃক্ষরূপে যে সব মহাপুরুষ বৃন্দাবনে আছেন, তাঁহাদের তো আর সাধারণ লোকে জানতে পারে না! বৃক্ষের উপরে কোন প্রকার অত্যাচার করলে ওসব মহাপুরুষদের কোনও ক্ষতি হয় না ?

ঠাকুর বলিলেন, এইজন্য ব্রজের বৃক্ষলতার উপরেও হিংসা নাই। অত্যাচার করলে তাঁদের ক্ষতি খুবই হয়। এই তো কিছুদিন হয় একটি বৃক্ষের উপরে অত্যাচার করায় ভয়ানক অনিষ্ট হয়ে গেল।···

এখানে নিকটেই একটি কুঞ্জে অনেক দিনের একটি সুন্দর নিম গাছ ছিল, কুঞ্জের বৈষ্ণব বাবাজী গাছটিকে খুব সেবা যত্ন করতেন। একদিন ওখানকার একটি বৈষ্ণব যুবতী রজস্বলা অবস্থায় বৃক্ষটি ধরলেন। রাত্রিতে বাবাজী স্বপ্ন দেখলেন, একজন বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী তাঁকে এসে বললেন—"তোমার এই কুঞ্জে এতকাল বেশ আরামে ছিলাম, কাল তোমাদের বৈষ্ণবী অশুদ্ধ কাম-কলুষিত অবস্থায় বৃক্ষকে বারংবার জড়ায়ে ধরেছে। এতে আমার অত্যন্ত ক্ষতি হয়েছে। তাই আমি এস্থান ত্যাগ করলাম।" বাবাজী সকালে উঠে দেখলেন, বৃক্ষটি শুকিয়ে গেছে। আমরাও যেয়ে দেখলাম, একটি রাত্রের মধ্যে সেই বড় বৃক্ষটি একেবারেই শুকিয়ে গেছে।···যথার্থভাবে সেবা করতে পারলে বৃক্ষের কথাও শুনা যায়।"

বৃন্দাবনের বৃক্ষলতাদি সম্বন্ধে ভারতবিশ্রুত মহাপুরুষ প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আরও বলেছেন—

"···আপনা আপনি বৃক্ষে দেব-দেবীর মূর্ত্তি পরিষ্কার রূপে প্রস্তুত হয়ে আছে। রাধাকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ প্রভৃতি নামের অক্ষর আপনা আপনি বৃক্ষে উৎপন্ন হচ্ছে। কোথাও 'রা' কোথাও বা 'কৃ' মাত্র হয়ে আছে। বৃক্ষের শিরায় শিরায় এ সকল স্বাভাবিক অক্ষর দেখে বড়ই আশ্চর্য্য হয়েছি।···এসব সকলেই দেখেছেন। কালীদহের উপরে বহু প্রাচীন একটি কেলিকদম্বের বৃক্ষ আছেন, তাঁর শাখায়, প্রশাখায় 'হরেকৃষ্ণ', 'রাধাকৃষ্ণ' নাম পরিষ্কার রূপে লেখা রয়েছে। যার ইচ্ছা হয়, যেয়ে দেখে আসতে পারেন। বন পরিক্রমার সময়ে, একদিন একটি বনের ধারে বসে আছি, সম্মুখে একটি গাছের পাতা দেখে, হাতে তুলে নিলাম। চেয়ে দেখি, দেবনাগর অক্ষরে 'রাধাকৃষ্ণ' নাম পাতাটির শিরায় শিরায় লেখা রয়েছে। একটু অনুসন্ধান করতেই বৃক্ষটিকে পেলাম, তখন একে একে ভারত পণ্ডিত মশায় ও সতীশ প্রভৃতি যাঁরা আমার সঙ্গে ছিলেন, সকলকে ডেকে দেখালেম, সকলে একই প্রকার নাম, বৃক্ষের পাতায় পাতায় দেখতে পেলেন। অনুসন্ধান করলে সেখানে এরূপ অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়।"

"পরিক্রমার সময়ে আর একদিন একটি বনের নিকটে উপস্থিত হলাম। শুনলাম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ বনের কদম্ব বৃক্ষের পত্রে 'দোনা' প্রস্তুত করেছিলেন। এখনও

ভগবান সেই লীলার নিদর্শন সময়ে সময়ে ভক্তদের দর্শন করান। আমরা বনের ভিতরে প্রবেশ করে, খুঁজে খুঁজে হয়রাণ। সোনা কোন বৃক্ষেই দেখতে পেলাম না। পরে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করে, কাতরভাবে সকলে বসে আছি, চেয়ে দেখি সম্মুখেই একটি কদম গাছের পাতা, সোনার মত দেখা যাচ্ছে। নিকটে যেয়ে দেখি, বৃক্ষের সমস্ত পাতাগুলিই সোনার আকার। সঙ্গে যাঁরা ছিলেন সকলেই বৃক্ষের পাতায় পাতায় সোনা দেখলেন।"

বৃন্দাবনের বৃক্ষলতাদি সম্পর্কে শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী বলেছেন, "শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষ সকল বাস্তবিকই অদ্ভুত। ছোটবড় সমস্তগুলি বৃক্ষেরই শাখা প্রশাখা লতার মত ঝুলিয়া ভূমির দিকে পড়িয়াছে, পাতাগুলি পর্যন্ত বোঁটার সহিত নিম্নমুখ। এমনটি আর কোথাও দেখি নাই। নিধুবনে এবং অন্যান্য প্রাচীন কুঞ্জে ও বনে বড় বড় বৃক্ষসকল রজে লুটাইয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। ঊর্ধ্বদিকে কেন যে বৃক্ষ ওঠে না, তাহা কিছুই বুঝিতেছি না। বহুদিনের অতি পুরাতন অনেক বৃক্ষকে ঐ সকল বনে লতা বলিয়া ভ্রম হয়। অদ্ভুত ব্রজভূমি! ভূমিরই বোধ হয় এই গুণ যে, মস্তক তুলিতে দেয় না। উদ্ধত প্রকৃতি দুর্বিনীত লোকও শ্রীবৃন্দাবনে দীর্ঘকাল বাস করলে, রজপ্রভাবে নতমস্তক হয়, ইহা আর অবিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। অপরাপর শত শত দোষ থাকা সত্ত্বেও ব্রজবাসিগণের স্বভাব মৃদু এবং বিনীত দেখিতেছি।"

কালীদহ ঘাটে সেই প্রাচীন কেলিকদম্বের গাছটি রয়েছে আজও। একটু লক্ষ্য করলে গাছের উপরের দিকে কোথাও আবছা, আবার কোথাও মোটামুটি পরিষ্কার দেখা যায় রাধাকৃষ্ণের নামের ছাপ। গাছের পাতা লক্ষ্য করেছি—ওই নাম চোখে পড়েনি। তবে গাছের গোড়ার দিকে স্থানীয় পাণ্ডাদের হয়তো কেউ যাত্রীদের অবাক করে দেয়ার জন্য অনেক জায়গায় লোহা বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে আঁচড় কেটে লিখে দিয়েছে রাধাকৃষ্ণের নাম।

এই কালীদহ ঘাটে রয়েছে মাঝারী আকারের মন্দির। সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই ভিতরে চোখ পড়লো কৃষ্ণের কালিয়দমন বিগ্রহের উপর। আর তেমন কিছু নেই এই মন্দিরে। ঘাটের পাশেই রয়েছে ছোট্ট একটি হনুমান মন্দির। এখানে সবকিছু ঘুরে ফিরে দেখতে বেশী সময় লাগলো না।

কালীদহ ঘাটের সিঁড়ি একটা একটা করে নেমে গেছে যমুনায়। একের পর এক স্নানের যাত্রী আসছেন, স্নান করছেন, চলে যাচ্ছেন। এখন বেলা দুপুর। যমুনার পাড় ঘেঁষেই বাঁধানো ঘাটের চত্বর। একটা কদমগাছ রয়েছে এই চত্বরে। পাশেই আছে বহুদিনের পুরনো একটা হনুমান মন্দির। এই মন্দিরের দেয়ালের পাশে, প্রায় দেয়ালকে ছুঁয়ে বিছানো কম্বলে আধশোয়া হয়ে শুয়ে আছেন এক সাধুবাবা। কনুইতে ভর দিয়ে মাথাটাকে রেখেছেন উপরে। মাথায় একটা গেরুয়া রঙের ফেটি বাঁধা। সাধুবাবার শোয়ার কায়দাটা দেখে মনে হলো, অনেকক্ষণ বসে থাকার পর বসার অস্বস্তি কাটাতে যে ভাবে আমরা পাশ ফিরে আধশোয়া হয়ে শুই —ঠিক তেমন।

কালীদহ ঘাটে নেমে যমুনার জল মাথায় দিয়ে উপরে এসে হনুমান মন্দিরে যাওয়ার সময়েই চোখ পড়লো সাধুবাবার উপরে। একটু কাছে এগিয়ে পাশ থেকে দেখলাম, সাধুবাবার নির্বিকার চোখদুটো কাউকেই দেখছে না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। আরও একটু এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, বেশ লম্বা লম্বা জটা কিছু পিছনে আর কিছু সামনের দিকে ছড়িয়ে রয়েছে এলোমেলো অবস্থায়। এবার ভালোভাবে লক্ষ্য করলাম, কনুইয়ের নীচেই রয়েছে সাধুবাবার ঝুলিটা। ফলে মাথাটা একটু বেশীই উঁচু হয়ে আছে। পরনে রয়েছে গেরুয়া রঙের কৌপীন। শুধু গোপনাঙ্গটুকু ঢাকা। গলা থেকে পা পর্যন্ত আর কোন বস্ত্র নেই দেহে। হঠাৎ করে দেখলে মনে হবে সাধুবাবা বুঝি শুয়ে আছেন উলঙ্গ হয়ে। গালভর্তি দাড়ি কাঁচায় পাকায় মিশিয়ে। এই মুহূর্তে বয়েসটা অনুমান করতে পারলাম না। নিটোল চেহারায় বেশ লাবণ্য রয়েছে। গায়ের রঙ ময়লা। বয়স্ক।

আমার আলাপ করার মতো অবস্থায় নেই সাধুবাবা। বসা অবস্থায় থাকলে হুট্ করে গিয়ে প্রণাম সেরে বসে পড়ে আলাপ শুরু করা যায়। এমনভাবে শুয়ে আছেন সাধুবাবা যে, চট্ করে প্রণাম করে সামনে বসবো—এমনটা হওয়ার উপায় নেই। সব কিছুই নিয়মে চলে। এর বাইরে যেটা—সেটাই অশোভন। আমি মাথার দিকে এমন একটা জায়গায়, এমন দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে সাধুবাবা সম্পূর্ণ ঘাড় না ঘোরালে দেখতে পাবেন না। দাঁড়িয়ে ভাবছি কি ভাবে বসবো—কি দিয়ে শুরু করবো! এই সব ভাবতে ভাবতেই কেটে গেল প্রায় মিনিট পাঁচ সাত। এবার ভাবলাম, দূর, যা হয় হবে! সামনে গিয়ে তো বসি। তারপর কথা বললে বলবে—না বললে না বলবে। ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই সাধুবাবার সামনে গিয়ে বসে হাঁটু মুড়ে স্পর্শ না করে প্রণাম জানালাম। শুনেছি, মৃত ছাড়া জীবিত কাউকে

নাকি শোয়া অবস্থায় স্পর্শ করে প্রণাম করতে নেই। উদ্দেশ্যে প্রণাম করা চলে। তাই-ই করলাম। এতে সাধুবাবা উঠে বসলেন। আমিও ওই ধুলোর মধ্যে বসলাম আরামসে। হিন্দিতে শুরু করতে হলো আমাকেই,
—বাবা কি বৃন্দাবনেই থাকেন, না অন্য কোথাও ডেরা আছে ?
কথাটা শোনামাত্রই সাধুবাবা বাংলায় বললেন,
—বেটা, তুই কি বাঙালী ?
সাধুবাবার মুখে বাংলা কথা শুনে মনটা আমার খুশীতে ভরে উঠল। বাংলার বাঙালী—এ চেহারায় এমনই একটা ছাপ—দেখলেই বুঝে উঠতে কারও বাকি থাকে না। কিন্তু বাংলার বাইরে অন্যপ্রদেশে দীর্ঘকাল বসবাসকারী বাঙালীর চেহারা, কণ্ঠস্বর, কথাবার্তা এমনকি চালচলনে এমন একটা প্রাদেশিকতার ছাপ পড়ে যায় যে, এক বাঙালী আর এক বাঙালীকে বাঙালী বলে চিনতে প্রায়ই ভুল করে—সে নিজে বাঙালী বলে পরিচয় না দিলে। অবশ্য এমন অনেক প্রবাসী বাঙালী আছেন যাঁরা বাঙলার বাঙালীকে ধরা দিতে চান না পথে। কারণ কোনভাবে যদি তার সাহায্যপ্রার্থী হয়—এই ভয়ে। এ-অভিজ্ঞতা আমার অনেকবারই হয়েছে ভ্রমণ পথে। ক্রিমিনালের চেহারায় যেমন ক্রিমিনাল ক্রিমিনাল ভাব—বাঙালীর চেহারায় তেমন বাঙালী বাঙালীভাব। তবে বাঙালীর কোন ছাপই নেই সাধুবাবার চেহারায়। বুঝলাম, এটা দীর্ঘকাল প্রবাস বাসের ফল। বাঙালী যখন—তখন কথা হবে অনেক। এই ভেবে খুশী খুশী ভাব নিয়েই বললাম,
—হ্যাঁ বাবা, আমি বাঙালী। থাকি কলকাতায়। বেড়াতে এসেছি এখানে। আপনি কি বাঙালী ?
হাসি মুখে সাধুবাবা আমাকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করে বললেন,
—আমি বাবা শুধু বাঙালী নই, বাঙালও বটে। এখন অবশ্য আমি ননবেঙ্গলী। বলে হাসলেন। এক পশলা হাসি খেলে গেল সারা মুখখানায়। কথা টানতে টানতে আসবো আমার আসল কথায়। তাই জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, বাড়ী বা দেশ কোথায় ছিল আপনার ?
ওই একই ভাব নিয়েই তিনি বললেন,
—এক সময় দেশ আর বাড়ী ছিল আমার ময়মনসিং-এ। প্রথম হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গায় আমার মা বাবা ভাই বোন সকলেই খুন হয়ে যায় শেখেদের হাতে। লুট হয়ে গেল যা কিছু ছিল—সবই। তখন আমার বয়েস বছর ১০/১২ হবে। কোন রকমে পালিয়ে বেঁচে গেছিলাম আমি। বংশে বাতি দিতে বাবা আমিই শুধু বেঁচে রইলাম।
এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা থামলেন। কেমন যেন একটা দুঃখের ছাপ ফুটে উঠলো উদাসীনতায় ভরা সারা মুখখানায়। কৌতূহল আমার বেড়ে গেল। জানতে চাইলাম,

—তারপর কি করলেন আপনি—কোথায় গেলেন ?
একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন,
—তারপর আর কি ! তখন কে কাকে দেখে ! বাড়ীঘর ছেড়ে ধাক্কা খেতে খেতে এক সময় চলে এলাম ভারতে। শুনলে অবাক হবি বাবা, ভাগ্য আমাকে কোথা থেকে টেনে নিয়ে এলো কোথায় ! কলকাতায় এসে একটা কাজ জুটিয়ে নিলাম এক মধ্যবিত্ত পরিবারে—থাকা খাওয়ার বিনিময়ে। আগে প্রাণটা তো বাঁচুক ! নইলে না খেয়েই যে মরতে হবে। ভগবানের দয়ায় পরিবারটা খুব ভালো ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই ওরা আপন করে নিল আমাকে। আমিও আপন হয়ে উঠলাম ওদের। ওদের ভালোবাসার কথা আমি আজও ভুলিনি।
এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা থামলেন। কৃতজ্ঞতায় মাথাটা যেন একটু নুয়ে পড়লো নীচের দিকে। একটা অব্যক্ত ব্যথাও যেন ফুটে উঠলো সাধুবাবার মুখখানায়। আমার আর তর্ সইলো না। বললাম,
—তারপর কি হলো বাবা ?
একবার ঘাটের দিকে আর একবার ডাইনে বাঁয়ে চোখদুটো ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন,
—আমার বাবুর মা ছিলেন অত্যন্ত ভক্তিমতি। দিবারাত্র তাঁর পুজোতেই কেটে যেত। বয়েস তখন তাঁর ৭৫/৮০ হবে। আমি যে বছর কাজে ঢুকলাম তার পরের বছরের কথা। বৃদ্ধাকে আমি ঠাকুমা বলেই ডাকতাম। ঠাকুমার সেবার হঠাৎ ইচ্ছা হলো তিনি গঙ্গাসাগরে যাবেন স্নানে। মাতৃ ইচ্ছায় বাধা দিলেন না বাবু। নির্দিষ্ট দিনে নৌকায় করে রওনা দিলেন বাড়ির সকলে। সঙ্গী হলাম আমিও।
আবার থামলেন। আমি কোন কথা বললাম না। কি যেন একটা ভাবলেন সাধুবাবা। তারপর আবার শুরু করলেন,
—বাবা, এবারই ঘটলো আমার জীবনে এক আমূল পরিবর্তন। গঙ্গাসাগর মেলায় পৌঁছানোর পর দ্বিতীয় দিনে মেলায় ঘুরছিলাম সকালে স্নান সেরে। হঠাৎ এক বৃদ্ধ নাগা সাধুবাবার মুখোমুখি হলাম। আমাকে দেখামাত্রই তিনি বললেন, 'বেটা, সবই তো তোর গেছে, আর কেন পরের বাড়ীতে থেকে চাকরের কাজ করা ? কিছু নেই এই সংসারে। চলে আয় আমার সঙ্গে। এক অপূর্ব আনন্দময় জীবন পেয়ে যাবি। ভয় নেই বেটা, আমার সঙ্গে গেলে লাভ ছাড়া তোর ক্ষতি কিছু হবে না।' কথাটুকু বলে খপ্ করে আমার হাতটা ধরে তাকালেন মুখের দিকে। তারপর সোজা নিয়ে গেলেন তাঁর অস্থায়ী ডেরায়। একটা কথাও সরলো না মুখ থেকে। গেলাম একেবারে বিবশ ভাবে। ভয়েতে গলা বুকটা আমার শুকিয়ে এলো। ওই ডেরায় দেখলাম রয়েছে আরও জনা পাঁচেক সাধুবাবা। সকলের বয়েস কুড়ি থেকে চল্লিশের মধ্যে। প্রত্যেকেরই পরনে কৌপীন আর সারা গায়ে ভস্মমাখা। এবার সেই সাধুবাবা একটা কৌপীন হাতে নিয়ে কি একটা মন্ত্র পড়লেন

বিড়বিড় করে। তিনবার পড়ে তিনটে ফুঁ দিলেন। তারপর আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'জামা কাপড় ছেড়ে এটা পরে নে বেটা।'

এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা একটু চুপ করে রইলেন। এতক্ষণ একভাবে বসেছিলেন। এবার পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে হাঁটুটাকে সামনে রাখলেন। তারপর হাঁটুর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন,

—বাবা, ঘটনাগুলো এত দ্রুত, এত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঘটতে লাগলো যে, আমার কিছু ভাবার—কিছু বলার একেবারে অবকাশই রইলো না। কি হচ্ছে, কি হবে—কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি কেমন যেন হয়ে গেলাম। সমস্ত স্বাধীন সত্তা তখন আমার লোপ পেয়ে গেছে। সাধুবাবার কথায় সম্মোহিতের মতো জামা কাপড় ছেড়ে আমি কৌপীনটা পরে নিলাম। একটা অদ্ভুত ব্যাপার, কৌপীনটা পরামাত্রই বিদ্যুতের মতো একটা শিহরণ খেলে গেল আমার সারা দেহমনে। মুহূর্তে একটা অনির্বচনীয় আলোড়নও ঘটে গেল মনের। আমার সেই 'বাবু ঠাকুমার' উপর যে মায়া ছিল—তাও অন্তর্হিত হলো মুহূর্তে। ওদের কথাও ভুলে গেলাম। এক কথায় বাবা, কেমন যেন হয়ে গেলাম আমি। এবার সেই সাধুবাবা ডেরার আর সব সাধুদের বাইরে বের করে দিলেন। আমাকে বসালেন ভিতরে জ্বলতে থাকা একটা ধুনীর সামনে। তারপর দীক্ষা দিলেন। ওইদিন আর তাঁবু থেকে কোথাও বেরোতে দিলেন না। পরদিন ভোরবেলায় সাধুবাবা ডেরা-ডাণ্ডা গুটিয়ে আমাকে নিয়ে রওনা দিলেন।

আবার একটু থামলেন। আমি হাঁ করে শুনছি তাঁর কথা। কল্পনাও করতে পারিনি তিনি এইভাবে তাঁর অতীতের ফেলে আসা দিনগুলোর কথা স্বেচ্ছায় এমন করে বলবেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে দেখে খুশীতে মনটা আমার ভরে গেল। সাধুবাবা চুপ করে রয়েছেন দেখে বললাম,

—বাবা, গঙ্গাসাগর মেলা থেকে তারপর কোথায় গেলেন—কেমন করে কাটতে লাগলো আপনার দিনগুলো ?

সাধুবাবা এবার চোখ দুটো বুজে বললেন,

—ওখান থেকে বাবা আমরা সকলেই চলে এলাম হরিদ্বারে। আর সব সাধুরা ছিলেন আমার গুরুভাই। হরিদ্বারে কয়েকদিন থাকার পর গুরুজীর নির্দেশে এক একজনে বেরিয়ে গেলেন এক একটি তীর্থ পরিক্রমায়। গুরুজী শুধু আমাকেই ছাড়লেন না। তাঁর সঙ্গে হরিদ্বারে থেকে বিভিন্ন শাস্ত্রশিক্ষা, সংযম, ব্রহ্মচর্যব্রত পালন, তপস্যা এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন তীর্থভ্রমণ করেই কাটতে লাগলো আমার দিনগুলো। গুরুজীর সঙ্গে একটানা ছিলাম দশ বছর। শেষের দিকে—তখন আমরা বিভিন্ন তীর্থ পরিক্রমা করে ফিরে এসেছি হরিদ্বারে। বৃদ্ধ গুরুজী একদিন সকালে বললেন, 'বেটা, আমার দেহরক্ষার সময় হয়ে এসেছে। আমি আজই এখান থেকে চলে যাবো গঙ্গোত্রীতে। ওখানেই সলিল সমাধি নেব। আমি দেহে না

থাকলেও জানবি, আমি তোর সঙ্গে সব সময়েই আছি। আশীর্বাদ রইলো তোর উপরে। আমার সমস্ত শক্তিই ক্রিয়া করবে তোর মধ্যে। এ-পথ পরমানন্দের। নির্লোভ থাকবি। বিপদ হবে না। ভেক আর ভক্তির ব্যবধান অনেক। ভেকে পার্থিব জীবনের অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা মেটে—শুধু ভক্তিতে মেলে তাঁকে। বাক্যের দ্বারা, দৃষ্টির দ্বারা, মন ও কার্যের দ্বারা মানুষকে প্রসন্ন করলে নিজেও সর্বদা প্রসন্ন থাকা যায়—একথা সব সময়েই মনে রাখবি। এখন থেকে তুই তীর্থ পরিক্রমা করতে থাক্—সময়ে সব মিলবে।' গুরুজীর কথা শেষ হতেই মনটা আমার ডুকরে কেঁদে উঠলো। প্রণাম করলাম। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে শুধু বললেন, 'বেটা, গুরু দেহ ছাড়েন। গুরুর মৃত্যু নেই।' কথাটা বলে আর একমুহূর্তও দেরী করলেন না। খালি গায়ে, খালি পায়ে, শূন্য হাতে, শুধুমাত্র কৌপীন সম্বল গুরুজী রওনা দিলেন। তিনি চলে যাওয়ার পর কয়েকটা দিন মনটা খুব খারাপ ছিল। ধীরে ধীরে সে ভাবটা কেটে গেল। গুরুবাক্য রক্ষার্থে হরিদ্বার থেকে আবার নতুন করে শুরু করলাম তীর্থ পরিক্রমা। তারপর এইভাবেই কেটে গেল জীবনের এতগুলো বছর।

এই পর্যন্ত বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন সাধুবাবা। অবাক হয়ে গেলাম সাধুবাবার জীবনের অদ্ভুত পরিবর্তন আর ছোটবেলার স্মৃতিকথা শুনে। এমনটা হয়—ভাবতেই পারছি না। এসব কথা শুনলে কারও বিশ্বাসও হবে না। কিন্তু এটা যে হয়—সাধুবাবাই তো তার প্রমাণ। আর সাধুবাবা যে মিথ্যা বলবেন—তাতে লাভ কি আছে তাঁর? এবার অনুরোধের সুরেই বললাম,

—বাবা, কিছু জিজ্ঞাসা আছে আমার। আপনি কি উত্তর দেবেন দয়া করে?

উত্তরে ঘাড় নেড়েও তিনি মুখে বললেন,

—বল্ না বাবা, কি প্রশ্ন আছে তোর? তবে সাধ্য মতো উত্তর দেব। আমার কথা শুনে যদি তোর এতটুকুও কল্যাণ হয়, তাহলে জানবো সেইটুকুই আমার ভগবৎ সেবা হলো।

অভয় পেয়ে একেবারে সোজাসুজি বললাম,

—একটু আগেই বলেছেন, প্রথম কৌপীন পরার সময় একটা অদ্ভুত শিহরণ খেলে গিয়েছিল আপনার সারা দেহমনে। এটা কি করে হলো—কেমন করে হলো—এর পিছনে রহস্যটাই বা কি?

হাসিমাখা মুখে সাধুবাবা বললেন,

—বাবা, সাধুসন্ন্যাসীদের কৌপীন সাধারণ এক টুকরো কাপড় মনে করিস্ না কিন্তু। এক অদ্ভুত মাহাত্ম্য আছে ওই এক টুকরো কৌপীন কাপড়ের। মন্ত্রপূত কৌপীন দেহে ধারণ করা মাত্রই আমার দেহমনের উপর মন্ত্রশক্তি ক্রিয়া করেছিল বলেই তো শিহরণ খেলে এনেছিল এক অদ্ভুত পরিবর্তন। এই কৌপীন তার নিজ প্রভাবে ইন্দ্রিয় সংযম করে সাধুসন্ন্যাসীদের।

সঙ্গে সঙ্গেই বললাম,
—বাবা, মন্ত্রটা একটু বলবেন, লিখে নেবো।
সাধুবাবা হাসতে হাসতে বললেন,
—কি হবে এই মন্ত্র লিখে নিয়ে ?
—কিছুই হবে না বাবা। তবুও যদি কখনও কোন কাজে লাগলেও তো লাগতে পারে।
হাসি মুখে সাধুবাবা নিজে নিজেই মন্ত্রটা একবার আউড়ে নিলেন। আমি বললাম,
—বাবা, ধীরে ধীরে বলবেন। নইলে লিখতে পারবো না।
কথাটুকু বলে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে পেন আর এক টুকরো কাগজ বের করে সাধুবাবাকে বললাম,
—এবার বলুন বাবা।
সাধুবাবা চোখ বুজিয়ে অতি ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন,

ওঁ গুরুজী বন্ধকর বন্ধকর, বজ্রকর বজ্রকর,
না মরে যোগী না পড়ে ফন্দ্,
চৌষট্ যোগিনী খেলৈ ছন্দ্।
সত্‌কা ধাগা সন্তোষকি কৌপীন,
নাগা পহরে নাগফণী, হনুমান্ বাঁধে লেঙ্গোট্।
বালগোপাল কৌপীন বাঁধে, অনন্ত কোট সিদ্ধাকি ওট্।
বাঁধে চীর মনমে ধীর, সো প্রাণী জগত্ কা পৌর॥

মন্ত্রটা কাগজে লিখে নিলাম। সাধুবাবা চোখ খুলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,
—বাবা, প্রতিদিন ধোয়া কৌপীন এই মন্ত্র পড়ে সাধুসন্ন্যাসীরা পরিধান করলে ইন্দ্রিয় ও মন সংযম হয়।
এবার প্রসন্ন সাধুবাবাকে প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, সাধুসন্ন্যাসী, মহাপুরুষেরা এবং হিন্দুশাস্ত্রে একমাত্র গুরুকেই সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন কেন ?
সাধুবাবা বললেন,
—শাস্ত্র ব্যতিরেকে সাধুসন্ন্যাসী নয়। ওটা শাস্ত্রেরই কথা। শাস্ত্রই প্রাধান্য দিয়েছেন গুরুকে। সাধুসন্ন্যাসী এবং মহাপুরুষেরা সেই কথাই শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে চলেন। সর্বদাই গুরুকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এই কারণে—গুরুশক্তি এমন, গুরুর এমন মহিমা, এমনই তাঁর করুণা, কৃপা যে—যা অন্য কারও মধ্যে অন্য কোন বস্তুতে তা প্রকাশিত হয় না কখনও। একমাত্র গুরুই পারেন মানুষকে দেবতা করে তুলতে এবং সেটা করতে তাঁর এতটুকুও সময় লাগে না।

কথাটুকু বলে সাধুবাবা হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন তাঁর গুরুজীর উদ্দেশ্যে। হাত নামাতেই বললাম,

—বাবা, অনেকেই বলেন, আগেকার দিনের গুরুরা ছিলেন সৎ সাত্ত্বিক নিষ্ঠা-পরায়ণ। এখনকার গুরুরা ভণ্ড এবং ব্যবসায়ী। শত শত শিষ্য তৈরী করেন নিজের আর্থিক স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে। ভালো গুরুই পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয় বাবা, অসংখ্য দীক্ষিত শিষ্যদের মুখে আমি শুনেছি—তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি, মনের উন্নতি তো দূরের কথা—দীক্ষার পর শান্তি তো গেছেই, কিছুই কল্যাণ হয়নি তাদের। তারা অভিযোগও করেন—'গুরু আমাকে দেখলেন না। দীক্ষা নিয়েছি কিন্তু কিছুই হলো না আমার। না সংসারের না মনের উন্নতি।' আমার জিজ্ঞাসা—কি রকম গুরু করা উচিত বা গুরু কেমন হওয়া উচিত? সাধারণ গৃহীরা যারা গুরুর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করেন—সেই অভিযোগের সত্যতা ও যথার্থতা কতটুকু—দয়া করে বলবেন?

কথাটা শোনামাত্রই মুখখানা গম্ভীর হয়ে এলো সাধুবাবার। কি যেন ভাবতে লাগলেন। কেটে গেল মিনিট পাঁচেক। এবার বললেন,

—তোর প্রশ্ন অনেক, উত্তরও অনেক বড়। কিছু কিছু উত্তর তোর মতো গৃহী যারা—তাদের শুনতে ভালো লাগবে না। তবুও যখন জানতে চেয়েছিস্—উত্তর আমি দেবো, নইলে গুরুর গুরুত্বকে এবং তাঁর সত্যতাকে অস্বীকার করা হবে।

কথাটুকু বলে সাধুবাবা এবার বাবু হয়ে বসলেন। মনে মনে বুঝে গেলাম—এবার আসর আমার জমেছে। আমিও বসলাম একটু নড়ে চড়ে। এতক্ষণ ধরে সম্মোহিতের মতো কথাগুলো শুনছিলাম বলে বিড়ির কথা আমার মনেই ছিল না। পকেট থেকে এবার বের করে বললাম,

—বাবা, আমার বিড়ি খাওয়ার অভ্যাস আছে। আপনি কি এক-আধটা খাবেন?

সাধুবাবা আপত্তি করলেন না। হাতটা এগিয়ে দিলেন। আমি দুটো বিড়ি একটা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে ধরালাম। একটা দিলাম সাধুবাবার হাতে। একটা নিলাম নিজে। সাধুবাবা পর পর কয়েকটা টান দিয়ে এবার বলতে শুরু করলেন,

—বাবা, অপার্থিব শক্তির প্রতিরূপ বা প্রতিমূর্তিই হলেন গুরু। যেখানে শক্তির খেলা—সেখানে গুরু ভণ্ড বা ব্যবসায়ী হবেন কি করে? দেহটা ধরে টানাটানি করলে চলবে কেন বাবা! গুরু কি মানুষ যে তাঁকে উদ্দেশ্য করে ভণ্ড বা ব্যবসায়ী বললে সব ব্যাপারটা মিটে যাবে? দেবতার মূর্তিকে যারা পাথর বা মাটি মনে করে, ইষ্টমন্ত্রকে—ইষ্টমন্ত্রের অর্থকে না বুঝে যারা কিছু অক্ষরের সমষ্টি মনে করে, যারা গুরুকে রক্তমাংসের দেহ—সাধারণ মানুষ বলে মনে করে—তাদের অধ্যাত্ম-জীবনে, সংসার জীবনে কিছুই হয় না। ইহকাল পরকাল দুই-ই তো তাদের যায়ই —নরকেও তাদের জায়গা হয় কি না সন্দেহ! গুরুকে পরমাত্মার এক বিশেষ শক্তির আধার বা প্রকাশ মনে না করে মানুষ ভাবে বলে দীক্ষিত শিষ্যের কিছুই

উন্নতি হয় না—হবেও না। হাজারে এক আধজন ছাড়া সকলেই গুরুকে মানুষ বলে মনে করে—তাই কিছুই হয় না। কথায় কথায় আরও অনেক কথায় তোর সমস্ত কথার উত্তর দেবো।

সাধুবাবা বিড়িতে খান তিনেক টান দিয়ে ফেলে দিলেন বিড়িটা। তারপর বললেন,

—বাবা, যাঁরা পরনিন্দা পরচর্চা করেন না, সকলকে সমান চোখে দেখেন—সমভাব যাঁর মধ্যে বর্তমান, শাস্ত্রীয় নিয়মে যিনি ঈশ্বরের আরাধনায় নিরত, জিতেন্দ্রিয় হয়ে যিনি শুদ্ধাচারী, প্রশান্ত চিত্ত এবং নিখুঁত অঙ্গ যাঁর, নিন্দা প্রশংসায় যিনি নির্বিকার—তিনিই গুরুপদবাচ্য, গুরু হওয়ার উপযুক্ত তিনিই—তাঁর মধ্যেই পরমাত্মার পরমশক্তির প্রকাশ ঘটে। বাহ্যত এই গুণের প্রকাশ না থাকলেও তিনি গুরুপদ বাচ্য—যিনি গুরু পরম্পরা সিদ্ধ মন্ত্রের ধারক ও বাহক। কারণ বাহ্যত গুরুরূপী দেহ শিষ্যের কোন কাজই করে না—কাজ করে তাঁর মুখনিঃসৃত ইষ্টমন্ত্র—যে মন্ত্রে নিহিত রয়েছে শিষ্যের ইষ্টলাভ, মুক্তি বা মোক্ষলাভের শক্তি। সুতরাং বাবা বুঝতেই পারছিস্, দেহটা সব নয়—সেই জন্যেই তো গুরু কখনও ভণ্ড বা ব্যবসায়ী নয়। সকলের বলা যেটা—সেটা দেহকে উদ্দেশ্য করে। আসলটা তো আসলই রয়ে গেল। এবার বলি, সংসারে কারা দীক্ষা নেয়ার অধিকারী এবং শিষ্য হওয়ার উপযুক্ত—তাদের কথা।

এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন। সঙ্গে সঙ্গেই আমি বললাম,

—বাবা, আপনার বলা এমন গুরু তো বিরল।

গম্ভীর সুরেই সাধুবাবা বললেন,

—বাবা, গুরু বিরল নয়। বিরল শিষ্য। সংসারে একটা নারীপুরুষকেও তুই খুঁজে পাবি না—যারা দীক্ষা পাবার উপযুক্ত। গুরুজী বলতেন, শাস্ত্রে আছে—যারা লোভী এবং ক্রোধী, কামুক এবং দেহে রোগ আছে, অল্পে সন্তুষ্ট নয়, সব সময়েই অসন্তুষ্ট চিত্ত যাদের, শাস্ত্রীয় নিয়ম এবং আচার ভ্রষ্ট, কারণে অকারণে এবং কথার ছলেও যারা মিথ্যা কথা বলে, কথায় যাদের মধুরতা নেই, বিনয়ী নয়, অন্যায়ভাবে অর্থোপার্জ্জন করে, পরস্ত্রীতে আসক্ত যারা, রমণীকে দেখামাত্র মনে ভোগের ইচ্ছা জাগে, ইচ্ছা জাগে না দেবালয় মন্দিরে যাওয়ার, পরনিন্দা ও পরচর্চা করে, আহারে যাদের সংযম নেই—অতিরিক্ত খায়, যা ইচ্ছা তাই খায়—যখন তখন খায়, প্রয়োজনে কথা বলে—অপ্রয়োজনেও কথা বলে এবং বেশী কথা বলে, কামে সংযমী নয়—আরও আছে, তোর জানার দরকার নেই—এমন অবিবাহিত এবং বিবাহিত নারীপুরুষ দীক্ষা এবং শিষ্য হবার উপযুক্ত নয়। সুতরাং কারা গুরুকে ভণ্ড বা ব্যবসায়ী বলে—একটু চিন্তা করলেই তুই উত্তর পেয়ে যাবি। এ সব দোষের একটাও যদি কারও মধ্যে বর্তমান থাকে, তাহলে তাকে কোন গুরুরই দীক্ষা দেয়া উচিত নয়।

কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাসতে হাসতে বললাম,

—বাবা, দীক্ষালাভের অনুপযুক্ত যে দোষগুলির কথা বললেন, সেগুলির মধ্যে দু-একটা ছাড়া সবগুলিই আমার মধ্যে পিকনিক্ করছে। আপনার কাছে গোপন করে বা মিথ্যা কথা বলে সাধু সেজে আমার কোন লাভ তো দূরের কথা—কোন কল্যাণই হবে না। এক এক করে বলি, লোভ আমার নেই তবে উপার্জ্জিত অর্থে মায়া আছে আমার ষোল-আনা কারণ ছোটবেলায় চরম অর্থ অন্ন আর বস্ত্র কষ্ট পেয়েছি আমি। কামুক নই তবে দেহে কামশক্তি আমার অফুরন্ত। দেহ যখন—তখন রোগ একটা ধরে—সারলে আর একটা ধরে। অল্পে সন্তুষ্ট হই তবে সব সময়েই যে হই—তা নয়। ক্ষেত্রবিশেষ ছাড়া শাস্ত্রীয় নিয়ম ও আচারে কোন সময়েই চলতে পারি না। কারণে মিথ্যা কথা বলি। অকারণে, কথার ছলেও মিথ্যা কথা বলি। এমন কি যে কাজ আমি করি—সেখানে মানুষের মন এবং তার শান্তি বজায় রাখতে মিথ্যা কথা বলি শত শত। কথায় মধুরতা আছে কিনা আপনার সঙ্গে কথা বলছি—আপনি সেটা ভালো বুঝতে পারবেন। তবে নিজের কাজ ও স্বার্থসিদ্ধির জন্যে গলায় কলসী কলসী মধু ঢেলে যে কথা বলি, তাতে আমার কোন সন্দেহই নেই। কখনও বিনীত আবার কখনও উদ্ধত। ক্রোধ আমার অসম্ভব। আমার চেয়ে ভালো আর কেউ বোঝে না। মতের বিরুদ্ধে কথা বললে আমি রাগবোই। রাগ আমার কিছুতেই বশে নেই। একটা গুণ আছে, পরস্ত্রী এবং কোন রমণীতে আমি আসক্ত নই এবং দেখলে কখনও ভোগের ইচ্ছাও জাগে না কিন্তু সুন্দরী রমণীকে দেখতে যে ভালো লাগে তাতে কোন সন্দেহই নেই। পরনিন্দা করি না তবে দলে পড়ে পরচর্চ্চা তো কখনও কখনও করেই থাকি। আহারে সংযম আছে তবে রান্না ভালো হলে এবং সুস্বাদু খাবার পেলে রাক্ষসের মতো খাই। প্রয়োজন ছাড়াও অপ্রয়োজনে কথা বলি এবং বেশী কথা বলি। কামে কিছুটা সংযম তবে সম্পূর্ণ নই। অন্যায়ভাবে অর্থোপার্জ্জন করি না। বাবা, এসব দোষ ছাড়াও—আরও অসংখ্য দোষ কিলবিল করছে আমার মন আর স্বভাব চরিত্রে। সেগুলি আর নাই বা বললাম। আর গুণ যেটুকু আছে তা হাজার দোষে চাপা পড়ে আছে। খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আমার মতো এমন অসংখ্য দীক্ষিত ও অদীক্ষিত নারীপুরুষ নিয়েই তো চলছে এই সংসার। আমার মতো যারা—যাদের অনেকেরই এই দোষের বাইরে যাওয়ার উপায় নেই—তাদের সম্পর্কে আপনার মত কি এবং তাদের জন্য গুরু-পদে আছেন যারা—তারা কি করেন ?

মন দিয়ে আমার কথাটা শুনলেন। মিনিট খানেক চুপ করে থেকে এবার বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে সাধুবাবা বললেন,

—তোরা যে বলিস্ গুরু ব্যবসায়ী, ভণ্ড—তা কি ঠিক ? গুরু যে কত মহৎ, কত উদার তার প্রমাণ—দীক্ষার অনুপযুক্ত হওয়া সত্বেও তোর মতো লক্ষ লক্ষ শুয়ারের বাচ্চাদের দীক্ষা দিয়ে অলক্ষ্যে সেই পরমশক্তি গুরুরূপে পূর্বজন্মার্জ্জিত পাপ গ্রহণ করে দিচ্ছেন মুক্তির সন্ধান—পরম পথের সন্ধান—পরমানন্দময় জীবনের

সন্ধান। শাস্ত্রে আছে, স্ত্রীর পাপ স্বামীতে বর্তায়, মন্ত্রীর পাপ রাজাতে আর শিষ্যের পাপ সংক্রামিত হয় গুরুতে। (দীক্ষার পর যে কাম ক্রোধ লোভের সংযমতা, যে সত্যবাদিতা, যে বিনয়, যে শুদ্ধাচারের জীবন যাপন, যে মন ও কথার সংযমতা—নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর নাম সাধন ইত্যাদি প্রয়োজন—তা কি কোন দীক্ষিত নারীপুরুষ একবর্ণও পালন করে থাকে ?) করে না। আর করে না বলেই তো অধ্যাত্ম-জীবনের কোন উন্নতি হয় না—আসে না মনের প্রশান্তি। এবার বল্ গুরু কি করবে ? সুতরাং তোর মতো সংসারে যারা আছে তারা তো গুরুর উপর দোষারোপ করবেই। এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে ! নিজের কর্তব্যটুকু পালন করবে না অথচ দোষারোপ করবে গুরুকে। শুয়োরের বাচ্চা !

এই পর্যন্ত বলে উত্তেজিত সাধুবাবা একটু থেমে আবার বললেন,

—ধরেই নিলাম তোর বা তোদের কথা মতো গুরু ভণ্ড, লম্পট, ব্যবসায়ী—সবকিছুই। তাহলেও তো তিনি দীক্ষা দিয়ে শিষ্যের পাপ গ্রহণ করছেন অলক্ষ্যে—দিচ্ছেন পরম পথের সন্ধান—তার কি কোন মূল্যই নেই ?

সাধুবাবার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আর স্পর্ধা দেখে চমকে গেলাম। এই মুহূর্তে সাধুবাবার নির্মম সত্য কথাগুলিকে অস্বীকার করার মতো ক্ষমতা রইলো না। বসে রইলাম মাথা নীচু করে। কিছু বলতে পারলাম না। মুহূর্তে কণ্ঠস্বর নামিয়ে একেবারে স্নেহভরা মধুর কণ্ঠে সাধুবাবা বললেন,

—কিছু মনে করিস্ না বাবা, কোন ভাবে মনে তোর এতটুকু কথার আঘাত হয়ে থাকলে ক্ষমা করে দিস্। একটা কথা মনে রাখিস্ বাবা, (পাত্রভরা প্রেমামৃত নিয়ে গুরু বসে আছেন। তিনি যখন যাকে একান্ত নিজের করে পান—তাকে সেই প্রেমামৃত পান করান সদা সর্বদা। তাতে তাঁর কার্পণ্য নেই এতটুকুও। বিষয় ভোগের কামনা যার আছে—দুঃখ আর মানসিক যন্ত্রণাও চলবে তার সারাজীবন ব্যাপী। ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্যই যে বিষয় ভোগের—বন্ধনের কারণ। দুঃখেরও কারণ বটে। একমাত্র সৎসঙ্গ, সাধুসঙ্গই নাশ করতে পারে মানুষের বিষয়ে আসক্তি। আর ভগবানকে বশ করার সহজ উপায়ই হলো এই সৎ ও সাধুসঙ্গ।)

গালাগালিতে আমার কিছু যায় আসে না। সাধুদের মুখ থেকে এর চাইতেও অনেক নগ্ন গালাগালি শুনেছি আমি। কোন প্রতিবাদ করিনি। ফলে শেষ পর্যন্ত দেখেছি আমার লাভই হয়েছে। আপন করে নিয়েছেন আমাকে—জানিয়েছেন তাঁদের অন্তরঙ্গ গোপন জীবন-কথা। যাইহোক, ওসব কিছু ভাববার অবকাশ নেই এখন—এখন শুধু প্রশ্ন। জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, অনেক সময় সদ্গুরুর আশ্রিত হয়েও মানুষের ভোগের বাসনা, বিষয় চিন্তা কাটে না কেন ? দীক্ষার পরও দেখা যায় স্বার্থচিন্তা বেড়ে গেছে। সংসারের নিয়ম নীতি বিরুদ্ধ কাজে লেগে গেছে জোর কদমে। দীক্ষিত শিষ্যের পাপের বোঝা যদি তিনি গ্রহণই করেন তাহলে শিষ্যের এমন দশা হয় কেন ?

মুহূর্ত মাত্র দেরী না করেই সাধুবাবা বললেন,
—বাবা, তুই যে কথাটা বলেছিস্ সেটা ঠিকই বলেছিস্। এমনটা সংসারে বহু দেখা যায়। এর পিছনে কারণ আছে অনেক। আমি সংক্ষেপে দু-একটা কারণ বলছি। শিষ্যের যদি দৈব অত্যন্ত বলবান থাকে তাহলে গুরু তা ভোগ করিয়ে কর্মক্ষয় করে নেন। ফলে দীক্ষার পরেও শিষ্যের ভিতরে ওই বিষয়গুলি থেকেই যায়। পূর্বজন্মের কৃত কর্মকেই দৈব বলে। সেক্ষেত্রে দীক্ষা নিলেও —জপতপ করলেও দৈব প্রকটভাবে কাজ করে বলে বাহ্যত কোন কল্যাণ হচ্ছে না মনে হলেও কর্মক্ষয় হচ্ছে অবশ্যই। যদি দৈব প্রকট না হয় অর্থাৎ ধর্ বিষয় বাসনা যদি বলবান না হয় তাহলে দীক্ষার পর সাধন ভজনে দ্রুত সাংসারিক, আধ্যাত্মিক এবং মানসিক দিক থেকে শুভ পরিবর্তন হতে থাকে। আর এক দল শিষ্যের কিছুই হয় না—না সংসার মনের—না ধর্মপথের উন্নতি, কোনটাই নয়। তাদের কথাই বলছি বাবা, যারা দীক্ষা নিয়েও গুরুর নিয়মে জপতপ করে না বা অবহেলায় করে, অনিচ্ছায় অর্থাৎ না করলে নয় ভেবে করে কিংবা নামেমাত্র জপ করে কিন্তু কোন নিষ্ঠা নিয়ে নয়।
কথা কটা বলে সাধুবাবা কপালে হাতজোড় করে তাঁর গুরুজীর উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়ে বললেন,
—বাবা, দয়া ভক্তি প্রেম ভগবত-জ্ঞান আর সরল বিশ্বাস—এরা কোথায় বাস করে জানিস? কিভাবে এসব লাভ করা যায় বলতে পারিস?
মুখে কোন কথা না বলে ঘাড় নাড়িয়ে জানালাম—জানি না। সাধুবাবা খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন,
—এদের সকলেরই আশ্রয় শ্রীগুরুর চরণে। শুধুমাত্র গুরুসেবা করলেই এসব লাভ করা যায় বিনা তপস্যায়—সহজেই।
সঙ্গে সঙ্গেই জানতে চাইলাম,
—বাবা, গুরুসেবা কি—কেমন করে তা করা যায়?
প্রশ্নটা শুনে সাধুবাবা অস্ফুট স্বরে 'জয় গুরু মহারাজ কি জয়' বলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,
—(গুরু যা যা বলেন—সেই কাজ বা গুরুবাক্য ঠিক ঠিক নিয়মে, বিনা প্রতিবাদে, নির্বিচারে, নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলেই গুরুসেবা করা হয়। গুরুসেবা মানে গুরুর গা হাত পা টেপা, একশো এক কিংবা পাঁচশো এক টাকা প্রণামী দেয়া নয়। গুরুসেবায় অর্থের প্রয়োজন হয় না। শুধু এ-টুকু পালন করতে পারলেই ওগুলি তো লাভ করা যায়ই—গুরুর সমস্ত শক্তি লাভ করে পৌঁছানো যায় পরমতত্ত্বে।) কিন্তু কোন শিষ্যই ঠিক ঠিক নিয়মে তা পালন করে না—আর তা করে না বলেই তো ওগুলি লাভ করতে পারে না। যার জন্যেই তো শিষ্যের দুর্ভোগও কাটে না।

সাধুবাবার কথা শেষ হতেই আমার প্রশ্ন তৈরী হয়ে যায়। যখন যে প্রসঙ্গ নিয়ে কথা হয়—তার শেষ না জানা পর্যন্ত শান্তি নেই। কপাল ভালো যে সাধুবাবা বিরক্ত না হয়ে সমানে উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। অনেক সময় এমন অনেক সাধুবাবাকে পেয়েছি—দু-একটা কথা বলে আর কোন কথারই উত্তর দেননি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে শেষে চলে এসেছি নীরবে। সাধুবাবা বাঙালী তাই সুবিধা হয়েছে অনেক বেশী। হিন্দিভাষী হলে অনেক সময় আমার মাঝে মাঝেই কথায় এবং বুঝতে অসুবিধা হয়। এখানে সে ভয় নেই। এবার জিজ্ঞাসা করলাম,

—কেমন গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

প্রসন্নভাবেই সাধুবাবা বললেন,

—বাবা, যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায় না, প্রয়োজনে মনের কথা সম্যক বলা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, দীর্ঘকাল পর সাময়িক দর্শন হয় মাত্র এবং প্রবাসী—এমন গুরুর কাছ থেকে কখনও দীক্ষা নেয়া উচিত নয়। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ অথবা তপস্বী কিংবা সত্যবাদী গৃহস্থের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে গুরু করা চলে। কুমারী নারী গুরু ভালো, তার চাইতেও অনেক অ-নে-ক গুণ ভালো হয় যদি গর্ভধারিণী মায়ের কাছ থেকে দীক্ষা নেয়া যায়। তবে কখনই দীক্ষা নেয়া উচিত নয় বিধবা নারীর কাছ থেকে। এছাড়া সত্ত্বগুণের আধার যিনি—তাঁকেও গুরু করা চলে। তবে যাঁকেই গুরু করো না বাবা, শাস্ত্র গুরুকে ভগবান বলেই বিশ্বাস করতে বলেছেন। যাকে গুরুরূপে বরণ করবি—তাঁর সম্পর্কে মনে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকলে তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নেয়া উচিত নয়। সংশয় থাকলে, দীক্ষা নিলে শিষ্যের কোন কল্যাণই হয় না। দীক্ষার পরেও যদি কখনও গুরু সম্পর্কে মনে কোন সংশয় উপস্থিত হয় —তাহলেও বাবা শিষ্যের অমঙ্গল হয়। পুরনো চাল আর পুরনো ভৃত্য—এই দুটির উপর যেমন আস্থা রাখা যায় তেমনই আস্থা রাখা যায় প্রাচীন ঋষিদের ধারা বহনকারী গুরু পরম্পরার উপর। তাঁরাই সিদ্ধমন্ত্রের ধারক ও বাহক। সুতরাং দীক্ষা নিলে সেই প্রাচীন গুরু পরম্পরা থেকেই নেয়া উচিত।

প্রসঙ্গক্রমেই প্রশ্ন এলো মাথায়। জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, একটু আগেই তো আপনি বলেছেন, গুরুর দেহটা কিছু নয়। মন্ত্রই সব। তাই যদি হয়, তাহলে গুরুর দর্শন, সাক্ষাৎ আর স্পর্শ ইত্যাদির প্রয়োজন কোথায় ? গুরু প্রবাসী হলেই বা কি যায় আসে ? মন্ত্রই যখন সব তখন গুরু দেহে থাকলে বা না থাকলেও তো কিছু যায় আসে না শিষ্যের—আপনি কি বলেন ?

উত্তরে সাধুবাবা হাসতে হাসতে বললেন,

—হ্যাঁ বাবা, শিষ্যের মধ্যে কাজ করে গুরুশক্তি—সেখানে গুরুর দেহে থাকা, না থাকা সমান। তবে একটা কথা আছে এখানে। যেখানে প্রতিদিন শুধু নুন দিয়ে ভাত মেখে খেলেই যখন পেট ভরে, তখন নানা তরকারী মাছ মাংস ইত্যাদি খাওয়ার

প্রয়োজন আছে কি ? আসলে ওগুলোতে দেহের পুষ্টি, রসনা তৃপ্তি, স্বাদ ইত্যাদি আলাদা বলেই খেতে হয়—ঠিক তেমনই গুরু দর্শন স্পর্শন ও সঙ্গ। গুরুদর্শনে মনের তৃপ্তি ও উন্নতি, স্পর্শনে ইন্দ্রিয়ের বিকার দগ্ধ আর সঙ্গ করলে জাগতিক কামনা বাসনা দূর হয়, মনের শক্তি বাড়ে, সংশয় আসে না—বুঝলি ?

মনে মনে ভাবলাম, একবার যখন পেয়েছি—তখন আর সহজে ছাড়ছি না। তাই এবার জিজ্ঞাসা করলাম,

—দীক্ষার পর কিভাবে জপ করলে, কি নিয়মে জপ করলে দ্রুত আধ্যাত্মিক কল্যাণ হয় ? আমি অনেক দীক্ষিত শিষ্যের মুখেই শুনেছি—শুধু মন্ত্রটা বলে দিয়েই গুরু খালাস হয়ে গেলেন—সঙ্গে আর বাহ্য কিছু নিয়ম।

আমার প্রত্যেকটা প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছেন সাধুবাবা বেশ খুশী হয়ে—এ আমি মুখ দেখেই বেশ বুঝতে পারছি। স্থির হয়ে বসে আছেন সাধুবাবা। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন,

—বাবা, এবার আমার কিছু কথা আছে। জীবনে লেখাপড়া কিছু শিখিনি আমি সুতরাং শাস্ত্র পুরাণও আমার পড়া হয়নি। যে সব কথা তোকে আমি বলেছি এবং যে সব কথা তোকে বলবো—সে কথা জানবি আমার গুরুর মুখ থেকেই শোনা। শাস্ত্র পুরাণের বাইরে তিনি একটা কথাও বলতেন না—আমিও মন গড়া কোন কথা তোকে বলবো না। শাস্ত্র পুরাণ একটু ঘাটলেই তুই জানতে পারবি—আমিও গুরুজীর কথার বাইরে, হিন্দুশাস্ত্রের বাইরে যাইনি। দীক্ষা এবং মন্ত্র—এসব অনেক কথা, অনেক গূঢ় ব্যাপার। আমি অত তলিয়ে গিয়ে কিছু বলবো না। যেটুকুতে তোর কল্যাণ হবে—সেটুকুই বলবো।

প্রথমেই বলি, স্বপ্নে পাওয়া মন্ত্র জপে কোন ফল হয় না—যদি না উচ্ছিষ্ট হয়। অর্থাৎ স্বপ্নে পাওয়া মন্ত্র কোন গুরুকে বলার পর তিনি ওই মন্ত্রই আবার নিজে মুখ থেকে বলে দিলেই তবে সে মন্ত্র কার্যকরী হয়। (একের অধিক মানুষকে এক ঘরে একসঙ্গে বসিয়ে কোন গুরু দীক্ষা দিলে সে মন্ত্রও বাবা কার্যকরী হয় না কখনও। গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র লিখে নিলে, লিখে দিলে, কাগজে ছাপানো ইষ্টমন্ত্র দিলে সে মন্ত্র জপে নারীপুরুষের কোন কল্যাণই হয় না।)

এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা একটু থামলেন। তীর্থযাত্রীদের আনাগোনা এক নজর দেখে নিয়ে আবার বললেন,

—(বাবা, ইষ্টমন্ত্র এতটাই গোপনীয় যে, একমাত্র গুরু আর শিষ্য ছাড়া পৃথিবীর অন্য কেউই কখনও জানবে না। যেখানে একের ইষ্টমন্ত্র অন্যে জানতে পারছে—সে মন্ত্র নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে। নামে দীক্ষা হচ্ছে বাবা, কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। গুরুজী বলতেন, স্বামী তার স্ত্রীর মন্ত্র এবং স্ত্রী তার স্বামীর মন্ত্র জানবে না। অর্থাৎ স্বামীস্ত্রীকে এক সঙ্গে বসিয়ে মন্ত্রদানও নিষিদ্ধ। সে মন্ত্রে আধ্যাত্মিক কল্যাণ তো দূরের কথা, শিষ্যের কোন কাজেই আসে না। মোটের উপর দীক্ষার

সময় শুধুমাত্র গুরু এবং দীক্ষা গ্রহণকারী ছাড়া তৃতীয় কোন ব্যক্তি থাকলে এবং সে সেই ইষ্টমন্ত্র শুনলে তা কখনই কার্যকরী হবে না—সে মন্ত্র যত শাস্ত্র-সম্মত ও সিদ্ধমন্ত্রই হোক না কেন। যে মন্ত্র তন্ত্রে নেই—সে মন্ত্র বাবা মন্ত্রই নয়। মন্ত্র সব সময়েই শাস্ত্রোক্ত হতে হবে। আরও একটা কথা হলো, কাউকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে মন্ত্র দিলে মন্ত্র গ্রহণকারীর আধ্যাত্মিক এবং মানসিক—কোন কল্যাণই হয় না। সর্বসমক্ষে মন্ত্রপ্রদান এবং গ্রহণ শাস্ত্রবিরোধী কর্ম। এতে মন্ত্র গ্রহণকারী শিষ্যের ধর্মজগতে অধঃপতন হয়। এই জাতীয় দীক্ষায় মন্ত্র নামক গুটি কয়েক শব্দলাভ হয় মাত্র—কারণ ওই মন্ত্র থেকে ইষ্ট বা পরমশক্তি অন্তর্হিত হয়। নিয়মে মন্ত্র পাওয়ার পর তা মৃত্যু পর্যন্তই গোপন করতে হয়। কারণ মৃত্যুর পর সংস্কারে ইষ্টমন্ত্রই সূক্ষ্মদেহ বয়ে নিয়ে চলবে পরলোকে—যাবে এক লোক থেকে আর এক লোকে—সেখানেও মুক্তিপ্রাপ্ত আত্মার চলবে সাধনা। যদি দীক্ষিত শিষ্য বা শিষ্যার আবার জন্ম হয় তা হলে ওই সংস্কারই তাকে দীক্ষার আগে ইষ্টনির্বাচনে সহায়তা করবে)

এবার আমার চোখে চোখ রেখে সাধুবাবা একটু সোজা হয়ে বসে বললেন,

—বাবা, দীক্ষাদান আর গ্রহণ পদ্ধতিটুকু না জানলে আসল কথাটাই জানা হয় না। এ তো আর ছেলে খেলা নয়—এ যে মুক্তির পথ—তাঁকে লাভ করার পথ যে! এবার আসি তোর জিজ্ঞাসার উত্তরে। বাবা, অনেক প্রকারের জপ আছে। (যেমন, হৃদয় জপ, কণ্ঠ জপ, বাচিক জপ, মানস জপ, উপাংশু জপ, জিহ্বা জপ এবং অসংখ্য জপ। শুধুমাত্র কণ্ঠে ইষ্টমন্ত্র জপকে বলে কণ্ঠ জপ। হৃদয়ে জপকে বলে হৃদয় জপ। উচ্চারণ করে বা ঠোঁট নাড়িয়ে জপকে বলে বাচিক জপ। মন্ত্র মনে মনে উচ্চারিত হবে অথচ কানে শোনা যাবে না, ঠোঁট বা জিভ নড়বে না—তাকে বলে মানস জপ। জিভ নড়বে, ঠোঁট সামান্য নড়বে এবং উচ্চারিত মন্ত্র কানেও শোনা যাবে—তাকে বলে উপাংশু জপ। শুধুমাত্র জিভের দ্বারা জপ করাকে বলে জিহ্বা জপ। মালায় সংখ্যা রেখে নয়, কর গুণেও নয়—চলাফেরায়, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় জপ করাকে বলে অসংখ্য জপ। যত প্রকারের জপ আছে, তার মধ্যে বাবা নিকৃষ্ট জপ হলো বাচিক জপ। মোটামুটি ভালো হলো উপাংশু জপ। সর্বোৎকৃষ্ট জপ হলো মানস জপ। তবে পথে ঘাটে, হাটে বাজারে, অন্ধকার ঘরে, চামড়ার জুতো পরে, বিছানায় বসে (অসুস্থ অবস্থায় ছাড়া) জপ করলে শিষ্যের কোন ফল বা কল্যাণ হয় না। অবশ্য এই নিয়মটা কোনভাবেই কার্যকরী নয় মানস জপের ক্ষেত্রে। মানস জপ এবং অসংখ্য জপের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম, শুচি অশুচি, স্থান, চলা, বলা, খাওয়া, শোয়া ইত্যাদির বিচার নেই। সর্বদাই করা যায়)

এক নাগাড়ে বলার পর এবার সাধুবাবা থামলেন। বেশ একটা উদাসীনতার ভাব ফুটে উঠলো মুখখানায়। কথা বলে আমি সাধুবাবার ভাব নষ্ট করলাম না।

শোনার অপেক্ষায় রইলাম। এইভাবে মিনিট আটেক কাটার পর বললেন,
—বাবা, ঠিক ঠিক নিয়মে দীক্ষা এবং ঠিক ঠিক নিয়মে জপ আর ইষ্টমন্ত্রের সঠিক উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই দেহে ঈশ্বরীয় শক্তির আকর্ষণ হয়। তাতে জপকারীর তেজঃ বাড়ে। এই তেজঃ তমোগুণ এবং রজোগুণের নাশ করে—বৃদ্ধি করে সত্ত্বগুণ। জপের সময় দেহের ভিতরে একটি বিশেষ বায়ুক্রিয়া করে। এই বায়ুই তেজঃ বৃদ্ধি করে। তাই জপের সময় ঠোঁট নাড়িয়ে বা উচ্চারণ করে জপ করলে সেই বায়ু বেরিয়ে যায় দেহ থেকে, ফলে তেজঃ সঞ্চিত হতে পারে না দেহে। এতে ইষ্টলাভে বিলম্ব হয়। মানস জপে দেহে তেজঃ সঞ্চিত হয় ফলে মন একাগ্র এবং ইন্দ্রিয়ের কার্যকরী শক্তি ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়। আর সত্ত্বগুণের আলোকে বিকাশিত হয় পারমার্থিক জ্ঞান। ক্রমে পার্থিব বন্ধন মুক্ত হয়ে আত্মা প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্দ্রিয়ের প্রভাবমুক্ত মনে। কালক্রমে ইষ্টমন্ত্র জপে জন্ম মৃত্যু রোধ হয়। তবে বাবা কোন সময়েই তাড়াতাড়ি অর্থাৎ দ্রুত জপ করতে নেই। দ্রুত জপ করলে অর্থক্ষতি এবং ধনক্ষয় হয়। আবার খুব ধীরে ধীরে জপ করাটাও ভালো নয়। তাতে সংসারে রোগভোগ, দুঃখ বাড়ে। সমান ভাবে জপ করলে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয়। তবে অপবিত্র বা নোংরা হাতে জপ করতে নেই।
এখন আমাকে আর কোন প্রশ্ন করতে হচ্ছে না। সাধুবাবাই বলে যাচ্ছেন শাস্ত্রমতে দীক্ষাপ্রসঙ্গ। সাধুবাবার বলা অনেক কথাই আমার পড়া আছে তন্ত্রে, তবে অনেক কথাই জানা নেই। জানতে পারছি নতুন করে—আলোচনা করে। এবার তিনি বললেন,
—বাবা, গর্ভবতী অবস্থায় মায়েদের নয় মাস পর্যন্ত দীক্ষা নেয়া চলে। তাতে মা এবং গর্ভস্থ সন্তান—উভয়েরই কল্যাণ হয়। সন্তানও ব্রহ্মমন্ত্রে সংক্রামিত হয়। তবে পূর্ণ মাসে দীক্ষা নিলে মা এবং সন্তান উভয়ের অমঙ্গল হয়। দীক্ষার পর বিবাহিত এবং অবিবাহিত সকল নারীপুরুষেরই যতটা সম্ভব ব্রহ্মচর্য পালন করা উচিত।
এই পর্যন্ত বলে এবার হাসতে হাসতে সাধুবাবা বললেন,
—বাবা, আজকাল ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন না করে দেহের বারোটা বাজাতে যত রকম ব্রত আছে—তা সবই পালন করে কুমার কুমারী, বিবাহিত নারীপুরুষেরা। যার জন্যেই তো কারও কিছু হচ্ছে না। দীক্ষা নিয়ে এসব পালন না করলে পারমার্থিক উন্নতি কিছু হবার নয়।
এবার জিজ্ঞাসা করালাম,
—বাবা, দীক্ষা না নিলে নাকি হাতের জল শুদ্ধ হয় না—কথাটা কি ঠিক?
মাথাটা নাড়িয়ে তিনি বললেন,
—বাবা, শাস্ত্রে আছে (মৎস্য সূক্তে), যে ব্যক্তির দীক্ষা হয়নি তার হাতের অন্ন বিষ্ঠা আর জল মূত্র তুল্য। শুধু তাই নয় বাবা, শ্রাদ্ধ বা যে কোন পারলৌকিক

ক্রিয়াদি, ব্রতপালন, পুজানুষ্ঠান, সৎ কার্যে কোন ফল হয় না। যারা দীক্ষিত —তাদের এই সব কাজগুলির সমস্তই সিদ্ধ হয় দীক্ষা-মাহাত্ম্যে।

এই পর্যন্ত বলার পর হঠাৎ সাধুবাবা বললেন,

—এবার যা তো বাবা, অনেক কথা শুনেছিস্—আর বক্‌বক্ করতে ভাল লাগছে না।

কথাটা শুনেই মনটা আমার ধড়াস্ করে উঠলো। মনে মনে ভাবলাম, এখনও তো আমার অনেক কিছুই জানার আছে। হঠাৎ মাঝ পথে ছেড়ে দিলে চলবে কেন! পা দুটো ধরে অনুরোধের সুরেই বললাম,

—বাবা, আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন। আর মাত্র কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিলেই আমার হবে। বেশী বিরক্ত করবো না। জীবনে আর কখনও আপনার সঙ্গে দেখাই হবে না—এমন সুযোগও কখনও পাবো না। দয়া করে যখন এতটা বললেন তখন শেষটা আর বাকি থাকে কেন?

কথাটা বলে হাতটা সরিয়ে নিলাম পা থেকে। সাধুবাবা বসে রইলেন একইভাবে—স্থির হয়ে। কখনও চোখ বুজছেন আবার কখনও তাকিয়ে দেখছেন তীর্থযাত্রী আর স্নানার্থীদের। আমার কোন দিকেই মন নেই। বাবু হয়ে হাত জোড় করে বসে আছি। যারা তোয়াজ করা কথা বলে, তাদের উদ্দেশ্য থাকে স্বার্থসিদ্ধির—তারা প্রথম শ্রেণীর শয়তান হয়। এখন আমার ভূমিকা সম্পূর্ণ স্বার্থসিদ্ধির। প্রায় মিনিট পনেরো কেটে যাওয়ার পর সাধুবাবা বললেন,

—আর কি জানতে চাস্ বল্, আমার জানা থাকলে তোকে বলবো।

বিনীতভাবেই বললাম,

—কোন্ দিনে বা মাসে দীক্ষা নিলে কল্যাণ হয়? পঞ্জিকায় তো অসংখ্য দিনের উল্লেখ আছে দেখেছি। আরও একটা কথা, বিভিন্ন ধরনের মালায় দেখেছি সাধু-সন্ন্যাসীদের জপ করতে। এই মালার ভেদে কি জপের ফলভেদ আছে?

উত্তরে সাধুবাবা জানালেন,

—হ্যাঁ বাবা, মালার ভেদে ইষ্টমন্ত্র জপেরও ফলভেদ আছে। সাধারণভাবে শঙ্খমালা, পদ্মবীজের মালা, স্ফটিকের মালা আর রুদ্রাক্ষের মালাই জপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। শঙ্খমালার চেয়ে অনেক বেশী ফল হয় পদ্মবীজের মালায় জপ করলে। পদ্মবীজের মালার চেয়ে অনেক অ-নে-ক গুণ বেশী ফল হয় স্ফটিকের মালায়। আর অনন্ত ফললাভ হয় রুদ্রাক্ষের মালায় জপ করলে। তাই সাধুসন্ন্যাসীরা রুদ্রাক্ষের মালায় জপ করাটাকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তবে বাবা, তুই যে মালাতেই জপ করিস্ না কেন—মানুষের মুক্তিতে সব মালাই ফল দান করে। এখানে একটা কথা আছে, জপের সময় মন্ত্রের উচ্চারণ সঠিক এবং মন্ত্র শেষ না হওয়া পর্যন্ত কর বা রুদ্রাক্ষ একটা ছেড়ে আর একটায় যেতে নেই। তাড়াতাড়ি জপ করলে কর বা রুদ্রাক্ষে জপ ছুট্ হয়। এদিকটা খেয়াল রাখতে হয় জপের সময়।

একটু থেমে আবার শুরু করলেন,

—দীক্ষায় মাস বার পক্ষ তিথি ইত্যাদিতে কিছু শুভাশুভ ফলের কথা বলা আছে আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে। সংসারে থেকেও যারা মুক্তিকামী—তাদের ক্ষেত্রে কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী পর্যন্ত এবং বিষয়কামীদের শুক্লপক্ষে দীক্ষা শুভ ফলদান করে। তবে শুক্ল এবং কৃষ্ণ যে পক্ষই হোক না কেন—প্রতিপদ এবং ষষ্ঠী তিথিতে দীক্ষা হলে পারমার্থিক জ্ঞানলাভে প্রতিবন্ধক হয়। চতুর্থীতে দীক্ষা হলে দীক্ষার পর সংসারে অর্থ ও বিত্ত নষ্ট হতে থাকে আর অষ্টমীর দীক্ষায় নষ্ট হয় বুদ্ধি। নবমীতে দীক্ষায় শরীর ক্ষয় এবং স্বাস্থ্যহানি আর চতুর্দশীতে দীক্ষা হলে সে জন্মে গুরু-কৃপায় মুক্তি না হলে পরজন্মে হীন যোনিতে জন্মলাভ হয়। ত্রয়োদশীতে দীক্ষা নেয়াটাও ভালো নয়। দীক্ষার পর সংসারে ধীরে ধীরে আর্থিক অভাববোধটা বেড়ে যায়। তবে একটা কথা মনে রাখিস্ বাবা, এই তিথিগুলির কোনটিতে দীক্ষা হলে দীক্ষার পর সংসারে এই সব অসুবিধাগুলি ভোগ করতে হয় বটে, তবে ইষ্টলাভে বা মুক্তিলাভের ক্ষেত্রে তিথিগুলির কোন বিরূপ ভূমিকা নেই। সেখানে মূলত কাজ করবে শিষ্যের জপ তপ নিষ্ঠা, গুরুতে বিশ্বাস ভক্তি শ্রদ্ধা ইত্যাদি। যে কোন পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে দীক্ষায় জ্ঞান আর পঞ্চমীতে নির্মল বুদ্ধির বৃদ্ধি ঘটে। তৃতীয়া ও একাদশী তিথিতে দীক্ষায় বৃদ্ধি পায় মনের শুদ্ধতা ও শুচিতা। হাজার কষ্টে থাকলেও সপ্তমীর দীক্ষায় শিষ্যের নিজ সুখ এবং দশমীতে দীক্ষা হলে সাংসারিক এবং ধর্মজীবন—উভয়েরই ক্রমোত্তর উন্নতি হতে থাকে। দ্বাদশী তিথিতে দীক্ষাও খুব শুভ। দীক্ষার পর শিষ্যের প্রাক্তন কর্মফল হেতু কিছু তারতম্য ঘটে বটে, তবে তার জীবনের অধিকাংশ কাজেই সিদ্ধি আসে।

এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা একটু থামলেন। মিনিট পাঁচেক কি যেন চিন্তা করে পরে আবার বলতে শুরু করলেন,

—বাবা, বিশেষ বিশেষ তিথিতে দীক্ষার ফল অত্যন্ত শুভ হয়—সেটা সংসার ও ধর্ম —উভয় উন্নতির ক্ষেত্রে। সেখানে কিন্তু আগের ওই তিথির নিয়ম খাটবে না। যেমন ধর, দুর্গাপুজোর ষষ্ঠী থেকে নবমীর মধ্যে দীক্ষা হলে দীক্ষিত নারীপুরুষের অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। এছাড়া বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া (অনেক সময় এই তিথি জ্যৈষ্ঠ মাসেও পড়ে), জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা, আষাঢ় মাসে শুক্লপক্ষের পঞ্চমী, শ্রাবণে কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী, ভাদ্রমাসে শুক্লা ষষ্ঠী, আশ্বিনে কৃষ্ণা চতুর্দশী, কার্তিকে শুক্লা তৃতীয়া, পৌষে শুক্লা নবমী, মাঘ মাসে শুক্লা চতুর্থী, ফাল্গুনে শুক্লা নবমী, চৈত্রের শুক্লা চতুর্দশী, রামনবমী এবং অশোকাষ্টমীতে দীক্ষায় বিশেষ ফললাভ এবং অশেষ কল্যাণ হয়—পার্থিব এবং অপার্থিব, দুয়েরই। তবে কখনই নিজের জন্মমাস বার এবং জন্মতিথিতে দীক্ষা নিতে নেই। দীক্ষার ফল, সাধনের ফল নষ্ট হয়। এছাড়াও বাবা, দীক্ষার ব্যাপারে আরও অনেক নিয়ম বাদ বিচার মত আছে—ওসব তোর জানার দরকার নেই—মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে। একটা কথা বলতে ভুলেই

গেছিলাম। চন্দ্রগ্রহণ চলাকালীন দীক্ষা গ্রহণ এবং জপ করলে বিশেষ ফললাভ হয় —কল্যাণও হয় অশেষ। তবে অমাবস্যায় জপ করা অত্যন্ত ভালো কিন্তু দীক্ষায় প্রশস্ত নয়। অমাবস্যায় দীক্ষা নিলে শিষ্যের জীবনের অধিকাংশ শুভ প্রচেষ্টায় আসে ব্যর্থতা। পূর্ণিমার দীক্ষায় ধীরে ধীরে অর্থ ধন আর ধর্মবৃদ্ধি হয়।

অন্যান্য কথা সব মনে রাখা সম্ভব হয় যে সব কথা হয় কথা প্রসঙ্গে। তবে অনেক কথাই অনেক সময় মনে রাখা যায় না। তাই সংক্ষেপে লিখে নিতে হয়। প্রথম থেকেই বিষয়টা আঁচ করতে পেরে ঝড়ের বেগে লিখে নিচ্ছি। সাধুবাবা দেখেছেন তবে তিনি আপত্তি করেননি, বাধাও দেননি। আমার লেখার সুবিধার জন্য অনেক সময়েই তিনি থেমে থেমে, ধীরে ধীরে বলছেন—অনেক সময় থেমেও থাকছেন। তবে আমি খুব দ্রুতগতিতে লিখতে পারি বলে তেমন কোন অসুবিধা হচ্ছে না সাধুবাবার কথায়। সবচেয়ে সুবিধা হয়েছে বাংলাতে কথা হওয়ায়।

এবার সাধুবাবা বললেন,

—বাবা, শনি আর মঙ্গলবারে দীক্ষা না নেয়াই ভালো। যদিও তান্ত্রিক দীক্ষায় শনি মঙ্গলবারকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তবে গৃহীদের এড়িয়ে চললেই ভালো হয়। কারণ শনিবারের দীক্ষায় জপের ফল নষ্ট এবং মঙ্গলবারে দীক্ষায় দীক্ষা গ্রহণকারীর আয়ুক্ষয় হয়। রবিবারে দীক্ষায় আর্থিক উন্নতি, সোমবারে মনের প্রশান্তি, বুধবারে দীক্ষা গ্রহণকারীর সর্বাঙ্গীণ সৌন্দর্যবৃদ্ধি, বৃহস্পতিবারে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বৃদ্ধি এবং শুক্রবারে দীক্ষা নিলে দীক্ষার পর সংসার ও প্রতিষ্ঠা জীবনের উন্নতি হয়।

বাবা, বিভিন্ন মাসে দীক্ষারও কিছু শুভাশুভ ফল আছে। যেমন, বৈশাখ মাসে দীক্ষা হলে দীক্ষার পর ক্রমোত্তর আর্থিক উন্নতি, জ্যৈষ্ঠ মাসে সাংসারিক জীবনে সুখভোগে ব্যাঘাত সৃষ্টি, আষাঢ়ে আত্মীয় প্রীতিতে বাধা, শ্রাবণে আয়ু বৃদ্ধি, ভাদ্রে সন্তানের অমঙ্গল নইলে কোন সন্তান নষ্ট, আশ্বিনে ধন ও অর্থের উন্নতি, কার্ত্তিক এবং অগ্রহায়ণ মাসে দীক্ষায় মন্ত্রসিদ্ধি, পৌষে দীক্ষা হলে দীক্ষার পর ধীরে ধীরে শত্রু বৃদ্ধি, মাঘে স্মৃতি বৃদ্ধি, ফাল্গুনে দীক্ষায় বিশেষ কোন মনোবাসনা থাকলে তা পূর্ণ আর চৈত্রমাসে দীক্ষা হলে পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়। আষাঢ় মাসে লক্ষ্মী মন্ত্রে দীক্ষা নিলে লক্ষ্মীলাভ হয়। দীক্ষার পর যত দিন যায় তত ধন সম্পদ এবং শ্রীবৃদ্ধি হয়। তবে মলমাসে দীক্ষা নিতে নেই। তাতে জপের ফল নষ্ট হয়।

এখানে একটা কথা আছে, মাস তিথি বার ইত্যাদিতে দীক্ষার ব্যাপারে যে সব শুভাশুভ ফলের কথা বললাম, তা দীক্ষা গ্রহণকারীর জপতপ এবং জন্মান্তরের শুভাশুভ কর্মফলের উপর ফলাফলের তারতম্য হবে। যেমন ধর, কেউ সোমবারে দীক্ষা নিল। ওই বারে দীক্ষা নিলে মনের প্রশান্তি আসবে। এখন দীক্ষিত কেউ যদি নিষ্ঠার সঙ্গে ইষ্ট মন্ত্রের সাধন না করে তা হলে কিন্তু বাবা তার মনের শান্তি

কিছুতেই আসবে না। সব সময় মনে রাখিস্, যা কিছু অশুভ ফল তা কাটবে জপেই। আর যা কিছু শুভ ফলের বৃদ্ধি তা সবই বাড়বে ইষ্টমন্ত্র জপে। তবে গুরু যদি দয়া করে কাউকে যে কোন দিন দীক্ষা দেন তাতে কোন কিছু বিচারের প্রয়োজন হয় না। তার ফল অসীম এবং কল্যাণকর। আর কোন কিছুরই বিচারের প্রয়োজন হয় না—গুরু যদি গঙ্গাতীরে, প্রয়াগে, একান্ন পীঠের যে কোন পীঠস্থানে, বিশ্বনাথ ক্ষেত্র কাশীধামে দীক্ষা দেন।
একটানা এই পর্যন্ত বলে এবার সাধুবাবা বললেন,
—অনেক হয়েছে, এবার যা তো বাবা—আমাকে একটু চুপচাপ থাকতে দে। অনেক হয়েছে।
সঙ্গে সঙ্গেই অনুরোধের সুরে বললাম,
—আর একটুখানি বাবা, এবারই আমি উঠবো। দয়া করে একটু বলুন—মন্ত্রশুদ্ধি, কর্মশুদ্ধি, মন্ত্রসিদ্ধি আর ইষ্টসিদ্ধি—এসব কথার প্রকৃত অর্থ কি ?
সাধুবাবার প্রশান্তচিত্ত এবং বিরক্তিহীন মুখখানা দেখে এবার বড় আনন্দ হলো। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছি অথচ কোন রাগের বালাই নেই। তিনি বললেন,
—বাবা, সংসারে থেকে অথবা সংসারের বাইরে থেকে গুরু বা ইষ্টের উপর সমস্ত কর্ম ছেড়ে দিয়ে কর্ম করার নামই কর্মশুদ্ধি। এক কথায় বলতে পারিস্—'আমি কিছু করছি না ঠাকুর, যা কিছু কর্ম তা তুমিই করছো আমার ভিতরে থেকে। আমার কিছু করার নেই।' এই ভাব-এ প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে কর্মশুদ্ধি বলে। মন্ত্রশুদ্ধি হলো—সদ্‌গুরুর মুখ থেকে ধর্মীয় জীবনের গোপন কথা ও কর্তব্য বিষয়ে উপদেশের মাধ্যমে শিষ্যের সম্যক জ্ঞানকেই বলে মন্ত্রশুদ্ধি। জপতপ হোম পুজো ইত্যাদির মাধ্যমে গুরু প্রদত্ত ইষ্টমন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধিলাভকে মন্ত্রসিদ্ধি বলে। মন্ত্র সাধনের দ্বারা উপাস্য বা আরাধ্য ইষ্টদেবতাকে লাভ করাই হলো ইষ্টসিদ্ধি। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা জেনে রাখ্ বাবা, গুরু প্রদত্ত যে কোন মন্ত্রের গোপনীয়তা রক্ষা করাকেই শাস্ত্রে বলা হয়েছে মন্ত্রগুপ্তি।
সাধুবাবাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করে বিরক্ত করার ইচ্ছা হলো না। দয়া করে যে এতক্ষণ ধরে এত কথা বললেন—এটাই আমার ভাগ্য। তবুও জানতে চাইলাম,
—মন্ত্রের বিষয়ে যে সব কথা বললেন, এগুলি কোন শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে ?
সাধুবাবা নির্বিকার ভাবে বললেন,
—আমি তো বাবা কখনও কোন শাস্ত্র পড়িনি। তবে আমার গুরুজীর মুখে শুনেছি এসব ভারতীয় চৌষট্টি তন্ত্রের কথা। ওই সব শাস্ত্র পুরাণ ঘাটলেই তুই এই সব কথা খুঁজে পাবি।
একপাশে বয়ে চলেছে যমুনা। একের পর এক তীর্থযাত্রী, স্নানার্থীদের আসা যাওয়ার কোন বিরাম নেই। অনেকে স্নান সেরে সোজা মন্দিরে দর্শন করে পুজো দিয়ে চলে যাচ্ছেন। বাঙালী মহিলাদের সংখ্যা যথেষ্ট। তবে দেশওয়ালীরা যখন

আসছেন তখন ঝাঁকে ঝাঁকে। মুখে তাদের দেশওয়ালী সুরে কৃষ্ণের নামগান। একজন প্রথমে গাইছেন—তারপর আর সকলে গাইছেন সম্মিলিতভাবে। হালকা শীতল হাওয়া বইছে ফুরফুর করে। সাধুবাবা বিছানো কম্বলের উপরে বসে আছেন স্থির হয়ে। মুখে কোন কথা নেই। এবার দু-হাত জোড় করে বললাম,

—বাবা, একটা শেষ কথা বলবো, দয়া করে উত্তর দেবেন ?

হাসিমাখা মুখে সম্মতি দিলেন মাথা নেড়ে। অভয় পেয়ে বললাম,

—বাবা, ঈশ্বর কি এবং তাঁকে দেখতে কেমন ?

কথাটা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন সাধুবাবা। হাসিটা থামতেই নির্লিপ্ত নির্বিকার বিনয়ী এই সাধুবাবা হাসির হালকা রেশ মাখানো মুখে বললেন,

—এতক্ষণ পর বেশ ভালো একটা কথা বলেছিস্। বলি শোন্—ঈশ্বর কি এবং তাঁকে দেখতে কেমন ? জিভ যাঁর আস্বাদ নিতে পারে না—কান যাঁকে শুনতে পায় না—চোখ যাঁকে দেখতে পায় না—নাক যাঁর গন্ধ পায় না—যাঁর রূপ নেই অথচ তিনি সর্বরূপে বিরাজমান, নাম নেই অথচ সবই তাঁর নাম, গুণ নেই অথচ সমস্ত গুণে যিনি পূর্ণ—যিনি আছেন তোর আমার এবং আর সকলের মাঝে—তিনিই ঈশ্বর।

কথাটা শেষ হতেই প্রণাম করলাম পায়ে হাত দিয়ে। ডান হাতটা মাথায় স্পর্শ করে মুখে বললেন,

—বৃন্দাবনে যখন এসেছিস্ বাবা, তখন রাধার কৃপালাভ হোক।

এমন আশীর্বাদে মনটা আমার ভরে গেল। উঠে দাঁড়ালাম। ভাবতে ভাবতে চললাম—সাধুবাবার কথা।

বৃন্দাবনে যেন আনন্দের জোয়ার বয়ে চলে সারা বছরই। ভাঁটা নেই। ভাঁটা পড়ে না যাত্রী সমাগমে। বিরাম নেই তাঁদের আসা যাওয়ায়—শীত গ্রীষ্ম বর্ষায়। শুধু সাধারণ মানুষ বা তীর্থযাত্রী নয়—আগমন ঘটে শত শত সাধু মহাত্মাদের। আমি জেনেছি, যে সব সাধু মহাত্মারা উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণে যান—তাঁদের প্রায় সকলেই একবার পায়ের স্পর্শ দিয়ে যান এই বৃন্দাবনে—ফেরার পথে। যমুনার যেমন চলায় বিরাম নেই—তেমন এখানে আসায় বিরাম নেই নানা শ্রেণীর মানুষের। বৃন্দাবনের তিনদিক ঘিরে বয়ে চলেছে যমুনা—যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে বৃন্দাবনকে—রাধাকৃষ্ণকে। এখানে যমুনার উদ্দামতা নেই—বাৎসল্য প্রেমের ভাব নিয়েই বয়ে চলেছে শত শত বছর ধরে। বৃন্দাবনে যমুনা যেন মাতৃভাবে যশোদা—আগলে রেখেছে কৃষ্ণকে—কৃষ্ণলীলাক্ষেত্রগুলিকে। সেইজন্যেই তো বৃদ্ধা যমুনার এত কদর, মানুষের কাছে—শাস্ত্রকারের শাস্ত্রে। যমুনারও কি ভাগ্য! রাধাকৃষ্ণের নিত্য লীলারস আস্বাদন করে চলেছে প্রতিদিন—দিন রাত।

আবার শুরু হলো চলা। আমাদের রিক্সা এদিক সেদিক করতে করতে এসে দাঁড়ালো

চির ঘাটে। এই ঘাটের আরও একটি নাম—বস্ত্রহরণ ঘাট। অনেকগুলি বড় বড় গাছ রয়েছে ঘাটের পাশে। বাঁধানো ঘাটের চত্বর—নেমে গেছে সিঁড়ি। ঘাটের পাশেই মাঝারী আকারের মন্দির। অনাড়ম্বর মন্দিরে স্থাপিত রয়েছে গোপবালাদের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। যমুনাতীরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়া এই ঘাটের আর তেমন কোন আকর্ষণ নেই, তবে এই মাহাত্ম্যপূর্ণ ঘাটে আসেন না—এমন যাত্রী বা তীর্থযাত্রীর সংখ্যা বিরল।

কথিত আছে, সংসারের সমস্ত সংকীর্ণতার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন ব্রজের গোপিনীরা। শ্রীকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গে পাওয়া যায়, একদা শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গোপিনীদের স্নানের সময় সমস্ত বস্ত্রহরণ করেন এই ঘাটে। পরে আকুল আর্তিতে শরণাগত হলে তিনি ফিরিয়ে দেন তাঁদের সমস্ত বস্ত্র। চির ঘাট আজও সেই কৃষ্ণলীলার সাক্ষী হয়ে আছে। গোপিনীদের বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধের ২২ অধ্যায়ে ব্যাসপুত্র শুকদেব গোস্বামী বলেছেন রাজা পরীক্ষিৎকে,

"মহারাজ, হেমন্তের প্রথম মাসে নন্দব্রজের কুমারীরা হবিষ্যভোজী হয়ে কাত্যায়নীর ব্রত আরম্ভ করলেন। সূর্যোদয়ের সময় কালিন্দীর জলে স্নান করে তাঁরা জলের নিকট বালুর প্রতিমা তৈরী করে সুগন্ধ দ্রব্য, মালা, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, প্রবাল, ফল, চাল প্রভৃতি নানা উপহার দিয়ে দেবীর পূজা করতে লাগলেন। হে কাত্যায়নী, হে মহামায়া, হে মহাযোগিনী, হে অধীশ্বরী, অনুগ্রহ করে আমাদের নন্দগোপের পুত্রকে পতিরূপে প্রদান করুন; আপনাকে প্রণাম করি। তাঁরা এইরূপ প্রার্থনা করে পূজা করলেন। নন্দসুত আমাদের পতি হোন, এই কামনায় ব্রজকুমারীরা এক মাস ব্রত পালন করে ভদ্রকালীর অর্চনা করতে লাগলেন। তাঁরা ভোরে উঠে হাত ধরাধরি করে নিজেদের নামের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করতে করতে যমুনায় স্নান করতে যেতেন। একদিন সেই ব্রজকুমারীরা নদীতীরে উপস্থিত হয়ে অন্যান্য দিনের মতো তীরে নিজেদের বস্ত্র রেখে শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করতে করতে জলের মধ্যে আনন্দে কেলি শুরু করলেন। যোগেশ্বরদের ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তা অবগত হয়ে তাঁদের কর্মের ফল দান করার জন্য বয়স্য বালকদের নিয়ে সেখানে এলেন এবং তাঁদের বস্ত্র হরণ করে তাড়াতাড়ি কদম্ব গাছে আরোহণ করলেন। পরে অন্যান্য বালকদের সঙ্গে হাসতে হাসতে বললেন, অবলাগণ, তোমরা এখানে এসে ইচ্ছামত বস্ত্র গ্রহণ কর। আমি সত্য বলছি, পরিহাস করছি না, কারণ তোমরা ব্রতক্লান্ত হয়েছ। আমি এখনও মিথ্যা বলছি না, আগেও কখন মিথ্যা বলিনি, এই বালকেরা তা জানে; তাই সুমধ্যমা সুন্দরীগণ, তোমরা একে একে অথবা সবাই মিলে এসে বস্ত্র নিয়ে যাও।১-১১

মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণের এই পরিহাসে গোপকুমারীরা লজ্জিত ও প্রেমরসে মগ্ন হলেন এবং নিজেরা নিজেদের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন, কেউ জল থেকে উঠতে পারলেন না। শ্রীকৃষ্ণ বার বার ঐরকম পরিহাস করতে থাকলে তাঁদের চিত্ত ব্যগ্র

হল এবং ঠাণ্ডা জলে কণ্ঠ পর্যন্ত মগ্ন থাকায় শীতে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, শ্রীকৃষ্ণ, অন্যায় করো না। তুমি নন্দতনয়, ব্রজের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভদ্র এবং আমাদের প্রিয়। আমাদের বস্ত্রগুলি দিয়ে দাও। চেয়ে দেখ, আমরা শীতে কাঁপছি। শ্যামসুন্দর, আমরা তোমার দাসী, তোমার আজ্ঞায় চলি। তুমি ধর্মজ্ঞ, আমাদের বস্ত্র ফিরিয়ে দাও, না হলে রাজাকে বলে দেব। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, শুচিস্মিতাগণ, তোমরা যদি আমার দাসী হও এবং আজ্ঞাবাহী হও, তা হলে আমি তোমাদের বলছি এখানে এসে নিজের নিজের বস্ত্র নাও, আমার কাছে এসে না নিলে কখনই দেব না। রাজাকে বলে দিলেই বা ক্ষতি কি? রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে আমার কি করবেন? এভাবে গোপকুমারীরা শীতে কষ্ট পাচ্ছিলেন, তাঁরা হাত দিয়ে যোনিদেশ আচ্ছাদিত করে জলাশয় থেকে উঠলেন। ভগবান তাঁদের অক্ষত বিশুদ্ধ ভাব দেখে প্রসন্ন হলেন এবং তাঁদের বস্ত্রগুলি কাঁধে রেখে হাসতে হাসতে বললেন, তোমরা ব্রতপালন করতে করতে বিবস্ত্রা হয়ে জলে স্নান করেছ, তাতে দেবতাকে অবহেলা করা হয়েছে। সেই পাপ দূর করার জন্য মাথায় অঞ্জলী ধারণ করে নতমস্তকে প্রণাম কর, তারপর বস্ত্র নিও। বিবস্ত্রা হয়ে অবগাহনে ভগবান অচ্যুত এরকম দোষ আরোপ করায় কুমারীরা মনে করল হয়তো তাঁদের ব্রত ভঙ্গ হয়েছিল। তাই তাঁরা ব্রতের পূর্ণতা কামনা করে সমস্ত অনুষ্ঠানের সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ সেই ভগবান দেবকীসুতকেই প্রণাম করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের ভক্তি দেখে বস্ত্রগুলি ফিরিয়ে দিলেন। ১২-২১

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজকুমারীদের বঞ্চনা ও উপহাস করলেও, লজ্জা জলাঞ্জলী দেওয়ালেও, বস্ত্রহরণ করলেও এমনকি তাঁদের ক্রীড়াপুত্তলিকার মত পরিচালনা করলেও সেই সব কুমারীরা দোষদৃষ্টিতে তাঁকে দেখলেন না। কারণ প্রিয়সঙ্গে তাঁরা সুখী হয়েছিলেন। বস্ত্র পরেও তাঁরা সেখান থেকে চলে গেলেন না, কারণ প্রিয়-সঙ্গমে বশীভূত হয়ে তাঁদের মন আকৃষ্ট হয়েছিল; তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সলজ্জ দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। ভগবান দামোদর তাঁর পাদস্পর্শ কামনায় নারীরা ব্রতপালন করেছেন এই উদ্দেশ্য জানতে পেরে বললেন, সাধ্বীগণ, তোমরা আমার অর্চনা করেছ, তোমাদের মনোরথ আমি অনুমোদন করে নিলাম, তা সত্য হবার যোগ্য। যাদের চিত্ত আমার প্রতি আবিষ্ট হয় তাদের কামনা সাংসারিক বিষয়-ভোগে পরিণত হয় না। পাকা বা ভাজা বীজের যেমন অঙ্কুরোদ্গম হয় না, অবলাগণ, তোমরা সিদ্ধ হয়েছে, এখন ব্রজে যাও। আগামী রজনীতে আমার সঙ্গে ক্রীড়া করতে পারবে। এই জন্যই তোমরা কাত্যায়নীর অর্চনা করেছিলে।"২২-২৮

মাত্র মিনিট দশেক সময় গেল এই বস্ত্রহরণ ঘাটে। রিক্সা থেকে নেমে ঘুরে দেখতে আসতে যতটুকু সময়—ততটুকুই লাগলো এখানে। আবার রিক্সা চলতে শুরু করলো।

আজকের বৃন্দাবন দেখছি আমি—অতীত দেখেছেন তাঁরা—যাঁরা এসেছিলেন

অতীতে। তাঁদের জীবনী বা লেখা থেকেই জানতে পারা যায় অতীত বৃন্দাবনের কথা। আজ থেকে একশো বছর আগের কথা। শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীকে বৃন্দাবনে থাকাকালীন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এক আশ্চর্য পাখীর কথা বলেছেন এইভাবে,
"কোন একটি ঋতুতে, উত্তর দেশ থেকে এক শ্রেণীর পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে শ্রীবৃন্দাবনে আসেন। ঐ পাখী সকল, 'রাধাশ্যাম,' 'রাধাশ্যাম' বলে ডাকেন। এমনই সুস্পষ্ট স্বরে 'রাধাশ্যাম,' 'রাধাশ্যাম' বলেন যে, শুনে অন্য কিছু মনে করা যায় না। শ্রীবৃন্দাবনে ঐ পাখীকে 'রাধাশ্যাম' পাখী বলে। একবার একটি ব্রজবাসী, কৌশলক্রমে দুটি রাধাশ্যাম পাখী ধরলেন। কিন্তু একটি উড়ে গেলেন, অপরটিকে ব্রজবাসী একটি পিঞ্জরায় পুরে রাখলেন। খাবার দিলেন, পাখীটি পিঞ্জরায় বন্ধ হয়ে খাওয়া ত্যাগ করলেন। আর সে ডাকও নাই, পাখীর স্ফূর্তিও নাই। পরদিন প্রত্যূষে দলে দলে রাধাশ্যাম পাখী এসে ব্রজবাসীর কুঞ্জে পড়ে, 'রাধাশ্যাম', 'রাধাশ্যাম' বলে ডাকতে লাগলেন! পাড়ার সব ব্রজবাসীরা তখন ঐ ব্রজবাসীকে ধমক দিয়ে বললেন, অবিলম্বে তুমি ঐ পাখীটি ছেড়ে দাও। না হলে তোমার সর্বনাশ হবে! দেখ, দলের সমস্ত পাখীগুলি এসে উহার জন্য 'রাধেশ্যাম', 'রাধেশ্যাম', বলে ডাকছে। তখন ব্রজবাসী পাখীটি ছেড়ে দিলেন।"
"শ্রীবৃন্দাবনে কাক কোথাও দেখলাম না। আমিষ ভক্ষণ নাই বলেই, ওখানে কাক নাই। আমিষ খাওয়া আরম্ভ হলেই কাক যেয়ে উপস্থিত হবে। ব্রজভূমির ন্যায় হিংসাশূন্য স্থান আর কোথাও দেখা যায় না। এজন্য বনের পশুপক্ষীও মানুষের গা ঘেঁসে চলতে কোন শঙ্কা করে না। যার ভিতরে হিংসা, তারই নিকটে ভয়।"
সত্যিই তাই, আজও বৃন্দাবনে একটা কাকেরও দেখা পাওয়া যায় না। সামান্য সময়ের মধ্যেই রিক্সা এসে দাঁড়ালো একটা তেমাথা পথের মোড়ে। দুপাশে সারি সারি দোকান। কোথাও মিষ্টি কোথাও বা বিক্রি হচ্ছে তুলসী কাঠের সুন্দর সুন্দর মালা। বেশ জমজমাট এলাকা। ডানদিকে একটা, আর একটা রাস্তা চলে গেছে বাঁ-দিকে। সামনেই বিশাল প্রবেশদ্বার—এলাম বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ শাহজীর মন্দিরে। রিক্সা দাঁড়িয়ে রইলো। নেমে প্রধান ফটক পার হতে দেখলাম বিশাল প্রাঙ্গণ। পরিষ্কার ঝকঝক করছে। ডান পাশে ফুলের বাগান—সাজানো সুন্দর। অনেক-গুলি ফোয়ারা রয়েছে এই প্রাঙ্গণে। বাঁ পাশেই বিশাল মন্দির। অল্পকিছু সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতেই বাঁ-দিকে দেখলাম, কৃষ্ণের সুন্দর মূর্তি। ব্যস, মন্দিরে দেখার মতো এইটুকুই।
অপূর্ব সুন্দর এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে সাদা মার্বেল পাথরে। এর শিল্প নৈপুন্যও দেখার মতো—বিশেষ করে মন্দিরে সামনের থামগুলি। রেতিয়া বাজারে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন লক্ষ্ণৌ-এর সুপ্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী শাহ বিহারীলালের পুত্র শাহ কুন্দনলাল—১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। তখন এটির নির্মাণ ব্যয় হয় দশ লক্ষ টাকা। সারা বৃন্দাবনে এই মন্দির শাহজীর মন্দির বা টেরে-খম্ভুর

মন্দির নামেই প্রসিদ্ধ। আসলে এটির নাম ললিত কুঞ্জ। এই মন্দিরে জাকজমকপূর্ণ একটি কামরা রয়েছে—যার নাম বাসন্তী কামরা। মাঘ মাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে এই কামরা খুলে দেয়া হয় সকলের দেখার জন্য। প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমাতে এই মন্দিরে স্নানযাত্রা উৎসব হয়। এই উৎসব জলযাত্রা নামে খ্যাত। অসংখ্য যাত্রী সমাগম যেমন হয়—তেমনই বড় মেলা বসে এখানে।

শাহজী মন্দির থেকে বেরিয়ে এলাম। বাঁ-দিকেই পড়লো একটা রাস্তা। সামান্য একটু পথ এগিয়ে যেতেই ডানদিকে পড়লো একটা প্রবেশদ্বার। এটাই নিধুবনে ঢোকার প্রধান ফটক। টুকটুক করে ঢুকে পড়লাম নিধুবনে। চারদিকেই দেখছি ঝোপের মতো বন। তার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে গেছে রাস্তা—বনে ঘুরে দেখার জন্য। অনেকটা জায়গা নিয়ে পাঁচিলে ঘেরা নিধুবন। এখানে ঝোপের মতো গাছগুলির নাম পিলু গাছ।

নিধুবনের ডানদিকে এগিয়ে যেতেই দেখলাম একটি একতলা সমাধি মন্দির। তিনজনের সমাধি দেয়া রয়েছে এই মন্দিরে। মাঝখানে সঙ্গীত সম্রাট তানসেন এবং বৈজুবাওরার সঙ্গীত শিক্ষাগুরু স্বামী হরিদাসজীর সমাধি। বাঁ-পাশে গোস্বামী জগন্নাথজী আর ডান পাশের সমাধিটি বিঠ্ঠল বিপুলদেব যোগীর। একই মন্দিরে সমাধি দেয়া হয়েছে পাশাপাশি।

১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আলিগড়ে জন্ম স্বামী হরিদাসজীর। একদা সংসারজীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে বৃন্দাবনে চলে আসেন চিরতরে। ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীত প্রেমিক হরিদাসজী সঙ্গীতের সঙ্গে শুরু করেন হরিনাম—চলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। স্বামীজীর কৃষ্ণসেবার মধ্যে সখীভাবই মুখ্য হওয়ায় নারী শৃঙ্গারের নানা জিনিষ আজও রয়েছে এই নিধুবনের সমাধি মন্দিরে।

বৃন্দাবনে বসবাসকালীন স্বামী হরিদাসজী নিধুবনে সর্বদাই কাটাতেন ভজন করে। সমাধি মন্দিরের কাছেই রয়েছে বিশাখা নামে একটি কুণ্ড। কথিত আছে, একদা তিনি স্বপ্নাদেশে জানতে পারলেন কুণ্ডের মধ্যে রয়েছে একটি দেববিগ্রহ। অনুসন্ধান করে দেখলেন ঘটনা সত্য। বিগ্রহটি তুলে আনলেন কুণ্ড থেকে। তারপর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে স্থাপন করলেন সেই দেববিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি—বঙ্কুবিহারী নামে প্রসিদ্ধ করলেন হরিদাসজী।

শ্রীকৃষ্ণের বহু লীলার স্মৃতি নিয়েই বৃন্দাবন—রাধাকৃষ্ণের অমর প্রেমের স্মৃতি নিয়েই নিধুবন। সুন্দর প্রকৃতির বুকে বৃন্দাবনে নীরব নিধুবন তাঁদের চরণধূলি বুকে ধারণ করে ধন্য হয়েছে। কথিত আছে, একদা নিবিড় নির্জন এই বনে শ্রীকৃষ্ণ গুপ্তভাবে নিভৃতে বিহার করতেন শ্রীমতী রাধারানী সহ গোপবালাদের সঙ্গে। এখানেই শ্রীমতী রাধা রাজা হয়ে আনন্দ ও কৌতুক উপভোগ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারী সাজিয়ে।

এখানকার পুণ্য সরোবর বিশাখাকুণ্ডের পাড়েই রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন। প্রবাদ

আছে, নিভৃত এই কুঞ্জে কোন এক রাতে একটি কাক চিৎকার করে উঠলে ঘুম ভেঙ্গে যায় রাধার। ক্ষুব্ধ হয়ে রাধারাণী সমস্ত কাকদের তাড়িয়ে দেন বৃন্দাবন থেকে। সেই থেকে একটি কাকও বৃন্দাবনে দেখা যায় না আজও।

সাধুসঙ্গ—আত্মা ও দেবদেবীদের ভর প্রসঙ্গে

ঘুরতে ঘুরতে এলাম বিশাখা কুণ্ডের পাড়ে। ভাবলাম, কুণ্ডের জল একটু মাথায় দিয়ে আসি। ভাবামাত্রই তর্‌তর্‌ করে নেমে গেলাম বাঁধানো সিঁড়ি বেয়ে। কুণ্ডের জল একটু মাথায় ছিটিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম মিনিট খানেক। তারপর ধীরে ধীরে যখন উঠে আসছি—তখন চোখ পড়লো, দেখলাম এক সাধুবাবা বসে আছেন সিঁড়িতে—নামতে গেলে বাঁপাশে। তাড়াতাড়ি নামার জন্যে প্রথমে চোখে পড়েনি। সিঁড়িতে বসে আছেন আরও কয়েকজন। চেহারা আর পোশাকে কয়েক-জনকে স্থানীয়, আর কয়েকজনকে মনে হলো আমার মতোই যাত্রী। নিধুবনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেক তীর্থযাত্রী থাকলেও বিশাখা কুণ্ডে সেই তুলনায় অনেক কম। এখানে যারা বসে আছেন তারা সকলেই গল্পে মশগুল। অনেক জায়গা ঘুরে ক্লান্ত হয়েছেন বলেই হয়তো এখানে বসে একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন।

সাধুবাবা বসে আছেন সিঁড়ির একেবারে পাশে। এমন জায়গায়—যাত্রীদের কুণ্ডে ওঠানামায় কোন অসুবিধে হবে না। সাধুবাবা বয়েসে বৃদ্ধ। পঁচাত্তর থেকে আশির মধ্যে হবে বলে আমার মনে হলো। এখন গায়ের রঙ তামাটে। রোদে জলে অর্ধাহারে অনাহারে হয়তো এমনটা হয়েছে। এককালে যে ফরসা ছিল—এখনও দেখলে তা বোঝা যায়। মাথায় জটা রয়েছে ঝুঁটি করে বাঁধা। পরনে আধ ময়লা গেরুয়া বসন। সঙ্গের সাথী লোটা কম্বল আর ঝুলিটা তো আছেই।

সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতেই এসব লক্ষ্য করলাম। সাধুবাবাও লক্ষ্য করলেন আমাকে। আমার ভিতর থেকে কথা বলতে মন সায় দিল না। আজ বিশেষ কারণে একটু ব্যস্ত আছি। মনটাও আছে অস্থির হয়ে। হরিদ্বার আর বৃন্দাবন তো সাধুদের হাট। এ যাত্রায় এসে অনেক সাধুরই সঙ্গ করেছি কয়েকদিনের মধ্যে। তাই আর মনটাই চাইলো না বসি গিয়ে সাধুবাবার পাশে। এই সব ভেবে সাধু-বাবার পাশ কাটিয়ে কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতেই সাধুবাবা বললেন,

—এই বেটা, শোন্‌।

বুঝতে পারলাম তিনি ডাকছেন আমাকেই। দাঁড়ালাম। ভাবছি, বসবো কি না! বসলে চট্‌ করে উঠতে পারবো না। সাধু দেখলে উপযাচক হয়ে আমিই বসি। আজ কিন্তু কিছুতেই মন চাইছে না। অপ্রত্যাশিত ভাবে সাধুসন্ন্যাসীদের পেয়েছি বিভিন্ন জায়গায়। তবে এমনভাবে তাঁরা ডেকেছেন খুব কমই। হাতে গুনে বলা

যায়। এই মুহূর্তে ভাবছি, এমন হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবো? আবার ভাবছি, ওদিকে আমার জন্যে বসে থাকবে সকলে—কাজটা আটকে যাবে। এই কথা ভাবতে ভাবতেই নেমে এলাম কয়েক ধাপ। দাঁড়ালাম সাধুবাবার সামনে। তাকিয়ে রইলাম মুখের দিকে। আমার কোন প্রশ্ন নেই। সাধুবাবাই হাসি মুখে বললেন হিন্দিতে,
—কিরে বেটা, একগাল দাঁড়ি নিয়ে অত ব্যস্ত হয়ে চললি কোথায়? এত অল্প বয়েসে কত শত সাধুসঙ্গ করলি আর আমার সঙ্গে দু-চারটে কথা হবে না?
কথাটা শুনে একটু দমে গেলাম। কিছু বললাম না। দাঁড়িয়েই রইলাম। এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না—বসবো, না চলে যাবো! সাধুবাবাই বললেন,
—আরে বেটা, এত ভাববার কি আছে? মন চায় তো বোস, নইলে চলে যা। আমি তোকে জোর করছি না বেটা। আমি তোর কাছে অর্থ চাইছি না—ডাকছিও না অর্থের জন্যে। আসলে তুই সাধু ভালোবাসিস্ তাই ডাকছি তোকে। অর্থের জন্য নয়। লোভীরা ভালোবাসে অর্থ, সংসারে কামুক পুরুষ যারা—তারা সব সময়েই ভালোবাসে নারী, সাধুসন্ন্যাসীরা ভালোবাসে ভগবানকে, আর সংসারে থেকেও যারা সাধুকে ভালোবাসে—তারা তো পরোক্ষে ভগবানকেই ভালোবাসে। সেই জন্যেই বেটা তোকে ডাকছি। অমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে কথা হবে কি করে—বোস্ না বোস।
কথাটা এমন আন্তরিকতার সুরে বললেন সাধুবাবা—আমি আর উপেক্ষা করতে পারলাম না। বিবশভাবে বসে গেলাম সাধুবাবার মুখোমুখি হয়ে। এতক্ষণ প্রণাম করার কথা মনেই ছিল না। আসলে নিজের মনের ইচ্ছা ছিল না বলেই ওকথা স্মরণে ছিল না। বসা অবস্থায় প্রণাম করলাম সাধুবাবাকে। প্রণাম করতেই সাধুবাবা দুটো হাত মাথায় দিয়ে বললেন,
—যতদিন বেঁচে থাকবি, ততদিন তোর সমস্ত কর্মে সিদ্ধিলাভ হোক—এই আশীর্বাদ করি। তোর জন্যে ছোট্ট এই প্রার্থনাটুকু রইলো আমার গুরুজীর কাছে।
সাধুবাবার মুখে এমন দুর্লভ আশীর্বাদের কথা শুনে ভিতরে ভিতরে আমার কান্না পেয়ে গেল। আবেগে জলে ভরে উঠলো আমার চোখ দুটো। মুখ থেকে একটা কথাও সরলো না আমার। ভাবছি, আজ এই সাধুবাবাকে এড়িয়ে গেলে এমন আশীর্বাদের কথাটা তো শোনা হতো না কখনও। এই মুহূর্তে একটা প্রশ্নও এলো না আমার মাথায়। সাধুবাবা বললেন,
—গালে দাড়ি রেখেছিস্ কেন?
এতক্ষণ পর এই প্রথম কথা বললাম,
—ভালো লাগে, তাই।
আবার প্রশ্ন করলেন,
—সংসারে এত কিছু থাকতে তোর দাড়ি ভালো লাগলো কেন?

এর উত্তর আমার জানা নেই। এবার উল্টে আমিই বললাম,

—এ-প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারবো না। আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে। সাধু-সন্ন্যাসীরা দাড়ি জটা রাখেন কেন—সে কথাই বলুন না আপনি।

সাধুবাবার সঙ্গে আমার বসা বা কথা বলার ব্যাপারে আর যারা বসে আছেন—তাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তবে আমার মতো অনেকেই আসছেন, একটু বসছেন—চলে যাচ্ছেন। কেউ বা নেমে কুণ্ডের জল ছিটিয়ে দিচ্ছেন মাথায়। সাধুবাবার সঙ্গে কথার ফাঁকেই এসব লক্ষ্য করলাম। তবে এক ভদ্রমহিলাকে দেখলাম, স্বামী পুত্র দাঁড়িয়ে রয়েছে সিঁড়ির একেবারে উপরে। তিনি কুণ্ডে নেমে প্রথমে নিজের মাথায় জল ছিঁটালেন। তারপর হাতে কোষ করে একটু জল এনে ছিঁটিয়ে দিলেন স্বামী পুত্রের মাথায়। ভাবলাম, এটাই বোধ হয় ভারতীয় নারীর ধর্ম। স্বামী সন্তানের মঙ্গল কামনায় এদের চাইতে আর বোধ হয় কেউ ভাবে না বেশী। এই মহিলাকে দেখে মনে পড়ে গেল ছোটবেলার কথা। বিজয়া দশমীর দিন বিকেলে ষষ্ঠীতলার মন্দিরে বেদী থেকে নামানো হয়েছে দুর্গা প্রতিমাকে। মা সিঁদুর, মিষ্টি ইত্যাদি নিয়ে গেলেন। আসার সময় আঁচলে মাখিয়ে নিয়ে এলেন মাটির প্রতিমার পায়ের ধুলো। তারপর বাড়ীতে এসে বাবা ভাই বোন সকলের মাথায় বুলিয়ে দিলেন আঁচল। ভাবটা এমন, স্বয়ং মাদুর্গার আশীর্বাদ এনেছি আঁচলে করে। বাড়ীতে ভাইবোনদের কেউ উপস্থিত না থাকলে কাপড় ছেড়ে রেখে দিতেন সযত্নে। তাদের কেউ আসার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে গিয়ে কাপড় এনে ছুঁয়িয়ে দিতেন মাথায়। ভদ্রমহিলাকে দেখে মনে পড়ে গেল মায়ের কথা। এমন না হলে মা নাকি! ঠাকুমাকে চোখে দেখিনি কখনও, তবে তিনিও নিশ্চয় আমার মায়ের মতো করতেন আমার বাবাকে—যা দেখে শিখেছেন আমার মা। আর এখন!

আমার ভাবনার সুতোটা কেটে দিয়ে সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, জটাটা জানবি ভগবানের আশীর্বাদ। সকলের হয় না। একশ্রেণীর সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা মাথা ন্যাড়া করেন—গোঁফ দাড়ি রাখেন না। আর সাধুদের একটা শ্রেণী আছে, যারা চুল দাড়ি কাটে না গৃহত্যাগের পর থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত। এর পিছনে যথেষ্ট কারণ আছে বেটা।

এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা একটু থামলেন। আমি আর তর সইতে না পেরে বললাম,

—কি কারণ বাবা?

মাথা দোলাতে দোলাতে হাসিমাখা মুখে সাধুবাবা বললেন,

—জগতের সমস্ত নারী পুরুষের রূপ সৌন্দর্য ও দেহের আকর্ষণ বৃদ্ধিতে মাথার কেশের অবদান প্রথম। যত সুন্দরী রমণীই হোক না কেন বাবা, তাকে ন্যাড়া মাথা করে দিলে কি কোন পুরুষের চোখে সে দেখতে ভালো লাগবে? শুধু পুরুষ কেন—মেয়েদের চোখেও কোন ন্যাড়া মাথা

মেয়েকে দেখতে ভালো লাগবে না। আসলে নারীর আকর্ষণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য সন্ন্যাসীরা নিজের রূপ সৌন্দর্যের প্রধান আকর্ষণ কেশ পরিত্যাগ করেন ন্যাড়া মাথা হয়ে। কেশহীন মাথা আর গেরুয়া বসন সন্ন্যাসীকে সংযত করতে সাহায্য করে সাধন জীবনের পরিপন্হী নারী আকর্ষণকে। সংসারে কেশের পরিচর্যা তো বাবা একের প্রতি অপরের—নারীর প্রতি পুরুষ—পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্যে। সাধুদের মাথায় জটা আর গাল ভর্ত্তি দাড়ি সংযত করে মনকে—নিবৃত্ত করে সেই সব কাজ থেকে, যে কাজ সাধু হয়ে করা উচিত নয়। পুরুষের সাধারণ রূপ সৌন্দর্য সকল নারীর কাছেই আকর্ষণীয়। কিন্তু কোন নারীই স্বপ্নে কখনও কল্পনাও করতে পারে না তার প্রেমিক বা স্বামীর মাথায় লম্বা লম্বা জটা আর গালভর্তি বড় বড় দাড়ি থাকুক। তাহলে বেটা বুঝতেই পারছিস্, নারীর আকর্ষণ মুক্ত হওয়ার জন্যেই সাধুদের দাড়ি জটা। কোন নারী কখনই চট্ করে পার্থিব কামনা নিয়ে প্রলুব্ধ হবে না দাড়ি জটা দেখে। অর্থাৎ সাধুর এই বেশ সংযত করে নারী মনকেও।

এই পর্যন্ত বলে বেশ হাসতে হাসতে সাধুবাবা বললেন,

—লম্বা লম্বা জটা আর বড় বড় দাড়ি নিয়ে কোন যুবক সাধুরও চট্ করে হিম্মত হবে না কোন নারীকে কাছে পেতে বা প্রেম নিবেদন করতে। অর্থাৎ বেটা, মাথায় কেশ না থাকা অথবা মাথায় জটা আর দাড়ি থাকা জানবি সব বিষয়ে সংযত ও সংযমতার কবচ।

সঙ্গে সঙ্গেই বললাম,

—এ-তো বাবা সাধুসন্ন্যাসীর বাহ্য সংযমের কথা আপনি বললেন। সন্ন্যাসীদের ন্যাড়া মাথায় আর সাধুদের দাড়ি জটা নিয়ে মনে মনে নারীতে আকর্ষণ অনুভব, প্রলুব্ধ হওয়া বা কোন নারীতে কামনা মিশ্রিত বা কামনাহীন ভালোবাসাও তো জন্মাতে পারে। এ সম্পর্কে আপনি কি বলবেন ?

সাধুবাবাও উত্তর দিলেন মুহূর্তে দেরী না করে,

—হাঁ বেটা, তোর কথা ঠিক। জন্মাতে পারে বৈ-কি! তবে তা একেবারেই তাৎক্ষণিক এবং সেটা তাৎক্ষণিক সঙ্গ দোষেই হতে পারে। কখনও কখনও ওগুলো থাকা সত্ত্বেও একের সঙ্গে অপরের মনের একটা যোগাযোগ সৃষ্টি হতে পারে তবে সরাসরি দেহের যোগাযোগে ওই দাড়ি-জটা আর ন্যাড়া মাথা বাধা দেবেই দেবে। এ-পথে একেবারে হতভাগ্যের কথা ছেড়ে দে।

উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, সাধুবাবার যুক্তিটা আমার কাছে খারাপ লাগলো না। টেকো মাথার চেয়ে ঘন কালো চুলভর্তি মাথা যে দেখতে ভালো, অনেক আকর্ষণীয় —এ সত্যকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এবার তিনি বললেন,

—বেটা, সাধুদের জটা দেখতে পাবি তিন রকমের। পিঠ বেয়ে নেমে যাওয়া লম্বা লম্বা জটা আছে এক রকমের। এই জটার নাম হচ্ছে শম্ভু জটা। ভগবান শংকরের

মূর্তিতে দেখা যায়। এই জটাগুলি মাথার মাঝখানে কুণ্ডলী করে পাকানো থাকে না। আর এক ধরনের জটা আছে, সেগুলিও অনেক থাকে কিন্তু কোমর ছাড়িয়ে লম্বা লম্বা জটা নয়—ছোট ছোট। এর নাম বারবান্ জটা। এই জটাগুলি তুই হামেশাই দেখতে পাবি সাধারণ সাধুদের মাথায়। আর এক ধরনের জটা আছে—মাথার উপরে পাকিয়ে পাকিয়ে পাগড়ীর মতো করে বাধা। এই জাতীয় জটার নাম নাগ জটা। মূলত নাগা সন্ন্যাসীদের মাথায় তুই ওই ধরনের জটা দেখতে পাবি।

সাধুবাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, বারবান্ জটা মানে কি ?

হাসতে হাসতে বললেন,

—ওগুলো বেটা, এক এক ধরনের জটার এক এক রকম নাম। আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য বা মাহাত্ম্য কিছু নেই। যেমন ধর্ সাধুসন্ন্যাসীরা যে কৌপীন ধারণ করে সেই কৌপীনেরও একটা নাম আছে—নাগফণী।

সাধুবাবার মাথার জটা দেখে বুঝতে আমার বাকি রইলো না, ইনি নাগা সন্ন্যাসী এবং মাথায় যে জটা রয়েছে সেটি নাগ জটা। ওদিকে আমার যাওয়া হয়নি বলে প্রথম দিকে মনটা বেশ অস্থির ছিল—এখন আর নেই। একেবারে স্থির হয়ে মনটা আমার কথা শুনছে সাধুবাবার। আমার এই মুহূর্তের ভাবটা লক্ষ্য করেই হয়তো সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, সংসারে সবই দুঃখের—শুধু দুটি বিষয় ছাড়া। একটা হলো, সৎ ও সাধুসঙ্গ আর একটা হলো, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ বা শোনা। এ দুটিই পরম তৃপ্তির। সংসারে মনের তৃপ্তিতে এ-দুটি ছাড়া আর কিছুই নেই। সংসারে আছিস্, হাজার কাজের মধ্যেও প্রতিদিন সময় করে এগুলি করলে আর যাই হোক ক্ষতি কিছু হয় না। কিন্তু এমনই সংসারীদের পোড়া কপাল—এটুকু করাতেও তাদের রুচি নেই।

এবার হাসি ফুটে উঠলো সাধুবাবার মুখে। বললেন,

—বেটা, একটা কথা প্রচলিত আছে। সারাজীবনে সংসারীদের সবকিছু করার সময় মেলে কিন্তু ঈশ্বর চিন্তার সময় মেলে না। কেমন জানিস্ ? ছোটবেলাটা কাটে খেলাধুলা আর পড়াশুনায়—সুতরাং ওই সময়টা ছেড়ে দে। যৌবনে যুবক যুবতী—একে অপরের মিলন পিয়াসী আর আত্মপ্রতিষ্ঠার চিন্তা নিয়ে সময় কাটায়—সুতরাং তখনও ঈশ্বর চিন্তার সময় নেই। অবশেষে বুড়ো বয়েসে বুড়োবুড়িদের সময় কাটে রোগ-ভোগ আর হাজার রকমের চিন্তায়। তাই সারাজীবনে সংসারীদের ভগবানকে ডাকার সময় কোথায় !

সাধুবাবা থামলেন। একটা প্রশ্ন আমার মাথায় সাধুবাবাকে প্রণাম করার পর থেকে ঘুরপাক খাচ্ছিল। সেটা কথার পৃষ্ঠে কথা হওয়াতে জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। এবার সুযোগ এলো। জানতে চাইলাম,

—বাবা, আপনাকে প্রথমে প্রণাম করার পর আপনি আশীর্বাদ করে আবার প্রার্থনা করলেন গুরুজী অর্থাৎ ভগবানের কাছে। আমার জিজ্ঞাসা, আশীর্বাদই যখন করলেন তখন আবার প্রার্থনার কি প্রয়োজন ?

প্রশ্নটা শুনে সাধুবাবা একটু ভেবে নিয়ে বললেন,

—বেটা, ঠিক তোর মতো আমিও একজন। তুই ঘরে আর আমি বাইরে, তফাৎ শুধু এইটুকুই। আমি তো শুধু আশীর্বাদরূপী কিছু বাক্যের প্রয়োগ করলাম কিন্তু তা কার্যকরী করার শক্তি তো রয়েছে গুরুজী বা ভগবানের হাতে। তাই আমার আশীর্বাদ বাক্য তোর উপর কার্যকরী করার জন্য প্রার্থনা করলাম তাঁর কাছে।

কথাটা বলেই কি যেন একটা ভাবলেন। মুখটা দেখেই তা মনে হলো। ভুরুটা একটু কুঁচকে সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, গৃহীদের হঠাৎ করে কোন প্রার্থনা করতে নেই ভগবানের কাছে। মানুষের বাক্য ও মনের মধ্যে নিহিত রয়েছে এক মহাশক্তি—যা প্রকাশ পায় প্রার্থনায়। মানুষের সব ব্যাপারে বোধশক্তি কম। প্রার্থনার ভালো মন্দ বোঝার মতো শক্তি অনেক বিদ্বান বুদ্ধিমান এমনকি অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিরও নেই। আপাতদৃষ্টিতে ভগবানের কাছে করা কোন প্রার্থনা শুভ মনে হলেও তার ফল মারাত্মক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ মনে কর, মরণাপন্ন সন্তানের প্রাণ রক্ষার্থে কোন বাবা মা আকুল প্রার্থনা জানালো ভগবানের কাছে। ভক্তের প্রার্থনা মঞ্জুর করতে ভগবান সব সময়েই প্রস্তুত। প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন তিনি। মরণাপন্ন সন্তান বেঁচে উঠলো। কালে কালে দেখা গেল সেই সন্তানই হলো হত্যাকারী বা এমন চরিত্রের—যাতে প্রার্থনাকারী বাবা মায়ের শান্তি নষ্ট হলো চিরকালের জন্যে। সুতরাং ভক্ত গৃহীর ভালো মন্দ দেখার দায়িত্ব ভগবানের। আমাদের ভালো মন্দের কতটুকুই বা বুঝি আমরা! সুতরাং প্রার্থনার দরকার নেই বেটা। তিনি তো দেখছেন—রয়েছেনও সঙ্গে! আমার কোনটা প্রয়োজন, সেটা আমার চেয়ে তিনি অনেক বেশী জানেন—বোঝেনও। প্রয়োজনে আমার প্রয়োজনটা তিনিই মিটিয়ে দেবেন। একমাত্র নিজের বা পরের আত্মিক কল্যাণের প্রার্থনা ছাড়া আর অন্য কোন প্রার্থনা করতে নেই ভগবানের কাছে।

এ-বিষয়ে এখন আর কোন প্রশ্ন এলো না মাথায়। কুণ্ডের সিঁড়িও অনেক ফাঁকা হয়ে গেছে। সাধুবাবা এতক্ষণ আমার দিকে মুখ করে কথা বলছিলেন সিঁড়ির নীচের ধাপে পা রেখে। আমি বসে আছি মুখের দিকে চেয়ে। সাধুবাবা এবার পা দুটো লম্বা টান টান করে দিলেন। অনেক দিনের একটা প্রশ্ন ছিল মাথার মধ্যে। চট্ করে মনে পড়ে না—খেয়ালও থাকে না একেবারে। হঠাৎ মনে পড়তেই সাধুবাবাকে বললাম,

—বাবা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো—উত্তর দেবেন ?

হাসি মুখেই সম্মতি জানালেন মাথা নেড়ে। অভয় পেয়ে বললাম,
—বাবা, আপনি 'ভর'-এ পড়া বিশ্বাস করেন, দেখেছেন কখনও ?
ভর কথাটা শুনে সাধুবাবা তাকালেন আমার মুখের দিকে। জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভর' কথাটা কি ? আর আমি নিজেও জানি না ভর শব্দের হিন্দি প্রতিশব্দ। বেশ মুশকিলে পড়ে গেলাম। অবশ্য এমনটা অনেক সময়েই হয়েছে হিন্দিভাষী সাধুদের সঙ্গে কথা বলার সময়। পরে অবশ্য অসুবিধে হয় না কথাটা অন্যভাবে বলা বা বোঝানোর জন্যে। সব হিন্দির মানে বুঝি না অনেক সময়, বলতে গিয়েও কথা আটকে যায়। ভর কথাটাকে অন্যভাবে বুঝিয়ে বলতেই সাধুবাবা মাথা নেড়ে জানালেন,
—হাঁ বেটা, অভি মেরা সমঝ মে আয়া।
এবার সাধুবাবা বললেন,
—হাঁ বেটা, ভর-এ পড়া নারী এবং পুরুষ আমি জীবনে দেখেছি বেশ কয়েকবার। এটা আমি বিশ্বাস করি।
এবার আমি বললাম,
—বাবা, আমি আগে এ-সব ব্যাপারে খুব কৌতূহলী ছিলাম। যখন যেখানে ভরে পড়ার কথা শুনতাম, তখনই ছুটে যেতাম সেখানে। নারী পুরুষ উভয়কেই দেখেছি ভরে পড়তে। তবে ভরে পড়ার ক্ষেত্রে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। এবার আমার অভিজ্ঞতার কথা বলি। যারা ভরে পড়েন তাদের মুখ থেকে অনেককে অনেক কথাই বলতে শুনেছি আমি। নিজের জীবন সম্পর্কে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেছি—দেখেছি, তাদের বলা অনেকের কথা মিলে গেছে অদ্ভুত ভাবে—অক্ষরে অক্ষরে। শুনলে কেউ বিশ্বাস তো করবেই না, ভাবতেও পারবে না কল্পনাতে। আবার এমনও দেখেছি, অনেক জায়গায়—ভরে পড়া অবস্থায় বলা কথার একটা অক্ষরও মেলেনি। তাই বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দোলায় আমি দুলছি। এটা কেমন করে হয়, কি করে হয়, কেন অনেক সময় কথাগুলি সত্য হয়, কেন অনেক সময় হয় না—এর অন্তর্নিহিত সত্য ও রহস্যটা কি দয়া করে জানাবেন ?
কথাটা শুনে সাধুবাবার মুখখানা দেখলাম খুশীতে ভরে উঠলো। হাসিভরা মুখে বললেন,
—হাঁ বেটা, তুই ঠিকই বলেছিস্। তোর দুটো কথাই ঠিক। কখনও অদ্ভুত ভাবে ভরে পড়া অবস্থায় বলা কথা ঠিক ঠিক হয়, কখনও হয় না। কারণ আছে বেটা। প্রথমে বলি, ভর জিনিষটা কি ? মানুষের মধ্যে কোন কোন সময় এক বিশেষ শক্তির আবির্ভাব ঘটে। সেই আবির্ভূত শক্তি মানুষের সুখ দুঃখ ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু কথা বলে। সেই কথা কারও জীবনে সুন্দরভাবে মিলে যায়—কারও মেলে না। এখন কথা হলো, সেই বিশেষ শক্তিটা কি ? মানুষের মধ্যে অনেক সময় কিছু পরলোকগত আত্মার আবির্ভাব ঘটে। অশুভ আত্মার আবির্ভাবে প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের

উত্তর যা দেয় তা কখনও সঠিক হয় না। সাধারণ মানুষের মতো প্রশ্নকর্তার প্রশ্ন বুঝে তার উত্তর দেয়। কারণ এদের মানুষের অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যত বিষয়টা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকে। এমনকি নিকট বা সুদূর ভবিষ্যতের ঘটনাবলী অর্থাৎ কি হবে, না হবে—এই সব আত্মারা কিছুই জানতে পারে না বা জানে না, তাই এরা ভরের সময় এসে কিছু বললে তা আদৌ ঠিক হয় না। যখন ভরে পড়া কোন মানুষের কথা মিলবে না তখন বুঝবি কোন অশুভ আত্মা আবির্ভূত হয়েছিল ওই সময়।

এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা একটা হাই তুললেন। কোন কথা বলে কথার স্রোতকে বাধা দিলাম না। তিনি বললেন,

—ভরে অনেক সময় অনেক উন্নত বা শুদ্ধ আত্মার আবির্ভাব ঘটে। সে আত্মা কোন মহাপুরুষ বা সাধকের হতে পারে। এই সব আত্মারা মানুষের জীবন সম্পর্কে সবটা নয়—খুব সামান্য কিছু নিকট ভবিষ্যত বিষয় সম্পর্কে অবগত থাকেন। এই সব আত্মার স্তর ভেদে কিছুটা বেশী জানা থাকতে পারে তবে সম্পূর্ণ কখনই নয়। এই শ্রেণীর আত্মা ভরে এসে কারও সম্পর্কে কিছু বলেন না। যদি কিছু বলেন তা একান্তই মামুলি কিছু কথা এবং প্রশ্নকর্তার প্রশ্নকে এড়িয়ে অথচ সত্যকে বজায় রেখে এবং প্রায়ই তা উপদেশমূলক কথা। এক্ষেত্রে অতি নিকট ভবিষ্যতের কথা দু-একটি কখনও বললেও সুদূর ভবিষ্যতের কথা কিছুই বলেন না—জানলেও কিছু বলেন না, আত্মার স্তরভেদে অনেকে জানেনও না। অর্থাৎ এই জাতীয় আত্মার ভরে বলা কথা মেলা বা না মেলা বলতে পারিস্ সমান। মোটের উপর অমন কথা কোন কথাই নয়। তবে দয়া করে যদি তারা নির্দিষ্ট করে কিছু বলেন তা জানবি নিকট ভবিষ্যতের কথা এবং তা সত্য।

সাধুবাবাকে উপেক্ষা করে যদি চলে যেতাম তাহলে আজ অনেক কথাই জানা হতো না। জীবন সময় চলে যায় মানুষের—অথচ অসম্পূর্ণ থেকে যায় জানাটা। তার মধ্যে যারা যেটুকুই জানতে পারে—লাভ তার সেটুকুই। অযাচিত সাধুসঙ্গ হয়েছে খুব কমই। যাচিত হয়ে সাধুসঙ্গই হয়েছে সব সময়ে। আজকের এই সাধুসঙ্গ আমার অতিরিক্ত লাভ। সাধুবাবা বললেন,

—অনেক সময় মুসলমানদের ভরও আমি দেখেছি। তাতে ওদের বলতে শুনেছি পীর বা কোন মুসলমান মহাত্মা এসে কথা বলেন। হিন্দুর সাধক মহাপুরুষদের স্তরের মতোই হয়তো কোন আত্মা হবেন তাঁরা। বেটা, ভরে অপদেবতা বা সাধক মহাপুরুষেরা অনেক সময় আসেন তবে উপদেবতা কখনও সাধনে সিদ্ধিলাভ ভিন্ন আসেন না। ভরে তো আসেনই না।

একটু থেমে আবার বললেন,

—বেটা, দেবদেবীদের অনেক পার্ষদ আছে। যেমন ধর্ শিবের নন্দী ভৃঙ্গীর মতো বিভিন্ন দেবদেবীর—কারও অনেক, কারও অল্প কিছু পার্ষদ থাকে। অনেক সময়

ভরে সেই সব দেবদেবীদের কোন পার্ষদ এসে উপস্থিত হয়। এরা প্রধানত নিজের নাম উল্লেখ করে না। যেমন ধর, ভরে নন্দী এলো। তোরা জিজ্ঞাসা করলি—উত্তরে নন্দী বললো, 'আমি বাবা মহাদেব এসেছি।' আসলে ভরে কে আসছে বা যাচ্ছে তা কেউই জানতে পারছে না। তারা যা বলছে—প্রশ্নকর্তা মহাদেবের কথা বলেই বিশ্বাস করছে। এই রকম প্রচলিত দেবদেবীদের এমন বহু পার্ষদ আছে—যারা নিজের নাম গোপন করে দেবদেবীদের নাম করে। ভরে যার উপর এরা আসছে—সে ব্যক্তি নিজেও জানে না কে আসছে। এই সব পার্ষদেরাও কিন্তু অনেক শক্তির অধিকারী। এরা কিছু কথা ঠিক ঠিক বলে আর কিছু প্রশ্নের উত্তর যদি সে দেখে হতাশমূলক তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মন রক্ষার জন্য মিথ্যা কথা বলে। এরাও অতি নিকট ভবিষ্যতের অনেক কথা জানে এবং বলতে পারে তবে সুদূর ভবিষ্যতের কথা এদেরও অনেকে দেবদেবীদের নিকট-দূরের অবস্থান ভেদে বলতে পারে, আবার অনেকে পারে না। তাই ভরে পড়া অবস্থায় এদের অনেকের কথা কিছু ঠিক হয়, অনেকক্ষেত্রে হয় না।

এপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, আপনি বললেন পার্ষদদের অনেকে কিছু জানা সত্ত্বেও মিথ্যা কথা বলে মন রক্ষার জন্য—কেন বলে এবং তাদের কি স্বার্থ আছে মিথ্যা কথা বলায় ?

উত্তরে সাধুবাবা জানালেন,

—ওদের স্বার্থ কিছু নেই। তবে তারা বলেই থাকে। যেমন ধর, কেউ মহাদেবের ভক্ত। ভরে মহাদেব এলেন না। এলেন তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের কেউ একজন। এবার ভরে তার কাছে কেউ প্রশ্ন করলো। সে প্রশ্নের উত্তরটা ধর অশুভ সূচক। এখন সেই অশুভ কথাটা শুনলে প্রশ্নকর্তা মানসিক দিক থেকে ভেঙে পড়বে বা তার মনোকষ্টের কারণ হবে বুঝে সেই প্রশ্নের উল্টো-পাল্টা উত্তর দেয়, অনেক ক্ষেত্রে এড়িয়ে যায়, নইলে মিথ্যা কিছু বলে। যেমন ধর, আমি দেখেছি, কোন প্রশ্নকর্তা কঠিন ব্যাধিতে ভুগছে। সে প্রশ্ন করলো তার রোগ আরোগ্য হবে কিনা ? এখন সে প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর হলো ধর্—না, রোগ মৃত্যু পর্যন্ত ভালো হবে না। শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ তার আমৃত্যু থাকবে। ভরে এ প্রশ্নের উত্তর মিথ্যা কথাই বলে মন খারাপ হবে বলে। তখন ধর এই রকম উত্তর দিল—'ওষুধ খা, ভগবানকেও ডাক, ধীরে ধীরে ভালো হয়ে যাবে।' একথায় প্রশ্নকর্তা রুগী মনের জোর পেল, হতাশ হলো না। তবে রোগ যন্ত্রণার উপশমও কিছু হলো না। পরবর্তীকালে এরাই বলে, ভরে বলেছিল রোগ ভালো হয়ে যাবে কিন্তু আমার কিছুই হলো না। অনেক সময় ভরে বিভিন্ন গাছগাছড়া, ওষুধপত্তর বা বিভিন্ন পুজোপাটের কথাও বলে। এখানেও সেই একই কথা বেটা, যার কাজ হবে—তাকে দিল, দেখা গেল সত্যিই কাজ হলো। আবার যার কোন কাজ হবে না—জেনেও তাকে দিল মনের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য। তার তো কাজ হলোই না। ভরের বিষয়ে প্রায় সবক্ষেত্রেই

এরকম জানবি।

সঙ্গে সঙ্গেই বললাম সাধুবাবাকে,

—তাহলে তো ভরের কোন ল্যাজা মাথাই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সাধক মহাপুরুষ, অশুভ আত্মা দেবদেবীদের পার্ষদ—এদের মধ্যে কারা ভরে আসছে, বলছে, চলে যাচ্ছে—তার তো কোন হদিশই পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ সাধারণ মানুষ তো এদের চোখেই দেখতে পাচ্ছে না এবং তারা সকলের ধরা ছোঁয়ার একেবারে বাইরে। এখন তো দেখছি, ভরে পড়া অবস্থায় বলা কথাগুলি সব সত্য মিথ্যা মিলিয়ে—যেগুলির কিছু সত্য হতে পারে আবার সব কথা একেবারে মিথ্যাও হতে পারে!

আমার কথাগুলি মন দিয়ে সাধুবাবা শুনলেন। টান টান করে রাখা পা-দুটো ভাঁজ করে সিঁড়ির নীচের ধাপে রাখলেন। এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন,

—বেটা, ভরে কিন্তু দেব দেবীদেরও আগমন ঘটে। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে তাঁদের আগমন হয় তাঁর বিশেষ ভক্তের প্রয়োজনে—সকলের কারণে বা প্রয়োজনে কখনই নয়। তাঁরা ভরে এলে থাকেন মাত্র তিরিশ সেকেণ্ড থেকে এক মিনিট—খুব বেশী হলে দেড় মিনিট। এর চেয়ে বেশী সময় কিছুতেই থাকেন না। এই সময়ের মধ্যে ভক্তের বিষয়ে যেটুকু প্রয়োজন তা বলে দিয়ে চলে যান এবং সেটা অব্যর্থ হয়। তাঁদের কথার একটি অক্ষরও মিথ্যা হয় না কখনও। প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের উত্তর যদি অশুভসূচক হয় তাহলে ক্ষেত্রবিশেষে তার কোন উত্তর দেন না, ভক্তের মন খারাপ হবে বলে। যদি উত্তর দেন, তবে তা যত অশুভসূচকই হোক না কেন, সরাসরি ঠিক ঠিক উত্তর দেন। দেবদেবীরা মিথ্যা বলেন না কখনও। দেবদেবীরা ছাড়া আর কেউই সর্বজ্ঞতা লাভ করে না। তাঁরা অতীত বর্তমান সুদূর ভবিষ্যত এবং মৃত্যুর পর প্রশ্নকর্তার কি হবে, না হবে তা সবই জানেন। প্রয়োজন মনে করলে প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের উত্তর দেন—নইলে দেন না। তবে মিথ্যা কথা বা মন রক্ষার জন্য কোন কথা তাঁরা বলেন না। সুতরাং তোর কথাই ঠিক এবং আমি নিজের অভিজ্ঞতাতে কয়েক জায়গায় ভর দেখে এই ধারণাই হয়েছে। তাতে আমি যেটুকু বুঝেছি, হাজারে এক-আধটা ক্ষেত্র ছাড়া ভরে দেবদেবীদের আগমন প্রায়ই ঘটে না এবং ঘটলেও তা বিশেষ ভক্তের জন্য, বিশেষ প্রয়োজনে এবং তা অতি—অতি স্বল্প সময়ের জন্য। আর একটা কথা বলে রাখি বেটা, দেবদেবীরা কোন ভক্তের প্রয়োজনে ভরে এলে কখনই তার কাছে কোন প্রশ্ন করেন না এবং কোন প্রশ্ন শোনার অপেক্ষায়ও থাকেন না। কারণ তাঁরা তো সব জেনেই বসে আছেন। ভরে এসে প্রয়োজনীয় উত্তরটুকু বলে দিয়ে তাঁরা চলে যান। যেখানে ভরে অনেকক্ষণ অথবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেবদেবীর অবস্থান বা স্থিতির কথা শুনবি বা দেখবি, সেখানে জানবি, মুক্তি দেয়ার মতো ক্ষমতাসম্পন্ন কোন দেবদেবীর আগমন ঘটেনি। এবং বেটা, সেখানে

ভর অবস্থায় বলা কথা কিছু মিলবে কিছু মিলবে না—আগে যে সব কারণগুলো বলেছি, সেইসব কারণ অনুসারেই।

সাধুবাবার কথায় এবং নিজের অভিজ্ঞতায় ভর অবস্থায় বলা কথা সত্য অথবা মিথ্যা হওয়ার মোটামুটি কয়েকটা কারণ জানতে পারলাম। এবার জানতে চাইলাম,

—এই ভর-টা কাদের হয়, কেন হয়? আমি দেখেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা মানুষ ভরে পড়ে থাকে—মহাশক্তিসম্পন্ন দেবদেবীদের কি খেয়ে দেয়ে আর কোন কাজ নেই? অশুভ আত্মা, সাধক মহাপুরুষ এবং দেবদেবী—এঁদের কার আগমনে কি রকম অবস্থা হয় ভরকারীর—দয়া করে বলবেন?

সাধুবাবার দেখা ভর সম্পর্কে যা বললেন, তার সঙ্গে আমার দেখা ভরের মিল আছে অনেক। তিনি বললেন,

—বেটা, ভরে যখন কোন দেবদেবী বা সাধকের আবিভাব হয় তখন ভরকারীর চোখ মুখের এবং কণ্ঠস্বরেরও অদ্ভুত একটা পরিবর্তন ঘটে। তবে তা কখনই ভয়ংকর নয় এবং কণ্ঠস্বরে কোন উগ্রতা থাকে না—কর্কশও নয়। ভাবটা থাকে সম্পূর্ণ শান্ত এবং তাতে থাকে পরম স্নেহের একটা ভাব। বিশেষ করে ভরে যদি কোন দেবীর আবির্ভাব ঘটে। কণ্ঠস্বর যেমন কোমল ও কমনীয় হয় তেমনই কথায় থাকে একটা মাতৃস্নেহের ভাব। কোন পুরুষ দেবতা বা সাধক মহাপুরুষের ভরে আবির্ভাবেও ওই ভাব এবং কণ্ঠস্বরের কোন পরিবর্তন ঘটে না। তাঁরা এবং দেবদেবী ব্যতিত অন্য কেউ ভরে আসলে ভাব ও কণ্ঠস্বরের আমূল পরিবর্তন ঘটে। যেমন ধর, চোখ মুখে উগ্রতা দেখা দেয়, চিৎকার করে কথা বলে, কণ্ঠস্বরে কোন মধুরতা থাকে না, মাথা ঝাঁকানো, চুল ছেঁড়া, দাপাদাপি করা, স্থির হয়ে বসে বা শুয়ে না থাকা, মুখ থেকে কু-কথা বলা, কোন কিছু খাবার বা পুজো চাওয়া, কারও উপরে ক্রোধ প্রকাশ করা, এটা না করলে তোর ক্ষতি হবে—ইত্যাদি ভয় দেখানো কথা বলা ইত্যাদির প্রকাশ ঘটলে জানবি, সেই ভরে কোন দেবদেবী বা সাধক মহাপুরুষেরা কেউ আসেননি। তাঁদের কেউ এলে এমনটা হবে না কখনও। আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করবি, দেবদেবী বা সাধক মহাপুরুষেরা ভরে এলে—যার উপরে আসছে, তার চোখের পলক পড়বে না—যতক্ষণ না তাঁরা চলে যাচ্ছেন। একমাত্র দেবদেবীরা ভরে এলে—যার উপর আসছে, তাকে কেউ স্পর্শ করলে তৎক্ষণাৎ দেব বা দেবী দেহ পরিত্যাগ করেন। দেবদেবী ভিন্ন অন্য কেউ ভরে এলে—ভরকারীকে স্পর্শ করামাত্রই ভর ভঙ্গ হয় না।

এক নাগাড়ে এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা থামলেন। সাধুবাবার কথায় বুঝতে আমার এতটুকুও দেরী হলো না যে, আমার দেখা ভরে কে এসেছিল এবং কার কথা মিলেছে এবং কাদের কথা একটাও মেলেনি। আমার জীবনে দেখা ভরগুলির মধ্যে শতকরা নিরানব্বইটা ক্ষেত্রেই এখন বুঝতে পারছি কোন দেবদেবীর আগমন ঘটেনি। যেক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ভাবে আবির্ভাব ঘটেছে—তাঁদের কথাই ঠিক ঠিক হয়েছে। একটু বিশ্রাম

নিয়ে এবার সাধুবাবা বললেন,
—বেটা, দেবদেবীর ভরটা সকলের হয় না। হাজারে এক-আধটা হয়। বাদ বাকি যাদের ভর হয়, জানবি, দেবদেবীর আগমন তাদের মধ্যে প্রায়ই ঘটে না। আরে বাবা, এটা তো বুঝিস্ যে, একটা মহাশক্তির আবির্ভাব ঘটতে গেলে—যার মধ্যে ঘটে, তার কতটা শুদ্ধ সাত্ত্বিক জীবন যাপনের প্রয়োজন! সংসারে থেকেও সৎভাবে, শুদ্ধ ও সাত্ত্বিক নির্লোভ সুখ দুঃখে বিকারহীন জীবন যাপনকারী সাধন ভজনশীল নারী বা পুরুষের মধ্যেই সেই মহাশক্তির আবির্ভাব ঘটে ক্ষণকালের জন্য। যার ভর হয়—তার ইচ্ছায় দেবদেবীরা আসেন না—তাঁরা আসেন ভক্তের উপর কৃপাপরবশ হয়ে। ভগবানকে ডাকলাম—অমনি এসে গেল, ফটাফট্ সব বলে দিয়ে গেল—অত সস্তা নয়! তবে সাধন ভজন বা শুদ্ধ সাত্ত্বিক জীবন যাপন করলেই যে ভর হবে—এমন কোন কথা নেই। কার ভর হবে অর্থাৎ কার মধ্যে সেই সাধক মহাপুরুষ দেবদেবী অথবা অশুভ কোন আত্মার শক্তি আবির্ভূত হবে—তা বলার কারও সাধ্য নেই। তাঁদের আসাটা বা পাত্রপাত্রী নির্বাচন করাটা সম্পূর্ণ তাঁদেরই ইচ্ছাধীন, বুঝলি?
সাধুবাবার কথাগুলো শুনলাম। তবে হ্যাঁ বা না এই মুহূর্তে কিছু বললাম না। ভাবতে লাগলাম সাধুবাবার কথাগুলো। মিলিয়ে নিতে থাকলাম আমার দেখা বিভিন্ন জায়গায় ভরের সঙ্গে। এই প্রসঙ্গে সাধুবাবার সঙ্গে আরও কিছু কথা হলো। তবে মোদ্দা কথা ওইটুকুই। সাধুবাবা হাসতে হাসতে বললেন,
—কিরে বেটা, আমার সঙ্গে বসে তোর লাভই হলো, বল্?
আমিও হাসতে হাসতে মাথাটা নাড়ালাম। এবার জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, এ-পথে তো আছেন বহুবছর ধরে। শান্তি পাওয়ার পথের কোন হদিশ পেলেন?
প্রসন্ন হাসিতে ভরা সাধুবাবার মুখখানা। মাথাটা নাড়িয়ে বললেন,
—হাঁ বেটা, পেয়েছি। সংসারে যার চাওয়া গেছে তার চিন্তা গেছে। মন যার কোন কিছুই পরোয়া করে না, কিছুই চায় না—সেই মনের দিক থেকে প্রকৃত রাজা। সেই শান্তিলাভ করে। চাওয়া আর পাওয়ার বাসনা যার আছে—সংসারে সে কিছুতেই শান্তি পাবে না।
এই প্রসঙ্গে সাধুবাবা একটা শ্লোকের মতো বলেছিলেন। বহুবছর আগের কথা। আজ আর অতটা মনে নেই। এবার সাধুবাবার গৃহত্যাগের কারণ জানতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, দয়া করে বলবেন, কেন গৃহত্যাগ করে এ-পথে এলেন?
সঙ্গে সঙ্গেই বললেন,
—হাঁ হাঁ বেটা, জরুর বলবো। আমি যখন তোকে ডেকে বসিয়েছি তখন তোর জিজ্ঞাসার উত্তর কি না দিয়ে পারি!

একটু অবাক হয়ে গেলাম সাধুবাবার কথাটা শুনে। এতদিন ধরে যে সব সাধুদের জিজ্ঞাসা করেছি তাদের অতীত জীবন এবং গৃহত্যাগের কথা—তাঁরা কেউই চট্ করে বলতে রাজী হননি। কখনও পায়ে ধরে, কখনও কাকুতি মিনতি করে, কখনও অনেক অনুরোধের পর বলেছেন তাঁর অতীত জীবনের কথা—গৃহত্যাগের কথা। অথচ এই সাধুবাবাকে বলামাত্রই রাজী হলেন দেখে মনের মধ্যে কেমন যেন একটা রহস্যের সৃষ্টি হলো। আমি জানার অপেক্ষায় রইলাম। সাধুবাবা বলতে লাগলেন,

—বেটা, নির্দোষ জীবন যে কিভাবে কলুষিত হতে পারে তার প্রমাণ আমি নিজে। আমার মতো নিরপরাধ এমন কত হাজার হাজার মানুষ সংসারে বিভিন্ন অপরাধের বোঝা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ব্যর্থ জীবন যাপন করছে, জেল খাটছে, কেউবা আত্মহত্যা করে প্রাণ দিয়েছে, তার কোন হিসাব সমাজের কেউ করেনি কখনও—রাখেওনি। আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম বলে, নইলে সংসারে থাকলে আজও, নির্দোষ হয়েও মানসিক গ্লানি নিয়েই বেঁচে থাকতে হতো আমাকে।

কথাটুকু বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। সাধুবাবার গৃহত্যাগের ঘটনা যে মর্মান্তিক হবে কথাবার্তার আঁচেই তা বুঝতে পারলাম, যদিও আসল কোন কথাই এখনও শোনা হয়নি। সাধুবাবার মুখখানা দেখলাম, ধীরে ধীরে কেমন যেন একটা যন্ত্রণায় ভরে উঠলো। এ যন্ত্রণা নিজের না অন্য কারও জন্যে তা বুঝতে পারলাম না। লক্ষ্য করলাম, বৃদ্ধের চোখ দুটোও জলে বেশ ঝাপসা হয়ে এলো। তিনি বললেন,

—বেটা, বিহারের দেওঘরের কাছের এক গাঁয়ে আমাদের বাড়ী ছিল। আমার বয়েস যখন বছর কুড়ি—তখনকার কথা বলছি। আমার এক ঘনিষ্ঠ 'দোস্ত' ছিল। বলতে পারিস, আমরা কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতাম না—শুধু খাওয়া আর শোয়ার সময়টুকু ছাড়া। একই গাঁয়ের পাশাপাশি বাড়ীতে থাকতাম আমরা। রাম লক্ষ্মণের মতো সম্পর্ক ছিল আমাদের মধ্যে। বয়েসে ও ছিল আমার চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। যাই হোক, আমার বন্ধুটি আমাদেরই গাঁয়ের একটি মেয়ের প্রেমে পড়লো। তাকে আমি চিনতাম। আমার সঙ্গে তার সম্পর্কও ছিল অত্যন্ত প্রীতির। ওদের বাড়ীতে বন্ধুটির মতো আমারও যাতায়াত ছিল অবাধ তবে মেয়েটির প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ বা দুর্বলতা ছিল না। ওদের বাড়ীতে বন্ধুটির যাতায়াতের ফলে প্রেম মন থেকে গড়িয়ে গেল দেহে। তারপর যা হবার তাই হলো। বছর ষোল মেয়েটির পেটে বাচ্চা এলো। আমার বন্ধুটির বাবা ছিল গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে অবস্থাপন্ন। এই ঘটনায় সম্মান বাঁচাতে আমার বন্ধুটি অবাঞ্ছিত এই ঘটনার দায় অস্বীকার করলো। ওদের সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি এতই প্রবল ছিল যে, মেয়েটির স্বীকারোক্তিকে উড়িয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ দায়টা চাপিয়ে দিল আমারই উপর, যেহেতু আমারও যাতায়াত ছিল ওদের বাড়ীতে—সম্পর্ক ছিল

বন্ধুর। ফলে একদিন মেয়েটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে বন্ধুর বাবা গ্রামবাসীদের সঙ্গে জোট বেঁধে আমাকে জোর করে ধরে বিয়ে দিয়ে দিল সেই অন্তঃসত্ত্বা মেয়েটির সঙ্গে। এই বিয়ের পর লজ্জায় ঘৃণায় মেয়েটির দেহ তো স্পর্শ করিইনি—মনের মধ্যে সংসারের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা, ক্রোধ জন্মে গেল। ভাবলাম, সংসারে যদি থাকি, তাহলে এই অযাচিত গ্লানি আর অসম্মানের বোঝা আমাকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত। এইভাবে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে বাবা মা ভাই বোন আর পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে বেঁচে থাকাটা মৃত্যুরই সমান। মাথা তুলে জীবনে চলতে পারবো না কখনও। তাই মনে মনে ঠিক করলাম, এ শালার সংসারে আর কিছুতেই থাকবো না। দুচোখ যেদিকে যায়—সেদিকেই চলে যাবো। সাধু হবো—এ সব কখনও এক মুহূর্তের জন্য ভাবিনি জীবনে—যখন ঘর ছেড়েছিলাম তখনও না। বিয়ের ঠিক দু-দিনের দিন গভীর রাতে পালালাম বাড়ী ছেড়ে—অপরাধ না করেও অপরাধীর মতো। বুঝলি বেটা, এই হলো আমার গৃহত্যাগের কথা। সংসারে নিরপরাধ হয়ে মানুষ যে কত ভাবে, কত কষ্ট পাচ্ছে—আর এ যে ভগবানের কি বিচিত্র খেলা তা আজও আমার বুদ্ধিতে এলো না। বেটা, আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম আজ শান্তিতে আছি কিন্তু বিনা দোষে দোষী হয়ে যারা সংসারে আছে তাদের মানসিক যন্ত্রণার কথা ভাবলে গা-টা আমার শিউরে ওঠে, কারণ আমি যে ভুক্তভোগী।

এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা থামার সঙ্গে সঙ্গেই বললাম,

—বাবা, ঘর ছেড়ে বেরোনোর পর কি করলেন—কোথায় গেলেন, কেমন করে পেলেন এ-জীবন আর গুরুর আশ্রয় ?

এ প্রশ্নে সাধুবাবার মুখখানা ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠলো। বৃন্দাবনে দেহটাকে রেখে মনটাকে নিয়ে চলে গেলেন ফেলে আসা সুদূর অতীতে। বললেন,

—ওই দিন রাতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এলাম স্টেশনে। দেওঘর থেকে সোজা যশিডি—তারপর আবার ট্রেন ধরে একেবারে মোঘলসরাই—ওখান থেকে বেনারস। বেনারসে এসে খাওয়ার অভাব হলো না। দীপাবলীর পর সেই সময় চলছিল অন্নকূট উৎসব। কয়েকদিন আহার জুটে গেল। এই সময়েই পেয়ে গেলাম এক সাধুবাবার আশ্রয়। তাঁকে জানালাম আমার সমস্ত কথা। তিনি থাকতেন গঙ্গোত্রীতে। এসেছিলেন এই অন্নকূট উৎসবে। তাঁর কথা মতো সেই সময়েই আমি জামা কাপড় ছেড়ে দিয়ে একটা চেলি পরে চেলা বনে গেলাম সাধুবাবার। অবশ্য দীক্ষা আমার তার অনেক পরেই হয়েছিল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সাধুবাবা তাকালেন আমার মুখের দিকে। ভাবটা এমন, তখন আমায় আর পায় কে ? কোন কথা বললাম না। সাধুবাবা বললেন,

—অন্নকূট উৎসব শেষ হতেই আমি আর সেই সাধুবাবা বেনারস থেকে চলে গেলাম বিন্ধ্যাচলে। ওখানে থাকলাম কয়েকদিন। তারপর একেবারে সোজা রওনা দিলাম

গঙ্গোত্রীর পথে। তখন যেমন ঠাণ্ডা তেমনই সেবার অসম্ভব বরফ পড়েছিল পাহাড়ে। আমরা ধরাসু এসে আর এগোতে পারলাম না। রয়ে গেলাম ধরাসুতেই। বেশ কয়েকটা মাস ওখানে থাকার পর যখন বরফ পড়া বন্ধ হলো, ঠাণ্ডা কমলো, যাত্রীদের যাওয়ার পথ সুগম হলো, তখন আমরা গেলাম গঙ্গোত্রীতে। ওখানে যাওয়ার পর আমি আর সাধুবাবা থাকতাম একটা পাহাড়ী গুহায়। আমার আগে সাধুবাবা ওখানেই থাকতেন। তারপর একদিন এক শুভক্ষণে দীক্ষা হলো আমার গঙ্গোত্রীতে। সেই সাধুবাবা তখন থেকে হলেন আমার পরমধন গুরুজী।
একটু থেমে সাধুবাবা বললেন,
—বেটা, দীক্ষা নিলে দক্ষিণা কিছু দিতে হয়। আমি কি দক্ষিণা দিয়েছিলাম জানিস্? দেয়ার মতো কিছু সম্বল ছিল না আমার। দীক্ষার পর গুরুজী আমার কাছে দক্ষিণা চাইলেন। আমি বললাম, 'গুরুজী, আমার কাছে দেয়ার মতো তো কিছু নেই।' গুরুজী বললেন, 'কেন রে বেটা, নেই কিরে? টাকা পয়সা ধন দৌলতের চেয়েও মানুষের অনেক বড় সম্পদ আছে গুরুকে দক্ষিণা দেয়ার জন্যে। সেটা হলো মন। তোর মনটাই আমাকে দক্ষিণা হিসাবে দে।' আমি হতবাক হয়ে গেলাম কথাটা শুনে। মুখে মনটা দিলাম বললে কি আর দেয়া হলো! ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম গুরুজীর মুখের দিকে। তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একবার হাসলেন। তখন আমার বয়েস কম। অত বুঝতাম না কিছু। গুরুজী মুচকি হাসি হেসে বললেন, 'গুরু ভিন্ন পার্থিব অন্য কোন চিন্তা না করলেই মনটা দেয়া হয় গুরুকে। সময় মতো দক্ষিণা বাবদ মনটাই তোর নিয়ে নেব আমি।'
এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা একটা অদ্ভুত আনন্দময় ভাব নিয়ে বললেন,
—হ্যাঁ বেটা, গুরুজী কথা দিয়েছিলেন—রক্ষাও করেছেন। এখন বুঝি, দক্ষিণা বাবদ ধীরে ধীরে তিনি আমার মনটাকে নিয়েই নিয়েছেন। যাইহোক, গুরুজীর আশ্রয় লাভের পর গঙ্গোত্রীর মনোরম পাহাড়ী পরিবেশে গুহার মধ্যে বসে চলতে লাগলো আমার সাধন ভজন। তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত কামনা বাসনা একেবারে ধুয়ে মুছে গেল মন থেকে। শীতের সময়টুকু ছাড়া পাহাড়ে ছিলাম আমি প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর।
হঠাৎ উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, 'জয় গুরু মহারাজ কি জয়'—গুরু কৃপাহি কেবলম'।
আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম সাধুবাবার আনন্দঘন মুখের দিকে। তিনি প্রশান্ত মধুর কণ্ঠে বললেন,
—বেটা, যেমন অপবিত্র ময়লা জলও পবিত্র হয়ে যায়, গঙ্গাজল হয়ে যায়—গঙ্গায় পড়লে, গঙ্গাজলে মিশলে—ঠিক তেমন ভাবেই বিষয়ে মলিন মনের মানুষও মলিনতা-মুক্ত হয়ে পবিত্র হয় গুরুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ, সৎসঙ্গ করলে। গঙ্গোত্রী থেকে বয়ে আসা গঙ্গার পবিত্র নির্মল ধারার মতোই যে এদের ধারা। বেটা, মানুষের আত্মা হলো

নদী, ধর্ম তার ঘাট, ধৈর্য হলো তার তীর, দয়া হলো তার তরঙ্গ, সত্যের স্রোতে তার প্রকাশ—ওই ধারাতে যারা (গুরুসঙ্গ, সৎসঙ্গ, সাধুসঙ্গ) স্নান করে, তারা পবিত্র নির্মল হবেই—হবে।)

এবার সাধুবাবার আবেগভরা কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো একটি পরিতৃপ্তির শব্দ—আহ্। এ-তৃপ্তির শব্দ হয়তো তাঁর গুরু মনে নিজ মন একাকার হয়ে যাওয়ার। তৃপ্তিতে চোখ বুজলেন ক্ষণিকের জন্য। তারপর আবার তাকালেন—তাকালেন আমার মুখের দিকে। বললেন,

—বেটা, সুন্দরী রমণীর সিঁথেয় সিঁদুর আর কপালের টিপ যেমন সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তাদের মাতৃভাবে প্রতিষ্ঠিত করে, তেমনই ইষ্টনাম মনের মাধুর্য বৃদ্ধি করে নারীপুরুষের মনকে প্রতিষ্ঠিত করে—একাকার করে গুরুমনে।

ভাবাবেগে সাধুবাবার কণ্ঠস্বরটা রোধ হয়ে এলো। মিনিট খানেক চুপ করে থাকার পর বললেন,

—গুরুজী সেদিন যদি আমাকে আশ্রয় না দিতেন তাহলে তখন আমার পথে কোথাও হয়তো মৃত্যুই হয়ে যেতো। বেটা, সুখ চাই না এতটুকুও। চাই সারাটা জীবন ব্যাপী দুঃখ—সে দুঃখ এমনই দুঃখ হোক—যে দুঃখে আমি যেন সব সময়েই স্মরণ করতে পারি আমার গুরুজীকে।

এবার সাধুবাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, এ-পথে জীবনটাই তো আপনার কেটে গেল। গুরুগত প্রাণ আপনি। নিশ্চয়ই আমার এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। আমরা গৃহী যারা—তারা কেউ কম, কেউ বেশী—কিছু না কিছু, কোন না কোন ভাবে ঈশ্বরকে ডাকছিই। কিন্তু গুরুতে বা ঈশ্বরে—যাই বলুন, প্রেম এসেছে কিনা কি করে বুঝবো?

প্রশ্নটা শুনে সাধুবাবা একটু ভাবলেন। তারপর বললেন,

—বেটা, (প্রেম মানুষেই বল আর ঈশ্বরেই বল—প্রেম একই। মানুষ হয়ে মানুষে প্রেম বা ঈশ্বরে প্রেম—এর আলাদা কোন সংজ্ঞা নেই। প্রেম বাস করে বহু বহু দূরে। ভগবৎ বিমুখ যারা—এতটুকু বিষয় বাসনা যাদের আছে, তারা মুখে যতই ঈশ্বরের নাম করুক না কেন বেটা, বুঝবি, ঈশ্বরে, নারীর পুরুষে, পুরুষের নারীতে আদৌ প্রেম আসেনি। প্রেম বলে যেটুকু মনে হয়, সেটুকু নিজের সুপ্ত মনের চাহিদা বা বাসনা সিদ্ধির প্রকাশ মাত্র—প্রেম নয়। কেন জানিস, মানুষের বিষয়ী মন হাতির চেয়েও বড় আর প্রেমের দরজা হলো চুলের মতো সরু। তাই প্রেমের দরজা দিয়ে অত বড় বিষয়ী মন চট্ করে ঢুকতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরে প্রেম এসেছে কিনা তখনই বুঝবি, যখন দেখবি বিষয়ী মন তোর বাসনা-বিহীন হয়েছে।)

কথাটুকু শেষ করে স্নেহের সুরে সাধুবাবা বললেন,

—যা বেটা, এখন আর তোকে আটকাবো না। তোর কাজ আছে, এবার যা।

সাধুবাবা বলার সঙ্গে সঙ্গেই উঠলাম না। ভাবতে লাগলাম, কি অদ্ভুত জীবন মানুষের! অদৃশ্য কোন এক শক্তির বলে অপ্রত্যাশিতভাবে ঘুরে যাচ্ছে নদীর গতিপথ পরিবর্তনের মতো মানুষের জীবন প্রবাহের গতি। সাধুবাবা কি জীবন থেকে চলে এসেন কোন্ জীবনে! ভাবতেই পারছি না! হঠাৎ একটা প্রশ্ন এলো মাথায়—করেই ফেললাম.

—বাবা, ধরুন আমি যদি সাধু হই কিংবা কোন গৃহী যদি সাধু হতে চায় অথবা কোন সাধু যদি আরও ভালো সাধু হতে চায়, অর্থাৎ বলতে চাইছি—কি গুণ থাকলে মানুষ ভালো সাধু হতে পারে?

প্রশ্নটা শুনে সাধুবাবা খুশীতে একেবারে উপছে পড়লেন। হাসিভরা মুখে বললেন,

—বাঃ বেটা বাঃ, বেশ মজার প্রশ্ন করেছিস্ তো! এমন সুন্দর প্রশ্ন করবি, ভাবতেই পারিনি। তাহলে বলি শোন, ভালো সাধু হতে গেলে কারও কাছে হাত পাততে নেই। যাঁরা ভালো সাধু তাঁরা দিতে ছাড়া কিছু চাইতে শেখেনি কখনও। চাইলে কখনও সাধু হতে পারবি না। যে সাধু চায়, সে সাধু সাধুর ভেক ধারণ করেও সাধু নয়। সাধুর সব পাওয়ার আশাকে পূরণ করে না চাওয়ার গুণ—এমনকি ঈশ্বরকেও, বুঝলি?

এবার উঠে দাঁড়ালাম চলে যাবো বলে। সিঁড়ির একটা ধাপ নীচে নেমে মাথাটা পায়ে ঠেকিয়ে প্রণাম করতেই সাধুবাবা হাত দুটো মাথায় বুলিয়ে দিলেন। আমি তাকালাম সাধুবাবার মুখের দিকে—তিনিও তাকালেন আমার মুখের দিকে। এবার আমার শেষ জিজ্ঞাসা,

—বাবা, ঈশ্বর কে?

নির্বিকার বৃদ্ধ সাধুবাবার প্রশান্ত মুখখানা এ প্রশ্নে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। কোমল মধুর কণ্ঠে বললেন,

—বেটা, বিনা দাড়ি পাল্লায় প্রতি মুহূর্তে, প্রতিটি মানুষের, প্রতিটি জীবের সমান নিখুঁত ওজন যিনি করেন—তিনিই ঈশ্বর।

নিধুবনের মাহাত্ম্য নিয়ে একটি লোকবিশ্বাস আছে, অসংখ্য ছোট ছোট ইট পাথরের নুড়ি পড়ে আছে এখানে। রাধাকৃষ্ণের এই লীলাক্ষেত্রে ওই নুড়ি দিয়ে সাজিয়ে কেউ যদি ভক্তি সহকারে রাধার কাছে প্রার্থনা করে কৃত্রিম বাড়ী তৈরী করে—তাহলে রাধারাণীর কৃপায় গৃহাদিলাভ করতে সমর্থ হয় সে।

সম্রাট আকবর এবং নিধুবনকে নিয়ে আছে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। রূপ ও সনাতন গোস্বামীর দেহরক্ষার পর শ্রীজীবের সমকক্ষ বৈষ্ণব নেতা তখন আর কেউই ছিল না শ্রীধাম বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের খ্যাতি আর সাধননিষ্ঠার কথা প্রায়ই শুনতেন সম্রাট আকবর। ফলে কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা ক্রমশ বেড়ে গেল সম্রাটের। আনুমানিক ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে একবার সদলবলে তিনি এসে হাজির

হলেন বৃন্দাবনে। সেই সময় সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন শ্রীজীব গোস্বামী বৈষ্ণব আচার্যদের মুখপাত্ররূপে। মহাবৈষ্ণব শ্রীজীবের লোকোত্তর প্রতিভা, তেজস্বিতা, দিব্য শ্রীমণ্ডিত মূর্তি এবং তাঁর করুণাসুন্দর দৈন্যময় বেশ দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে যান আকবর বাদশা।
বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা গ্রাউস সাহেব বৃন্দাবন প্রসঙ্গে তাঁর 'মথুরা' গ্রন্থে লিখেছেন, এই সময় রাধাগোবিন্দের পবিত্র লীলাভূমি নিধুবন দর্শনে উৎসুক হলেন সম্রাট আকবর। শ্রীজীব সহ অন্যান্য গোস্বামীরা সম্মতি দিলেন নিধুবন দর্শনের তবে শর্ত সাপেক্ষে। সম্রাটের চোখ বেঁধে দেয়া হলো কাপড় দিয়ে। তারপর তাঁকে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো কৃষ্ণের লীলাস্থলীর এক কোণে।
নিধুবনে দাঁড়ানো মাত্রই এক বিস্ময়কর অলৌকিক অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি লাভ করলেন বাদশা। ভিন্নধর্মী হয়েও সম্রাট সেদিন স্বীকার করেছিলেন যে, সত্যিই তিনি এক পবিত্র লীলাভূমি স্পর্শ করার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন।
মোঘল আমলে মুসলমান সম্রাটদের অনুমতি ছাড়া একটি হিন্দু মন্দিরও নির্মাণ করা যেতো না। বৃন্দাবনে আসার পর সে বাধা অপসারণ করেছিলেন সম্রাট আকবর। আনন্দের সঙ্গে অনুমতি দিয়েছিলেন—এবার থেকে হিন্দু ভক্তরা ইচ্ছামত দেবমন্দির নির্মাণ করতে পারবে বৃন্দাবনে। গোস্বামীদের প্রতিও প্রসন্ন হয়েছিলেন সম্রাট। তখন তাঁর একান্ত ইচ্ছা হয় বৃন্দাবনে তাঁর এই আগমনকে স্মরণীয় করে রাখতে—এর জন্য যে কোন উদ্যোগ আয়োজন ও অর্থব্যয় করতে তিনি প্রস্তুত। সবিনয়ে জানালেন গোস্বামীদের তাঁর মনের কথা। জানতে চাইলেন, তাঁদের কিছু প্রার্থনীয় আছে কিনা ?
উত্তরে শ্রীজীব বলেছিলেন, সম্রাট আমরা একেবারেই দীনহীন কাঙাল বৈষ্ণব। কৃষ্ণ ছাড়া আমরা আর কিছুই জানি না। সর্বস্ব দিয়ে যাতে তাঁর স্মরণ নিতে পারি—তাই'ই যে আমাদের নিরন্তর সাধনা। আমাদের চাইবার মতো কিছুই নেই—নেই কোন কিছুরই প্রয়োজন।
সহজে ছাড়লেন না বাদশা আকবর। অনুরোধের সুরে বারংবার বলতে লাগলেন, আমার কাছ থেকে যা হোক কিছু একটা চেয়ে নিন আপনারা, তাহলে খুব খুশী হবো আমি।
শ্রীজীব জানালেন, সম্রাট, বৈষ্ণবেরা যাতে এই শ্রীবৃন্দাবনে নিরুপদ্রবে আনন্দের সঙ্গে ধর্মাচরণ এবং শাস্ত্র চর্চা করতে পারেন—সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখলে উপকৃত হবো। প্রাচীনকালের হিন্দুরাজারা একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করতেন তপোবন। আমরা চাই আপনিও তাই করুন। তাছাড়া বৃন্দাবনের অরণ্যে অনেকেই প্রাণী হত্যা করেন মৃগয়া করতে এসে। এতে বড়ই ব্যথিত হন অহিংস বৈষ্ণবেরা। দয়া করে আপনি বন্ধ করুন এই প্রাণী হত্যা। এটাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা আপনার কাছে।

কথা দিলেন সম্রাট। ফরমান জারি করলেন, ব্রজমণ্ডলে আর একটা প্রাণীও হত্যা করা চলবে না—কাটা যাবে না পবিত্র স্থানের একটি বৃক্ষলতাও।

এরপর ফিরে যান আকবর। শ্রীজীব প্রমুখ বৈষ্ণব গোস্বামীদের তেজস্বীমণ্ডিত রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন আকবর। বিশিষ্ট এই মহাপুরুষদের চিত্র আঁকার জন্য রাজধানী থেকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন সুদক্ষ চিত্রকর। কিন্তু প্রতিচ্ছবি দিতে রাজী হলেন না কেউই। এই সময়ে শ্রীজীব একটি পত্র দিলেন বাদশাকে। তাতে লিখেছিলেন, বৈষ্ণবদের সাধনার এক প্রধান অঙ্গ হলো ত্যাগ বৈরাগ্য ও দৈন্য। ছবি না নিতে পারায় সম্রাট যেন কোনভাবেই মনক্ষুন্ন না হন।

আমাদের রিক্সা দাঁড়িয়ে ছিল শাহজী মন্দিরের সামনে—রাস্তার ধারে। নিধুবন থেকে একটুখানি হেঁটে এলাম রিক্সার কাছে। নিধুবনে ঢোকার মুখে অনেক মেয়ে আর বউরা বসে থাকে ছোলা আর বাদাম নিয়ে। বনে অনেক হনুমান আছে। যাত্রীরা কিনে নিয়ে যায় তাদের খাওয়ানোর জন্যে। আমরা আবার উঠে বসলাম রিক্সায়। ধীরে ধীরে চলতে শুরু করলো।

ব্রজপরিক্রমাকালীন ব্রজমায়ীদের ব্যবহার প্রসঙ্গে একদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁর ভক্তশিষ্যদের বলেছিলেন—

"চোর ডাকাতের উপদ্রব তো সর্বত্রই আছে। পরিক্রমার সময়ে সঙ্গে জিনিষপত্র নিয়ে যাওয়া হয় না। সঙ্গে সঙ্গে বাজার চলে, আবার পথের স্থানে স্থানে আড্ডাও আছে। সেখানে সমস্ত জিনিষই জোটে। যাঁরা গৃহস্থ, তাঁরা আড্ডায় গিয়ে প্রয়োজন মত জিনিষ খরিদ করে আহারাদি করেন। আর সাধুরা লুটপাট করে খাবার সংগ্রহ করে নেন। পরিক্রমার সময়ে গ্রামে গ্রামে ব্রজমায়ীরা দধি দুগ্ধাদি, ভাড়ে ভাড়ে একখানা ঘরে সাজায়ে রাখেন। পরে অন্য ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকেন। সাধুরা গিয়ে এ-ঘর, ও-ঘর করে দধি দুগ্ধ খুঁজে বার করেন। সেই সময়ে ব্রজমায়ীরা কৃত্রিম কোপ করে হাতে ঠেঙ্গা নিয়ে তাড়া করতে থাকেন। সাধুরা দধি দুগ্ধাদি লুটপাট করে, হাঁড়ি পাতিল ভেঙে দৌড় মারেন। ইহাতে ব্রজমায়ীদের বড়ই আনন্দ। তাঁরা এ সময়ে রাখাল বালকসহ শ্রীকৃষ্ণের দধি দুগ্ধ চুরির কথা মনে করে সেইভাবেই মুগ্ধ হয়ে থাকেন। চুরি করে বা জোর করে এরূপ লুটপাট করে কেহ কিছু নিলে, ব্রজমায়ীদের যে আনন্দ, তা আর বলবার নয়। এই আনন্দ করবার জন্যই তাঁরা প্রতিদিন কত চেষ্টা করে দধি, দুগ্ধ, মাখনাদি নানা সুখাদ্য বস্তু ঘর ভরে সাজায়ে রাখেন। যে সকল সাধুরা লুটপাট করেন না, আসনেই থাকেন, ব্রজমায়ীরা তাঁদের নিকটে যেয়ে, বাৎসল্যভাবে কত গালি দেন। হাত ধরে টেনে বাড়ীতে নিয়ে যান। সাধুদের গলা জড়ায়ে ধরে কত আদর করে, ঘরে যা থাকে স্বহস্তে সাধুদের মুখে তুলে দিয়ে খাওয়ান। ব্রজমায়ীদের এ-সব ভাব দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

ব্রজের পাড়াগাঁয়ে গেলে দেখা যায়, এখনও সেই ভাবই বর্তমান। বেলা শেষ হলে ব্রজমায়ীরা উৎকণ্ঠিত প্রাণে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়ায়ে থাকেন। কতক্ষণে রাখাল

বালকেরা গরু নিয়ে ফিরবে, তাই দেখেন। চেনা অচেনা জ্ঞান নেই। ঘরের ভাল ভাল জিনিষ নিয়ে, কত আদর করে রাখাল বালকদের খাওয়ান। রাখালগণের আসতে একটু বিলম্ব হলে, স্নেহভরে তাদের কত গালাগালি করেন। ব্রজের পাড়াগাঁয়ে গেলে দেখা যায়, ব্রজমায়ীদের ভিতরে এখনও পূর্বের সেই ভাব, সেই অবস্থা সমস্তই রয়েছে।" (শ্রীশ্রী সদগুরুসঙ্গ, ২য় খণ্ড)

ভ্রমণপথে স্থানের দূরত্ব আর চলতি পথে কতটা সময় লাগলো—সব সময় খেয়াল রাখা বা ঠিক করা যায় না। ঠিক রাখতে পারছি না আমিও—বিশেষ করে এই বৃন্দাবনে। কারণ এত মন্দির আর দর্শনীয় স্থান—একই সঙ্গে একের পর এক এ-গুলি আর সে-গুলি। আমাদের রিক্সাও সামান্য সময়ের মধ্যে এসে দাঁড়ালো নিকুঞ্জবনের সামনে।

প্রাচীরে ঘেরা ছোট্ট বন। এসে দাঁড়ালাম বনে। নিকুঞ্জবনের আরও একটা নাম রয়েছে—সেবাকুঞ্জ। এই বনে আজও কাউকে থাকতে দেয়া হয় না রাতে। কথিত আছে, এই বনে শ্রীকৃষ্ণ পদ-সেবা করেন রাধারাণীর। তাই এই বনের নাম হয়েছে সেবাকুঞ্জ।

ভক্তের সঙ্গে যেন ভগবানের এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এই বনে। এখানে এসে দাঁড়ালে এক অদ্ভুত প্রশান্তিতে ভরে ওঠে মন। চারদিকে বন। ঠিক মাঝখানে নয় —একটু পাশেই রয়েছে রাধারাণীর মন্দির। ভিতরে রয়েছে কৃষ্ণের বিগ্রহ। রাধারাণীর বিগ্রহটিও বড় সুন্দর। একদা প্রেমের ডালি সাজিয়ে বৃন্দাবনের এই কুঞ্জে বসে অপেক্ষা করতেন রাধারাণী তাঁর প্রেমিক কৃষ্ণের অপেক্ষায়। নিকুঞ্জবন তাঁরই স্মৃতি বুকে নিয়ে বসে আছে আজও এই বৃন্দাবনে। লোকবিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণ রাধাসহ আজও বিহার করেন এই বনে।

মন্দিরের কাছেই রয়েছে একটি বাঁধানো কুণ্ড—ললিতা কুণ্ড। নিষ্কাম প্রেমের সাধনায় প্রিয় সখী ললিতা বিশাখা দেবতাগণেরও আদর্শ। এঁদের ছেড়ে বৃন্দাবন-লীলা সম্ভব হতো না কখনও। রাধারাণীর কৃষ্ণ-প্রেম সাধনায়, পূর্ণতায়—ললিতা বিশাখার দান অপরিসীম। নিকুঞ্জবনে ললিতা কুণ্ড আর নিধুবনে বিশাখা কুণ্ড এঁদেরই পুণ্যস্মৃতি বহন করে চলেছে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল—মহাভারতীয় যুগ থেকে।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ রামদাস কাঠিয়া বাবার কথা। বৃন্দাবনে আসার পর বহুকাল যাবৎ তিনি নিকুঞ্জবনের দ্বারে আসন করে বসে থাকতেন। প্রতিদিনের অধিকাংশ সময়ই তাঁর কেটে যেতো এখানে। বাবাজী মহারাজের সর্বপ্রথম রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা দর্শন হয় এই সেবাকুঞ্জে। তাই তিনি প্রতিদিন এখানে বসে দর্শন করতেন নিত্য-লীলা। কাঠিয়াবাবার প্রসঙ্গে একথা বলেছেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

নিকুঞ্জবনে রয়েছে একটি তমাল গাছ। এই গাছের গায়ে রয়েছে কয়েকটি শিলা-

মূর্তি। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ ননী খেয়ে এই গাছে হাত মুছে ছিলেন। যেখানে যেখানে হাত মুছে ছিলেন সেখানেই সৃষ্টি হয়েছে শিলা মূর্তি। আজকের বৃন্দাবনের যা কিছু অবিশ্বাস্য বলে সাধারণ মানুষের কাছে মনে হয়—ভক্তপ্রাণ তীর্থযাত্রীদের কাছে তা বিশ্বাসের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

একদা এই নিকুঞ্জবনেই রাধারাণীর দর্শন পেয়েছিলেন গোস্বামী শ্যামানন্দ। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের কথা। উড়িষ্যার ধারেন্দা-বাহাদুরপুর অঞ্চলে নিজেদের এক দুঃখময় পরিবেশে জন্ম কৃষ্ণদাসের। দুঃখী পিতামাতা নাম রাখেন দুঃখীরাম। গ্রামের লোকেরাও তাঁকে ডাকতো ওই একই নামে।

মহাকালের স্রোতে ভেসে এসে পরবর্তীকালে বৈষ্ণবীয় সাধনা আর দীক্ষা গ্রহণ করলেন কালনার ভগবত কৃপাপ্রাপ্ত সাধক হৃদয় চৈতন্য ঠাকুরের কাছে। তাঁরই আদেশে বৃন্দাবনধামে দুঃখী কৃষ্ণদাস এলেন একটি অনুরোধ-পত্র নিয়ে। তখন রঘুনাথ-দাসজীর সাধন-প্রভাবের কথা ছড়িয়ে পড়েছে সারা ব্রজমণ্ডলে। তাঁরই ভজন কুটির পবিত্র রাধাকুণ্ডের তীরে। সেই কুটিরকে ঘিরে রয়েছে আরও অসংখ্য বৈষ্ণব মহাত্মাদের কুটির।

ব্রজধামে এসেই প্রথমে কৃষ্ণদাস এলেন রঘুনাথদাসজীর ভজন কুটিরে। তারপর সেখান থেকে গেলেন শ্রীজীব গোস্বামীর কাছে। তখন শ্রীজীব ছিলেন ব্রজমণ্ডলের কর্তা। অসামান্য বৈরাগ্য ও ভক্তির প্রতিমূর্তি দুঃখী কৃষ্ণদাস অনুরোধ-পত্রটি দিলেন শ্রীজীবের হাতে। তারপরেই শুরু হলো এক নতুন জীবন অধ্যায়।

শ্রীজীবের কুটিরে নিয়মিতভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে চলতে লাগলো কৃষ্ণদাসের বৈষ্ণব ও ভক্তিশাস্ত্রপাঠ, ভজন আর বিগ্রহ-সেবা। ভক্তিশাস্ত্রের মূল কথাই হলো সেবা। তাই সেবাকার্যে সর্বদাই তৎপর থাকতেন দুঃখী কৃষ্ণদাস। এই সময়েই তিনি ঝাড়ুদারের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন বৃন্দাবনের এই নিকুঞ্জ মন্দিরে।

কৃষ্ণদাস প্রতিদিন ঝাঁট দেন মন্দির-অঙ্গন। সদানন্দে মত্ত থাকেন রাধাগোবিন্দের লীলা স্মরণ করে। ধীরে ধীরে শ্রীরাধার দর্শন পিয়াসী হয়ে ওঠে কৃষ্ণদাসের অন্তর। কবে সখীমঞ্জরীসহ রাধামাধবের দর্শন হবে—এই আশায় দিনগুণে চোখের জল ফেলতে থাকেন দুঃখীপ্রেমিক কৃষ্ণদাস।

একদিন রাতের শেষ প্রহরের কথা। কৃষ্ণদাস ঘুম থেকে উঠে ঝাঁট দিতে থাকেন নিকুঞ্জমন্দির-অঙ্গন। হঠাৎ নজরে পড়ে একগাছা অপূর্ব সুন্দর সোনার নূপুর। শেষ রাত্রির অস্ফুট আলোতেও একেবারে জ্বলজ্বল করছে। দ্রুত এগিয়ে তুলে নিলেন হাতে। স্পর্শমাত্রই কৃষ্ণদাসের হৃদয়ে জেগে ওঠে এক অপূর্ব প্রেম-বিহ্বলতা। ব্রজরজে তখন তিনি গড়াগড়ি দিতে থাকেন অষ্টসাত্ত্বিক এক ভাবতন্ময়তায়। এইভাবে কেটে যায় কিছুক্ষণ। এবার উঠে বসেন কৃষ্ণদাস। হাতে ধরা নূপুরটির অপূর্ব উজ্জ্বলতার সঙ্গে বেরোতে থাকে এক অনাস্বাদিত দিব্যগন্ধ। হঠাৎ কৃষ্ণদাসের অন্তরে জেগে ওঠে এক পরম উপলব্ধি। এ সোনার নূপুর কিছুতেই কোন প্রাকৃতিক

বস্তু হতে পারে না। হৃদয়মন্দির থেকে কে যেন বারংবার বলে দেয়, ওরে দুঃখী কৃষ্ণদাস, পরম ভাগ্যবান তুই। শত জন্মের চেষ্টাতেও মানুষ কখনও যা পায় না— আজ তুই তাই-ই পেয়েছিস। ওরে, ও যে স্বয়ং প্রিয়াজীর চরণ-নূপুর।
দুঃখী কৃষ্ণদাসের দু-চোখ বেয়ে ঝরতে থাকে কৃষ্ণপ্রেমের অশ্রুধারা। আক্ষেপ করে বলতে থাকেন, হে কৃপাময়ী রাধে, দুঃখী এ-কাঙালের প্রতি এতই যখন কৃপা করলে তখন কেন শুধু নূপুরে দিয়েই ভুলিয়ে রাখলে? দয়া করে তোমার চরণ কমল দাও—দর্শন দাও আমার সামনে এসে।
ভাবনামাত্রই ঘটে গেল এক বিস্ময়কর ঘটনা। ভাবতন্ময় সাধকের চোখের সামনে খুলে গেল এক দিব্যলীলার দৃশ্যপট। মুহূর্তে এক পরমা সুন্দরী বালিকা এসে দাঁড়ালেন নিকুঞ্জ মন্দিরের দরজায়। বয়স ১০/১১ হবে। সুমধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন কৃষ্ণদাসকে, 'এ ভাইয়া, একঠো সোনেকা নূপুর তুমকো মিলা হ্যায়?'
দিব্যভাবে ভাবান্বিত দেহে উত্তর দিলেন কৃষ্ণদাস, 'হ্যাঁ গো, একটা নূপুর আমি পেয়েছি, কিন্তু কার এটা বলতে পারো?'
কিশোরী মেয়েটি বললেন, 'এ নূপুর আমার এক সঙ্গিনীর। কাল রাতে হারিয়েছে। তিনি বয়েসে তরুণী—রাজনন্দিনী। সহসা লোকের কাছে আসতে তাঁর বড় সংকোচ হয়। তাই আমাকে খোঁজ করতে পাঠিয়েছেন।'
একথার উত্তরে কৃষ্ণদাস একটু কৌশল করে বললেন, 'দেখো, তুমি যে সত্য কথা বলছো তা কি করে জানবো আমি? যাঁর নূপুর তাঁকে নিয়ে এসো আমার কাছে। আগে আমি এই নূপুরটির সঙ্গে তাঁর চরণ মিলিয়ে দেখবো, তারপর বিশ্বাস করবো তোমার কথা। যদি সত্য হয় তবে তোমার সখীর চরণে নিজের হাতে পরিয়ে দেবো আমি—নইলে পাবে না।'
এই সিদ্ধান্তে অটল হয়ে রইলেন কৃষ্ণদাস। এ-কথার পর মুহূর্তে অন্তর্হিতা হয়ে গেলেন বালিকা। কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এলেন তিনি। তবে এবার আর একা নয়, সঙ্গে রয়েছেন সেই রাজনন্দিনী সখীটি।
দেখামাত্রই এক অদ্ভুত পুলক শিহরণ খেলে গেল কৃষ্ণদাসের সারা দেহমনে। কিশোরীর সর্বাঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে স্বর্গীয় এক রূপ-মাধুরী। অপলক দৃষ্টিতে কৃষ্ণদাস চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। পরে প্রশ্ন করলেন, 'আমাকে বলতেই হবে, তোমরা দুই সঙ্গী গভীর রাতে কেন এসেছিলে এই মন্দির-প্রাঙ্গণে।'
এবার স্বয়ং উত্তর দিলেন নূপুরের অধিকারিণী, "মঁয় বহুত ক্যা কহুঙ্গি? ইয়ে তো মেরা নিকুঞ্জ মন্দির হ্যায়। অব্ তুম সব সমঝ্ লেও। জ্যাদা হট্ না করো। দেখো, সুবহ্ হোনেকে আয়া। মেরা নূপুর তো লওটা দো!"
বৈষ্ণব সাধক কৃষ্ণদাসের চোখের আবরণ কে যেন খুলে দিলেন ধীরে ধীরে। তিনি উপলব্ধি করলেন সর্বসত্তা দিয়ে, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন যে রাজনন্দিনী— তিনি আর কেউই নন—কৃষ্ণপ্রিয়া রাধারাণী। আর সঙ্গিনী কিশোরী তাঁরই প্রাণ-

প্রিয়া ললিতা সখী। কৃপা করে শ্যামপ্রিয়া আজ দেখা দিয়েছেন তাঁকে হারানো নূপুর খোঁজার ছলে। আজ দুঃখী কৃষ্ণদাসের উদ্ধারের জন্য শ্রীমতী রাধারাণীর এ-এক করুণালীলা।

আবেগে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো কৃষ্ণদাসের। হাত দুটি জোড় করে প্রার্থনা জানালেন, 'রাধারাণী, এতই যখন কৃপা করলে এই অধমকে—তখন একবার তোমার স্বরূপ দেখিয়ে এ জীবন ধন্য করো।'

এ-কথায় স্নিগ্ধমধুর হাসি ফুটে উঠলো রাধারাণীর মুখখানায়। বললেন, "ইন আঁখোসে মেরা সত্যরূপ তুম ক্যা দেখ্ সকোগে ?"

এ-কথা শুনে দুঃখী কৃষ্ণদাস কেঁদে উঠলেন। আকুল আর্তিতে চেয়ে রইলেন ললিতা সখীর মুখের দিকে। এক অপার্থিব করুণা সৃষ্টি হলো ললিতা সখীর অন্তরে। এবার তিনি রাধারাণীকে বললেন, "প্যারীজী, যব্ তুমহারী কৃপা হুই হ্যায়, তো থোরি শক্তি ভি দান করো।"

ললিতা সখীর এ-কথায় রাধারাণী খুলে দিলেন তাঁর কৃপা-ভাণ্ডারের চাবি। মুহূর্তে খুলে গেল কৃষ্ণদাসের জ্ঞাননেত্র। দর্শন করলেন শ্রীগোবিন্দের আহ্লাদিনীর প্রকাশ।

কৃষ্ণদাসের এ-দর্শন হলো মুহূর্তমাত্র। দিব্য আনন্দে ভরে গেল তাঁর সর্বসত্ত্বা। পরক্ষণেই শুনতে পেলেন রাধারাণীর মধুর কণ্ঠের আশীর্বাদ, "কৃষ্ণদাস, তোমার একনিষ্ঠ সেবা আর অচলা ভক্তিতে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি আমি। আমার কৃপার চিহ্ন স্বরূপ তুমি নূপুর-চিহ্নিত তিলক তোমার কপালে ধারণ করো আজ থেকে।"

এবার ব্রজের রজলিপ্ত নূপুর-গাছা রাধারাণী স্পর্শ করলেন কৃষ্ণদাসের কপালে। সঙ্গে সঙ্গেই বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন কৃষ্ণদাস। তারপর রাধারাণী অন্তর্হিতা হলেন সঙ্গিনী ললিতাকে নিয়ে।

সকাল হলো। সংজ্ঞা ফিরে এলো দুঃখী কৃষ্ণদাসের। আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে এলেন শ্রীজীব গোস্বামীর কাছে। রাধারাণীর অলৌকিক দর্শন আর অপার কৃপার কথা সবিস্তারে জানালেন আনন্দ-পুলকিত মনে।

সমস্ত কথা শুনে দুচোখ বেয়ে শ্রীজীবের ঝরতে থাকলো আনন্দ-ধারা। দু-হাত তুলে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন দুঃখী কৃষ্ণদাসকে। বললেন, "দেখো বাবা, আজ থেকে তুমি আর দুঃখী কৃষ্ণদাস নও। তোমার নামের পাশে আর থাকবে না দুঃখী কথাটা। তোমার দুঃখ যে বাবা দূর হয়েছে চিরতরে। শত শত জন্ম তপস্যা করেও সহসা এ কৃপা লাভ হয় না কারও। ধন্য তুমি, ধন্য তোমার জন্ম-জীবন। শ্যামপ্রিয়া রাধারাণীর কৃপা পেয়েছো তুমি। আজ থেকে আর দুঃখী কৃষ্ণদাস নয়—লোক সমাজে অভিহিত হবে নতুন নামে—গোস্বামী শ্যামানন্দ। আর রাধারাণীর নূপুর-চিহ্নিত চিহ্নই তুমি ধারণ করবে তোমার কপালে তিলক ভূষণরূপে।"

মথুরার কাছেই বাদগ্রামে জন্ম হিতহরিবংশজীর—যিনি এই প্রাচীন সেবাকুঞ্জ—নিকুঞ্জবন, রাসমণ্ডল, বংশীবট আর মান সরোবর—লুপ্ত এই চারটি পুণ্যস্থলের প্রকট করেছিলেন। কথিত আছে, রাধারাণীর সাক্ষাৎ দর্শনও তিনি পেয়েছিলেন এই বৃন্দাবনে।

নিকুঞ্জ বা নিধুবনের মতো রয়েছে কিশোরী বন—হরিদাস ব্যাসের সাধনাস্থল। মাধ্ব সম্প্রদায়ের মাধবদাসের শিষ্য হরিদাসের জন্ম ঔরদায়—১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে এসে আর ফিরে যাননি তিনি। কথিত আছে, ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মাঘ শুক্লপক্ষে, কিশোরীবনে হরিদাস ব্যাসকে প্রকট হয়ে দর্শন দিয়েছিলেন প্রভু যুগলকিশোর।

সেই সকাল সাতটায় বেরিয়েছি, এখন বাজে বেলা নয়টা। দু-ঘণ্টায় সাইকেল রিক্সায় ঘুরে ঘুরে দেখা হলো এই পর্যন্ত। এর মধ্যে এতটুকুও বিশ্রাম নিইনি। এবার একটা দোকানে ঢুকলাম সকালের জল খাবার খেতে। উৎকৃষ্ট খাবার বলতে যা—তা হলো আটার পুরী তরকারী আর বৃন্দাবনের প্যাঁড়া। সত্যিই প্যাঁড়া আজও মুখে লেগে আছে। এখানকার হোটেলের খাবার নিরামিষ কিন্তু মুখে খুব একটা রোচে না—এমনই রান্নার গুণ। মিনিট দশেকের বিরতির পর আবার শুরু হলো চলা।

শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি এই বৃন্দাবন ধামের কথা লিখতে গেলে নারায়ণ ভট্টকে বাদ দিয়ে লেখা চলে না। ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদুরাইতে জন্ম নারায়ণ ভট্টের। সংসারের সব কিছু ছেড়ে তিনি বৃন্দাবনে চলে আসেন ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর গদাধর গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে রাধাকুণ্ডে অবস্থান এবং রচনা করতে থাকেন বহুমূল্য ভক্তিগ্রন্থ। কথিত আছে, বৃন্দাবনে আসার আগেই তিনি দর্শন পান শ্রীকৃষ্ণের। একই সঙ্গে ব্রজেশ্বর আদেশ দেন ব্রজে এসে যেন ব্রজের সেবা করেন। শুধু তাই নয়, শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন একটি বালক গোপালমূর্ত্তি—যে মূর্ত্তি ব্রজের লুপ্ত তীর্থগুলির আভাষ দিত তাঁকে। চৈতন্য মহাপ্রভুর পর তিনিই প্রথম ব্যক্তি—ব্রজের বনপরিক্রমা এবং রাসলীলা উৎসবের প্রচলন করেছিলেন। তৎকালীন রাজা ডিহরমলকে প্রভাবিত করে বৃন্দাবনে স্থাপন করেছিলেন অসংখ্য মন্দির।

রিক্সা এসে দাঁড়ালো রাধাবল্লভ মন্দিরের সামনে। পথে বেরোলে মানুষ সাধারণত ভগবানের উপর নির্ভর করেই পথ চলে। তবে এই বৃন্দাবনে এসে ঘুরতে বেরিয়ে এতটুকুও নির্ভর করছি না—করিনি শ্রীকৃষ্ণের উপরেও। স্থানীয় মন্দির আর দেববিগ্রহ দর্শনের জন্য সম্পূর্ণ ভরসা আর নির্ভর করে চলেছি মুর্শিদাবাদ থেকে চলে আসা প্রবাসী বাঙালী এই ত্রিশ বছর বয়েসের রিক্সাওয়ালার উপর। এরা এখানকার প্রতিটা অলি-গলি মন্দির চেনে তাই আমাকে খুঁজে নিতে হচ্ছে না কোথায় কোন মন্দির—কেমন ভাবে যাবো। এক একটা মন্দির দেখছি আর এসে বসামাত্রই চোঁ-চোঁ করে রিক্সা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর এক মন্দিরে। বৃন্দাবনে এসে

ভগবানের উপর ভরসা করে পায়ে হেঁটে ঘুরলে দেখা যাবে না অনেক কিছুই। রিক্সাওয়ালার উপর নির্ভর করলে অল্প সময়ের মধ্যে দেখা যাবে সব কিছুই।

টুকটুক করে মন্দিরের প্রধান প্রবেশদ্বার পেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম মন্দির চত্বরে। আর একটু এগিয়ে একেবারে নাটমন্দিরে। বেদিতে সুসজ্জিত রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব বিগ্রহ রয়েছে মন্দির-মধ্যে। এমন মনোহর মূর্তি—চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। বিশাল এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে। রাধাবল্লভের প্রাচীন মন্দিরটি নির্মাণ করেন হরিবংশজীর পুত্র ব্রজচাঁদের শিষ্য সুন্দরদাসজী। আকর্ষণীয় শিল্পকলা না থাকলেও এই মন্দিরের সাধারণ সৌন্দর্য কিন্তু কম আকর্ষণীয় নয় এই বৃন্দাবনে —অন্য মন্দিরের তুলনায়।

এখানে সময় বেশী লাগলো না। এমন সময় বেশী লাগছে না অন্য মন্দির ও বিগ্রহ দর্শনে। আবার এসে বসলাম রিক্সায়—শুরু হলো আবার চলা। সামান্য সময়ের মধ্যেই রিক্সা এসে দাঁড়ালো একটা ছোট্ট পুলের এপারে। নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নোংরা জল। পুলটা পেরিয়ে পাঁচিলে ঘেরা মন্দিরের প্রবেশদ্বার পার হয়ে এলাম মন্দির চত্বরে। এটি যোগমায়া মন্দির। সুন্দর চূড়া বিশিষ্ট মাঝারী আকারের এই মন্দিরের গর্ভগৃহে স্থাপিত রয়েছে ওই একই বিগ্রহ—রাধা আর কৃষ্ণ। এত পিরিত যে সারা বৃন্দাবনের কোন মন্দিরে কেউ কাউকে ছেড়ে নেই—যেমন গোটা অযোধ্যায় যে কোন মন্দিরে সীতাকে ছেড়ে রাম নেই, হনুমানজী নেই—এমন একটা মন্দিরও নেই।

এখান থেকে রিক্সা চললো মীরাবাঈ মন্দিরে। রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও সাংসারিক সুখে বঞ্চিতা মীরা একদা এসেছিলেন গিরিধারী গোপালের অপ্রাকৃত লীলাধাম এই বৃন্দাবনে। কোন এক দুর্বার আহ্বানই টেনে এনেছিল তাঁকে।

প্রথমে মেবারে ছিলেন কিছুদিন—সেখান থেকে চলে যান মেড়তায়, তারপর এসেছিলেন ব্রজরাজের বৃন্দাবনে। এখানে এসেই অপূর্ব এক প্রেমাবেশে ঘুরতে থাকেন তাঁর উপাস্য প্রেমের ঠাকুর প্রভু শ্যামল কিশোরের নানা লীলা স্থানগুলি।

সেই সময় সারা বৃন্দাবনে প্রবল প্রতাপ ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গোস্বামীদের। তাঁরা তখন বসেছিলেন ব্রজমণ্ডলের এক একটি অঞ্চল প্রদীপ্ত করে। যেমন রূপ, সনাতন, রঘুনাথ, শ্রীজীব প্রমুখ আচার্যরা।

রূপ গোস্বামীর ভক্তিমধুর রচনাগুলির কিছু অংশ পাঠ করেছিলেন মীরা। তাই বৃন্দাবনে আসামাত্রই মীরার মনে প্রবল ইচ্ছা জেগে ওঠে সেই ভজনসিদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্মা রূপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তিনি—একই সঙ্গে তাঁর শ্রীমুখ থেকে শুনবেন রাগানুগা ভজন উপদেশাদি।

একদিন প্রেম-প্রমত্তা কৃষ্ণময়ী মীরা কৃষ্ণের ভজন গাইতে গাইতে এসে উপস্থিত হলেন রূপ গোস্বামীর ভজন কুটিরের সামনে। মীরা রূপের দর্শন প্রার্থিনী। সেবক

গিয়ে রূপ গোস্বামীকে জানালেন মেবারের রাজ পুত্রবধূ মীরাবাঈ একটু দেখা করতে চান।

এই সময় রূপ গোস্বামী দিবারাত্র লিপ্ত থাকতেন সাধন ভজন জপতপে। সাধারণত তিনি দর্শন দিতে চাইতেন না স্ত্রীলোকেদের। তাই মীরাকে এড়ানোর জন্য সেবকের মাধ্যমে তাঁর বিশেষ অসুবিধার কথা জানালেন—মার্জনা চাইলেন ভক্তিমতী মীরার কাছে।

মীরা তখন দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'একমাত্র বাসুদেবই যে পুরুষ—সারা বিশ্ব সংসারে আর সবকিছুই হচ্ছে প্রকৃতি—পণ্ডিত প্রবর গোস্বামী কি ভুলে গেছেন ভাগবতের অনন্ত কালের এই পরম সত্য কথাটা? শ্রীধাম এই বৃন্দাবনে একমাত্র পুরুষই হচ্ছেন পরম পুরুষ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ আর সবাই যে প্রকৃতি, সুতরাং বহুজনবন্দিত গোস্বামীজী তত্ত্বদর্শী—তিনি আমার দর্শনে কেন এত কুণ্ঠিত বা ভীত হচ্ছেন?'

সেবকের মুখে এই কথা শুনে বর্ষীয়ান বৈষ্ণব আচার্য হেসে ফেললেন। তারপর উপস্থিত ভক্তদের বললেন, 'মীরা মহাসাধিকা এবং কৃষ্ণপ্রাণাও বটে। তাঁকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায়ই নেই। অতএব তাঁকে নিয়ে এসো আমার কাছে।'

এবার আন্তরিকভাবে মহাত্মা রূপের সঙ্গে কৃষ্ণলীলা-প্রেমের কথা হয় মীরার। এরপর কিছুকাল ব্রজমণ্ডলে থাকার পর মীরা চলে যান দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের আশ্রয়—দ্বারকায়।

আর আমাদের রিক্সাও এসে থামলো মীরাবাঈ মন্দিরের কাছে। পরিবেশটা একেবারেই ঘিঞ্জি। পর পর অসংখ্য বাড়ী রয়েছে এখানে। মন্দিরটা প্রায় গলির মধ্যেই বলা চলে।

রিক্সা যেখানে থামলো, সেখান থেকে কয়েক পা এগোতেই বাঁদিকে পড়লো মন্দির। মন্দির বলতে সাধারণভাবে আমাদের চোখে যে রকমটা ভেসে ওঠে—এখানে, এই বৃন্দাবনে প্রসিদ্ধ কিছু মন্দির ছাড়া আর প্রায় সব মন্দিরই সাধারণ বাড়ী যেমন হয়—তেমনই। এই মীরাবাঈ মন্দিরও ঠিক তেমন। প্রাচীনত্বের ছাপ রয়েছে সারা বাড়ীর দেয়ালে। একই সঙ্গে যত্ন আর সংরক্ষণের অভাবটাই বড় বেশী করে চোখে পড়ে। বিকানীর-এর রাজা এই মন্দিরের পুনঃনির্মাণ করেন ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর থেকে মন্দিরের গায়ে হাত পড়েছে বলে মনে হলো না।

মন্দিরের প্রবেশদ্বার পার হতেই পড়লো ছোট্ট উঠোন। তারপর সোজা তাকালেই মন্দির—চূড়া নেই। মন্দিরের দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়ে দেখলাম—ভিতরে রয়েছে একটি বেদির উপরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। তার নীচের ধাপে রয়েছে নারায়ণ শিলা।

এই মন্দির পরিচালনা ও দেখাশুনা করেন এক মধ্যবয়স্কা ভদ্রমহিলা। অদ্ভুত ভাব আর অপূর্ব সুন্দর ব্যবহার—মুগ্ধ হয়ে যাওয়ার মতো। অবাঙালী হলেও চমৎকার বাংলা বলেন। স্বভাবভক্ত এই ভদ্রমহিলা নিজেই এগিয়ে এসে বললেন, বেদিতে যে

নারায়ণ শিলাটি দেখছেন, স্বয়ং মীরাবাঈ-এর হাতের স্পর্শ আছে ওটিতে। মেবার থেকে আসার সময় সঙ্গে করে এনেছিলেন ওই নারায়ণ শিলাটি। যতদিন তিনি বৃন্দাবনে ছিলেন, ততদিন নিজ হাতে দিয়েছেন প্রতিদিন তুলসী-চন্দন। মীরার বৃন্দাবনে আসার পর থেকে আজও সযত্নে রক্ষিত এবং পূজা পেয়ে আসছে প্রতিদিন ওই নারায়ণ শিলা।

কথাটা শুনে মীরাবাঈ-এর স্পর্শ ও স্মৃতিবিজড়িত নারায়ণ শিলাটি দেখে অবাক তো হলামই—আনন্দেও মনটা আমার ভরে গেল। ভাবলাম, শত শত বছর ধরে দেহে না থাকলেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে শুধু যত্নে।

জানতে চাইলাম, মীরাবাঈ-এর স্পর্শ করা আর কিছু আছে এখানে? কথাটা শুনে জলভরা চোখে মীরা-সেবিকা বললেন, না তাঁর স্পর্শ করা বা ব্যবহৃত কোন জিনিষই আর নেই গোটা বৃন্দাবনে—একমাত্র ওই নারায়ণ শিলা ছাড়া। তবে আর একটা দুর্লভ জিনিষ আছে—সেটি হলো তাঁর পায়ের ধুলো।

কথাটা বলে আমার হাতটা ধরে কয়েক পা এগিয়ে নিয়ে গেলেন মন্দিরের ডানপাশে। দেখালেন, ছোট্ট বাঁধানো একটি বেদি। চারপাশ তারের জাল দিয়ে ঘেরা। বললেন, বৃন্দাবনে মীরা থাকাকালীন ঠিক এই স্থানটিতেই আসন করে বসে করতেন কৃষ্ণের সাধন ভজন—বুক ভাসাতেন কৃষ্ণপ্রেমের অশ্রুজলে। বৃন্দাবনে মীরার শুধু এইটুকুই আছে।

কথায় কথায় জানতে পারলাম, সংসার ছেড়ে ভদ্রমহিলা এখানে পড়ে আছেন মীরার স্মৃতি রক্ষার্থে। মীরার প্রাণের স্পর্শজড়িত নারায়ণ শিলা আর সাধন-আসন দেখে এসে বসলাম রিক্সায়। আবার শুরু হলো চলা।

এখানকার অধিকাংশ মন্দিরেই শিল্পের ছোঁয়া নেই—অনাড়ম্বর। বিশেষ করে তৎকালীন মহাত্মাদের স্মৃতি মন্দিরগুলি। যে সব মন্দিরগুলি দেখছি—এগুলি যে কেউই বৃন্দাবনে এলে দেখতে পাবেন—এইভাবে ঘুরে ঘুরে। ব্রজ ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমার মধ্যে এগুলি পড়ে না। ওটা অন্য মনের—অন্যভাবের ভ্রমণ। যতবার এসেছি বৃন্দাবনে, ততবারই ভালো লেগেছে বৃন্দাবন। বয়েসে বৃন্দাবন অতি বৃদ্ধ—তবে আমার কাছে বুড়ো বলে মনে হয়নি একবারও। যতবার বৃন্দাবন দেখেছি, ততবারই মনে হয়েছে বৃন্দাবন যেন যুবতী রাধা।

বাদশা আকবরের আমল। তখন উত্তরপ্রদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় ভক্তি সংগীত গায়ক ছিলেন ভক্ত সুরদাস। তাঁর জন্ম আগ্রা-মথুরার মধ্যে গোঘাটা নামক একটি গ্রামে। জন্ম থেকেই অন্ধ ছিলেন তিনি। প্রভু কৃষ্ণের প্রেম-রস পানের তৃষ্ণা ছিল তাঁর বুকে। তাই তাঁর নিজের রচিত ভাবময় সংগীতগুলি ছিল সব কৃষ্ণলীলা বিষয়ক। সুরদাস ছিলেন বল্লভ-সখা।

বৃন্দাবনের সঙ্গীত রসিক কুম্ভন দাস ছিলেন আচার্য বল্লভের এক বিশিষ্ট শিষ্য এবং সখা। স্বভাবভক্ত কুম্ভন দাস। কথিত আছে, তিনি চিন্ময় ঠাকুর গোবর্ধন-

জীর সঙ্গে এমন সখ্যতা স্থাপন করেছিলেন যে, কৃষ্ণ তাঁকে সখা মনে করতেন। সখার মতোই পরমানন্দে তাঁর সঙ্গে আনন্দরঙ্গ ও খেলাধুলোয় মত্ত থাকতেন প্রায়ই।

একবার সম্রাট আকবরের অন্যতম সেনাপতি মানসিংহ এসেছিলেন তীর্থদর্শনে—বৃন্দাবনে। ঘুরতে ঘুরতে এসে উপস্থিত হলেন কুম্ভনদাসের কুটিরে। দেখলেন, শ্রীবিগ্রহের সামনে বসে কুম্ভন তাঁর নিত্যকর্মে রয়েছেন গভীরভাবে মনোনিবেশ করে। কৃষ্ণের গান গাইছেন আপন মনে—আর মালা গাঁথছেন প্রভুর জন্যে। কিছু না বলেই চলে গেলেন সেনাপতি মানসিংহ।

পরদিন আবার এলেন মানসিংহ ভক্তকবি কুম্ভনদাসের কুটিরে। মনে একান্ত বাসনা হলো, কিছু অর্থদান করবেন কৃষ্ণপ্রেমিক কুম্ভনকে।

মানসিংহ এসেছেন—কোন খেয়ালই নেই কুম্ভনের। পর্ণকুটিরে তিনি প্রতিদিনের মতো লিপ্ত রয়েছেন নিত্যকর্মে। কুটিরের আর সকলে পরম সমাদরে সেনাপতিকে বসতে দিলেন কুটিরের বারান্দায়।

মানসিংহ বসে আছেন তবুও কোন খেয়ালই নেই কুম্ভনদাসের। উঠোন ভর্ত্তি হাতি ঘোড়া লোক-লস্কর। এইভাবে কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। হাতের কাজ শেষ করে কুটির থেকে বেরিয়ে এলেন কুম্ভন। মানসিংহকে দেখে বললেন, আরও একটু অপেক্ষা করুন। প্রভুর মন্দিরে যেতে হবে আমাকে—সময় হয়ে গেছে। তার আগে একটু প্রসাধন করে নিতে হবে।

কথাটা বলে গোপীচন্দনের তিলক দেবেন বলে আয়নাটা চাইলেন কুটিরের একটি বালিকার কাছে। উত্তরে বালিকাটি জানায়, আয়নাটা সে বাইরে নেবে কি করে—নীচের ফুটো দিয়ে জল পড়ে যাচ্ছে যে!

বিস্ময়ে মানসিংহ জানতে চাইলেন, আয়নার সঙ্গে জলের কি সম্পর্ক রয়েছে, তা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না।

এরই মধ্যে বালিকাটি হাতে নিয়ে এলো শালপাতা দিয়ে তৈরী বাটির মতো একটি পাত্র। তাতে জল রাখা আছে। সেই জলই পড়ছে টপ্‌টপ্ করে। কুম্ভনদাস এই পাত্রের জলে নিজের প্রতিকৃতি দেখে গোপীচন্দনের তিলক স্বরূপ করেন কপালে। এটিই তাঁর আয়না।

এই ঘটনা দেখামাত্রই মানসিংহ ইসারায় একটি সোনার তৈরী আয়না আনতে বললেন হাতির হাওদা থেকে। পরিচারকেরা তৎক্ষণাৎ এনে দিলেন সেনাপতি মানসিংহের হাতে। সেনাপতি সেটি এগিয়ে দিয়ে রাখতে বললেন কুম্ভনদাসকে।

কুম্ভনদাস সেটি নিলেন না। বিনয়ের সুরে জানালেন, সোনা বাঁধানো এই দামী আয়নাটির কোন প্রয়োজন নেই। কুটিরে থাকলে ডাকাতের ভয় থাকবে।

এবার মানসিংহ দরিদ্র ভক্তের আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে এক থলি সোনার মোহর কুম্ভনদাসের সামনে ঢেলে বললেন গ্রহণ করতে। আবারও তা প্রত্যাখান করলেন নির্লিপ্ত প্রেমিক সাধক কুম্ভন।

এবার কিছু জমি বা একটা গ্রাম নেয়ার অনুরোধ জানালেন আকবর বাদশার প্রধান সেনাপতি মানসিংহ।

এতেও রাজী হলেন না কুম্ভনদাস। এদিকে মানসিংহ আটকে রেখেছেন তাঁকে। প্রভু গোবর্ধনের মন্দিরে যেতে দেরী হয়ে যাচ্ছে অকারণ। এরজন্য ছটফট্ করতে লাগলেন তিনি।

নাছোড়বান্দা মানসিংহ এবার বললেন, 'দয়া করে একটু বলুন—কি করলে আপনি খুশী হবেন বা আপনার সামান্যতম উপকারে আসতে পারি।'

প্রশান্ত মুখেই উত্তর দিলেন কুম্ভনদাস, 'কোন রাজা বা ধনবান ব্যক্তিরা আমার কাছে না এলেই সবচেয়ে খুশী হবো আমি। আমার প্রভু গোবর্ধন আর আমার মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে কেউ ব্যবধান সৃষ্টি করুক—এ আমি চাই না মহারাজ।'

কুম্ভনদাসের এই অকপট উত্তরের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে দেরী হলো না মানসিংহের। আর অনুরোধ করলেন না তিনি। বারংবার অন্তর থেকে শ্রদ্ধা জানালেন তাঁকে। তারপর সদলবলে কুম্ভনের কুটির অঙ্গন থেকে বিদায় নিলেন মানসিংহ।

আর আমরা এসে উপস্থিত হলাম একটা বহু পুরনো বাড়ীর প্রধান ফটকের সামনে, যার উপরে একটা সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে—'শ্রীশ্রী ঠাকুর রাধাদামোদরদেবজী মহারাজ। দামোদর মন্দির।'

রিক্সা থেকে নেমে এলাম। কয়েকধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠলাম মন্দির চত্বরে। মোজায়েক করা বাঁধানো চত্বর। রাধা দামোদরের মন্দিরটি সুন্দর—সাজানো। মাঝারী আকারের মন্দির। রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ রয়েছে মন্দিরের আসন বেদীতে। নয়নাভিরাম মূর্তি। মাথায় সোনার মুকুট। অপূর্ব সুন্দর সাজে সাজানো হয়েছে বিগ্রহদ্বয়কে।

মূল মন্দিরের ডানপাশেই রয়েছে ছোট্ট একটি দরজা। এই দরজা পেরোতেই দেখলাম রূপ গোস্বামীর সমাধি মন্দির। মাঝারী আকারের মন্দিরের ভিতরে রয়েছে সমাধি বেদী পাথরে বাঁধানো। এর ঠিক বিপরীত দিকেই তাঁর ছোট্ট ভজন কুটির। এককালে ছিল পর্ণকুটির, এখন স্মৃতি রক্ষার্থে সিমেণ্ট বালির। বৃন্দাবনে আসার পর রূপ গোস্বামীর এখানেই কেটেছে সাধন জীবন—এখানেই কৃষ্ণের কোলে মাথা রেখে ফেলেছেন তাঁর শেষ নিঃশ্বাস।

রাধাদামোদরের মূল মন্দিরের বাঁদিকে কিছুটা যেতেই দেখলাম পর পর কয়েকটি সমাধিবেদী। এরই মধ্যে দিয়ে এসে দাঁড়ালাম ছোট্ট একটি সমাধি মন্দিরের দাওয়ায়। এখানে পাশাপাশি দুটি ঘরের একটিতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এবং অপরটিতে রয়েছে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর সমাধি। ভিতরে সমাধির উপর আছে বাঁধানো বেদী। (তবে আর একটি মতে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের সমাধি মন্দির রাধাকুণ্ডে।) অন্যান্য সমাধি বেদীগুলি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবদের—কোনটি বড়, কোনটি ছোট। প্রবাদ আছে, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর ধ্বনি কোন কোন ভাগ্যবান ভক্ত বা

সাধক শুনতে পান এখানে—এই সমাধিক্ষেত্রে।
তৎকালীন বৈষ্ণব চূড়ামণি রূপ ও শ্রীজীব গোস্বামীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই আজকের বৃন্দাবন। শুধু ব্রজবাসী নয়—সারা ভারতের ভক্তপ্রাণ তীর্থযাত্রী এঁদের কথা স্মরণ করেন কৃতজ্ঞ চিত্তে। আমরা বেরিয়ে এলাম দামোদর মন্দির থেকে। আবার শুরু হলো চলা।
বিশ্বনাথের আবাস কাশীক্ষেত্রের মতো ভারতের প্রায় সব সাধকেরই কোন না কোন সময় পায়ের ধূলি পড়েছে বৃন্দাবনেও। বিশেষ করে বৈষ্ণব সাধক মহাত্মাদের কেউই প্রায় বাদ যাননি এখানে আসায়। কেউ কেউ এখানে এসে আর ফিরে যাননি—ব্রতী হয়েছেন কৃচ্ছ্র সাধনায়, কেউ বা ব্রজরজ মাথায় নিয়ে চলে গেছেন আপন সাধনার পথে—অভীষ্ট লক্ষ্যে। তবে বৃন্দাবনের পরিবেশ আর এ-মাটির এমনই গুণ—কোন সাধক মহাত্মা এখানে এসে হতাশ হয়ে, কাম্যবস্তু না পেয়ে ফিরে গেছেন—এমন কথা একবারও মনে হয়নি কখনও—আজও হয় না।
সপ্তদশ শতাব্দীর কথা। ওই শতাব্দীতেই জন্মগ্রহণ করেন সিদ্ধ কৃষ্ণদাস। তাঁর মমতাময়ী মা 'সতী' হওয়ার সময় চিতাশয্যায় বসে কৃষ্ণদাসকে (বাল্যনাম বটকৃষ্ণ) বলেছিলেন, 'বাবা, তোমার স্থান উন্মুক্ত আকাশের নীচে বৃক্ষতলে—গৃহ নয়। যত শীঘ্র পারো তুমি চলে যাও ব্রজে। সেখানে গিয়ে তুমি শুরু করো কাঁথাকরঙ্গধারী বৈষ্ণবের দৈন্যময় জীবন। অকৃপণ করে মহাপ্রভু কৃপা করবেন তোমায়—এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে।'
মাতৃবিয়োগের পর আর পিছুটান রইলো না। একদা এক গভীর রাতে গৃহত্যাগ করলেন বটকৃষ্ণ। পায়ে হেঁটে রওনা দিলেন বহু আকাঙ্ক্ষিত বৃন্দাবনের পথে। পার্থিব বন্ধন মুক্তির জন্য আকুল হয়েছে প্রাণ। ব্রজমণ্ডলের অমৃতময় আকাশ-বাতাস আর পরম পবিত্র ভূমি বার বার জানাচ্ছে আহ্বান। রাধাকৃষ্ণের পাদস্পর্শে পবিত্র ব্রজের রজে দেহখানি লুটিয়ে না দেয়া পর্যন্ত কোন স্বস্তি নেই বটকৃষ্ণের।
দিনের পর দিন অর্ধাহারে অনাহারে পায়ে হেঁটে একদিন ক্লান্ত দেহ নিয়ে এলেন বৃন্দাবনে। পরম আশ্রয়ও পেলেন বটকৃষ্ণ। চরণাশ্রিত হলেন ব্রজকুণ্ডবাসী বৈষ্ণব সাধক চরণদাস বাবাজীর। বটকৃষ্ণের নতুন নামকরণ করলেন তিনি—কৃষ্ণদাস।
গুরু মহারাজ চরণদাস বাবাজীর দেহরক্ষার পর কৃষ্ণদাস গেলেন জয়পুরে। সেখানে মহারাজার অনুগ্রহে গোবিন্দজীর নিত্য সেবার ভার পেলেন কৃষ্ণদাস। কিছুকাল সেখানে থাকার পর অনিবার্য কারণে (তৃতীয় খণ্ডের জয়পুর অধ্যায়ে কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।) ফিরে এলেন বৃন্দাবনে। তারপর তৎকালীন বৃন্দাবনের উচ্চকোটি সাধক মহাত্মা জয়কৃষ্ণদাসের পরামর্শে দোমন-বনে লেগে গেলেন কঠোর সাধন ভজনে।
বৃন্দাবনের এই অরণ্যে বসে কৃষ্ণদাসের চলতে থাকে এক বিস্ময়কর তপস্যা। সারা দিনরাতের অধিকাংশ সময় কাটে রাধাকৃষ্ণের স্মরণ মনন ও লীলা-ধ্যানে। দু-চার

দিন পর পর চলে যান নন্দগ্রামে। গৃহস্থ বাড়ী থেকে চেয়ে আনেন কিছু আটা। কখনও জলে গুলে, কখনও বা আগুনের উপর রেখে রাঙা করে খান। আর এই কঠোরতপা সাধক তরকারী হিসাবে খান মাত্র কয়েকটি নিমপাতা।

এই কৃচ্ছ্র সাধন আর অর্ধাহারে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েন কৃষ্ণদাস। কিছুদিনের মধ্যে চলে গেল দৃষ্টি শক্তি—ফলে ভিক্ষায় যাওয়ার পথও গেল বন্ধ হয়ে।

ভজন কুটিরের সামনেই রয়েছে একটি কুন্ড। দৃষ্টিহীন সাধক কোন মতে হাতড়িয়ে গিয়ে জল পান করে আসেন কুন্ড থেকে। দিনের পর দিন এইভাবে চলতে থাকায় দেহ এত দুর্বল হয়ে পড়লো যে, কৃষ্ণদাসের আর সামর্থই রইলো না ওই কুন্ডের তীরে গিয়ে জল পান করা। এই জীর্ণ শীর্ণ মৃতপ্রায় দেহ নিয়েই কৃষ্ণদাসের চলতে থাকে নিয়মিত সাধন ভজন। ঠাকুরজী দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়েছেন কিন্তু এত দুঃখের আগুনে পুড়িয়েও অন্তরে জ্বালিয়ে দিচ্ছেন না প্রকৃত আলোর প্রদীপ। এতকাল ধরে বড় আশায় বুক বেঁধে বসে আছেন তিনি—তিনি যে পরম ভক্ত, তিনি যে প্রেমময় ঠাকুরজীর আপনজন। যত কাঙাল পতিতই হোক না কেন—একদিন না একদিন করুণাময়ের কৃপা যে তাঁর উপরে বর্ষিত হবেই।

পরমভক্ত কৃষ্ণদাসের ব্যর্থ হয়নি এই কৃচ্ছ্রব্রত. আকুল কান্না আর একান্ত বিশ্বাস। অবশেষে ব্রজেশ্বরী রাধারাণীর হৃদয় বিগলিত হলো—কৃপাধারা অঝরে ঝরে পড়লো তাঁর শরণাগত ভক্তের উপর।

একদিন ভাবতন্ময় সাধক কৃষ্ণদাস বসে আছেন ভজনে—সাধন-আসনে সহসা স্বর্গীয় এক আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল তাঁর ছোট্ট পর্ণকুটিরেও। ঝুনঝুন শব্দে নূপুর বাজিয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন এক দিব্যদর্শনা নারীমূর্তি। সুমধুর কন্ঠে বললেন, 'আরে এ বাবাজী, লে ইয়ে পরসাদ তু পা লে। মোরা মাঈজী তেরা দুখ্ দেখ্‌কে হামারা হথ্‌সে ইয়ে ভেজ দিয়া।'

এ-কথায় এক অপার্থিব আনন্দে হৃদয় মন উথলে উঠলো কৃষ্ণদাসের। প্রসাদের পাত্রটি হাতে নিয়ে ভোজন করলেন তৃপ্তি সহকারে। দিব্যদর্শনা নারীমূর্তি এবার আরও কাছে—প্রায় স্পর্শের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন কৃষ্ণদাসের। অন্তরঙ্গ সুরে প্রশ্ন করলেন, 'বাবাজী, তোমাকে তো দেখছি দিনরাত সাধন ভজন করে চলেছো এখানে, কিন্তু জিইয়ে রাখতে হবে তো তোমার ভজনযন্ত্র এই দেহটাকে। তুমি ভিক্ষা মাগতে যাওনা কেন গাঁয়ে ?'

এ-প্রশ্নে কন্ঠস্বর রোধ হয়ে এলো সাধকের। আবেগভরা কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'মা, আমি যে অন্ধ। কিছুই দেখতে পাইনে চোখে। ভিক্ষায় বেরবো কেমন করে ?'

অলৌকিক নারীমূর্তি বললেন স্নেহভরা সুরে. 'তবে শোন বাবা, মাঈজী এক অদ্ভুত কাজল দিয়েছেন তোমার জন্যে। এখনই তা লাগিয়ে দিচ্ছি তোমার চোখে। কিছুক্ষণ তুমি চোখ বুজে থাকো—দেখবে, আবার ফিরে পাবে তোমার আগের মতো দৃষ্টি শক্তি।'

কথাটুকু বলেই সেই নারীমূর্তি কাজল পরিয়ে দিলেন বাবাজীর দু-চোখে। তারপর অন্তর্হিতা হলেন মুহূর্তে।

দেখতে দেখতে কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। আবার শোনা গেল নূপুরের সেই সুমধুর ধ্বনি। কাছে এসে দিব্যদর্শনা নারী বললেন, 'বাবাজী, একবার দু-চোখ মেলে তাকাও। কি দেখবে—দেখো ?'

এ-এক অদ্ভুত অলৌকিক রহস্য—এ রহস্য কল্পনাও করতে পারেননি কৃষ্ণদাস। দু-চোখ খুলে তাকালেন: আবার তিনি ফিরে পেয়েছেন পূর্বের দৃষ্টিশক্তি। আগের মতোই দেখতে পেলেন সমস্ত কিছুই—আগে তিনি যা দেখতেন। কিন্তু যে স্নেহময়ী দেবীর কৃপায় তিনি ফিরে পেয়েছেন নতুন জীবন—তিনি কোথায় ? কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি ?

ঠিক এ-সময়েই বাবাজীর ছোট্ট সাধন কুটির ভরে উঠলো এক অনাস্বাদিত দিব্য-গন্ধে। কিন্তু কোথায় সে সুমধুর গন্ধের উৎস ? কোথায় সেই প্রাণপ্রদায়িণী দেবী ? আর্তি আর কান্নায় ভরে উঠলো কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণদাসের অন্তর। ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি। একেই কি বলে হতভাগ্য ? পরম বস্তু—যার জন্য কঠোর কঠিন নির্মম এই জীবন যাপন, তা হাতের মধ্যে এসেও চলে গেল অজ্ঞাত কোন কারণে ?

হতাশায় ভরে ওঠে কৃষ্ণদাসের অন্তর। অনাহারে অনিদ্রায় দেখতে দেখতে কেটে গেল তিন তিনটে দিন। মনে মনে সংকল্প করলেন কৃষ্ণদাস, যে করেই হোক সেই নারী মূর্তির রহস্য উদ্ঘাটন না করে তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না। তাতে এ-দেহ যায়—যাক্।

তৃতীয় দিনের গভীর রাত। সাধন আসনে আছেন কৃষ্ণদাস অনাহারে, অনিদ্রায়। হঠাৎ দেখতে পেলেন ছোট্ট কুটির তাঁর ভরে উঠলো এক তীব্র উজ্জ্বল আলোয়। তারপর ধীরে ধীরে সেই আলোর মধ্যে থেকে নেমে এলেন এক অপরূপ লাবণ্যবতী দেবী। হাসিমাখা মুখ থেকে ঝরে পড়ছে আনন্দ আর মাধুর্যের রসধারা। প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে বললেন, 'বাবা কৃষ্ণদাস, অন্তরে এত ক্ষোভ রেখেছো কেন ? আমি তোমার কাছেই আছি। আমি তো আপনা হতেই ছুটে এসেছি তোমার কাছে। তোমার কষ্ট জানবে আমারই কষ্ট। ভক্ত আর ভগবান জানবে অভিন্ন হৃদয়। তাঁকে ডাকলে সে না এসে পারে বাবা! এখন থেকে যে তুমি আমার, আমি তোমারই। আমার প্রাণপ্রিয়া ললিতা সখী তোমার কষ্টে কাতর হয়েছিল। তাঁরই হাতের স্পর্শ দিয়ে চোখদুটি দান করেছে তোমার। নিশ্চিন্ত মনে তুমি এখান থেকে চলে যাও গোবর্ধনে। সেখানে রয়েছে বহু বৈষ্ণব সাধক। তাঁরা আমার ভজন করে যাচ্ছে। তুমি সেখানে গিয়ে উন্মুক্ত করে দাও প্রেম সাধনার সহজ পথটি—আর নিরন্তর তুমি ডুবে থাকো আমার মাধুর্যরসে।'

কথা শেষ হতেই অন্তর্হিতা হলেন শ্রীমতী রাধারাণী। সিদ্ধ হলেন কৃষ্ণদাস। হৃদয় তাঁর উত্তাল হলো রাধা-প্রেমের প্রেমানন্দে। দিব্যভাবে ভাবতন্ময় কৃষ্ণদাস পর্ণকুটির

ছেড়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে। টলতে টলতে এসে উপস্থিত হলেন গোবর্ধনের চাকলেশ্বরে।

আর আমাদের নিয়ে রিক্সাওয়ালাও এসে উপস্থিত হলো বাঁকে বিহারী বা বঙ্কুবিহারী মন্দিরের কাছে। এখানকার রাস্তা বেশী চওড়া নয়। দুটো রিক্সা পাশাপাশি যেতে পারে ভালো ভাবে। বহু দোকানপাট আর অসংখ্য লোক গিজগিজ করছে। অধিকাংশ দোকানই 'মিঠাই কা দুকান'। সকাল থেকে এই পর্যন্ত যতগুলি মন্দির দেখেছি—তার মধ্যে এত ভীড় আর লোক সমাগম চোখে পড়েনি কোথাও। এক কথায় গমগম করছে জায়গাটা।

রিক্সা থেকে নেমে ডানদিকেই পড়লো একটা গলি। বেশী চওড়া নয়। দু-পাশেই সারি দিয়ে রয়েছে দোকানপাট—যেন বেনারসের বিশ্বনাথ গলি। সোজা কিছুটা আসতেই বাঁদিকে পড়লো উঁচু দালান। পাশ দিয়েই রয়েছে সিঁড়ি। অল্প কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম মন্দিরের দালানে। আরও একটু এগোতেই বাঁদিকে পড়লো দরজা। ঢুকে গেলাম মন্দিরে। অনেকটা জায়গা জুড়েই মন্দির।

ব্রজবাসীদের প্রাণের ঠাকুর বাঁকে বিহারীজী। দ্বারকা. জয়পুরের গোবিন্দ মন্দির এবং উদয়পুরের নাথদোয়ারায় স্থাপিত মূর্তির মতো অবিকল মূর্তি এই বঙ্কুবিহারীজীর। কুচকুচে কালো কষ্টি পাথরের বিগ্রহ। হাতে মোহন বাঁশি। মাথায় সোনার চূড়া। চরণ দুটি ঢাকা রয়েছে বস্ত্র দিয়ে। অপূর্ব এবং অত্যন্ত চমকপ্রদ এই মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে থাকলে চট করে চোখ নামিয়ে নেয়া সম্ভব হয় না। শুধুমাত্র বছরে একবার—অক্ষয় তৃতীয়াতে বাঁকে বিহারীজীর চরণ দর্শন করতে পারে সকলে—তখন সরিয়ে দেয়া হয় পায়ের বস্ত্র। আর সারা বছরই ঢাকা থাকে। এখানেও ঝাঁকে ঝাঁকে দর্শন—ঝাঁকি দর্শন।

সমগ্র বৃন্দাবনের মুখ্য মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম এই বাঁকে বিহারী মন্দির। কথিত আছে, স্বামী হরিদাসজী নিধুবনের বিশাখা কুণ্ডে এই শ্রীবিগ্রহটি পেয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এখানে।

বেলা প্রায় বারোটা বাজতে চললো। ফিরে এলাম ধর্মশালায়। স্নান খাওয়া সারতে হবে। রিক্সাওয়ালাকে বলে দিলাম এক ঘণ্টা পরে আসতে। ঘাড় নেড়ে বেল বাজিয়ে চলে গেল। আমিও সঙ্গীসহ ঢুকে গেলাম ধর্মশালার ঘরে।

কাঁটায় কাঁটায় বেলা একটা। রিক্সাওয়ালা এসে হাজির। আমরাও তৈরী হয়েছিলাম। রিক্সা চললো গোবিন্দজীর মন্দিরে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের কথা। বৈষ্ণবীয় দৈন্যতার এক জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি ভগবানদাস বাবাজী। উড়িষ্যাবাসী এই পরম বৈষ্ণব তখন রয়েছেন কালনার শ্রীপাটে। কোন একটি দিনের কথা। ঠাকুরজীর উপলভোগ সেদিন সবে মাত্র শেষ হয়েছে। নিত্যসঙ্গী ঝুলি আর মালা হাতে বাবাজী মহারাজ ঢুকেছেন তাঁর ভজন

কুটিরে। গভীর ভজনাবেশে অন্তরে চলেছে তাঁর নামব্রহ্মের অনুধ্যান। তন্ময়তায় কখন থেমে গেছে তাঁর হাতের জপের মালা।

এমন সময় তাঁর ভজন কুটিরে প্রবেশ করলেন বর্ধমানের মহারাজা। বাবাজী মহারাজের দর্শনপ্রার্থী তিনি। হঠাৎ কোথা থেকে কি ঘটে গেল—জপের মালা ফেলে আসন ছেড়ে চিৎকার করে উঠলেন, "ওরে মার মার, তাড়িয়ে দে।"

বাবাজীর এ-কথায় একেবারে বিস্মিত হয়ে গেলেন দর্শনার্থী মহারাজ। সিদ্ধ সাধুর ভজন কুটিরে এসেছেন প্রণাম করতে অথচ এ-কি বিপত্তি। ভাবলেন, বিষয়ী মানুষ তিনি। তাই হয়তো সিদ্ধসাধক এড়িয়ে যেতে চাইছেন তাঁকে। কিন্তু এর পরই একেবারে স্থির হয়ে গেলেন বাবাজী। আগের মতোই বুজে ফেললেন চোখ দুটি। দেহটি হয়ে গেল নিস্পন্দ। বাহ্যজ্ঞান বিরহিত সাধকের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন মহারাজা। ভাবলেন, সম্বিৎ ফিরে এলে জানতে চাইবেন—কেন এই ক্রোধ প্রকাশ করলেন তিনি?

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল এই ভাবে। এবার বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলো সাধকের। মালাটি কুড়িয়ে নিলেন হাতে। তারপর দেখলেন, সামনেই বসে আছেন অতিথি মহারাজ। আনন্দ-বিগলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কখন আসা হয়েছে এখানে? পরমানন্দময় ঠাকুর সর্বাঙ্গীণ আনন্দে রেখেছেন তো? ঠাকুরজীর প্রসাদ কি পেয়েছেন এখানে?'

বিস্ময়ে হতবাক হলেন মহারাজা। একটু আগেই যাঁকে তাড়াতে তিনি উদ্যত, অল্পক্ষণের মধ্যেই একি অদ্ভুত রূপান্তর? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'বাবা, আপনার ভজন কুটিরে ঢোকার সময় আপনি এমনভাবে আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন কেন? বিষয়ী হতে পারি তবে নামব্রহ্মের দর্শনার্থীও তো বটে! কি অপরাধ আমার—অমন কটু কথা বললেন?'

এ-কথায় ততোধিক বিস্মিত হয়ে আত্মভোলা সাধক বললেন বিনয়ী হয়ে, 'সে কি গো বাবা, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই গুরু বিরাজ করছেন। বৈষ্ণবের কাছে প্রতিটি মানুষই যে পরম আরাধ্য। কাউকে কটু কথা বললে যে শ্রীভগবানকেই অসম্মান করা হয়। আপনাকে কখন কটু কথা বললাম আমি?'

মহারাজ জানালেন তাঁর একটু আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা। বড় লজ্জিত হলেন বাবাজী মহারাজ। এবার তিনি বললেন কোমল, সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে, 'না বাবা, আপনাকে উদ্দেশ্য করে অমন কথা বলিনি আমি। মনে কোন দুঃখ করবেন না। কখন এসেছেন ভজন কুটিরে—তা এই স্থূল চোখে দেখিনিও আমি। সে সময় দেখলাম, একটা ছাগল বৃন্দাবন ধামে গোবিন্দ মন্দিরের তুলসীমঞ্চের উপরে উঠে তুলসীপাতাগুলো খেয়ে ফেলছিল। ভাবলাম, প্রভুর সেবায় বিঘ্ন হবে। তাড়িয়ে দিচ্ছিলাম ওটাকে। কটু কথা যা বলেছি বাবা, তা ওই ছাগলটাকে লক্ষ্য করেই বলেছি।'

ভগবানদাস বাবাজীর একথায় বিস্ময়ের অবধি রইলো না মহারাজের। বাবাজী মহারাজ বসে আছেন বর্ধমান-কালনার ছোট এক ভজন কুটিরে, অথচ স্থূলদেহে উপস্থিত হলেন বৃন্দাবনে। তাড়িয়ে এলেন তুলসীমঞ্চের ছাগলটিকে। কিছুই বোধগম্য হলো না মহারাজের। সঙ্গে সঙ্গে দেখে নিলেন হাতের ঘড়িটা। তারপর যথা সময়ে ফিরে গেলেন তিনি।

এবার বর্ধমান-রাজ ভাবলেন, জানা দরকার, সত্যিই এই সময় এ-রকম কোন ঘটনা ঘটেছিল কিনা বৃন্দাবনে! সেদিন সময় উল্লেখ করে তার পাঠালেন বৃন্দাবনে তাঁরই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে। উত্তর এলো—সত্যিই তাই, গোবিন্দজীর তুলসী-মঞ্চের চারা গাছটি খাচ্ছিল একটি ছাগলে। কালনা নিবাসী ভগবানদাস মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে লাঠি হাতে চিৎকার করে তাড়িয়ে দেন ছাগলটিকে।

অলৌকিক এই ঘটনার কথা জেনে মহারাজের যেমন বিস্ময়ের অন্ত রইলো না, তেমনই বিস্ময়ে বিমূঢ় হলেন স্থানীয় আর সকলে। বুঝলেন, ভজনাবেশের মধ্যে দিয়ে এই সিদ্ধ মহাপুরুষ স্থূলদেহে গেছিলেন বৃন্দাবনে।

মহাপ্রভুর প্রেম-ভক্তির প্রবাহ ধারায় ভেসে কাঙাল বৈষ্ণবের বেশে প্রথম জীবনে ভগবানদাস বাবাজী চলে আসেন বৃন্দাবনে। উৎকলদেশীয় মহাবৈষ্ণব সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজীর চরণ তলে আশ্রয় নেন—ভেক গ্রহণ করেছিলেন তাঁরই কাছ থেকে। দীর্ঘদিন তিনি রাগানুগা সাধনের নিগূঢ় নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে গুরু কৃষ্ণদাস বাবাজীর আদেশে পরবর্তীকালে আবার ফিরে এসে বসবাস করেন আম্বিকা কালনায়।

বাসন্তীবাঈ ধর্মশালা থেকে সামান্য সময়ের মধ্যেই আমাদের নিয়ে রিক্সা এসে দাঁড়ালো বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ গোবিন্দজীর মন্দিরের সামনে।

রিক্সা থেকে নেমে এগোতে লাগলাম মন্দিরের দিকে। উপর থেকে নীচের দিকে নেমে এসেছে ঢালু হয়ে রাস্তা। এটাই মূল মন্দিরের বাইরের প্রাঙ্গণ। এর দু-পাশেই রয়েছে মাত্র কয়েকটা দোকানপাট। এখন তেমন কিছু ভীড় নেই। কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম মন্দিরের দালানে।

গোবিন্দজীর বিশাল এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে আগাগোড়া লাল বেলে পাথর দিয়ে। পায়ে পায়ে আরও একটু এগিয়ে যেতেই মূল গর্ভমন্দিরের বেদীতে দেখলাম, রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ এবং পাশেই রয়েছে নিত্যানন্দ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মূর্তি। এখানে একজন পূজারী বসে আছেন সর্বক্ষণ। পূজার উপকরণ নিয়ে এলে তা নিবেদন করে প্রসাদ হিসাবে দিয়ে দেন যাত্রীরই হাতে।

রাজস্থানী শিল্পকলায় ভরপুর এই মন্দিরটি ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেন অম্বরীশ মহারাজ মানসিংহ। একথা লেখা রয়েছে মন্দিরের গায়ে লাগানো একটি সাইন বোর্ডে। বৈষ্ণব আচার্য রূপ গোস্বামীর ব্যবস্থাপনায় এবং সম্রাট আকবরের সহায়তায় এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন রাজপুত সেনাপতি—এ-কথাই প্রচলিত আছে সারা বৃন্দাবনে।

আবার অনেকের মতে, মানসিংহ এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে। মন্দির নির্মাণে সহায়তা করেছিলেন সম্রাট আকবর। ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে একবার বাদশা ছদ্মবেশে এসেছিলেন এই মন্দিরটি দেখতে।

শুধু মথুরা বৃন্দাবনেই নয়, সমগ্র উত্তর-ভারত জুড়েই এর প্রসিদ্ধি। রাজস্থানী শিল্প-ঢঙে নির্মিত এই মন্দিরের সারা দেয়ালেই রয়েছে কারুকার্যখচিত। এক সময় বিশাল এই মন্দিরটি ছিল সাততলা। মন্দিরটি এত উঁচু ছিল যে, দিল্লী থেকেও দেখা যেতো এর সুউচ্চ চূড়াটি। কথিত আছে, পরবর্তীকালে মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব স্পর্ধিত এই মন্দিরের চূড়া দেখে জ্বলে ওঠেন ক্রোধে। আদেশ দেন ভেঙে ফেলার। ভাঙাও হলো উপর থেকে তিনতলা পর্যন্ত। বর্তমান মন্দিরে কোন চূড়া নেই। বিশাল এলাকা নিয়ে স্থাপিত হয়েছে এই গোবিন্দজীর মন্দির।

গোবিন্দজীর বিগ্রহ লাভ এবং মন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে আজও এই বৃন্দাবনে—

বাদশা হুসেন শাহের রাজকার্য ছেড়ে একদা রূপ গোস্বামী মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পুণ্যময় সান্নিধ্যে দশদিন কাটালেন প্রয়াগে। এই সময় মহাপ্রভুর মুখে শুনলেন বৈষ্ণবীয় সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব আর কৃষ্ণ-সেবার মাহাত্ম্য বর্ণনা। তারপর মহাপ্রভুরই আদেশে এলেন বৃন্দাবনে। শ্রীকৃষ্ণ হলেন বৃন্দাবনের রাজা আর তাঁর রাজ প্রতিনিধি হলেন রূপ গোস্বামী—একথা বলেছেন মহাপ্রভুই।

ব্রজমণ্ডলে হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন বিগ্রহগুলির একটি—মদনমোহনকে উদ্ধার করেন সনাতন গোস্বামী। এবার শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র ব্রজনাভ-র আমলের আরও একটি বিগ্রহ উদ্ধার করলেন আজন্ম সুকবি রূপ গোস্বামী।

প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থাদি পড়ে রূপ জানতে পারলেন যে, মহারাজ ব্রজনাভ-র গোবিন্দজীর বিগ্রহটি রয়েছে বৃন্দাবনেরই যোগপীঠে। তখন থেকেই গোবিন্দজী বসে গেলেন রূপের হৃদয়-সিংহাসন জুড়ে। দিবারাত্র তাঁর একই ধ্যান, একই জ্ঞান ওই গোবিন্দজী। কিন্তু রূপ জানেন না কোথায় সেই যোগপীঠ—দুর্গম বনে না নদীগর্ভে। কোথায় আত্মগোপন করে আছেন প্রেমের ঠাকুর, প্রাণের ঠাকুর গোবিন্দজীর বিগ্রহ।

সাধন ভজন করেন কাঙাল বৈষ্ণব রূপ গোস্বামী। আর আকুল প্রার্থনা জানান তাঁর প্রাণনাথের কাছে, 'কোথায় আছো প্রভু, সন্ধান দাও তোমার এই অধম ভক্তকে। প্রাণের জ্বালা তুমি জুড়াও প্রভু।'

প্রতিদিনের প্রার্থনায় কৃপার উদ্রেক হলো গোবিন্দজীর। ভক্তের ডাকে সাড়া দিলেন ভগবান। রূপ একদিন বসে আছেন যমুনাতীরে। সজল চোখে ভাবতন্ময় হয়ে তিনি স্মরণ করে চলেছেন তাঁর কৃপাময় গোবিন্দজীর কথা। হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এলো একটি ব্রজবালক। অপরূপ দিব্য লাবণ্যময় শ্যামকান্তি নধরদেহ।

চোখ ফেরানো যায় না। তন্ময় হয়ে অপলক দৃষ্টিতে রূপ চেয়ে রইলেন সেই বালকটির দিকে। ব্রজবালক বললেন, 'বসে বসে অত কি ভাবছো বাবাজী—গোবিন্দজীর কথা? তোমার গোবিন্দজী তো রয়েছেন গোমাটিলার ভিতরে।'

এ-কথায় চমকে উঠলেন রূপ। বলে কি এ-বালক! এ যে তাঁর প্রাণনাথের সন্ধানের কথা। ধ্যানের আবেশ কেটে যায় রূপের। উঠে দাঁড়ান আসন ছেড়ে। ব্যাকুল কণ্ঠে জানতে চান, 'কোথায় সেই গোমাটিলা—যেখানে শত শত বছর ধরে অভুক্ত অনাদৃত হয়ে পড়ে রয়েছেন প্রাণনাথ গোবিন্দজী।'

উত্তরে ব্রজবালক জানালেন, 'গোমাটিলায় প্রতিদিন একটি গাভী চরতে আসে দুপুর বেলায়। তারপর একটি নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে প্রাণভরে ছেড়ে দেয় দুধের ধারা। তারপর আবার চলে যায়। যেখানে দুধ ঢেলে দেয়—ঠিক সেখানেই রয়েছেন গোবিন্দজী।'

কথা কটি বলেই বালক অন্তর্হিত হলেন নিমেষে। মূর্ছিত হয়ে পড়লেন রূপ। যখন সংবিৎ ফিরে পেলেন তখন দেখলেন অপার্থিব এক আনন্দে ভরে উঠেছে রূপের দেহ মন ও অন্তরাত্মা। বুঝতে আর বাকি থাকে না রূপের। তাঁর আরাধ্য দেবতা স্বয়ং গোবিন্দজীই এসে জানিয়ে গেলেন তাঁর নিজেরই অবস্থানের কথা।

তৎক্ষণাৎ উন্মত্তের মতো ছুটে গেলেন সেই গ্রামে। গ্রামবাসীদের জানিয়ে দেন গোমাটিলার গাভী আর গোবিন্দ-বিগ্রহের রহস্যের কথা। আবেগে রূপের দু-গাল বেয়ে ঝরতে থাকে কৃষ্ণপ্রেমের অশ্রুধারা। সনাতনের কথায়, রূপের উৎসাহ আর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে গ্রামবাসীরা। শুরু হয়ে যায় খননের কাজ। অদ্ভুত কাণ্ড—বেরিয়ে আসে প্রেমের ঠাকুর গোবিন্দজীর প্রাচীন পবিত্র বিগ্রহ—যে বিগ্রহ এক সময় পূজা পেয়ে এসেছে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র ব্রজনাভ-র হাতে। রূপের আকুল আর্তির আর তপস্যার ফলে কৃপা করে বৃন্দাবনে প্রকটিত হলেন গোবিন্দজী।

এই গোমাটিলাই ছিল দ্বাপর যুগের যোগপীঠ। গোবিন্দজীর এই বিগ্রহই প্রতিষ্ঠা ও পূজা করেছিলেন মহারাজ ব্রজনাভ। রূপ ও সনাতনের সহকর্মী ছিলেন রঘুনাথ ভট্ট। তাঁরই এক ধনবান শিষ্য একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন গোবিন্দজীর—এই গোমাটিলায়। উত্তরকালে আজকের বিশাল মন্দিরটি নির্মাণ করেন আকবর বাদশার সেনাপতি রাজপুত মহারাজা মানসিংহ। এই মন্দিরের দক্ষিণ দিকে—পাশেই রয়েছে একটি ছোট মন্দির। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন এক ভক্তপ্রাণ বাঙালী নন্দকুমার বসু। কথিত আছে, রূপ গোস্বামীর কাছে এখানেই প্রকটিত হয়েছিলেন গোবিন্দজী। যোগপীঠের এই মন্দিরে স্থাপিত রয়েছে দেবী যোগমায়ার বিগ্রহ—যিনি বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ লীলার ঘটনকর্ত্রী। আর যোগমায়া মন্দিরের বাঁপাশেই মাঝারী আকারের অনাড়ম্বর মন্দিরটি বৃন্দাদেবীর। স্থাপিত বিগ্রহটি তাঁরই।

তবে মানসিংহ এবং পরবর্তীকালে নন্দলাল বসু নির্মিত মন্দিরের কোনটিতেই

মহারাজা ব্রজনাভ পূজিত গোবিন্দজীর প্রাচীন বিগ্রহটি নেই। এখন নিত্য পূজো হয় প্রতিকৃতি বিগ্রহ। কথিত আছে, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মন্দির ভাঙার আদেশ বৃন্দাবনে পৌছানো মাত্রই মন্দিরের বিগ্রহ সরিয়ে ফেলা হয় গোপনে। বিগ্রহ কলুষিত হওয়ার ভয়ে রূপের গোবিন্দজীর প্রাচীন বিগ্রহ জয়পুরে এবং করৌলি নামক স্থানে স্থানান্তরিত করা হয় সনাতন গোস্বামীর উদ্ধার করা মদনমোহনের মূল বিগ্রহ।

এবার আমাদের রিক্সা চললো গোপীনাথ মন্দিরের পথে। ভাবছি বৃন্দাবনের কথা। শত শত বছর ধরে যমুনার মতো কত যে পরিবর্তনের স্রোত বয়ে গেছে বৃন্দাবনের উপর দিয়ে তার ইয়ত্তা নেই। তবুও ভক্তের কাছে এতটুকুও পরিবর্তন ঘটেনি এই ব্রজেশ্বর আর বৃন্দাবনের। আজও বৃন্দাবনে পা রাখলে এখানকার পশুপাখী বৃক্ষলতা এমনকি প্রতিটি ধূলিকণা যেন বলে দেয়—বৃন্দাবন ছেড়ে আর কোথাও যায়নি কানাই। অজস্র পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েও তার চিরন্তন বাঁশীর সুর আকর্ষণ করে চলেছে ভক্তপ্রাণ তীর্থযাত্রী আর অগণিত পর্যটকদের—যে সুরে মানুষ হারিয়ে ফেলে নিজেকে—ভুলে যায় ভেদাভেদ—ছুটে আসে সব ফেলে পরম পথের সন্ধানে—এই বৃন্দাবনে। এ সেই বৃন্দাবন—যেখানে ব্রজবাসীরা মুক্তি ও বৈকুণ্ঠ কামনাকে তুচ্ছ মনে করে শ্রীকৃষ্ণকে বেঁধে রেখেছিলেন প্রেমভক্তির দড়ি দিয়ে। এ-সেই বৃন্দাবন—যেখানে শত সহস্র ব্রজবালা, ভক্ত সাধক প্রেমাশ্রুর অর্ঘ্য সাজিয়ে দিবারাত্র ডেকেছেন ভগবানকে—যার স্মৃতি আজও রক্ষা করে চলেছে মর্ত্যের বৈকুণ্ঠ এই বৃন্দাবন। সেইজন্যেই তো প্রেমধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে বৃন্দাবনে—কৃষ্ণ-প্রেমিক বৃন্দাবনের। যেখানে মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রেমকে উপেক্ষা করতে পারেননি শ্রীকৃষ্ণ নিজে। প্রেমময় বৃন্দাবন—বৃন্দাবন প্রেমময়।

রিক্সা এসে দাঁড়ালো গোপীনাথ মন্দিরের সামনে। গোবিন্দজীর মন্দির থেকে এখানে আসতে বেশী সময় লাগলো না। রিক্সা থেকে নেমে এলাম মন্দির চত্বরে। মাঝারী আকারের প্রাচীন মন্দির। শিল্পের কোন আড়ম্বর নেই মন্দিরের কোন অংশে। মন্দিরে স্থাপিত বিগ্রহ দুটি রাধারাণী আর গোপীনাথের। গোপীদের প্রাণপুরুষ ছিলেন বলেই বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ প্রসিদ্ধিলাভ করেন গোপীনাথ নামে। রাধারাণীর পাশেই রয়েছে জাহ্নবী দেবীর বিগ্রহ। গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন তৎকালীন বিখ্যাত মহাত্মা মধুপণ্ডিত। এই বিগ্রহটি শ্রীমদনমোহন এবং গোবিন্দজীর বিগ্রহের তুলনায় আকারে অনেক ছোট। তবে সুন্দর ও রমণীয় মূর্তি।

কথিত আছে, একদা মধুপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লালসায় ঘুরতে থাকেন বৃন্দাবনের বনে বনে। কিন্তু তাঁর দর্শন না পেয়ে একদিন আকুল হয়ে গোপীনাথের নাম করতে করতে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন। তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দর্শন দিলেন মধু পণ্ডিতকে। জানালেন তাঁর অবস্থানের কথা। বাহ্যজ্ঞান ফিরতে পণ্ডিত ছুটে যান বংশীবটে। সেখানে মাটি খুড়ে উদ্ধার করেন গোপীনাথকে। তারপর বিগ্রহ

স্থাপন করেন নিজ হাতে। মন্দিরের কাছেই রয়েছে মধু পণ্ডিতের বাড়ী।
তবে গোপীনাথের মূল এবং প্রাচীন মন্দিরটি এখন আর নেই। মধু পণ্ডিতের নির্দেশে প্রথম মন্দিরটি ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন করেছিলেন সম্রাট আকবরের সভার রাজপুত বীর রাই মিলজী মতান্তরে রাজপুতনার এক বিশিষ্ট ভক্ত রায় শাগনজী। কালক্রমে এই মন্দিরটি বিনষ্ট হয়ে যায়। কারও মতে, ঔরঙ্গজেব মন্দিরটি ধ্বংস করে দেন। পরবর্তীকালে, আজকের মন্দিরটি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে নতুন করে নির্মাণ করেন স্বর্গীয় মহাত্মা নন্দকুমার বসু। আরও দুটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন তিনি—গোবিন্দ মন্দির (ছোট) এবং মদন মোহন মন্দির। বৃন্দাবনে গোপীনাথ এবং শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লুপ্ত লীলাক্ষেত্র উদ্ধার করে মধুপণ্ডিত আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন বৃন্দাবনের আধ্যাত্মিক পটভূমিতে—থাকবেনও, যতদিন বৃন্দাবন থাকবে—ততদিন।
বৃন্দাবনে গোপীনাথ, গোবিন্দ মন্দির (নন্দকুমার বসু প্রতিষ্ঠিত) এবং মদন মোহন মন্দির—এই তিনটি মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করতে হলে ভেট দিতে হয় যাত্রীদের, নইলে বিগ্রহ দর্শন করতে দেওয়া হয় না।
প্রথমে গোপীনাথ মন্দির, পরে মধু পণ্ডিতের বাড়ী হয়ে আবার এসে বসলাম আমাদের তিন চাকাওয়ালা রিক্সায়। শুরু হলো চলা।
মন্দির শহর বৃন্দাবন। এখানে প্রতিটি বাড়ীই মনে হয় এক একটি মন্দির। আর শহর বৃন্দাবন ছোট হলেও বৃন্দাবনের কোল ভরে রয়েছে প্রায় সব প্রদেশের বাসিন্দায়। বাঙালী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, গুজরাটি, হিন্দি, উড়িয়া, মাদ্রাজী—কোন প্রদেশের বাসিন্দা নেই এখানে! তবে বৃন্দাবনে পা দিলে কখনই মনে হবে না বাংলার বাইরে কোন বাঙালী পা দিয়েছেন। আর বৃন্দাবন প্রেমিক বলেই এখানে সমস্ত সম্প্রদায়ের কিছু না কিছু প্রতিষ্ঠান স্থান পেয়েছে—চলছেও তারা স্বাধীন ভাবে। শ্রীধাম বৃন্দাবন কারও মনোবাসনাই অপূর্ণ রাখেনি।
রিক্সা এসে দাঁড়ালো যমুনা পুলিন—যমুনা তীরে। যে পাঁচ ক্রোশ এলাকা নিয়ে বৃন্দাবন পরিচিত ছিল—তার নির্দিষ্ট স্থানটি ছিল যমুনা পুলিন। বর্তমানে অসংখ্য বাড়ী ঘর হয়ে গেছে এখানে। তাই সামান্য একটু জায়গা আর কয়েকটি রাধাকৃষ্ণের মন্দির নিয়েই শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি রক্ষা করছে যমুনা পুলিন। কথিত আছে, ব্রজবালাদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এখানেও রাসলীলা করেছিলেন। তাই এটি শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান। লোক বিশ্বাস, সমস্ত পাপ মানুষের দূরীভূত হয় এই যমুনা পুলিনের ধূলা মাথায় স্পর্শ করলে।
ভারতের প্রায় সমস্ত উচ্চকোটি সাধকের কৃপাধন্য মহাপুরুষ ছিলেন প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। তাঁর জন্ম ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট, ঝুলন পূর্ণিমার সন্ধ্যায়। সাধন ও তীর্থ ভ্রমণ জীবনে এক বৎসরের কিছু বেশী সময় তিনি কৃষ্ণপ্রেমরস আস্বাদন করেছিলেন শ্রীবৃন্দাবনে বাস করে। বৃন্দাবনে তিনি এসেছিলেন বাংলা

১২৯৭ সালে—১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে।

বৃন্দাবনে থাকাকালীন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ ও দর্শন হয়। ওই সময় পরমভাগবত গৌরকিশোর দাসের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা হয় প্রভুপাদের। উভয়েই পরম তৃপ্তি ও আনন্দলাভ করতেন রাধাকৃষ্ণের কথা ও কাহিনী আলোচনা করে।

একবার ভক্তবৃন্দসহ তিনি বেড়াচ্ছিলেন এই যমুনা পুলিনে। হঠাৎ বালুর মধ্যে একটি অস্থি দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিলেন হাতে। উপস্থিত সঙ্গীদের বললেন, 'চেয়ে দেখো, পবিত্র হরেকৃষ্ণ নামের ছাপ পড়ে গেছে এই হাড়টিতে। কি অপূর্ব প্রভাব বৃন্দাবনের বৈষ্ণবদের নাম সাধনার। অবিরত নাম করার ফলে এমন নামাঙ্কিত হয়ে যায় সাধকের অস্থিমজ্জা।'

গোঁসাইজীর পত্নী যোগমায়া দেবী বৃন্দাবনে থাকাকালীন বলেছিলেন, ব্রজধাম হলো রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাভূমি। এখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন তিনি। হয়েছিলও তাই। শুদ্ধাত্মা সাধিকা গোঁসাই পত্নী রাধারাণীর কোলেই মাথা রেখে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেছিলেন এই বৃন্দাবনে।

যমুনা পুলিন থেকে আবার রিক্সা চলতে শুরু করলো। রিক্সাওয়ালাকে কিছু বলতে হচ্ছে না। ওই ওর সুবিধা মতো রাস্তা ধরে, নিজের ইচ্ছা মতো একটা মন্দির থেকে নিয়ে চলেছে আর একটা মন্দিরে। দেখতে দেখতে চলে এলো রাধাবাগে।

যমুনার ধারে দারুণ সুন্দর জায়গা। বসন্তকে যেন ধরে রেখেছে রাধাবাগ। মুগ্ধ হয়ে যাওয়ার মতো প্রাকৃতিক পরিবেশ। ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে ময়ূর ময়ূরী। মাঝারী আকারের সুন্দর একটি মন্দির—মন্দির-মধ্যে স্থাপিত বিগ্রহ রাধারাণী আর ব্রজেশ্বরের। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মন্দির-অঙ্গন।

শ্রীকৃষ্ণের আর একটি লীলাস্থল পাণীঘাট—রাধাবাগ থেকে একেবারেই কাছে। এখান থেকে রঙ্গজীর বাগান আর কাত্যায়নীর মন্দিরও খুব বেশী দূরে নয়।

বৃন্দাবনে থাকাকালীন একবার এই রাধাবাগে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু নিমগ্ন ছিলেন গভীর ধ্যানে। তাঁর জীবন-কথায় আছে, সেই সময় জ্যোতির্ময় মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। এই দর্শনে গোস্বামী প্রভুর দেহ মনে জেগে ওঠে এক মহাভাবের প্রভাব। বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তিনি।

আরও অসংখ্য সাধকের পাদস্পর্শে রাধাবাগ পবিত্র হয়ে রয়েছে আজও। একদা প্রভু জগদ্বন্ধুর আগ্রহ ও ব্যবস্থাপনায় রামদাস বাবাজী মহারাজ রওনা দিলেন বৃন্দাবনে। বহুদিনের ইচ্ছা পূর্ণ হলো। বয়েসে একেবারেই তরুণ। মাত্র সতেরো বছর। মহাধামে এসে আনন্দের আর সীমা রইলো না রামদাসের। তখন ঝুলনের সময়। দূর-দূরান্তর থেকে অগণিত ভক্ত ও তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়েছে এই মহাতীর্থে। মন্দিরে কুঞ্জে ঘুরে ঘুরে রামদাস দর্শন করতে লাগলেন সিদ্ধ মহাত্মা আর শ্রীবিগ্রহ। অচিরেই প্রাণমন ভরে ওঠে বাবাজী মহারাজের।

ঝুলনযাত্রার পরেই শুরু হয় পরিক্রমার পালা। দলে দলে বেরিয়ে পড়েন ভক্তপ্রাণ বৈষ্ণবেরা। তাদেরই একটি দলে ভীড়ে যান রামদাসও। পরিক্রমার পথে একদিন অবস্থান করেছিলেন গাঁঠুলী গ্রামে। তখন এক সূক্ষ্মদেহী সিদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্মা তাঁকে দিলেন দেবী অন্নপূর্ণার সিদ্ধমন্ত্র। শ্রীকুণ্ডে স্নান করার পর তাঁর মানসপটে জেগে ওঠে ব্রজনন্দর ও রাধারাণীর দিব্যলীলার এক অপূর্ব অনুভূতি। অন্তর ভরে ওঠে কৃষ্ণরসের মাধুর্যে। ফলে আংশিক পরিক্রমা করেই রামদাস বাবাজী ফিরে এলেন বৃন্দাবনে।

এই সময় প্রভু জগদ্বন্ধুও এসে উপস্থিত হলেন বৃন্দাবনে। উভয়ে অবস্থান করলেন রাধাবাগের ছত্রিশগড় কুঞ্জে। বিগ্রহদর্শন, কৃষ্ণলীলা অনুধ্যান আর কীর্তনের মধ্যে দিয়ে রাধাবাগে দিনের পর দিন তাঁদের কাটতে থাকে পরমানন্দে।

একদিনের কথা। প্রভু জগদ্বন্ধু আর রামদাস স্নান করে ফিরছেন যমুনা থেকে। পথিমধ্যে রামদাসকে মাধুকরী সেরে আসার কথা বলে প্রভু জগদ্বন্ধু ফিরে এলেন কুঞ্জে।

কিন্তু রামদাস দাঁড়িয়ে রইলেন নীরবে। ভাবছেন, এত ভোরে তিনি কোথায় পাবেন মাধুকরী। এমন সময় হঠাৎ কানে এলো সুমধুর নারীকণ্ঠ। ডাকছেন রামদাসকে। পিছন ফিরে দেখলেন, কাছেই দাঁড়িয়ে আছে এক অপরূপ তরুণী। সঙ্গে রয়েছে তাঁর পরিচারিকা। প্রণাম করে একটি ঠোঙা হাতে দিয়ে রামদাসকে বললেন, ভিতরে কিছু প্রসাদ আছে, তিনি যেন তা গ্রহণ করেন।

ঘটনার আকস্মিকতায় একেবারে বিহ্বল হয়ে গেলেন রামদাস। ঠোঙাটি নিয়ে তিনি সোজা চলে এলেন শিক্ষা গুরু জগদ্বন্ধুর কাছে। দেখালেন, প্রচুর কচুরি পুরি লাড্ডু আর ক্ষিরের পেঁড়া। কণিকামাত্র প্রসাদ তুলে মুখে দিলেন প্রভু। তারপর অর্ধেকটা নিজে নিয়ে আর অর্ধেকটা খাওয়ালেন রামদাসকে। তারপর নির্দেশ দিলেন, 'এখনই যমুনায় গিয়ে যমুনা মাঈকে এবং অর্ধেক প্রসাদকে প্রণাম করে তারপর ঠোঙাটা জলে ফেলে দিয়ে আসবে।'

রামদাস ভাবলেন, প্রসাদ পরম পবিত্র চিন্ময় বস্তু। অথচ জলে বিসর্জন দিতে বলছেন কেন প্রভু? অন্তর্যামী প্রভু জগদ্বন্ধু। বুঝতে পারলেন রামদাসের মনের কথা। হেসে বললেন, 'শ্রীবিগ্রহ আর প্রসাদে কোন পার্থক্য নেই। তিনি বিরাজ করছেন সর্বত্রই। তবে ভক্তের ভক্তি আর আকুল আর্তির উপরেই শ্রীবিগ্রহ প্রকট করেন নিজ স্বরূপ। নইলে তিনি কখনই আত্মপ্রকাশ করেন না। প্রসাদের বেলাতেও তাই। সর্বত্র আত্মপ্রকাশ করে না প্রসাদও। ভক্তস্থানেই প্রসাদ গ্রহণ করবে. আর সব জায়গায় শুধু মর্যাদা রক্ষা করে চললেই হবে।'

কথাগুলি শুনে এক দিব্যভাবের শিহরণ খেলে গেল রামদাসের সারা দেহমনে। তারপর যমুনায় দিয়ে এলেন প্রসাদের ঠোঙাটি।

এই সময় টানা নয় মাস বৃন্দাবনে বাস করেছিলেন রামদাস বাবাজী। তাঁর সাধন-

জীবনের ভিত্তি নির্মিত হয় এই সময়েই। বৃন্দাবনে থাকাকালীন বাবাজী মহারাজ দর্শন করেছিলেন বহুজনবন্দিত বহু মহাত্মাদের, আর আকণ্ঠ পান করেছিলেন পরম মধুর ব্রজরস।

রাধাবাগ থেকে রিক্সায় এলাম কাত্যায়নী পীঠে। দূরত্ব সামান্য—সময়ও বেশী লাগলো না। চূড়া বিশিষ্ট সুন্দর মন্দির। নাট মন্দিরে এসে দাঁড়ালাম। মন্দির মধ্যে স্থাপিত বিগ্রহটি দেবী কাত্যায়নীর। দেবী দুর্গারই বিগ্রহ। মন্দির-প্রাঙ্গণ এবং পরিবেশ—দুই-ই সুন্দর। দেবী দুর্গা এখানে বৈষ্ণবীরূপেই বিরাজ করছেন। অনেকের মত, একান্ন পীঠের একটি। সতীর মাথার কেশ পড়েছিল এখানে। এই প্রসঙ্গে 'সতীপীঠ পরিক্রমা' গ্রন্থের প্রথমখণ্ডে অমিয়কুমার মজুমদার 'বৃন্দাবনে দেবী উমা' নামক অধ্যায়ে লিখেছেন,

"বৃন্দাবন বৈষ্ণবদের শ্রেষ্ঠধাম, আবার শাক্তদেরও অন্যতম পীঠস্থান। পীঠনির্ণয় বা তন্ত্রচূড়ামণি অনুসারে বৃন্দাবন দ্বাত্রিংশতম মহাপীঠ। এখানে সতী দেবীর কেশজাল পড়েছিল।

বৃন্দাবনে কেশজালমুমা নাম্নী চ দেবতা।
ভূতেশো ভৈরব স্তত্র সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ॥

বৃন্দাবনে সতীর কেশজাল পড়েছিল, সেখানে দেবী উমা নামে অধিষ্ঠিতা এবং ভৈরব হলেন ভূতেশ। তিনি সর্বসিদ্ধি প্রদান করে থাকেন।

পাণ্ডুলিপি ভেদে আছে—

বৃন্দাবনে কেশজালে কৃষ্ণনাথস্তু ভৈরবঃ।
কাত্যায়নী তত্র দেবী সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনী॥

এই মতে দেবীর নাম কাত্যায়নী এবং ভৈরব হলেন কৃষ্ণনাথ। শিবচরিতের দ্বিতীয় উপপীঠ হলো 'কেশজাল'। এখানে সতীর কেশ পড়েছিল। দেবী উমা এবং ভৈরব ভূতেশ। ভারতচন্দ্র শিবচরিতকে অনুসরণ করে লিখেছেন—

'কেশজাল নাম স্থানে পড়ে তাঁর কেশ।
উমা নামে দেবী তাহে ভৈরব ভূতেশ॥'

কেশজাল কোন স্থানের নাম হতে পারে না। তাই মনে হয় শিবচরিতকার হয়তো ভুল করেছেন। তবে কোন কোন প্রাচীন গবেষক বলেন, বৃন্দাবনে যে স্থানে সতীর কেশজাল পড়েছিল, সেই স্থানটি 'কেশজাল' নামে অভিহিত হয়। যেমন, মেগাস্থিনিসের গ্রন্থে বৃন্দাবনের অন্য নাম কালীয়বর্ত। বোধ করি কালীয় নাগের আবর্ত থেকে ঐ নাম হয়েছিল।

শিবচরিতের ষোল নম্বর উপপীঠ হলো বৃন্দাবন। এখানে পড়েছে সতীর স্কন্ধাংশ। দেবীর নাম কুমারী, ভৈরব কুমার। বৃন্দাবনে এই পীঠস্থানটি যে কোথায় তার সন্ধান পাওয়া দুরূহ। কালিকাপুরাণ, কুলার্ণব তন্ত্র, রুদ্রযামল, জ্ঞানার্ণবতন্ত্র, হেবজ্রতন্ত্র, শঙ্করাচার্যের অষ্টাদশ পীঠ বর্ণনায় কেশজাল বা বৃন্দাবনের উল্লেখ

আছে। সেখানে পীঠ-দেবী হলেন রাধা।
প্রাণতোষিণীতন্ত্রে গোবর্ধনকে পীঠস্থান বলা হয়েছে। মহানীলতন্ত্রে আছে অখিলাত্মিকা মহাদেবী কাত্যায়নী গোবর্ধন পাহাড়ে বিরাজ করছেন। এতে মনে হয় এখানে গিরি গোবর্ধনের কাত্যায়নী স্থানের উল্লেখ করা হয়েছে। অনেক আগে হয়তো তা থাকতে পারে, তবে বর্তমানে বৃন্দাবনেই কাত্যায়নী মন্দির আছে।
শ্রীমদভাগবতের দশম স্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে (১০/১২) বলা হয়েছে যে, বৃন্দাবনের গোপকুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাবার কামনা করে মার্গশীর্ষে মাসে ভগবতী কাত্যায়নীর অর্চনা করেছিলেন। হেমন্তকালের প্রথম মাসে নন্দব্রজের কুমারীগণ হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে কাত্যায়নীর অর্চনা ও ব্রত আচরণ করতে লাগলেন। তাঁরা অরুণোদয়কালে কালিন্দীর জলে স্নান করে জলের কাছে বালুকাময়ী কাত্যায়নী প্রতিমা তৈরী করে গন্ধদ্রব্য, সুগন্ধিমাল্য, নবপল্লব, ফল, তণ্ডুল, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও নানাবিধ উপহার দিয়ে দেবীর অর্চনা করতে লাগলেন।...
বৃন্দাবনে কেশীঘাটের কাছে একটি মন্দিরে সতীর কেশপতন হয়েছিল বলে পাণ্ডারা দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু ভৈরব ভূতেশ্বরের মন্দির মথুরায়। সেখানেও পাতালদেবী নামে দেবী মূর্তি আছে। অনেকে মথুরাকেই শক্তিপীঠ বলে থাকেন। বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরের পাশে কালীমূর্তি। তিনি যোগমায়া। প্রবাদ আছে, দেবী যোগমায়া রাধাকৃষ্ণের লীলার ঘটনকর্ত্রী। শ্রীমদভাগবতে আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াকে আশ্রয় করে গোপীদের সঙ্গে রাসক্রীড়া করেছিলেন।
বৃন্দাবনে বংশীবটের দক্ষিণে গোপীশ্বর শিবের মন্দির। বৃন্দাবনে অসংখ্য রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের মধ্যে এই একটিমাত্র শিবলিঙ্গ। মহারাসলীলার সময় মহাদেব গোপীবেশে লীলা দেখেছিলেন, তাই গোপীশ্বর হয়েছেন।...
এই গোপীশ্বর শিবকে যেভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তাতে গোপীশ্বর শিব ভূতেশ ভৈরব কি না এ বিষয়ে প্রশ্ন জাগে। উমাবনের কাছে পীঠস্থান হতে পারে একথাও ঐতিহাসিকেরা বলেন। স্থানীয় লোকদের অনেকে দেবীকে বলেন চামরী।...
আদ্যাস্তোত্রে রয়েছে, 'ব্রজে কাত্যায়নী পরা' এবং মথুরায়াং সুরেশ্বরী' বা পাঠান্তরে 'মাহেশ্বরী'। তাই মনে হয় বৃন্দাবন ও মথুরা দুটি স্থানেই পৃথক দেবী-পীঠ রয়েছে। 'ভূতেশ্বর' শিব মথুরাতে, আর উমাদেবী বৃন্দাবনে এমন সাধারণত হয় না। বৃন্দাবনে কেশীঘাটের কাছে দেবীস্থান ও বংশীবটের কাছে ভৈরবস্থান সম্ভব। ঠিক তেমনি সম্ভব মথুরাতে পাতাল দেবী ও ভূতেশ্বর শিবের সহাবস্থান।...
'রাধাতন্ত্রম্' গ্রন্থের ৫ম পটলে আছে, মথুরামণ্ডল শান্তিময় স্থান। সেখানে গোবর্ধন পর্বত নিরন্তর শোভা পাচ্ছে। মথুরাপুরীতে শিবসংযুতা মহামায়া বৃন্দাদেবী কাত্যায়নীরূপে সর্বদা বিরাজ করছেন। মথুরা ও ব্রজমণ্ডল শিবশক্তিময়।...পীঠক্ষেত্র মথুরাপুরী শক্তিস্বরূপিনী। মথুরা ও ব্রজ এই উভয়ের মধ্যভাগে কালিন্দী নদী প্রবাহিতা। এটিও সাক্ষাৎ শক্তিরূপিনী। মথুরা নগরীতে

যে গোবর্ধন পাহাড় আছে সেটিও ঊর্ধ্বশক্তিময়।
শিববাক্য হলো, মথুরা দেবীর কেশসংযুক্তা, অর্থাৎ দেবীর কেশ ওখানে পড়েছিল। তাই মথুরা ও ব্রজমণ্ডল কেশপীঠ নামে পরিচিত।...মাতৃকাগণ সংযুক্ত কালিন্দী জলপূরিত ব্রজমণ্ডল দেবীর কেশপাশ দিয়ে গঠিত। এখানে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ কালিন্দীকূলে কাত্যায়নী দেবীর সামনে তপশ্চরণ করেছেন। ব্রজমণ্ডলে যে কাত্যায়নী দেবী আছেন, তিনিই তাঁর কেশমণ্ডল দেবী। মথুরা ও ব্রজমণ্ডলের মধ্যস্থলে যে কালিন্দী স্রোতস্বিনী রয়েছে তার গাছপালা শোভিত সুন্দর উপবনে মহামায়া কাত্যায়নী নিরন্তর বিরাজ করছেন।
'রাধাতন্ত্রম্' অনুসারে বৃন্দাবনের কাত্যায়নী দেবীই হলেন পীঠদেবী। বলা বাহুল্য, কাত্যায়নীর অন্য নাম উমা।"
কাত্যায়নী মন্দির থেকে আমরা এবার সোজা চলে এলাম শ্যামসুন্দর মন্দির। দূরত্ব মোটেই বেশী নয়। রিক্সা থেকে নেমে এসে দাঁড়ালাম নাটমন্দিরে। একেবারেই সাদামাটা মন্দির। বেদীতে স্থাপিত শ্রীরাধা আর নবজলধর শ্রীশ্যামসুন্দরের যুগল মূর্তিটি অপূর্ব। এমন সুন্দর মূর্তির অভাব আছে সারা বৃন্দাবনে। এই মন্দির এবং বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন স্বর্গীয় শ্যামানন্দ গোস্বামী।
এবার এখান থেকে রিক্সা টানা চললো প্রায় মিনিট কুড়ি। এলাম ফটিকরা রোডে বন মহারাজ কলেজের সামনে। ঠিক এর সামনে রাস্তার উপরেই রমনরেতীতে বিশাল শ্রীকৃষ্ণ বলরাম মন্দির। এখানকার সব রিক্সাওয়ালারা এই মন্দিরকে 'ইংরাজ মন্দির' বলেই জানে এবং যাত্রীদেরও সেই কথাই বলে। তাদের মতে কাত্যায়নী মন্দির থেকে এর দূরত্ব প্রায় চার কিলোমিটার।
বিশাল এলাকা নিয়ে সুদৃশ্য এই মন্দিরটি নির্মিত হয় ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। সম্পূর্ণ শ্বেত পাথরে নির্মিত এবং প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত শাস্ত্রীর বহু বিদেশী ভক্তদ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তাই এই মন্দিরটি বৃন্দাবনে ইংরাজ মন্দির নামে পরিচিত।
সুন্দর চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করার পরই দেখলাম সারি সারি ফোয়ারা। মন্দির প্রাঙ্গণে রয়েছে একটি তমাল গাছ। আরও একটু এগোতেই চোখে পড়লো তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে মন্দিরকে। ঠিক মাঝখানে অপূর্ব সুন্দর বিগ্রহ—কৃষ্ণ বলরাম। এর বাঁদিকে রয়েছে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আর নিত্যানন্দ, ডানদিকে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি, সঙ্গে আছে দুই সখী—ললিতা, বিশাখা। প্রতিটি মূর্তি এত মনোহর, আকর্ষক যে তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। এই মন্দিরের একেবারে ডানদিকে রয়েছে একটি তুলসীমঞ্চ। পরিবেশ যেমন সুন্দর, তেমনই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এখানকার মন্দির-অঙ্গন। দেববিগ্রহগুলির এক পাশেই রয়েছে প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্তের প্রতিমূর্তি। এই মন্দিরেই রয়েছে গেস্টহাউস এবং রেস্টুরেন্ট। এখানে বাঙালী ভক্তসেবক যেমন আছেন তেমনই বহু বিদেশী নারী-পুরুষ—যাঁরা সব ফেলে এসে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে পড়ে আছেন রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে।

শ্রীকৃষ্ণ বলরাম বা ইংরেজ মন্দির দেখে এসে বসলাম রিক্সায়। অল্প সময়ের মধ্যেই এলাম ভারত সেবাশ্রম সংঘের সামনে। এই সেবাশ্রমের সীমানা শেষ হতেই ডানদিকে চলে গেছে একটা রাস্তা। মিনিট দুয়েক হাঁটলেই বৃন্দাবন স্টেশন। আমাদের রিক্সা আরও একটু এগিয়ে বাঁ-দিকে ঢুকেই থেমে গেল। 'কাঠিয়াবাবা কা স্থান' অর্থাৎ বৃন্দাবন স্টেশনের ঠিক পিছনেই ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং রামদাস কাঠিয়াবাবার প্রাচীন আশ্রম।

রিক্সা থেকে নেমে পাঁচিলে ঘেরা আশ্রমের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। ডানদিকেই সাদামাটা একটা ঘর। এই ঘরে এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়লো অতি সাধারণ একটা খাট। এত সাধারণ খাট যে, অতি সাধারণ মানুষেরও শোয়ার ইচ্ছা হবে না এই খাটে। অথচ ভারত বরেণ্য সাধক ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়াবাবা বিশ্রাম করতেন এই খাটেই। তিনি শেষ জীবন অতিবাহিত করেন এই আশ্রমে। এখানে ধুনিকুণ্ড—যেখানে তিনি সর্বদা বসে থাকতেন ভক্তশিষ্য পরিবৃত হয়ে। ছোট ছোট ঘর রয়েছে কয়েকটি—আশ্রমিক আর অতিথিদের থাকার জন্য। একটি ছোট মন্দির রয়েছে এই আশ্রমে। তাতে রয়েছে রাধারাণী আর গোবিন্দের বিগ্রহ, সঙ্গে নারায়ণ শিলা।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধারাণী আর ব্রজবালাদের লীলাক্ষেত্র যেমন এই বৃন্দাবন, তেমনই ভক্ত সাধক মহাপুরুষের সংযমী জীবনের পরীক্ষা আর তাঁদের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের অন্তরঙ্গতা ও ক্রীড়াক্ষেত্রও এই বৃন্দাবন। একদা যোগীরাজ কাটিয়াবাবাকেও বৃন্দাবনে এসে কৃষ্ণের কাছে দিতে হয়েছিল তাঁর সংযমী জীবনের পরীক্ষা।

নানাবিধ কঠোর তপস্যা এবং ভারতের অসংখ্য তীর্থ পর্যটন করেছিলেন রামদাস কাঠিয়াবাবা। অবশেষে তিনি নিয়ত বাস করতে থাকেন এই ব্রজধামে। তিনি বলতেন, অন্যান্য সকল স্থান অপেক্ষা ব্রজমণ্ডলই তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় বোধ হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সাধুদের বাসোপযোগী এমন স্থান আর অন্য কোথাও তিনি দেখেননি। তাঁর মুখের কথায়, "উত্তরাখণ্ডও তপস্যার জন্য উপযুক্ত স্থল সত্য, কিন্তু সেখানে আহারের জন্য নির্ভর করতে হয় কন্দমূলের উপর এবং বর্ষার সময় কোথায় কন্দ অঙ্কুরিত হয়েছে তা খুঁজে দেখে রাখতে হয়।

এরকম আহারের চেষ্টা সেখানেও আছে। আমি ভাবলাম, ব্রজধামই এর চেয়ে ভালো। আহারের জন্য এমন সঞ্চয়ের চেষ্টার প্রয়োজন হয় না সেখানে। সাধুর উপযুক্ত সুন্দর সুন্দর আহার্য বস্তু তথায় সব সময়েই সুলভ, অতএব ব্রজেই থাকবো বলে আমি মনস্থ করলাম।"

ব্রজধামে স্থায়ীভাবে বাস করার আগে তিনি ভরতপুরে সয়লানির কুণ্ড নামে একটি কুণ্ডের কাছে তিনি বাস করেছিলেন কিছুদিন। তারপর বৃন্দাবনে এসে কেমার বনে দাবানল কুণ্ডের উপরে একটি আখড়ায়ও ছিলেন কিছুদিন। এরপর তিনি যমুনাতীরে শ্রীগঙ্গাজী কুঞ্জের গলির সামনে যে ঘাট আছে, সেই

ঘাটের উপরে একটি গাছের তলায় আসন স্থাপন করে বাস করতে লাগলেন। শ্রীগরীবদাসজী নামে এক শিষ্য তাঁর সেবায় নিযুক্ত থাকতেন সর্বদা।

এই ঘাটে নারীপুরুষেরা এসে স্নান করতেন প্রতিদিন। কোন কোন ব্রজবাসী মনে করলেন এই ঘাটে সব সময়েই আসেন অনেক স্ত্রীলোক। এই সাধু থাকেন এখানে। এঁকে পরীক্ষা করে দেখা যাক্—কেমন সাধু ইনি।

এই সংকল্প করে একদিন মাঝরাতে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে তারা সকলে একজন যুবতীকে পাঠিয়ে দিলেন কাঠিয়াবাবার কাছে। তখন তিনি শুয়ে আছেন নিজের আসনে। এমন সময় নিঃশব্দে যুবতীটি তাঁর আসনে গিয়ে পাশে শুয়ে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। শ্রীগরীবদাসজী তখন নিজের আসনে শুয়েছিলেন হাত কুড়ি দূরে। যুবতীটি বাবাজী মহারাজকে ওইভাবে জড়িয়ে ধরতেই গরীবদাসজীকে ডেকে বললেন,

—"গরীবদাস! হিঁয়া আয়। দিবা জাগাকের দেখ্, হমরা আসনপর কোন্ আয় গিয়া।"

তখন গরীবদাসজী উঠে প্রদীপ জ্বালাতেই যুবতীকে দেখতে পেয়ে কাঠিয়াবাবা বললেন,

—"তুমি কে; এমন সময়ে কিসের জন্য তুমি এসেছো আমার আসনে?"

উত্তরে যুবতীটি বললো,

—"মহারাজ, বড় কামার্ত হয়েছি আমি। এইজন্যে এসেছি তোমার কাছে। আমি একজন বিধবা। কেউ নেই আমার।"

কাঠিয়াবাবা বললেন,

—"তেরা কাম হওয়া তো কোই গৃহস্থিকো পাস্ চলা যা, হিঁয়া গৃহস্থি বহোত হ্যায়।"

এবার স্ত্রীলোটি বললো,

—"মহারাজ! তোমরা উপর হমরা মন বহোত চলা, তুমকো যব্‌সে হম দেখা, তবসে তোমারি উপর হামরা মন চল্‌নে লাগা, তুম্‌হি হমারি উপর কৃপা করো।"

তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন,

—"গরীবদাস! তু হিঁয়াসে জের হট্ যা, হম্ এই রাঁড়কো সাধুকা কেরামত কুচ্ছ দেখায় দেঙ্গে, ইয়ে সাধুকা সত্ব খিঁচ লেনে মাংতা, হ্যায়, ইসকো দেখায় দেয়েঙ্গে সাধুকা সাত্ রমণ কেয়সা হোতা হ্যায়; এক ঘণ্টা ভরকা বিচমে ইস্‌কে জান হম্ খিঁচ্ লেয়েঙ্গে, যব ইস্‌কো মালুম পড়েগা সাধুকা সামর্থ কেয়সা হোতা হ্যায়।"

এই বলে তিনি স্ত্রীলোকটিকে বললেন,

—"অব্ আয় যা তু হমারা পাশ।"

তখন স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো,

—"মহারাজ! ক্ষমা করো আমাকে। কোন দোষ নেই আমার। ব্রজবাসীরা

আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য। সেইজন্যে এসেছি আমি। ক্ষমা করো আমাকে।"

একথা শুনে বাবাজী মহারাজ বললেন,

—"আচ্ছা চলা যা, ঔর সাধুকা পাশ ইসমাফিক কবহি নেহি যানা, সব সাধু বরাব্বর নহি হোতা হ্যায়, কোই যোগিরাজ বি হ্যায়।"

এবার কাঠিয়াবাবার জীবনচরিত লেখক ব্রজবিদেহী মহন্ত শ্রদ্ধেয় সন্তদাস বাবাজী মহারাজের ভাষায় বলি,

"অপর এক দিবস সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ একক ঐ ঘাটের উপর আসনে বসিয়া আছেন, এমন সময় অতি রূপ যৌবনসম্পন্না দুইটি পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিল, এবং কিছু ভেট তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করিয়া তাঁহার সমক্ষে বসিয়া হাবভাব ভঙ্গীযুক্ত হইয়া কথোপকথন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইরূপে নানা কথা প্রসঙ্গে কাটাইয়া, অবশেষে হাসিতে হাসিতে একজন হঠাৎ তাঁহার…ধারণ করিয়া টানাটানি করিতে লাগিল, তখন তিনি বলিলেন, "লে শালী…পকড় লিয়া! ইস্‌মে কেয়া হেয়, হম্ ত কুচ্ছ নহি দেখতে হেঁ, তেরা যেত্না মর্‌জি হোয় তু ইস্‌কো আচ্ছি তরেছে দেখ্ লে!" তখন সেই দুইটি স্ত্রীলোকই তাঁহার…ধরিয়া নানাপ্রকার টানাটানি করিয়া দেখিল, কিন্তু…কোন প্রকারে খাড়া হইল না, তাহারা তখন অপ্রস্তুত হইয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।"

বাংলা ১৩১৬ সালের ৮ই মাঘ ভোর রাতে যোগীরাজ শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবাজী মহারাজ মানবলীলা সম্বরণ করেন বৃন্দাবনেই। যমুনা তটেই তাঁর দেহ সৎকার করা হয় মহাসমারোহে।

রামদাস কাঠিয়াবাবার প্রাচীন আশ্রম থেকে রিক্সা চলতে লাগলো মথুরা-বৃন্দাবন রোড ধরে। চওড়া রাস্তা। অল্প সময়ের মধ্যেই এসে দাঁড়ালো একটি বড় আশ্রমের সামনে। এটি রামদাস কাঠিয়া বাবার ব্রহ্মজ্ঞ শিষ্য সন্তদাস বাবাজীর আশ্রম।

রিক্সা থেকে নেমে ঢুকলাম আশ্রমের ভিতরে। আশ্রমস্থ মন্দিরে রয়েছে রাধারাণী এবং ব্রজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব সুন্দর সজ্জিত বিগ্রহ। সঙ্গে রয়েছে সন্তদাস বাবাজী আর কাঠিয়াবাবার প্রতিকৃতি। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বহু সাধুরা বাস করেন এখানে। এই আশ্রমটি নির্মাণ করেন সন্তদাস বাবাজী মহারাজ।

কলকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ আইনজীবি তারা কিশোর চৌধুরী (গৃহত্যাগের পর নাম হয় সন্তদাস বাবাজী মহারাজ) ওকালতি ছেড়ে দিয়ে এক সময় চিরতরে চলে আসেন এই বন্দাবন ধামে। গুরুধাম বৃন্দাবনে এসে নিতান্ত সাধারণ এক ভক্ত ও আশ্রমিকের জীবনই যাপন করতেন তিনি। অথচ তাঁর লক্ষ্য ছিল সর্বদিকেই। একদিনের ঘটনা। প্রতিদিনই প্রসাদান্ন দেয়া হতো আশ্রমের মেথরটিকে। একদিন হঠাৎ বহু সাধু অতিথির সমাগম ঘটে পঙ্গতের সময়। ফলে কম পড়ে যায়

ভোজনদ্রব্যের। সেদিন আর প্রসাদ দেয়া সম্ভব হলো না মেথরটিকে।
ব্যাপারটি কিন্তু দৃষ্টি এড়ালো না বাবাজী মহারাজের। শিষ্যদের কাছে তিনি জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন অসময়ে বহু অতিথির আগমন কারণেই মেথরকে প্রসাদ দেয়া সম্ভব হয়নি।
একথা শুনে ক্রোধে ফেটে পড়লেন সন্তদাস বাবাজী। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'তোমাদের কোন কথাই শুনতে চাইনা আমি। আজ থেকে আগে মেথরের জন্য প্রসাদান্ন আলাদা করে রেখে, পরে বিতরণ করবে অপরকে। খবরদার! এমনটা যেন আর কখনও না ঘটে।'
তখনই প্রচুর সিধা দিয়ে বিদায় করা হলো মেথরকে। এরপর অত্যন্ত শান্ত ও স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বাবাজী মহারাজ বললেন, 'দেখো, মা যেমন আমাদের মলমূত্র পরিষ্কার করেন ঘৃণা না করে, এরাও কি তাই করে না? এদের কি রোজ দুটি প্রসাদ দেয়া উচিত নয়?'
এইভাবে নিজের আচার-আচরণের মধ্যে দিয়ে অনেক সময়েই বাবাজী মহারাজ প্রকৃত আদর্শ তুলে ধরতেন শিষ্যদের সামনে।
আর এক দিনের কথা। তখন তিনি বয়েসে বৃদ্ধ। বিশেষ কোন কাজে বাবাজী গেছেন মথুরায়। রাত নয়টা বেজে গেল। তবুও তিনি ফিরছেন না দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন আশ্রমের সকলে। হঠাৎ দেখা গেল বৃদ্ধ মহারাজ ধীর পায়ে আসছেন আশ্রমে। কাঁধে বড় একটি চালকুমড়ো।
ফিরতে দেরী হওয়ায় চিন্তিত শিষ্যরা অনুযোগ করতেই বাবাজী মহারাজ বললেন, 'বাবা, একটি এক্কা গাড়ীর জন্য দরদস্তুর করলাম মথুরায়। সুযোগ বুঝে ওরা বেশী ভাড়া হাঁকলো। প্রায় একটাকা। ঠাকুরজীর পয়সা বাবা এইভাবে ব্যয় করতে মন চাইলো না। তাই হেঁটেই এলাম। আর তাতে কষ্টও হয়নি কিছু। মনে রেখো বাবা, অনেক দরিদ্র শিষ্য অতিকষ্টে উপার্জ্জন করে ঠাকুরজীর ভোগের জন্য কিছু পাঠায়। তাই ঠাকুরজীর পয়সা অপব্যয় করতে নেই।'
সারা বৃন্দাবনে এত মন্দির—এত দর্শনীয় স্থান যে, দেখে যেন শেষ করার উপায় নেই। একটি থেকে আর একটি—দর্শনীয় স্থান ও মন্দিরের দূরত্ব খুব বেশী নয়—সময়ও খুব কম লাগে বলে রিক্সাতেই ঘুরে ঘুরে দেখে নিলাম—
ব্রহ্মকুণ্ড—এখানে রয়েছে মাঝারী আকারের একটি কুণ্ড। কুণ্ডের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে একটি অশোক গাছ। জনশ্রুতি আছে, প্রতিবছর বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে একটিমাত্র ফুল ফোটে এই গাছে। সেটি দেখার জন্য অসংখ্য লোকের সমাগম হয় এখানে।
কথিত আছে, কৃষ্ণলীলা দর্শন মানসে ব্রজে জন্মগ্রহণ করার জন্য একদা প্রজাপতি ব্রহ্মা এই ক্ষেত্রটিতে বসে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করে চোখের জলে সৃষ্টি করেছিলেন এই কুণ্ডটি। তাই তাঁর নামানুসারেই নাম হয়েছে ব্রহ্মকুণ্ড। এখানকার

প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন সুন্দর, তেমনই মনোরম। প্রতিবছর শ্রাবণ মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে এই কুণ্ডের তীরে বড় মেলা বসে। তখন ভক্তপ্রাণ অসংখ্য তীর্থযাত্রীরা স্নান তর্পণ ইত্যাদি করেন এখানে এসে।

অদ্বৈত বট—একটি বিশাল প্রাচীন বটবৃক্ষ রয়েছে এখানে। এই স্থানটিতে এক সময় তপস্যা করেছিলেন আচার্য অদ্বৈত স্বামী। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে চৈতন্য মহাপ্রভু আসার পর তিনিও এই বৃক্ষের নীচে বসে বিশ্রাম করেছিলেন।

শৃংগার বট—যমুনা তীরে প্রাচীন এই বট বৃক্ষটি নিত্যানন্দ প্রভুর স্মৃতি রক্ষা করেছে চলেছে আজও। বৃন্দাবনে আসার পর এক সময় তিনি অবস্থান করেছিলেন এখানে। জনশ্রুতি আছে, এই স্থানটিতে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকার শৃঙ্গার করেছিল তাঁর সখারা। সেইজন্য বৃন্দাবনে এটি শৃঙ্গার বট নামে প্রসিদ্ধ।

রাস মণ্ডল—গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্তদের বিশ্বাস, পৌরাণিক যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালাদের সঙ্গে রাসলীলা করেছিলেন এই রাসমণ্ডল ক্ষেত্রটিতে।

ধীর সমীর—যমুনাতীরে এই স্থানটি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং ব্রজবাসীদের সঙ্গে নিয়ে অনেক লীলা করেছিলেন বলে প্রবাদ আছে আজও। একটি প্রাচীন মন্দির রয়েছে এখানে। তাতে স্থাপিত আছে রাধাকৃষ্ণের যুগল-বিগ্রহ। বর্তমানে যত্ন ও সংরক্ষণের অভাবে মন্দিরটি প্রায় নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে।

আচার্য প্রভুর কুঞ্জ—পিতৃবিয়োগের পর আচার্য শ্রীনিবাসের মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের প্রতি অনুরাগের এতটুকুও কম হয়নি। তখন মহাপ্রভু ছিলেন পুরীতে। গৌরাঙ্গের দর্শনের জন্য তিনি যাত্রা করলেন পুরীধামে। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি শুনলেন মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের কথা। ব্যর্থ হলো উদ্দেশ্য। তবুও গেলেন জগন্নাথক্ষেত্রে। কিছুদিন বাস করে তারপর কাশী অযোধ্যা প্রয়াগ মথুরা হয়ে এলেন বৃন্দাবনে। এখানে এসে শুনলেন দেহরক্ষা করেছেন সনাতন গোস্বামী, রঘুনাথদাস, রূপ ও কাশীশ্বর গোস্বামী প্রমুখ অধ্যাত্ম জগতের মধ্যমনিরা।

এই সময় তিনি আসেন শ্রীজীব গোস্বামীর সান্নিধ্যে। দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে থেকে শ্রীজীবের কাছে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করে, আচার্য পদবী প্রাপ্ত হয়ে, যমুনার মতো তিনিও বৃন্দাবনে নিত্য রাধাকৃষ্ণের মধুর লীলারস আস্বাদন করেন।

আচার্য শ্রীনিবাসই স্থাপন করেন এই কুঞ্জটি। এখানে বসেই কেটেছে শেষ জীবনের শেষ দিনটি। আচার্যের দেহরক্ষার পর তাঁকে সমাধি দেয়া হয় এই কুঞ্জে। এখানে স্থাপিত ছোট্ট সমাধি মন্দিরটি আজও বহু বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে তীর্থস্বরূপ।

মহাপ্রভুর মন্দির—সুন্দর মাঝারী আকারের মন্দির। শিল্পের কোন ছোঁয়া না থাকলেও মন্দিরটি আকর্ষণীয়। মহাপ্রভুর একটি মনোমুগ্ধকর বিগ্রহ স্থাপিত আছে মন্দিরে। বৃন্দাবনের অন্তর-রাজ্যে আজও বাস করে চলেছেন নদীয়ার প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

বেণুকূপ—এখানে কূপ আছে একটি। প্রবাদ আছে, একদা শ্রীমতী রাধারাণী

তৃষ্ণার্ত হন। তখন কাছাকাছি কোথাও জল না থাকায় শ্রীকৃষ্ণ বেণু অর্থাৎ বাঁশী দিয়ে কূপ খনন করে জল এনে তৃষ্ণা নিবারণ করেছিলেন রাধারাণীর। তাই এটির নাম হয়েছে বেণুকূপ।

দাবানল কুণ্ড—যমুনায় কালিয় নাগকে দমন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ক্ষেত্রটিতে এসে দাবাগ্নি পান করেছিলেন। এখানে স্থাপিত মন্দিরটিতে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ।

জ্ঞান গুদড়ী—জনশ্রুতি আছে, উদ্ধব যখন মথুরা থেকে শ্রীকৃষ্ণের বার্তা নিয়ে বৃন্দাবনে এসেছিলেন, তখন এই ক্ষেত্রটিতে ব্রজবাসী এবং ব্রজবালাদের কাছ থেকে তিনি জ্ঞান-বার্তা প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তিনিও দিয়েছিলেন তাঁদের শ্রীকৃষ্ণের কুশল সংবাদ।

টোটিয়া স্থান—শ্রীহরিদাসজীর শিষ্য পরম্পরার স্থান এই টোটিয়াতে রয়েছে একটি মন্দির—তাতে স্থাপিত রয়েছে সুন্দর রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। প্রতিবছর রাধাষ্টমীতে বেশ জমজমাট মেলা বসে এখানে।

এ-গুলি ছাড়াও মূল বৃন্দাবনে ৬৪ মহান্তের সমাধি, হরিদাসজীর বৈঠক (যেখানে হরিদাসজী বসে বিশ্রাম করতেন), রামবাগ, যমুনা মন্দির, বনচন্দ্রজীর মন্দির, টোপিবালী কুঞ্জ, অগ্রাবিহারী মন্দির, স্বর্গীয় নন্দকুমার বসু প্রতিষ্ঠিত হাড়াবাড়ী কুঞ্জে গোপাল বিগ্রহ, লোহ বাজারে ছোট একটি মন্দিরে সোয়া মণ ওজনের শালগ্রাম শিলা, মথুরা-বৃন্দাবন রোডে আই. টি. আই. স্কুলের পিছনে অক্রুর মন্দির, রেতিয়া বাজারে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের শ্রীজী মন্দির, আনন্দ বৃন্দাবনের কাছে কানপুরওয়ালা মন্দির, শ্রীরঙ্গজীর মন্দির কাছে মানস মন্দিরের, হরিদাস স্বামী পরম্পরার আচার্য রসিক দাস নির্মিত রসিক বিহারী মন্দির, রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালের সামনে জয়পুরের রাজার প্রতিষ্ঠিত কারুকার্যখচিত বিশাল জয়পুরওয়ালা মন্দির, তরাসের স্বর্গীয় রায় বনমালী বাহাদুর প্রতিষ্ঠিত জামাই বিনোদ মন্দির, শ্রীরসিক দাসজীর শিষ্য গোবিন্দদাসজী প্রতিষ্ঠিত গোরে দাউজীর মন্দির, হেতমপুরের মহারাজা কর্তৃক ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত অষ্টসখীর মন্দির, শহর থেকে একটু দূরে স্বামী অখণ্ডানন্দের প্রেরণায় নির্মিত আনন্দ বৃন্দাবন এবং মথুরা-বৃন্দাবন রোডে আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমটি দর্শনীয়।

এগুলি বৃন্দাবনে রিক্সায় করে ঘুরে ঘুরে দেখা যায়। সময় কেটে যায় আনন্দের মধ্যে দিয়ে। বৃন্দাবনে বেড়াতে এসে ছেলে মেয়েদের স্কুল খুলে যাবে, ছুটি ফুরিয়ে এল—কাজের লোকটাকে বিশ্বাস নেই—বাড়ীতে গিয়ে কি দেখবো তা কে জানে—কারও মাথায় যদি এ-সব কথা ঘুরপাক খায়—তাদের কাছে এই মন্দির আশ্রমগুলি তো ভালো লাগবেই না—সময়ও নষ্ট হবে। তাই তাদের ক্ষেত্রে স্কুল খুলে যাওয়াই ভালো। ছুটি ফুরোবে না। বাড়ীতে ফিরে কাজের লোকটাকে দেখা যাবে—সে এবং জিনিষপত্র সব ঠিকঠাক আছে। খোয়া যায়নি এতটুকুও।

গোকুলের নন্দভবনে
সাধুসঙ্গ—আসক্তি, অভিমানই ঈশ্বরলাভের অন্তরায়

মথুরা থেকে টাঙ্গা চললো গোকুলের পথে—মথুরা-সাদাবাদ রাস্তা ধরে। এক বন্ধু রয়েছে আমার সঙ্গে। যমুনার ওপারে গোকুল। নৌকায় গেলে তাড়াতাড়ি যাওয়া হয়। টাঙ্গায় গেলে একটু দেরী হয় বটে, পথও কিছুটা বেশী তবে পথ চেনা আর দেখার সুখটা অনেক বেশী। মনেরও আরাম হয়। এই নিয়ে গোকুল যাওয়া হবে পাঁচ বার। একবার আগ্রা থেকে বৃন্দাবন মথুরা হয়ে সরাসরি বাসে গেছিলাম গোকুলে। দুবার নৌকায় যমুনা পার হয়ে। এইবার নিয়ে দু-বার টাঙ্গায়।

টাঙ্গা খুব দ্রুত গতিতে চলছে—তা নয়, আবার একেবারে ঢিমেতালে চলছে—এমন নয়। টাঙ্গার গতি মোটামুটি। দু-জনে চলেছি গল্প করতে করতে। চোখ রয়েছে আমার পথে দু-পাশে। যমুনা-পুলটা পার হতেই দেখলাম, লাঠি হাতে এক বৃদ্ধ সাধুবাবা চলেছেন আমরা যেদিকে যাচ্ছি সেদিকে। সাধুবাবাকে দেখামাত্রই দাঁড়াতে বললাম টাঙ্গাওয়ালাকে। টাঙ্গা দাঁড়াতে দাঁড়াতেই এগিয়ে গেছে প্রায় হাত ত্রিশেক আগে। থামামাত্রই টুক্ করে লাফ দিয়ে নেমে নীচে দাঁড়ালাম। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন সাধুবাবা। এ-পথে গাড়ী আর লোক চলাচলের বিরাম নেই।

বৃদ্ধ সাধুবাবার পরনে রয়েছে একটু ময়লা গেরুয়া বসন। বাঁ-কাধে ঝুলছে ঝুলি। তার উপরে পাট করা রয়েছে কম্বল। বাঁ-হাতে ছোট্ট একটা পিতলের বালতি। ডান হাতে সরু লম্বা একটা লাঠি। মাথায় জটা নেই। সকালে স্নান করে ওঠায় লম্বা এলো চুল রয়েছে কাধ আর পিঠ ছড়িয়ে। মুখের আকৃতি পানের মতো। প্রশস্ত কপাল। সামান্য ফরসা গায়ের রঙ। নাক চোখ মুখ সুন্দর। আর সব সাধুদের মতোই এই সাধুবাবার সাজপোশাক। রূপের পরিবর্তনটুকু ছাড়া আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়লো না। বয়েস আমার ধারণায়, আন্দাজ ৭০/৭৫ এর কাছাকাছি হবে।

একেবারে কাছাকাছি আসতেই আমি কয়েক পা এগিয়ে সামনে দাঁড়াতেই সাধুবাবা দাঁড়িয়ে গেলেন। নীচু হয়ে প্রণাম করে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। মুখে কিছু বললেন না। একটু অবাক হয়েই তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। আমি জোড় হাত করে অনুরোধের সুরে বিনীত ভাবে বললাম হিন্দিতে,

—বাবা, আমরা গোকুলে যাচ্ছি। আপনি একই পথে পায়ে হেঁটে চলেছেন দেখে দাঁড়ালাম। যদি দয়া করে টাঙ্গায় ওঠেন তাহলে আপনার কষ্টটা কম হবে আর আমিও বলতে পারবো দু-চারটে কথা। আপনি কি আমাদের সঙ্গে যাবেন? এ-দিকে

কোথায় যাচ্ছেন ?
কোন রকম দ্বিধা না করেই সাধুবাবা বললেন,
—আমি গোকুলে যাবো না। তার একটু আগেই যাবো একটা দরকারে। তুই যখন বললি—চল্, তোর সঙ্গেই যাই ; আমার হেঁটে যেতেও অসুবিধে নেই—টাঙ্গাতে গেলেও কোন অসুবিধে নেই।
কথাটা বলেই উঠে বসলেন দাঁড়িয়ে থাকা টাঙ্গায়—কোলে ঝুলিটা নিয়ে। আমি বসলাম সাধুবাবার বাঁ-পাশে। আমার পাশে বসলো আমার সঙ্গী। টাঙ্গাওয়ালা মুখে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করতেই চলতে শুরু করলো ঘোড়া। আর কথা শুরু করলাম আমি,
—বাবা, আপনি কি মথুরা বৃন্দাবনের কোথাও থাকেন, না অন্য কোথাও ?
সাধারণভাবেই সাধুবাবা বললেন,
—আমি থাকি অমর কণ্টকে—নর্মদা মাঈ-র কাছে। ওখানে ছোট খাটো একটা ঝুপড়ি আছে আমার। হরিদ্বারে গেছিলাম। ভাবলাম, একবার মথুরা বৃন্দাবনটা হয়েই যাই। এত কাছে এসে না দেখে ফিরে যাবো! আগেও বহুবার এসেছি এখানে। এখান থেকে আর যাবো না কোথাও। সোজা ফিরে যাবো ডেরায়।
কথা শেষ হতেই জানতে চাইলাম,
—এর মধ্যেই চলে যাবেন, না থাকবেন আরও কিছুদিন ?
মোটামুটি গতিতে চলছে আমাদের টাঙ্গা। গতি ঠিক রাখার জন্যে মুখ থেকে মাঝে মাঝেই একটা অদ্ভুত শব্দ করছে টাঙ্গাওয়ালা। এ-পথে চলছে অধিকাংশই মালবাহী লরী। সাধুবাবা উত্তরে বললেন,
—হাঁ বেটা, এখানে আর দিন দশ-পনেরো থাকবো—তারপর চলে যাবো।
হাতে সময় কম। এই টাঙ্গায় চলার পথটুকুতেই জেনে নিতে হবে অনেক কথা। সময় নষ্ট করলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না ভেবেই এবার সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, যদি কিছু মনে না করেন তাহলে দয়া করে বলবেন, এই সাধুজীবনে এলেন কি ভাবে ?
প্রশ্নটা করার সঙ্গে সঙ্গেই সাধুবাবার মুখখানা একটু অস্বস্তিতে ভরে উঠলো। এই প্রশ্ন যাঁদের কাছেই করেছি, তাঁদেরই দেখেছি ওই একইভাব। এই সাধুবাবাও তাঁদের মতো ব্যতিক্রম নয়। উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দিলেন না। মিনিটখানেক চুপ করে থেকে পরে বললেন,
—বেটা, এসব কথা বলা নিষিদ্ধ। তবুও বলছি শোন। মধ্যপ্রদেশের রাজনন্দ-গাঁওতে আমার জন্ম। ওখানেই এক সময় বাড়ী ছিল আমাদের। এখন কিছু আছে কিনা বা কে আছে—কিছুই জানি না।
কথাটা বলেই একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেললেন। তাকালেন আমার মুখের দিকে।

তারপর বললেন,৷

—ছোটবেলায় পড়াশুনা কিছু করিনি। আমাদের চাষ আবাদের কিছু জমি ছিল। তখন আমার বয়েস বছর দশেক হবে। প্রতিদিন বাবার সঙ্গে যেতাম মাঠে। ও-সব আমার মোটেই ভালো লাগতো না। ওই বয়েসেই প্রতিদিন বাবা আমাকে জমিতে লাঙল দেয়া শেখাতেন। আমি কিন্তু কিছুতেই পারতাম না। তুই বল্, ওই বয়েসে কি আমার মতো বাচ্চার পক্ষে ওই কাজ করা সম্ভব? একদিন সকালে জেদ ধরলাম মাঠে যাবে না বলে। বাবা তখন রাগে একেবারে ফেটে পড়লেন। একটা লাঠি দিয়ে এমন মার মারলেন যে, সে মারের ব্যথা যেন আমি আজও অনুভব করতে পারি। মার খেয়ে পড়ে রইলাম বাড়ীতে। মায়ের প্রতিবাদে বাবা এতটুকুও কর্ণপাত করেননি। ভাবলাম, যখনই আমি মাঠে না যেতে চাইবো, তখনই আমার কপালে জুটবে মার। মনে মনে ঠিক করলাম, বাড়ী থেকে পালাবো। তাহলে আর মাঠে যেতে হবে না, মারও খেতে হবে না। মারের প্রথম ধকল সামলে নিয়ে পালালাম ঘর ছেড়ে। এলাম সোজা স্টেশনে। একটা ট্রেন আসতেই উঠে পড়লাম ট্রেনে। আমি কোথায় যাবো আর ট্রেন কোথায় যাবে—কিছুই জানি না। তারপর যাইহোক, ঠোক্কর খেতে খেতে—এখান ওখান করতে করতে একদিন পৌঁছে গেলাম অমরকণ্টকে। ওখানে এক বৃদ্ধ সাধুবাবার আশ্রয় পেলাম। এক সময় দীক্ষাটাও হয়ে গেল ওই সাধুবাবার কাছে। আমার প্রথম আশ্রয়দাতাই পরে হলেন চিরকালের, পরকালের আশ্রয়দাতা। তারপর অমর কণ্টকেই রয়ে গেলাম। ওখান থেকে যখন যেখানে মন চেয়েছে—চলে গেছি। তবে থাকার জন্য অন্য কোথাও মন বসেনি।

জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবার বয়েস কত হলো এখন?

সঙ্গে সঙ্গেই বললেন,

—সেই ছোট বেলায় ঘর ছেড়েছি—এখন কী আর অতসব খেয়াল আছে বেটা! বয়েস আন্দাজ সত্তর পঁচাত্তর আশি হবে!

কথার ভাবটা দেখেই মনে হলো, কোন কিছু না ভেবেই কথাটা বললেন। আর ভাববারই বা কি আছে? বিয়ের প্রয়োজনে কুমারী মেয়েরা আর চাকুরীর জন্য বয়েস নিয়ে ভাববে ছেলেরা—সাধুসন্ন্যাসীরা ভাববে কোন্ দুঃখে? তাঁদের জীবন-ভাবনাটা তো বয়েস নিয়ে নয়—মন নিয়ে! যাইহোক টাঙ্গা এগিয়ে চলেছে গোকুলের দিকে। ক্রমশ কমে আসছে পথের দূরত্ব। তবুও হাতে এখনও সময় আছে একটু। আমি দেখেছি, তাড়াহুড়ো করে সাধুদের সঙ্গে কথা বললে চট্ করে কোন প্রশ্ন আসে না মাথায়। এখন ভিতরে প্রচ্ছন্নভাবে একটা অস্থিরতা কাজ করছে—তাই কোন প্রশ্ন এলো না। কথায় কথায় কথা বাড়ে—কথা হলে। আগ্রহ করে সাধু-

বাবাকে টাঙ্গায় তুলেছি কিন্তু ভিতর থেকে কোন কথা আসছে না। সাধুসঙ্গের সময় মাথায় কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা না এলে একটা কৌশল করে থাকি। তাতে ফলও হয় দারুণ। তখন কথাও চলতে থাকে সমানে। সাধুদের উপর ছেড়ে দিয়ে এইভাবে বলি এবং বললামও,

—বাবা, এমন সুন্দর একটা কথা বলুন, যে কথাটা সারাজীবন যেন মনে রাখার মতো হয়।

প্রশ্নটা শুনে সাধুবাবা একটু চিন্তায় পড়ে গেলেন—ভাবটা দেখে মনে হলো। ডান-হাতটা কপালে একটু বুলিয়ে নিয়ে বললেন,

—বেটা, সব সময় গুরুকেই ধরে রাখবি। সংসারে গুরু ছাড়া আপন বলতে আর কেউই নেই। আমার গুরুজী বলতেন, মানুষের শরীর হলো রথ—মন হলো সারথী আর ইন্দ্রিয়গুলি হলো লাগাম ছাড়া বেগবান ঘোড়া। সংসারে ত্যাগী যারা —তারা এই শরীর রথে চড়েই, সংসারে থেকেও গুরুকে ধরে সংসার-পথ অতি সহজে অতিক্রম করে পৌঁছে যায় তাঁরই কোলে। আবার এই একই রথে চড়ে, গুরুকে আশ্রয় না করে ভোগীরা দুঃসহ নরক-প্রাঙ্গণেই সর্বদা ভ্রমণ করে যন্ত্রণাময় জীবন যাপন করে।

সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, ত্যাগী বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন? সংসারে থেকে সংসারীদের পক্ষে সবকিছু ত্যাগ করা কি সম্ভব?

সুন্দর প্রসন্নভাবেই সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, গুরুর শরণাগত হলেই মানুষের সব ত্যাগ হয়—ত্যাগী হয় আপনা থেকেই। মানুষ শরণাগত না হলে যে যে বিষয়গুলি থেকে সে নিবৃত্ত হয় বা ত্যাগ করে—শুধু সেই সেই বিষয়গুলির বন্ধন থেকেই সে মুক্তিলাভ করে—বুঝলি?

এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা থামলেন। টাঙ্গার গতি একটু বেড়েছে। বিরক্ত হলাম। কারণ এতে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবো—অনেক কথা জানা যাবে না সাধুবাবার কাছ থেকে। বিরক্ত হলেও কিছু বললাম না টাঙ্গাওয়ালাকে। বললাম সাধুবাবাকে,

—বাবা, থামলেন কেন, আরও কিছু বলুন?

সাধুবাবা ডানহাতে ঝুলিটা চেপে ধরে বাঁ-হাতটা আমার পিঠের উপর রেখে বললেন,

—বেটা, সংসারেই হোক আর সাধুসন্ন্যাসীদের সংসারহীন জীবনেই হোক—যা কিছু সুখের উৎপত্তি তা হয় বিষয় থেকে। বিষয়ের আলোচনায় জন্মে বিষয়ে আসক্তি। এই আসক্তি থেকে কামনার উদয় হয় মনে। তারপর কামনা থেকেই উৎপত্তি বা সৃষ্টি হয় কলহের—অসহনীয় ক্রোধের জন্ম হয় কলহ থেকে—ক্রোধ মানুষের প্রকৃষ্ট জ্ঞান নষ্ট করে মানুষকে করে তোলে বিবেকহীন—বিবেকহীনতাই সারাজীবনব্যাপী চলতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে। বিবেকহীন যারা—তারা ঘুরে বেড়ায় অস্তিত্বহীন হয়ে।

ফলে সাধুসন্ন্যাসী বা গৃহী যাই হোক কেন, মুক্তিলাভের পথ থেকে তারা ভ্রষ্ট হয়। এক কথায় এরা জীবিত থেকেও জীবনযাপন করে মৃতের মতো।
এবার প্রসঙ্গটা পাল্টে জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, অমরকণ্টকে নর্মদা মাঈর কোলে বসে আছেন বছরের পর বছর ধরে। মায়ের করুণা কি কিছু উপলব্ধি হলো? উচ্চমার্গের মহাত্মারা কি এখনও আছেন ওখানে?
সাধুবাবা কপালে হাত দুটো ঠেকিয়ে নমস্কার জানিয়ে বললেন,
—বেটা, গৃহত্যাগের পর সেই ছোটবেলা থেকে অমরকণ্টক ছেড়ে যাইনি কোথাও। আজ তো 'বুড্ডা' হয়ে গেছি। নর্মদা মাঈ করুণা না করলে জীবনের এতগুলো বছর কাটালাম কি করে! নর্মদা মাঈর কৃপার কথা, করুণার কথা শুনলে তুই অবাক হয়ে যাবি। পাহাড়ে লোকজন তীর্থযাত্রী গেলে দুটো খাওয়ার অভাব হয় না। বহু বছর আগের কথা। তখন আমার গুরুজী আর দেহে নেই। সে বার একটানা ছয় সাতদিন প্রবল ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল। ঝুপড়ি থেকে বেরোয় কার সাধ্যি! পাহাড়ে একটা লোক আসার মতো পরিস্থিতি নেই—আসেওনি কেউ। একটা পাখীর পর্যন্ত দেখা পাওয়া যায়নি। সাধুদের তো বেশী সঞ্চয় থাকে না। লোকের দেয়া বাড়তি যেটুকু থাকে—সেটুকুই খাওয়া হয় পরে। আমার কাছে যেটুকু সঞ্চয় ছিল—প্রথম দু-দিনেই শেষ। তৃতীয় দিনে ডেরায় একটা দানা পর্যন্ত নেই। ডেরা থেকে বেরোবো—তারও কোন উপায় নেই। আর বেরিয়ে কারও কাছে যে কিছু চাইবো—এমন একটা মানুষও নেই। কি করবো—আহারের সন্ধানে কোথায় যাবো, কিছুই ভেবে পেলাম না। উপায়হীন হয়ে আমার ভজন কুটিরের দাওয়ায় বসে শুধু নর্মদা মাঈকেই স্মরণ করতে লাগলাম। এমন সময়েই ঘটলো এক আশ্চর্য ঘটনা। দেখলাম, অতি বৃদ্ধা এক মহিলা ভিজতে ভিজতে এসে উপস্থিত হলেন আমার কুটিরের উঠোনে। তাঁর সঙ্গে রয়েছে মাঝারী আকারের একটা ঝুড়ি। পাহাড়ী গাছের বড় বড় পাতা দিয়ে ঢাকা। ঝুড়িটা দাওয়ার উপরে রাখতেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম,
—মাঈ, কোথায় থাকো তুমি—এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে এখানে এলেই বা কেমন করে?
অদ্ভূত সুন্দরী শ্যামবর্ণা অতিবৃদ্ধা হাসি হাসি মুখ করে বললেন,
—'বেটা, আমি থাকি কাছেরই ভীলদের পাড়ায়। তুমি এখানে অনেকদিন ধরে আছো, তা জানি। এই দুর্যোগে তুমি কোথাও বেরোতে পারবে না দেখে চলে এলাম, নইলে যে তুমি অভুক্ত থাকবে। আমার বাচ্চা না খেয়ে থাকবে মা হয়ে তা কি কখনও দেখা যায়! তাই তো ছুটে এলাম বেটা।'
কথাটুকু শেষ হতেই এবার আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,
—বেটা, আমি ভাবলাম, মাঈকে একটু বসতে দিই। ভেবে কুটিরে ঢুকে একটা

আসন আনতে যেটুকু সময়—ব্যস, বাইরে এসে দেখলাম, ফল আটা ঘি সবজীর ঝুড়িটা ছাড়া আর কেউ কোথাও নেই। একফোঁটা জলে ভেজেনি ঝুড়িটা। মনটা আমার খারাপ হয়ে গেল। মাঈকে হাতে পেয়েও হারালাম। এইভাবে নর্মদা মাঈ আমাকে করুণা করে জুটিয়ে দিয়েছে আহার। তাঁর দয়াতেই তো বেটা চলছি—বেঁচে আছি। আর সাধু-মহাত্মাদের কথা বলছিস্—তাঁদের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। তবে লোকালয়ে আসে না। অধিকাংশই তাঁরা তপস্যা করেন নর্মদার তীরে তীরে—গভীর অরণ্যে। এই জীবনে অনেক মহাত্মার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে—তাঁদের কৃপালাভও করেছি।

টাঙ্গাওয়ালা ঘোড়া ছুটিয়েছে বেশ গতিতে। আমার এখন আর কোন দিকে মন নেই—নজরও নেই। চোখ দুটো রয়েছে সাধুবাবার মুখের দিকে। মথুরা থেকে কতটা পথ এলাম—এখান থেকে গোকুল আর কতটা বাকি—সাধুবাবা কোথায় নামবেন—কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারলাম না। শুধু সাধুবাবার উপর নর্মদা মাঈ-এর কৃপার কথা ভাবছি—আর ভাবছি, এ যুগে এসব কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে। কারও মুখে অবিশ্বাস্য কথা শুনে—সেই কথায় শ্রোতার প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মাবে—এমন মানুষের সংখ্যা খুব বেশী আছে বলে আমার মনে হয় না। তবে একেবারে যে কেউ নেই—একথায় আমার একেবারেই বিশ্বাস নেই। যাই হোক, বিশ্বাসটা যে মানুষের জন্মান্তরের সংস্কারের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে—সাধুদের এ-কথায় আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। এবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা সারাটা জীবনই তো কাটালেন ভগবান ভগবান করে। তাঁকে লাভ করার পথের অন্তরায়টা কি—তা কি জানা আছে আপনার ?

দেখেছি, সব সাধুবাবারাই যেন 'রেডিমেড সাপ্লায়ার'। প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর প্রস্তুত। সাধননিষ্ঠ বৈরাগ্যময় জীবন সাধুবাবার। মুখখানা দেখে মনে হয়, আবিলতার এতটুকুও স্পর্শ নেই মনের মধ্যে। আমার প্রশ্নের উত্তরে জানালেন,

—বেটা, ভগবানকে লাভ করার, তাঁর করুণা, কৃপালাভের অন্তরায় মাত্র দুটো বলেই আমার মনে হয়। এক, আসক্তি—দুই, অভিমান। এই দুটো যার মধ্যে আছে, তার তাঁকে লাভ করা তো দূরের কথা—তাঁর করুণা থেকেও মানুষ বঞ্চিত হয় সারাটা জীবনই। বেটা, যে কোন বিষয় বা বস্তুতে মানুষের আসক্তি নষ্ট করে দেয় ধর্মভাবকে। আর অভিমান নষ্ট করে দেয় মানুষের সমস্ত গুণকে—তার মধ্যে বিশেষ করে নষ্ট করে সত্ত্বগুণকে। সুতরাং বেটা, আসক্তিতে ধর্মভাব আর অভিমানে যার সমস্ত গুণ নষ্ট হয়ে গেল—তার তাঁকে পাওয়ার পুঁজি রইলো কোথায় ? ঠিক এই দুনিয়ায়—মানুষের ক্রোধ নষ্ট করে অর্থ ও বিষয় সম্পত্তি, জরা সৌন্দর্যকে নষ্ট করে রোগব্যাধি, সমস্ত আশা নষ্ট করে দেয় ধৈর্যকে, অসৎ সঙ্গ নষ্ট করে স্বভাবকে আর কাম মানুষকে নির্লজ্জ করে তোলে লজ্জাকে নষ্ট করে। সুতরাং আসক্তি আর অভিমান—এ-দুটো ত্যাগ করতে না পারলে তাঁর করুণাটুকুও মানুষ লাভ

করতে পারে না। বেটা, ভ্রমের বশে মানুষ যাঁকে খুঁজে বেড়ায় অথচ যিনি রয়েছেন তোর আমার আর সকলের ভিতরে—তিনিই তো ঈশ্বর। তবে তিনি রয়েছেন অপ্রকট অবস্থায়। যে আসক্তি আর অভিমান ত্যাগ করতে পারে—তার কাছেই তিনি প্রকটিত হন। যাঁরা পেরেছেন—তাঁদের কাছে তিনি প্রকটিতও হয়েছেন। যারা তা ত্যাগ করতে পারবে না—তাদের কাছে তিনি প্রকটিত হবেনও না।
কথাটুকু শেষ হতেই ঘাড় ঘুরিয়ে পথের ধারে বড একটা গাছ দেখিয়ে বললেন,
—বেটা, এবার আমি নামবো। ওই গাছের সামনে আমাকে নামিয়ে দিলেই হবে।
দেখতে দেখতে টাঙ্গা এসে গেল গাছের কাছে। থামতে বললাম। গাছ ছাড়িয়ে আরও হাত কুড়ি এগিয়ে টাঙ্গা থামলো। সাধুবাবা নামলেন। আমিও নামলাম। সঙ্গী বন্ধুও নেমে এলো টাঙ্গা থেকে। আমরা দুজনেই প্রণাম করলাম সাধুবাবাকে। হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে মাথায় হাত দিলেন। তারপর বাঁ-পাশের একটা মেঠো পথ ধরে এগিয়ে চললেন নির্মল হৃদয় আসক্তি ও অভিমানত্যাগী বৃদ্ধ সাধুবাবা। আমরা উঠে বসলাম টাঙ্গায়। টাঙ্গাওয়ালা মুখে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করতেই ঘোড়া চলতে শুরু করলো। কথাগুলো রয়ে গেল—চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেলেন সাধুবাবা।

মথুরা থেকে গোকুলের পথে কোন বৈচিত্র্য নেই। আর পাঁচটা আধা শহরের পথ আর পাশের জনবসতি যেমন থাকে, ঠিক তেমনই গোকুলের পথে। টাঙ্গা চলছে মথুরার পূর্ব দিকে পাকা রাস্তা ধরে।
বৃন্দাবন ও মথুরা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আছে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোর লীলার সঙ্গে। শত শত বছর ধরে আজও পুরাণ ও ইতিহাসের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে মথুরা—মথুরার অন্তর্গত গোকুলও। মথুরায় যমুনার পূর্বপারের সমস্ত এলাকাটিই গোকুল নামে প্রসিদ্ধ। এর আরও একটি নাম আছে—মহাবন বা পুরাতন গোকুল। প্রবাদ আছে, রাজা যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় হেরে যাওয়ার পর মহাবন বা গোকুলে এসেছিলেন। তবে মহাভারতে একথার সমর্থনে কোন কথা লেখা নেই। তবে অনেকের ধারণা, মহাবনই শ্রীবলদেবের জন্মস্থান।
ব্রজের প্রধান বারোটি বনের মধ্যে রয়েছে এই গোকুল বা মহাবন। ব্রজ পরিক্রমার পথে এখানে আসতেই হয় তীর্থকামীদের। তবে পরিক্রমা না করলেও গোকুল দেখতে আসায় অসুবিধে নেই তীর্থযাত্রী বা ভ্রমণকারীদের।
টাঙ্গাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই, শ্রীকৃষ্ণের আমলের সত্যিই কি কিছু আছে? আপনারা তো এখানে আছেন বহু বছর ধরে। আপনাদের যত বেশী জানা আছে —ততটা কি আর আমরা জানতে পারবো!
ঘোড়ার পিঠে হুশাং করে চাবুকের একটা ঘা দিয়ে বৃদ্ধ টাঙ্গাওয়ালা বললেন,

—হাঁ বাবু, আছে। সমগ্র ব্রজ মণ্ডলে তিনটি প্রাচীন এবং সত্য জিনিষ আছে। যমুনা, ব্রজভূমি আর গিরি-গোবর্ধন—এই তিনটেই আছে শ্রীকৃষ্ণের আমল থেকে। আর যা কিছু বাবু তা মহাত্মাদের কথায়—আপনাদের বিশ্বাসের উপর।

টানা প্রায় ১২ কি.মি. চলার পর টাঙ্গা এসে থামলো মথুরা-সাদাবাদ পাকা রাস্তার ধারে—চারদিক সুন্দর ছায়াঘেরা মনোরম পরিবেশে—একটা বড় গাছের নীচে। অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ। মহাবন—বনের সৌন্দর্যই চোখে পড়ার মতো। আর লক্ষ্য করার মতো—এখানকার সব বাড়ীগুলিরই মাটির দেয়াল, খড়ের চাল।

টাঙ্গা যেখানে এসে দাঁড়ালো সেখান থেকে সামান্য একটু এগোতেই বাঁ-পাশে পড়লো পোৎরা কুণ্ড। চার পাশ এর পাথর দিয়ে বাঁধানো। মাঝারী আকারের কুণ্ড তবে বেশ গভীর। এর চারদিকেই কদম আর অন্যান্য নানা গাছের সাজানো সুন্দর বন। লুকোচুরি খেলার জন্য বনের প্রতিটি গাছ যেন ডালপালা নেড়ে ডাকছে বালক কৃষ্ণকে। বাল্যকালে এই মহাবন অত্যন্ত প্রিয় ছিল কৃষ্ণের। সখাদের নিয়ে তিনি খেলা করতেন এই বনে।

পোৎরা কুণ্ডে কাপড় কাচতে দেয়া হয় না গোকুলবাসীদের। এই কুণ্ড সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর আতুর ঘরের কাঁথা কাপড় ধোয়া হয়েছিল এই কুণ্ডে। এর পবিত্রতা রক্ষার্থে চারপাশ ঘিরে রাখা হয়েছে। তীর্থযাত্রীরা ইচ্ছা করলে স্নান বা জলস্পর্শ করতে পারেন এখানে।

এই কুণ্ড থেকে আরও একটু এগোতেই পড়লো একটি প্রবেশ তোরণ। এমন দ্বার গোকুলে আছে মোট সাতটি। যেমন, কৃষ্ণ দ্বার, বলদেব দ্বার, গোকুলনাথ দ্বার, নন্দপুরী দ্বার, যশোদাপুরী দ্বার, যোগমায়া দ্বার এবং নন্দ দ্বার।

প্রথমেই পড়লো নন্দ দ্বার। এগিয়ে গেলাম সরু রাস্তা ধরে। এখানকার রাস্তাগুলি যদিও বাঁধানো তবে কলকাতার বস্তি এলাকার রাস্তার মতো। পথের দু-পাশে কখনও দোকান-পাট আবার কখনও বাড়ীঘর। বাইরের লোক বলতে যা—তা নেই এখানে। স্থানীয় যারা—তারা প্রায় সকলেই পাণ্ডা।

আরও মিনিট খানেক হাঁটার পর এলাম—প্রাচীন নন্দভবন। সাইনবোর্ডে লেখা দেখলাম—'নন্দ কিলা মন্দির'। অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে একটি প্রাচীন বাড়ীর ভগ্নাবশেষ। যদিও প্রাচীন এবং স্থানীয় লোকবিশ্বাস, এটি নন্দরাজার বাড়ী। তবে আমার বিশ্বাস, প্রাচীনকালে হয়তো এখানে নন্দরাজার বাড়ী ছিল—এখনকার এটি নয়।

সামান্য উঁচু পথ। প্রথমে পড়লো বড় একটি প্রাচীন বটগাছ। তারপর একটা গলির মতো রাস্তা ধরে একেবারে কয়েক মিনিটের মধ্যে এসে গেলাম যমুনা তীরে। বাঁধানো একটি ঘাট রয়েছে—চক্রবলী ঘাট। পাশ দিয়ে যমুনা বয়ে চলেছে কুলকুল করে।

এই ঘাটের বাঁধানো পাড় ধরে কিছুটা এগিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠে

এলাম উপরে। বাঁ-দিকে রয়েছে ছোট্ট একটা ঘর। মন্দির বলে মনেই হয় না। ভিতরে রয়েছে ছোট্ট কৃষ্ণের বাল্যকালের একটি বিগ্রহ। দরজার উপরে ছোট একটি সাইনবোর্ডে লেখা দেখলাম—'মাখন চোর গলি'। কথিত আছে, বাল্যকালে এই ক্ষেত্রটিতে শ্রীকৃষ্ণ মাখন চুরি করে খেয়েছিলেন।

এরপর এলাম একটুখানি হেঁটে নন্দ ঘাটে। ঘাটের কাছেই স্থাপিত রয়েছে যোগমায়া মন্দির। মন্দিরটি বেশ বড়। ভিতরে এসে দাঁড়ালাম। বেদীতে প্রতিষ্ঠিত আছে বড় সিংহবাহিনী দুর্গার বিগ্রহ। সাদা পাথরে নির্মিত মূর্তিটি ভারি সুন্দর। কথিত আছে, প্রাচীনকালে নন্দভবনের এই ক্ষেত্রটিতে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যোগমায়া। বিগ্রহের সামনেই রয়েছে ছোট্ট একটি যজ্ঞকুণ্ড।

যোগমায়া মন্দির ছেড়ে আরও একটু উপরে উঠে এলাম সিঁড়ি ভেঙ্গে। আবার পড়লো ছোট্ট একটি সাধারণ ঘর। দরজার উপরে লেখা রয়েছে—'মাটি খাওয়া মন্দির।' কথিত আছে, এই ক্ষেত্রটিতে বাল্যকালে মাটি খেয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। এই ঘরটির পাশেই রয়েছে আরও একটি সাদামাটা ছোট্ট ঘর। প্রবাদ আছে, অতীতে এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলরাম। দরজার উপরেও এ-কথা লেখা রয়েছে ছোট একটি সাইন বোর্ডে।

এরই পাশে এলাম মূল নন্দভবন মন্দিরে। চুরাশীটি গোল স্তম্ভের উপর নির্মিত হয়েছে এই মন্দিরটি। মন্দিরে ঢুকেই ডানপাশে দেখলাম একটি ছোট্ট শিব মন্দির। একই মন্দিরের বাঁপাশে একটি দোলায় রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ। কথিত আছে, একদা এখানে শ্রীকৃষ্ণ বড় হয়েছিলেন ধীরে ধীরে। বসুদেব এখানেই রেখেছিলেন কৃষ্ণকে। এই মন্দিরের প্রবেশ মুখে লেখা রয়েছে—'বাসুদেবজীকা গোকুল আগমন'।

শ্রীমদ্ ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৩য় অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে এইভাবে,

"...বসুদেব ভগবানের আজ্ঞায় ('যদি কংসের ভয় পাও, আমাকে গোকুলে রেখে আমার যোগমায়া কন্যা হয়ে যে জন্মেছেন তাঁকে নিয়ে এস।' শ্রীধরস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা অনুসারে।) পুত্রকে নিয়ে সূতিকা-গৃহের বাইরে যাবার উদ্‌যোগ করলেন। এদিকে সে সময় ভগবানের যোগমায়া জন্মরহিত হয়েও নন্দজায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন। সেই মায়ার প্রভাবে সমস্ত দ্বারপাল প্রহরীদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি অবশ হয়ে গেল এবং নগরবাসী সকলে নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ল। বসুদেব-দেবকীর ঘরের বিশাল কপাট লোহার খিল ও শিকলে শক্তভাবে বন্ধ ছিল। কিন্তু বসুদেব যখন শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে বের হতে গেলেন তখন সূর্যের উদয়ে যেমন অন্ধকার নিজেই দূর হয়, সেভাবেই সমস্ত দ্বার, শৃঙ্খল ইত্যাদি আপনিই খুলে গেল। তখন মন্দ মন্দ মেঘগর্জনের সঙ্গে বৃষ্টিপাত হচ্ছিল সত্য, কিন্তু তাতে বসুদেবের কোন কষ্ট হল না। অনন্তদেব তাঁর বিস্তৃত ফণা দ্বারা জল নিবারণ করে তাঁর পেছন পেছন যেতে লাগলেন। ইন্দ্রের অনবরত বর্ষণে যদিও যমুনার জলরাশি সহস্র তরঙ্গে ফেনিল এবং

অসংখ্য আবর্তে ভয়ানক হয়ে উঠেছিল, তবু সাগর যেমন রামচন্দ্রকে পথ দিয়েছিল, ঐ নদীও সেরকম শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে যাবার জন্য বসুদেবকে পথ করে দিল। ৪৬-৫০
বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে নন্দব্রজে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, গোপেরা সবাই নিদ্রায় মগ্ন হয়ে রয়েছে। তিনি নিজের পুত্রকে যশোদার শয্যায় রেখে তাঁর কন্যাকে তুলে নিয়ে আবার ফিরে এলেন। দেবকীর শয্যায় তনয়াটিকে রেখে নিজেকে লোহার শিকলে বাঁধলেন এবং আবার আগের মতো বন্দী অবস্থায় রইলেন। যশোদা এইমাত্র বোধ করেছিলেন যে, যা হোক একটি সন্তান হয়েছে। ক্লান্তি ও মায়ায় অপহৃত-স্মৃতি হওয়াতে তিনি সন্তানের পুত্র বা কন্যা কোন লক্ষণ স্থির করতে পারেন নি। ৫১-৫৩
এই হলো বসুদেবের গোকুল আগমনের কথা। তবে এখানকার মন্দিরে ভ্রমণকারী বা তীর্থযাত্রীরা সতর্ক না হলে পাণ্ডাদের কথার জালে জড়িয়ে পড়ে যথেষ্ট অর্থের শ্রাদ্ধ করতে বাধ্য হয়। বেরিয়ে আসার উপায় থাকে না।
গোকুলে নন্দভবনকে কেন্দ্র করে দেখার মধ্যে এইটুকুই। বেশী সময় লাগে না কারণ দর্শনীয় জায়গাগুলি সব পাশাপাশি বলে।
আমার টাঙ্গা দাঁড়িয়ে রইলো পোৎরা কুণ্ডের কাছে। আমি সঙ্গীকে নিয়ে যমুনার পাড় ধরে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে প্রায় ১ কি. মি. হেঁটে এলাম মথুরার ব্রহ্মাণ্ড ঘাটে। বাঁধানো ঘাট। পাশেই রয়েছে মাঝারী আকারের মন্দির। শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপিত রয়েছে এই মন্দিরে। কথিত আছে, এই ক্ষেত্রটিতে শ্রীকৃষ্ণ গরু চরাতেন এবং বাল্যকালে মাটি খাওয়ার পর এখানে মা যশোদাকে নিজ মুখে দেখিয়ে ছিলেন ব্রহ্মাণ্ড। তাই এই ঘাটের নাম হয়েছে ব্রহ্মাণ্ড ঘাট।
কাহিনীটি শ্রীমদ্ ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে শুকদেব গোস্বামী এইভাবে বর্ণনা করেছিলেন রাজা পরীক্ষিৎকে,
"হে রাজর্ষি, রাম (বলরাম) ও কৃষ্ণ অল্পদিনের মধ্যেই জানুঘর্ষণ (হামাগুড়ি) ত্যাগ করে পায়ে হেঁটে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে লাগলেন। তারপর তাঁরা ব্রজবালকদের সঙ্গে ব্রজনারীদের আনন্দ সঞ্চার করে ক্রীড়া করতে লাগলেন। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বাল্যচপলতা দেখে এসে তাঁর মাকে বললেন, তোমার এই ছেলে কখনো অসময়ে বৎসদের মুক্ত করে দেয়, কেউ ভর্ৎসনা করলে হাসতে থাকে, কখনো বা চুরি করে সুস্বাদু দধি-দুগ্ধ ভক্ষণ করে, আবার তা বানরদের ভাগ করে দেয়। বানরেরা না খেলে ভাণ্ডগুলি ভেঙে ফেলে। কোন কিছু না পেলে গৃহস্থের প্রতি কুপিত হয়ে তাদের শিশুদের কাঁদায়। যদি হাত বাড়িয়ে নাগালের মধ্যে কোন কিছু না পায় তাহলে পীঠ (পিঁড়ি) ও উদূখল (উখলি) প্রভৃতি দিয়ে উপায় রচনা করে তা হস্তগত করে। শিকার-ঝোলানো ভাণ্ডের মধ্যে যে দধি, দুগ্ধাদি থাকে, তা নেবার ইচ্ছে হলে তাতে ছিদ্র করে দেয়। তোমার পুত্র ছিদ্র করতে বিলক্ষণ পটু। একে এর দেহ স্বভাবত উজ্জ্বল, তাতে আবার তা মণিমালায় শোভিত। গোপীরা

গৃহকার্যে ব্যস্ত থাকলে বালক অন্ধকার ঘরে ঢুকে নিজের অঙ্গকান্তিকে প্রদীপের মত ব্যবহার করে প্রয়োজন সাধন করে থাকে। সে এ-ভাবে নানা দৌরাত্ম্য করে। সে নানা জিনিষ চুরি করেই ক্ষান্ত হয় না, সুমার্জিত ঘরে মল-মূত্রও ত্যাগ করে। এই সব অপকর্ম করে তোমার কাছে সাধুর মত থাকে। ২৬-৩২

ব্রজকামিনীরা যখন কৃষ্ণের সভয় দুটি চোখে শোভিত মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে এসব গুণ ব্যাখ্যা করেন, তখন মা যশোদা হাসতে থাকেন। তাঁর তিরস্কার করতে একটুও প্রবৃত্তি হয় না। একদিন বলরাম প্রভৃতি গোপবালকরা খেলতে এসে মা যশোদার কাছে নালিশ করল, কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে। হিতৈষিণী যশোদা শিশুর হাত দুটি ধরে ভয় দেখানো চোখ করে তাঁকে তিরস্কার করলেন, অশান্ত ছেলে, মাটি খেয়েছিস্ কেন? এই ব্রজবালকেরা আর জ্যেষ্ঠ রামও বলছে একথা। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, মা, আমি মাটি খাইনি। এরা সবাই মিথ্যা কথা বলছে। সবার সামনেই আমার মুখ দেখ তা হলেই এদের কথা মিথ্যা কিনা বুঝতে পারবে। যশোদা বললেন, তা হলে হাঁ কর।

মহারাজ, ভগবান শ্রীহরি লীলাচ্ছলে মানব-শিশুরূপে আবির্ভূত হলেও তাঁর ঐশ্বর্য নষ্ট হয় নি। তিনি মার ঐ কথা শুনে হাঁ করলেন এবং মা যশোদা তাঁর মুখের মধ্যে তাকিয়ে দেখলেন স্থাবর, জঙ্গম, অন্তরীক্ষ, সকলদিক, পর্বত, সাগর, দ্বীপ, সমুদ্রের সঙ্গে ভূলোক, প্রবাহ বায়ু, বিদ্যুৎ, অগ্নি, চন্দ্র ও তারামণ্ডলের সঙ্গে জ্যোতিশ্চক্র, জল, তেজ, আকাশ, স্বর্গ, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারা, সমস্ত ইন্দ্রিয়, মন, শব্দ প্রভৃতি বিষয়, ত্রিগুণ প্রভৃতি সহ সমস্ত বিশ্ব তাঁর মুখের মধ্যে বিরাজ করছে। পুত্রের বিস্ফারিত মুখের মধ্যে জীব, কাল, স্বভাব, কর্ম ও তার সংস্কার প্রভৃতি দ্বারা চরাচর শরীরের ভেদলক্ষণযুক্ত বিচিত্র বিশ্ব, এমনকি ব্রজভূমি এবং নিজেকেও দেখে যশোদার ভয় হল। (তুলনীয় : অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন, গীতা ১১/১৫)। তিনি বলতে লাগলেন, একি স্বপ্ন, না-দৈব মায়া? না আমার বুদ্ধির বিকার ঘটেছে? দর্পণে যে রকম মুখ দেখি এর মধ্যে সেরকম বিশ্বকে দেখছি। এবোধ হয় শিশু-সন্তানেরই কোন স্বাভাবিক ঐশ্বর্য। চিত্ত, মন, বাক্য এবং কর্মদ্বারা যে পদার্থের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না, যা জগতের আশ্রয়, যার অধিষ্ঠানের জন্য বুদ্ধি-বৃত্তি অভিব্যক্ত হয় এবং যে পদ থেকে এই জগৎ প্রতীয়মান হচ্ছে, আমি সেই অনন্ত দুজ্ঞের্য় পদকে নমস্কার করি। আমি যশোদা নাম্নী গোপী, এই ব্রজেশ্বর নন্দগোপ আমার পতি, আমি এর যাবতীয় বিত্তের অধিষ্ঠাত্রী সতী পত্নী, কৃষ্ণ আমার পুত্র, এই গোপী, গোধন আমার—এইসব কুমতি যাঁর মায়া থেকে উৎপন্ন হয়েছে সেই ভগবান আমাকে ত্রাণ করুন। ৩৩-৪২

মহারাজ, গোপী যশোদা সমস্ত তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি পুত্র-স্নেহ-রূপিণী নিজ মায়া প্রয়োগ করলেন। তাতে গোপীর আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত হল। তিনি পুত্রকে কোলে নিয়ে বুকের কাছে রেখে আবার আগের মত স্নেহে অচেতন

হলেন। বেদ, উপনিষদ, সাংখ্য, যোগশাস্ত্র এবং ভক্তরা যাঁর মাহাত্ম্য গান করেন সেই শ্রীহরিকে যশোদা মায়ার বশে নিজের পুত্র মনে করলেন"। ৪৩-৪৫

প্রাচীন গোকুলে মহারাজ নন্দের ভবনই মূলত দর্শনীয়। তবে এখানে রয়েছে গোকুলনাথের মন্দির। এটি বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের কয়েকটি মন্দিরের মধ্যে অন্যতম। মথুরা বৃন্দাবনের মতো গোকুলেও বসবাস করেছিলেন বল্লভাচার্য।

নারদঋষির শিষ্য এবং শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ ছিলেন পর্জন্যগোপ। কথিত আছে, প্রথমে তিনি বাস করতেন নন্দীশ্বরে। সেখানে কেশী দৈত্যের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে চলে আসেন মথুরায়—আত্মীয়দের সঙ্গে বাস করেন এই গোকুলে। এখানকার একটি মন্দিরে স্থাপিত রয়েছে তাঁর সুন্দর একটি মাটির মূর্তি।

প্রাচীন তথা আজকের রমনীয় গোকুলে ঘুরে ঘুরে দেখতে বেশী সময় লাগে না। গোকুলনাথ আর পর্জন্যগোপের মন্দির দেখে এসে বসলাম টাঙ্গায়। টাঙ্গা চললো যেখান থেকে উঠেছিলাম—সেখানে।

গিরি গোবর্ধনের পথে

সাধুসঙ্গ—প্রতারক গুরু এবং বিভ্রান্ত শিষ্য প্রসঙ্গে

মথুরা বাস ডিপোয় এলাম। বাস ছাড়তে এখনও কিছুটা দেরী আছে। ডিপোর কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে বাসে উঠতেই দেখলাম পিছনের সিটে বসে আছেন এক সাধুবাবা। সামনের এবং পাশের সিটগুলো দেখলাম যাত্রীতে ভরে আছে। পিছনের সিটে সকলে বসলেও তখনও অনেকটা বসার জায়গা ফাঁকা রয়েছে। একটা যাত্রীও দাঁড়িয়ে নেই। সাধুবাবা বসে আছেন এক কোণে। তার পাশেই বসে আছেন একজন ময়লা জামা কাপড় পরা দেশওয়ালী বৃদ্ধ। মাথায় একটা কাপড় জড়ানো পাগড়ীর মতো করে। পায়ের কাছে রয়েছে একটা টিনের বাক্স। বৃদ্ধের এই পাশে পর পর বসে আছেন আরও দুজন—একজন মাঝ বয়সী আর একজন বছর দশেকের ছেলে। তারপর তিনজনের বসার মতো জায়গা ফাঁকা। এরপর কয়েকজন বসে আছে একেবারে জানলার ধার পর্যন্ত।

অপ্রত্যাশিতভাবে সাধুবাবাকে দেখতে পেয়ে মনটা আমার আনন্দে নেচে উঠলো। তাই কোন কিছু না ভেবে সোজা বৃদ্ধযাত্রীর কাছে গিয়ে অনুরোধের সুরেই বললাম,

—দয়া করে আপনি একটু এদিকে সরে বসবেন, 'বাবা সে কুছ পুছনা হ্যায়।'

বৃদ্ধ তাকালেন আমার মুখের দিকে। মুখে কিছু বললেন না। পাশে বসা যাত্রীদের ইসারায় বললেন সরে বসতে। সকলেই একটু একটু করে সরে বসতেই বসার জায়গা হলো আমার। এবার আমিও বসলাম সাধুবাবার গা ঘেষে। আমার সঙ্গীটিও বসলো দুজনের পরে।

এবার বলি সাধুবাবার চেহারার কথা। বেশ বৃদ্ধ। কাঁধে রয়েছে ইহকালের সম্বল সেই ঝোলা—যা থাকবে মরার দিন পর্যন্ত। পরনে গেরুয়া বসন। বেশ ময়লা। শত কাচাকাচিতেও এ ময়লা উঠবে বলে মনে হলো না। মুখ ভর্তি দাড়ি। মাথায় লম্বা লম্বা চুল তবে জটা বাঁধেনি একটাও। ভাঙা গাল লাবণ্যে ভরা। চোখ দুটো অনেক বসে গেছে তবে অসম্ভব রকমের উজ্জ্বল। মাঝারী আকারের নাক। চাপা নয় আবার একেবারে টিকালোও নয়। গায়ের রঙও বেশ ময়লা। একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি, আরামে বসে বসে খাওয়া সাধুরা ছাড়া পথ-চলতি আশ্রয়হীন একজন সাধুর চেহারাও তেল চুকচুকে নাদুসনুদুস নয়।
সাধুবাবা বসে আছেন কোণায় জানলার ধারে। মাথা নিচু করে প্রণাম করতে গেলে দুজনেরই অসুবিধে হবে। তাই দু-হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে মুখে বললাম,
—আপকা গোড় লাগে বাবা।
মুখে কিছু বললেন না। ইসারায় ডানহাতটা নাড়লেন অভয়সূচক করে। বাসে স্টার্ট দেয়ার আওয়াজ এলো কানে। বাস ছাড়লো মথুরা বাসডিপো থেকে। সকাল ভোর—ফাঁকা রাস্তা। তাই শুরু থেকেই বাস চলতে লাগলো হৈ হৈ করে—ডীগ জয়পুর যাওয়ার রাস্তা ধরে। বৃন্দাবন থেকে এই ডিপোয় এসেছি টাঙ্গায়। এখন অবশ্য অটো হয়েছে। যাচ্ছি গিরিরাজ গোবর্ধন। গোবর্ধন পর্বতের নাম। একদা শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র। সময় কম, তাই কোন ভূমিকা না করেই জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, আপনি কোথায় যাবেন, গিরিগোবর্ধন ?
সাধুবাবা মাথাটা নেড়ে মুখেও বললেন,
—না বেটা, আমি গিরিগোবর্ধনে যাবো না। যাবো রাধাকুণ্ডে।
কথাটা বলে সাধুবাবা বাসের জানালা দিয়ে তাকালেন বাইরের দিকে। ইতিমধ্যেই একজন উঠে খালি সিটে বসে পড়েছেন বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। দাঁড়িয়েও রয়েছেন কয়েকজন। জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, এখন আপনি আসছেন কোথা থেকে—বৃন্দাবন ?
কোন রকম ইতস্তত না করেই উত্তর দিলেন সাধুবাবা,
—বৃন্দাবনে কয়েকদিন ছিলাম। গতকাল মথুরায় এসেছি। আজ রাধাকুণ্ডে যাচ্ছি। ওখানে কয়েকদিন থাকার ইচ্ছে আছে। তারপর গিরিগোবর্ধন হয়ে পরে যাবো একটু দ্বারকায়।
বাসটা থামলো। কয়েকজন হিন্দী ভাষাভাষীর মহিলাপুরুষ উঠলেন এক গাদা বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে। বসার জায়গা নেই। সিটের কোণা ধরে বাচ্চারা দাঁড়ালো। বড়রা দাঁড়ালেন উপরের হ্যাণ্ডেল ধরে। প্রত্যেকেরই পরনে ময়লা জামা কাপড় দেখেই বোঝা যায়, আর্থিক অবস্থা এদের ভালো নয়। এই বাসে একমাত্র আমি

আর আমার সঙ্গী ছাড়া প্রত্যেকেই হিন্দীভাষী। বাস ছাড়লো। ধীরে ধীরে চলতে চলতে আবার গতি বাড়লো। বললাম,

—বাবা, দয়া করে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন ?

মুখে কোন কথা বললেন না। ইসারায় জিজ্ঞাসা করলেন—কি জানতে চাই ? বললাম,

—বাবা, অনেক দীক্ষিত শিষ্য-শিষ্যার মুখেই শুনেছি এবং শুনি, দীক্ষার পর তাঁদের কারও গুরু প্রতারণা করেছেন, কেউ বা শিষ্যের বিশ্বাস ভক্তির সুযোগ নিয়ে প্রচুর টাকা পয়সা নিয়েছেন ফলে পরবর্তীকালে শিষ্যের শ্রদ্ধা বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে গুরুর উপর, কেউ হয়তো কারও মাধ্যমে কোন গুরুর বিষয়ে প্রশংসা শুনে আবেগের বশে দীক্ষা নিয়ে পরে জানতে পারলেন আসলে যা শুনেছিলেন—তার সঙ্গে গুরুর চরিত্র ব্যবহার ও কার্যকলাপের সঙ্গে মোটেই মিল নেই, ফলে শ্রদ্ধা বিশ্বাস হারালেন তাঁর গুরুর উপরে। কেউ হয়তো বাহ্যত দেখলেন গুরু খুবই ভালো। দীক্ষা নিলেন আনন্দের সঙ্গে। পরে জানতে পারলেন, গুরুজী তাঁর লম্পট চরিত্রহীন মদ্যপ বা অবৈধ কোন কর্মে লিপ্ত আছেন—ফলে শিষ্য বা শিষ্যার মন শুধু খারাপ নয়, শ্রদ্ধা বিশ্বাস হারালেন এমনকি দীক্ষায় লাভ করা ইষ্ট মন্ত্র পর্যন্ত পরিত্যাগ করলেন—এমন জাতীয় অসংখ্য ঘটনার কথা আমি শুনেছি অনেক দীক্ষিত শিষ্য-শিষ্যার মুখে। এক কথায় বাবা, তাদের ভাষায় 'গুরু তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন' বা ওই জাতীয় এমন কিছু করেছেন যার ফলে শিষ্য বা শিষ্যার গুরুর উপর আস্থা নেই—বিশ্বাস ভক্তি শ্রদ্ধার শেষ সম্বলটুকু মুছে গেছে অন্তর থেকে—এসব সত্ত্বেও কেউ ইষ্টমন্ত্র নামেই ধরে রেখেছেন, কেউ পরিত্যাগ করেছেন, কেউ বা কখনও কখনও জপ করেন আবার করেন না। অর্থাৎ গুরুর বিষয়ে দ্বিধা সংশয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। আবার তারাই শুনেছেন গুরু পরিত্যাগ করা অপরাধ। তারা গুরুকে ফেলতেও পারছেন না, আবার গ্রহণও করতে পারছেন না অন্তর থেকে। আপনি তো বাবা এ পথে আছেন বহু বছর ধরে। আমার বিশ্বাস, আপনাদের মতো যাঁরা—তাঁরা প্রাচীনদেরই ধারা বহনকারী। আমার জিজ্ঞাসা, গুরুকে কেন্দ্র করে যে সব শিষ্য-শিষ্যারা মানসিক দিক থেকে দিনের পর দিন কষ্ট পাচ্ছেন—তাঁরা কিভাবে এই মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন—তাঁদের এই সমস্যার সমাধানের উপায় কি—তাঁদের কি করা উচিত এবং কি করলে কল্যাণ হবে—দয়া করে বলবেন বাবা ?

যত রকমভাবে পারলাম, আরও অনেক কথা বলে বিষয়টা বোঝালাম সাধুবাবাকে। আমার সৌভাগ্য, তিনি প্রত্যেকটা কথাই শুনলেন নিবিষ্ট মনে। বাসের ঝাঁকানি, আওয়াজ, গতির তারতম্যহেতু খুব অসুবিধেই হচ্ছিলো আমার কথা বলতে, সাধুবাবার শুনতে। তবুও আমি বোঝাতে পেরেছি—বুঝতে অসুবিধা হয়নি সাধুবাবারও। কথাগুলো শোনার পর কেমন যেন একটা ব্যথার ভাব ফুটে

উঠলো সাধুবাবার উজ্জ্বল মুখখানায়। মিনিটখানেক চুপ করে থাকার পর সাধুবাবা বলতে শুরু করলেন,

—বেটা, এ-খুব জটিল প্রশ্ন আর উত্তরও অনেক বড়। এইভাবে বাসে যেতে যেতে এসব কথা ঠিক মতো আলোচনা করা যায় না। তবুও তুই যখন বললি তখন যতটা পারি উত্তর দিচ্ছি। তবে এসব আলোচনার জায়গা বাসে নয়।—

আমার সময় কম। যতটা পারি ততটা জেনে নিই। অকারণ সময় নষ্ট হবে কথা বাড়ালে। তাই একটা কথাও বললাম না। সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, তুই যে সমস্যার কথাগুলো বললি দীক্ষিত শিষ্য-শিষ্যাদের সম্পর্কে—এ-সমস্যা আজ বলতে পারিস সারা দেশজুড়ে। এমন ঘটনা দু-একজন শিষ্য বা শিষ্যার জীবনের নয়—লক্ষ লক্ষ অভাগাদের জীবনে ঘটে চলেছে অবিরত। যতটা পারি তোর প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করছি। তুই যাবি কোথায়—রাধাকুণ্ডে? থাকিস কোথায়?

সাধুবাবার কথার উত্তরে জানালাম,

—আমি বাবা কলকাতায় থাকি। বৃন্দাবন মথুরায় এসেছি কৃষ্ণের লীলাভূমি দর্শন করতে। এখন যাবো গিরিরাজ গোবর্ধন দর্শনে। আসার পথে দর্শন করবো রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড।

কথাটা শুনে মাথাটা একটু নাড়ালেন সাধুবাবা। অর্থাৎ ভাবটা এমন—'তোর কথা বুঝেছি।'

এবার তিনি শুরু করলেন এইভাবে,

—বেটা, আমি শাস্ত্রও পড়িনি, লেখাপড়াও কিছু শিখিনি। আমার গুরুজীর মুখে যেটুকু শাস্ত্রকথা শুনেছি এবং তাতে যে জ্ঞানটুকু আমার হয়েছে, তার উপর ভিত্তি করেই তোকে বলছি। একটা কথা সব সময়েই মনে রাখবি, গুরু কখনও লম্পট প্রতারক চরিত্রহীন বা ভণ্ড হয় না। কারণ গুরু তো মানুষ নয় যে তিনি ভণ্ড প্রতারক হবেন। গুরু ভগবান বা বলতে পারিস এমন এক বিশেষ শক্তি—যা মানুষের মধ্যে ক্রিয়া করে মানুষকেই দেয় মুক্তি বা পরম পথের সন্ধান। সে শুভ শক্তি চোখে দেখা যায় না অথচ প্রকাশ তাঁর ক্রিয়ায় এবং সে শক্তি নিহিত রয়েছে মন্ত্রের মধ্যে। সুতরাং গুরু যা ভগবান কিংবা পরমশক্তি—যাই বলিস না কেন, অনাদিকালের অনন্ত যে সত্য—সে সত্যের কি বিকৃতি হতে পারে, না মানুষকে প্রতারণা করতে পারে—তুই একটু ভেবে বলতো দেখি?

সাধুবাবার কথাও শেষ হলো—বাসটাও থামলো একটা স্টপেজে। হুড়মুড় করে কিছু লোক উঠতেই আবার চলতে শুরু করলো। বাইরের দিকে আমার নজর নেই। মনটা আমার সাধুবাবার কথা শোনায়, চোখদুটো তাঁর মুখের দিকে। সাধুবাবার কথাটা শুনলাম। জানতে চাইলাম,

—বাবা, তাহলে এখানে একটা কথা আছে। গুরু যখন ভণ্ড লম্পট বা প্রতারক

নয়, তাহলে দীক্ষিত শিষ্য-শিষ্যারা অনেকে যে প্রতারিত হয়ে গুরুর উপর বিশ্বাস ভক্তি শ্রদ্ধা হারাচ্ছে, বিভ্রান্ত হয়ে লক্ষ্যচ্যুত হচ্ছে বা যিনি প্রতারণা করছেন —তাঁকে তো শিষ্য-শিষ্যারা গুরু বলেই জানেন এবং জ্ঞানও করেন—তাহলে তিনি কে?

উত্তরে সাধুবাবা জানালেন,

—বেটা, যে কোন মানুষই গুরুকরণের মাধ্যমে মন্ত্র পেতে পারে অথবা শাস্ত্র পড়েও তার থেকে মন্ত্র সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু মন্ত্র পেলেই তিনি গুরু হওয়ার বা মন্ত্রদানের অধিকারী হন না যদি তাঁর গুরু তাঁকে ওই পদে প্রতিষ্ঠিত হওঁয়ার ক্ষমতা দান না করেন। এ-রকম ক্ষেত্রে অনেকে নিজেকে গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করে অর্থাৎ স্বঘোষিত গুরু হয়ে অনেককে দীক্ষা দিচ্ছেন। এমন দীক্ষাদানের অনধিকারী মানুষের মধ্যে গুরুশক্তি অর্থাৎ ভগবানের শক্তি—যে শক্তিবলে মানুষ মুক্তিপথের অধিকারী হবে—সে শক্তির ক্রিয়া হয় না তার মধ্যে। ফলে সে রকম মানুষ যদি মন্ত্র দেয় বা প্রতারণা করে তাহলে গুরু বা পরমশক্তির অপরাধটা কোথায়? এখন কথা হলো, যাঁকে গুরু বলে মানুষ মেনে নিচ্ছে, তার মধ্যে সেই পরমশক্তির ক্রিয়া বা আবির্ভাব হচ্ছে কিনা—তা তো বাইরে থেকে দেখে তুইও বুঝতে পারবি না, আমিও নয়। কিন্তু বোঝা যাবে এবং প্রকাশ পাবে তার কর্মেই। কেমন করে? বেটা, মানুষের মধ্যে অনন্ত শক্তি ও সত্যের আবির্ভাব হলে সেখানে অসত্যের প্রকাশ হবে কেমন করে? তা হবে না। যেখানে অসত্যের আশ্রয়, প্রতারণা, ভণ্ডামী ইত্যাদির প্রকাশ—সেখানে গুরু বা ভগবানের শক্তি ক্রিয়া করে না। সেখানে মানুষ দীক্ষা দিয়ে, মানুষের রিপু ক্রিয়া করে মানুষকে প্রতারণা করে—সেখানে গুরু কে এবং তাঁর স্থিতি, অবস্থানই বা কোথায়? প্রকৃত গুরু যিনি—বাহ্যত মানুষের দেহ দেখছি ঠিকই, তবে তিনি ভগবান। তাঁর মধ্যেই বিশেষ শক্তির ক্রিয়া করে মানুষকে দিচ্ছেন শান্তি ও পরমপথের—মহাজীবনের সন্ধান। যখনই গুরুরূপী কারও মধ্যে সত্যের বিপরীত ভাব দেখবি, তখনই বুঝবি—তিনি গুরু নয়, তিনি রক্তমাংসের মানুষ এবং রিপুর অশুভ ক্রিয়া চলছে তার মধ্যে অবিরত। এমন মানুষের পাল্লায় পড়লে তো বাবা প্রতারিত হতে হবে, অর্থে, মনে এবং মন্ত্রে। মন্ত্র বলতে—ভুল মন্ত্র, অসিদ্ধ মন্ত্র, মরা মন্ত্র এবং অসম্পূর্ণ মন্ত্র।

একটানা এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা থামলেন কিন্তু বাস থামলো না। চলছে হৈ-হৈ করে। একবার বাসের জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। সামনে দু-জনের বসা সিটের উপর হাতটা একবার রেখে আবার নামিয়ে নিলেন নিজের কোলে। তারপর বললেন,

-বেটা, স্বঘোষিত বা অনধিকারী যে সব গুরু-নামধারীদের কথা বললাম, গৃহী গুরুদের মধ্যে এদের সংখ্যাটাই সবচেয়ে বেশী। তবে মঠ আশ্রম ইত্যাদিতে যে নেই, তা নয় বেটা। সেখানেও হচ্ছে—কোথাও কম, কোথাও বেশী—অল্পবিস্তর

হচ্ছেই। তার মধ্যে সেখানেই বেশী প্রতারণা হচ্ছে, যেখানে মঠ মন্দির আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত সাধুসন্ন্যাসী—যাদের গৃহী শিষ্য-শিষ্যাদের বাড়ীতে গুরু হিসাবে কমবেশী যাতায়াতের অভ্যাস আছে।

এবার বলি তাদের কথা, যারা দীক্ষাদানের অধিকারী হয়েও শিষ্যদের নানাভাবে প্রতারণা করেছে, করছে। সেসব ক্ষেত্রেও জানবি স্বঘোষিত বা অনধিকারী মন্ত্রদানকারী মানুষের মতো তাদের মধ্যেও গুরু বা ভগবানের শক্তি আবির্ভূত হয়নি বলেই তারা মানুষ হিসাবে রিপুর বশবর্তী হয়ে অসত্যের আশ্রয় নিয়ে প্রতারণা করছে। একটা কথা বার বার মনে রাখবি, মানুষরূপে প্রকৃত গুরু যিনি—তাঁর মধ্যে কিছুতেই, কোনভাবেই সত্য-বিরুদ্ধভাবের প্রকাশ পাবে না কখনই। যেখানেই এর বিপরীত কিছু দেখবি, সেখানেই জানবি অপদার্থ মানুষ যা যা করে তা সবই ওই মানুষগুলো করতে পারে মন্ত্রদান করে শিষ্য বা শিষ্যাদের সঙ্গে। তবে বেটা, সংসারে গৃহীগুরু এবং সংসারের বাইরে সন্ন্যাসী গুরু কি মহৎ নেই—নির্লোভ নির্বিকার নির্লিপ্ত গুরু কি নেই—ছলচাতুরী আশ্রয় নেন না, মিথ্যা কথা বলেন না—এমন গুরুর কি অভাব আছে? না বেটা, অভাব নেই—অভাব ছিল না কোনকালেই। তবে কালের প্রভাবে সংখ্যাটা অনেক কমে গেছে কিন্তু আছেই। যাদের কপাল ভালো তারা তাঁদের সান্নিধ্য পায়। অভাগাদের কপালে জোটে মনুষ্যরূপী ও গুরুনামধারী একশ্রেণীর অপদার্থ।

সাধুবাবা থামলেন। বাসও থামলো। কিছু যাত্রী উঠলো আবার নামলোও কিছু। এবার জানতে চাইলাম,

—বাবা, আমার প্রশ্ন হলো, যারা এখন এই সমস্যায় পড়ে বিভ্রান্ত, প্রতারিত—গুরুর উপর বিশ্বাস হারিয়েছেন, হারাতে বসেছেন কিংবা মনের মধ্যে গুরুর বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় রয়েছে—তাদের তো ইহকাল পরকাল দুই-ই যাবে। তাদের সমস্যার সমাধান কি—কি করলে এই মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে তারা মুক্তি পাবে?

বাস চলার এত আওয়াজ হচ্ছে যে, খুবই অসুবিধে হচ্ছে আমাদের মধ্যে কথা বলতে ও শুনতে। তবুও চালাতে হচ্ছে কথা। সাধুবাবা আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন,

—এ-সমস্যার সমাধান আছে কয়েকটা। যেমন ধর, মন্ত্রদাতা গুরুর উপর কোন কারণে শ্রদ্ধা বিশ্বাস হারালে তাতে কিছু যায় আসে না। তাঁর দেয়া মন্ত্র নিষ্ঠার সঙ্গে জপ করলে তাতে ফল হবে। সেখানে মন্ত্রদাতা দেহধারীর রূপ চিন্তা না করে, উপাস্য দেবতার রূপ চিন্তা করে, বিশ্বাস নিয়ে সাধন ভজন করলেও প্রতারিত শিষ্য বা শিষ্যারা মুক্তি পাবে, শান্তিও পাবে। এখানে মানসিকভাবে মন্ত্রদাতাকে পরিত্যাগ করলে কোন দোষ হয় না। কারণ গুরুশক্তি তো মন্ত্রের মধ্যেই নিহিত আছে এবং ইষ্টের মধ্যেই তিনি—শুধু রূপের ভেদ হচ্ছে মাত্র। গড়ে ত্যাগ কর হচ্ছে না গুরুকে। সাধনে তাঁকেই লাভ করা যায়। এখন কথা হলো, প্রতারক

মন্ত্রদাতা যদি মন্ত্রেও কোন গোলমাল করে থাকে তাহলে বেটা, কিছু করার নেই। বিশ্বাস ভক্তি নিয়ে ওই মন্ত্র জপ করলে কল্যাণ কিছু হবে না, তবে অকল্যাণও কিছু হবে না। দীক্ষা নেয়া বা না নেয়া সমান। প্রতারিত হলেও মন্ত্র যদি ঠিক থাকে তা হলে বাঁচোয়া। তবে কথা হলো, মন্ত্র ত্রুটিযুক্ত, না শুদ্ধ তা জানার কোন উপায় নেই কারণ এটা শুধুমাত্র মন্ত্রদাতা আর গ্রহীতার মধ্যেই যে সীমাবদ্ধ। এবার মন্ত্রটা অন্য কোন গুরুর কাছে বলে শুদ্ধাশুদ্ধের বিচার করতে গেলে—যদি সত্যিই শুদ্ধ মন্ত্র পেয়ে থাকে তাহলে সেখানে তা বলার সঙ্গেই নিষ্ফল হয়ে যাবে। আর অশুদ্ধ থাকলে তো তার একটা গতি হয়েই যাবে। সুতরাং এক্ষেত্রে কিছু করার নেই।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সাধুবাবা একটু থামলেন। একটু ভেবে আবার বলতে শুরু করলেন,

—বেটা, মন্ত্রদাতা গুরু যদি লম্পট ভণ্ড বা প্রতারক হয় এবং সে যদি সাধনা না করে, অথবা সাধনা করেও যদি তাঁর ইষ্টপ্রাপ্তি না হয়, তাতে শিষ্যের কিছু যায় আসে না। শিষ্য মুক্ত হবে শুদ্ধ মন্ত্রের সাধনকরে—বিশ্বাসের প্রভাবে। কারণ সাধন-বীজ তো রয়েছে শিষ্যের হাতে। সুতরাং হতাশার কিছু নেই। সাধনের উপরেই তো নির্ভর করে তার মুক্তি—মনের আনন্দ বেটা, মন্ত্রই সব। কেমন জানিস, শয্যার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে যেমন নারী তেমনই মনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ইষ্টনাম।

কথাটুকু শেষ হতেই জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, আপনার সব কথা মেনে নিয়েও বলি, যদি কোনভাবে প্রতারিত অথবা কোন কারণে গুরুর উপর বিশ্বাস ভক্তি বা শ্রদ্ধা হারানো কোন শিষ্য বা শিষ্যা আপনার কথা মতো প্রতারক গুরুকে মন থেকে সরিয়ে ইষ্টকে বসিয়ে জপতপ করা সত্ত্বেও যদি তার মনের সংশয় না কাটে—তার ক্ষেত্রে এই সমস্যা সমাধানের উপায় কি?

এ-প্রশ্নে সাধুবাবাকে যে আর ভাবতে হলো না, তা মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বললেন,

—এ-সমস্যার সমাধানও আছে। শাস্ত্রে বলা আছে, কেউ যদি গুরুকে পরিত্যাগ করে তা হলে তার জীবনে দারিদ্রতা আসে। মন্ত্র পরিত্যাগ করলে পার্থিব জীবনে মনের মৃত্যু হয়। গুরু আর মন্ত্র—উভয় ত্যাগে মৃত্যুর পর মানুষের বাস হয় প্রেতলোকে। আবার শাস্ত্রকারেরা একথাও বলেছেন, মধুলোভী ভ্রমর যেমন মধু সংগ্রহের জন্য এক ফুল থেকে আর এক ফুলে ভ্রমণ করে, তেমনই মুক্তিকামী শিষ্য এক গুরু থেকে আর এক গুরুতে গেলে কোন দোষ হয় না।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মনে একটা খটকা লাগলো। সাধুবাবাও মুহূর্ত দেরী না করে বললেন,

—বেটা, এখানেও কথা আছে একটা। এক গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নেয়ার পর

অন্য গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নিলে অথবা একাধিকবার গুরু করলে তাতে দোষ হবে না ঠিকই, তবে পূর্বগুরু এবং তাঁর দেয়া মন্ত্র ভুল হোক আর শুদ্ধই হোক— তা কিছুতেই পরিত্যাগ করা চলছেনা। তা করলে অপরাধের শেষ থাকবে না। যেমন ধর, প্রথমে একজনের কাছ থেকে দীক্ষা হলো কোন শিষ্যের। কোন কারণে সেই গুরুর উপর শ্রদ্ধা বিশ্বাস ভক্তি—সব কিছুই হারালো অথবা ধর, হারালো না। এবার সেই শিষ্যের ইচ্ছা হলো আর এক গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নেবে। এবং মন্ত্র নিলও। এখন সেই শিষ্যের বোঝা বেড়ে গেল। কেমন করে? এবার জপ করার সময় প্রথমেই পূর্বগুরুপ্রদত্ত মন্ত্র (ভুল শুদ্ধ যাই হোক)—সেই গুরুর নিয়মানুসারে জপ করার পর, দ্বিতীয় বার গ্রহণ করা মন্ত্র জপ করলে তবেই শিষ্যের কল্যাণ হবে। প্রথমে পাওয়া মন্ত্রকে পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় বারে পাওয়া মন্ত্র জপ করলে কোন কল্যাণ হবে না। মোটের উপর আগের পাওয়া মন্ত্র কিছুতেই পরিত্যাগ করা চলবে না। পাঁচজন গুরুকে বরণ করলে তাঁদের পাঁচজনেরই দেয়া মন্ত্র ক্রমান্বয়ে জপ করতে হবে। কাউকে পরিত্যাগ করলেই অকল্যাণ হবে। নির্ভুল সিদ্ধমন্ত্র একজনের কাছ থেকে নিয়ে জপ করলে যে ফল হবে—পাঁচজনের কাছ থেকে পাঁচটা মন্ত্র নিয়ে জপ করলে ফল তার একই হবে। কারণ সব মন্ত্রের মূলেই নিহিত রয়েছে পরম সত্য—যা তাঁকে নিজের করে পেতে সাহায্য করে। গুরু যত বাড়াবে, বোঝা তত বাড়বে অথচ ফল লাভ হবে একটাই। তাই শিষ্যের যাতে অকারণ বোঝা না বাড়ে তার জন্যেই শাস্ত্রকারেরা একাধিক গুরু না করতে উপদেশ দিয়েছেন— বুঝলি? আরও একটা কারণ আছে, একাধিকবার গুরু করলে, একাধিক দেবদেবীর মন্ত্র গ্রহণ করলে তাতে গুরু বা ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠা কমে যায়। মন বসে না। যেমন ধর, পাঁচজন গুরুর কাছ থেকে কেউ দীক্ষা গ্রহণ করলো। কেউ দিল শিব মন্ত্র, কেউ বা দুর্গা, কালী, গনেশ এবং কৃষ্ণমন্ত্র। পাঁচজন গুরু দিলেন পাঁচটা ইষ্টমন্ত্র। জপ করতে হবে সব কটাই। এখন কোনটার উপর নিষ্ঠা রেখে ধ্যান জপ তপ করবে—ভেবে বলতো! মানুষের মন তো একটা। ভাবনাটা হাজার। এবার কোনটাকে ছেড়ে কোনটাকে রাখবে?

একটু থেমে সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, যে কোন কারণে গুরুর প্রতি কোন শিষ্য বা শিষ্যার যদি শ্রদ্ধা বিশ্বাস ভক্তি চলে যায় বা হারায় অথবা গুরুর কারণে মনে ব্যথার সৃষ্টি হয়—তাহলে তাদের সমস্যা সমাধানের এই পথটুকু ছাড়া আর কোন পথ আছে বলে আমার জানা নেই।

এইটুকুতেই আমি খুশী। কারণ অনেকের মুখে তাদের গুরুবিষয়ে সংশয়ের কথা কখনও কখনও আমাকে ব্যথিতও করেছে। তাদের বোঝানোর মতো ঠিক ঠিক কথা আমার তখন জানা ছিল না, তাই কোন উত্তরও আমি দিতে পারিনি। সমস্যা সমাধানের মোটামুটি একটা পথ জানতে পেরে আমার নিজেরই বড় আনন্দ হচ্ছে।

এবার সাধুবাবা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,
—বেটা, জবা ফুলের গাছ দেখবি প্রচুর ফুল ধারণ করে, দেখতে বড় সুন্দর লাগে অথচ একটা ফলও ধারণ করে না। ঠিক তেমনই আজকের সমাজে অসংখ্য শিষ্য-শিষ্যাদের নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন অধিকাংশ গুরুরা—নামে এবং যশে, দেখতে এবং তাদের কথা শুনতে বড় ভালো লাগে—কিন্তু বেটা, তাঁদের অধিকাংশই জবা গাছ—এতটুকুও শক্তি অর্থাৎ ফল ধারণ করে না। বেটা, দীক্ষার পর দীক্ষিত শিষ্য বা শিষ্যাদের ঠিক ঠিক মতো জপতপ করলে কোন কল্যাণ হবে না—এ-হতেই পারে না। যার হচ্ছে না, নির্ঘাৎ জানবি, গোড়ায় তার কোথাও গলদ আছে।
এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা চুপ করে রইলেন। আমি ভাবতে লাগলাম সাধুবাবার কথা। খানিক চুপ করে থেকে পরে বললেন,
—বেটা, তুই কোথায় থাকিস্, যাচ্ছিস্ কোথায়—কি কাজ করিস্ ?
সাধুবাবার প্রত্যেকটা জিজ্ঞাসার উত্তর দিলাম। শুনে তিনি মাথাটা একটু নাড়ালেন। এর মধ্যে বাস অনেকটা পথই এগিয়ে এসেছে। মাঝে কয়েকবার থেমেছে। লোক উঠেছে নেমেছে তবে আমাদের কথা কোথাও একটুও থামেনি। এবার সাধুবাবাকে বললাম,
—বাবা, আপনার কোথাও ডেরা-টেরা আছে ?
হাসি মুখে সাধুবাবা জানালেন,
—না বেটা, স্থায়ীভাবে কোথাও থাকি না। বিভিন্ন তীর্থে তীর্থেই আমার দিনগুলো কেটে যায় পরমানন্দে। তবে যখন কোন তীর্থে যাই না, তখন পড়ে থাকি হরিদ্বারে। কখনও হরকি পিয়ারী ঘাটে, কখনও কনখলে, কখনও সপ্তঋষির আশ্রমে, কখনও বা চলে যাই লছমনঝোলায়। পড়ে থাকি পথে পথে। তবে বৃষ্টিবাদলের দিনে আশ্রয় নিই কোন আশ্রম বা ধর্মশালায়। এইভাবেই গুরুকৃপায় কেটে যাচ্ছে আমার দিনগুলো। আর একটা কথা, যেখানেই আমি থাকি না কেন, প্রতি বছর আমি কেদার বদরী গঙ্গোত্রীতে একবার যাবোই। বড় ভালো লাগে আমার ওই পাহাড়ী তীর্থগুলো।
সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, আপনি যখন সাধু তখন অসংখ্য তীর্থ তো ঘুরেছেনই। এই তীর্থপথে কোন মহাত্মার সঙ্গে যোগাযোগ বা তাঁদের দর্শনলাভ হয়েছে কখনও ?
একটু ভেবে নিয়ে সাধুবাবা বললেন,
—হাঁ বেটা, সারাজীবনে তিনবার তিন জায়গায় তিনজন উচ্চমার্গের মহাত্মার দর্শন আমি পেয়েছি। আর নির্লোভ নির্বিকার সাধুসন্ন্যাসীর দর্শন পেয়েছি অসংখ্য। একবার কুম্ভমেলায়—একবার হরিদ্বার থেকে গঙ্গোত্রী যাওয়ার পথে এক মহাত্মার সঙ্গে গেছিলাম। আর—একবার এক মহাত্মার দর্শন আমি পেয়েছিলাম মানস সরোবরে যাওয়ার পথে।

বাস চলছে বেশ দ্রুতগতিতে। আবার প্রশ্ন করলাম,

—কি করে বুঝলেন তাঁরা উচ্চমার্গের মহাত্মা—দয়া করে তাঁদের সম্পর্কে কিছু বলুন ?

উত্তরে সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, তাঁদের জীবন নিয়ে অনেক কথা। আমার তো নামবার সময় হয়ে এলো। তবুও দু-এক কথায় তাঁদের কথা বললে বুঝতে পারবি, তাঁরা কত বড় মহাত্মা ছিলেন। প্রথমে বলি মানস সরোবরে যাওয়ার পথে দেখা হওয়া মহাত্মার কথা। আমি যখন মানস সরোবর কৈলাসে গেছি তখন সারাটা পথ হেঁটেই যেতে হতো। আলমোড়া ছাড়িয়ে আরও অনেকটা এগিয়ে গেছি। দেখলাম, অতি বৃদ্ধ এক মহাত্মা বসে রয়েছেন পথের ধারে। মাথার চুল আর গালের দাড়িগুলো একেবারে সাদা ধবধবে হয়ে গেছে। বয়েস পরে জেনেছিলাম ১৪০ বছরের কাছাকাছি। প্রথমে মানস-যাত্রী সাধু ভেবেছিলাম। পরে বুঝেছিলাম উচ্চ-মার্গের মহাত্মা—এখন যাঁদের দর্শন পাওয়া বলতে পারিস্ প্রায় বিরলই। পরিচয় হলো। একসঙ্গে আমরা পথ চলতে লাগলাম। পথে চলা এবং মানস সরোবর কৈলাস দর্শন নিয়ে তাঁর সঙ্গে ছিলাম গড়ে প্রায় মাস দুই-আড়াই। এই সময়ের মধ্যে তাঁকে একদিনের জন্যেও জল পান তো দূরের কথা—কোন খাদ্য গ্রহণ করতে দেখিনি কখনও। অথচ সারাটা পথে এবং মানস সরোবর কৈলাসে আমার খাবার তিনি কোথা থেকে সংগ্রহ করে এনে দিতেন—তা আমি বুঝতে পারিনি এতটুকুও এবং সে খাবার ছিল অত্যন্ত সুস্বাদু। সদা সর্বদা আমি থাকতাম তাঁর সঙ্গে। কাছ ছাড়া হয়নি কখনও। আরও একটা কথা, পরনের কৌপীনটুকু ছাড়া সব সময়েই তিনি থাকতেন খালি গায়ে। কোন শীতবস্ত্র, এমন কি কুলিটুকুও তাঁর সঙ্গে ছিল না। ওই মহাত্মার সঙ্গে তিব্বতে ছিলাম কিছুদিন। সাধন জীবনের অনেক কথা হতো। তারপর তিনি ওখানেই রয়ে গেলেন আর আমি ফিরে এলাম একা একা।

সাধুবাবার মুখে শুনছি মহাত্মাদের কথা। তিনি বললেন,

—বেটা, তখন আমার বয়েস বছর পনেরো কুড়ি কি পঁচিশ হবে। অতটা মনে নেই এখন। সেবার কুম্ভস্নানের যোগ পড়েছিল তীর্থরাজ প্রয়াগে। সেবারই আমার প্রথম কুম্ভস্নান এবং প্রয়াগ দর্শন হয়েছিল। মেলায় ঘুরছিলাম গুরুজীর হাত ধরে। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ গুরুজী আমাকে নিয়ে দাঁড়ালেন একটা জায়গায়। হাত দিয়ে দেখালেন সামনেই বসে থাকা কংকালসার দেহ এক অতিবৃদ্ধকে। শীতের মধ্যে বসে আছেন এক টুকরো কৌপীন পরে। মাথায় মাত্র কয়েকটা জটা। দেখে তো আমার ভক্তি হলোই না, মনে হলো বহুকালের না খাওয়া এক ভিখারী। গুরুজী আমাকে বললেন ওই বৃদ্ধ ভিখারীকে প্রণাম করতে। গুরুজীর আদেশ, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রণাম করার জন্য পায়ে হাত দিতেই সারাটা দেহে আমার একটা বিদ্যুতের মতো তীব্র শিহরণ খেলে গেল। দেহটা আমার ঝনঝন্ করে উঠলো।

আমি ছিটকে পড়ে গেলাম হাত তিনেক দূরে। উঠে বসতেই বৃদ্ধ তাকালেন আমার মুখের দিকে। দেখলাম, মুখখানা তাঁর হাসিতে ভরে আছে। কোন কথা বললেন না। আমার গুরুজীও প্রণাম করলেন তাঁকে। তবে কথা হলো না তাঁর সঙ্গে। তারপর এগিয়ে গেলাম মেলার মধ্যে। চলতে চলতে আমার গুরুজী বললেন, 'বেটা, তোর কপাল ভালো। ওই যে বৃদ্ধ যাকে তুই দেখে প্রথম থেকেই ভিখারী ভাবছিলি—অমন মহাত্মা সারা কুম্ভমেলায় দ্বিতীয়টি নেই। কিন্তু দেখে তা বোঝার উপায় নেই। মনে হয় যেন ভিখারী। হিমালয়েই থাকেন উনি। বয়স প্রায় তিনশো বছরের কাছাকাছি। দয়া করে এসেছেন পাহাড় থেকে। কুম্ভমেলায় বহু দেবদেবী এবং পরলোকগত মহাত্মাদেরও আগমন ঘটে। তাঁদের সঙ্গ এবং দর্শন করার জন্যেই তিনি এসেছেন এখানে। তোর দর্শন হলো। বহুজন্মের সঞ্চিত কর্মফল তোর দয়া করে ভস্মীভূত করে দিলেন স্পর্শ করা মাত্র। সেইজন্যেই তুই প্রণাম করার সঙ্গেই বিদ্যুৎ পৃষ্ঠের মতো ছিট্‌কে পড়লি। ওখানে বসে রয়েছেন—ভাগ্যবানরা ওনাকে দেখতে পাচ্ছেন, আবার অনেকে মহাত্মার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন তাদের চোখে অদৃশ্য হয়ে বসে আছেন তিনি। আমি এই মহাত্মাকে বহু বছর আগে হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় একবার দর্শন করেছিলাম। তখন কথা হয়েছিল মহাত্মার সঙ্গে।'

সাধুবাবা তাঁর গুরুজীর মুখে মহাত্মার বিষয়ে শোনা এবং দর্শনের কথা বলে একটু থামলেন। আমি চেয়ে রইলাম মুখের দিকে। তিনি বললেন,

—বেটা, এ-সব মহাত্মাদের কথা শুনলে কারও বিশ্বাসই হবে না। ভাগ্যবানদের কপালেই এঁদের দর্শন মেলে। যারা পায় না—তারা এ-সব চট্‌ করে বিশ্বাসও করে না। আমার এই জীবনে আসার পর প্রথম দিকে—তখন পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম হরিদ্বার থেকে গঙ্গোত্রী। চলার পথেই পরিচয় হয়েছিল এক মহাত্মার সঙ্গে। বেশীরভাগ সময়েই থাকতেন পাহাড়ে। মাঝে মধ্যে পাহাড় থেকে নামলে তিনি হরিদ্বারেই থাকতেন। তিনি কোন তীর্থপরিক্রমা করতেন না। এমন মধুর ব্যবহার, এমন মিষ্টি কথা আমি জীবনেও কোনদিন ভুলবো না। সারাটা পথে তাঁর মুখে ভগবানের নাম ছাড়া আর কিছুই শুনিনি। তিনি বলেছিলেন, 'শত সহস্র তীর্থ করলেও মনের মলিনতা, কামনা বাসনা এতটুকুও যাওয়ার নয়—সাধুসঙ্গ, গুরুসঙ্গ না করলে।' তীর্থপরিক্রমার চেয়ে এটার উপরেই তিনি জোর দিতেন। তিনি আরও বলেছিলেন, সাধু হয়ে লোকালয়ে ঘুরলে বিষয়াসক্ত মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়। তাঁদের সান্নিধ্যে মন বিষয়াসক্ত হয়ে পড়ে। ফলে সাধনে মন বসাতে বড় অসুবিধা হয়। ভজনে বিঘ্ন ঘটে। তাই তিনি পাহাড় থেকে নীচে নামতেন খুব কমই। ওই মহাত্মার অতি অল্প বয়েসে বৈরাগ্যের উদয় হয়। সকলকে ছেড়ে তিনি একবস্ত্রে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। আমার সঙ্গে যখন কথা হয়, তখন তাঁর বয়েস প্রায় বছর নব্বই। ওই বৃদ্ধ মহাত্মার সঙ্গ করতে করতেই পৌঁছেছিলাম

গঙ্গোত্রীতে। পথে যেতে যেতে তিনি যে সব কথা বলেছিলেন, তা আজও আমার স্মরণে আছে। একদিন দুপুরে পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। পাহাড়ী পথ তো! ক্লান্ত দেহে তিনি আর আমি বসেছি একটা গাছের তলায়। কথায় কথায় তিনি বললেন, 'বেটা, পতিপ্রাণা রমণী যেমন এতটুকু দ্বিধা না করে তার দেহ মন সমর্পণ করে স্বামীকে—ঠিক তেমন ভাবেই নিজেকে সঁপে দিতে হয় তাঁর কাছে। তাহলে তাঁকে পেতে আর কিছু করতে হয় না।'

মহাত্মার কথা এই পর্যন্ত বলে চলমান বাসে বসা সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, গঙ্গোত্রীর পথে মহাত্মার বলা কথা যে কত সত্য—নিজের জীবন দিয়ে আজ তা উপলব্ধি করতে পারি। গঙ্গা যমুনা অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর ধারা বয়ে যাবে যতদিন—এ-সত্যের ধারাও বয়ে চলবে ততদিন।

হঠাৎ বাসের গতি কমে এলো। কণ্ডাকটার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'অভি রাধাকুণ্ড্ আনেবালা হ্যায়। উতরনে বালা আ যাইয়ে।' সাধুবাবা উঠে দাঁড়ালেন। একটু সরে জায়গা করে দিলাম বেরোনোর জন্যে। এবার সুযোগ হলো। প্রণাম করলাম পায়ে হাত দিয়ে। মনটা আমার খারাপ হয়ে গেল। বাসটা এখনও থামেনি। গতি আরও কমে এলো। ভাবলাম, এমন সুযোগ আর পাবো না কখনও। আর একটা প্রশ্ন করি—করেই ফেললাম,

—বাবা, দয়া করে একটু বলে দিয়ে যান, ঈশ্বরে বিশ্বাস দৃঢ়, ও ভক্তিলাভের উপায় কি ?

প্রসন্ন উজ্জ্বল হাসিমাখা মুখে সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, সংসারের কোন বিষয়ে মনে কোন প্রার্থনা না থাকলে অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ে উদাসীন থাকলে মানুষের ঈশ্বরে বিশ্বাস দৃঢ় এবং ভক্তিলাভ হয়।

সাধুবাবা এগিয়ে গেলেন বাসের দরজার সামনে। বাস থামলো। সাধুবাবা নেমে গেলেন। একই সঙ্গে নামলেন আরও কয়েকজন যাত্রী। আমি বসে রইলাম। আবার বাস ছাড়লো। ভাবতে লাগলাম শুধু সাধুবাবার কথা।

বৃন্দাবনে এসে যারা ব্রজ পরিক্রমা করেন—তাদের পরিক্রমার পথেই পড়ে গিরিরাজ গোবর্ধন। আবার অনেকে শুধু গোবর্ধনও পরিক্রমা করে থাকেন। তবে ব্রজ বা গোবর্ধন পরিক্রমা না করেও বৃন্দাবনে এসে ব্রজেশ্বরের গোবর্ধন ঘুরে দেখা যায় অনায়াসে। আমার দেখা গোবর্ধন পরিক্রমা না করেই।

লোক বিশ্বাস, মনোরথ সিদ্ধ হয় গোবর্ধন পরিক্রমা করলে। এই পরিক্রমা শুরু হয় রাধাকুণ্ড থেকে। তীর্থযাত্রীরা পরিক্রমা করেন কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা অর্থাৎ দীপাবলীর দিন আর আষাঢ় মাসের পূর্ণিমায়।

এবার বেশ ফাঁকা রাস্তা। বাসের গতি বাড়লো। মথুরা থেকে গোবর্ধন মাত্র 25 কি.মি.। এইটুকু আসতে সময় লাগলো প্রায় পঞ্চাশ মিনিট। সঙ্গীসহ নেমে এলাম বাস থেকে।

বড় বাস-রাস্তা পার হতেই ডানদিকে পড়লো আর একটা রাস্তা। চওড়া বাঁধানো রাস্তা ধরে একটু এগোতেই চোখে পড়লো একটা বাড়ীর গায়ে ছোট্ট সাইনবোর্ড—গিরিরাজ আশ্রম। যাত্রীদের থাকার জন্য অসংখ্য ছোট বড় ধর্মশালা তো এখানে আছেই, আর আছে ভরতপুরের রাজার যাত্রীশালা—যেখানে এক সঙ্গে থাকতে পারে কমপক্ষে এক হাজার যাত্রী। ওই একই পথ ধরে আরও কিছুটা যেতেই পেলাম একটা ধর্মশালা। আজ থাকবো গোবর্ধনে। তাই থাকার ব্যবস্থা করে নিশ্চিন্ত মনে বেরিয়ে পড়লাম ঘুরতে।

যে পথে বাস-রাস্তা ছেড়ে ঢুকেছি—ওই পথ ধরে সোজা কিছুটা এগোতেই ডানদিকে পড়লো ভরতপুর মহারাজের বিশাল কারুকার্যখচিত বাড়ী। এটাই এখন রাজার সমাধি মন্দির। ডানপাশে সমাধি মন্দির রেখে বাঁ-পাশে আরও কিছুটা এগিয়ে যেতেই—আবার বাঁ-পাশে পড়লো সরু একটা গলির মতো রাস্তা। এই রাস্তা ধরে সোজা কিছুটা এগোতেই একেবারে এসে হাজির হলাম গোবর্ধন মন্দির চত্বরে।

বিশাল মন্দিরটি ছোট বড় চূড়াযুক্ত। এই মন্দিরটি নতুন হয়েছে। পুরনো মন্দিরটি ছিল চুণের। সেটি ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করেছে গিরিরাজ সেবক সংঘ। পায়ে পায়ে মন্দিরটি একবার বেড় দিয়ে ঘুরে নিলাম। আটটি দরজা রয়েছে এই মন্দিরে। নাটমন্দিরে সামনের দিকে আছে বড় একটি ঘণ্টা।

এবার মন্দিরের ভিতরের কথা। শ্বেত পাথরের মেঝে। কালো পাথরের দেয়াল। মন্দিরের ঠিক মাঝখানে আটকোণা বাঁধানো বেদি। মাটি ফুঁড়ে ওঠা শিবলিঙ্গ যেমন, ঠিক তেমনই পাথরের শিবলিঙ্গের মতো গিরিরাজের মূর্তি। পশ্চিমমুখী। মাথায় অপূর্ব সুন্দর চূড়া। কপালে লাল তিলক। গিরিরাজের একটু উপরেই রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের পাষাণ বিগ্রহ। সুন্দর সাজানো। মাথায় সোনার মুকুট। অপূর্ব —চোখ ফেরানো যায় না। উপরে শ্রীকৃষ্ণ, নীচে গিরিরাজ গোবর্ধন।

গিরিরাজ মন্দিরে দরজার সামনে বসে আছেন একজন পুরোহিত। যাত্রীরা আসছেন একের পর এক। পূজার উপকরণ দিচ্ছেন পুরোহিতের হাতে। দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করে তা ফিরিয়ে দিচ্ছেন যাত্রীদের হাতে—প্রসাদ হিসাবে।

মহাভারতের উদযোগপর্ব, অধ্যায় ১২৯, ৫১ শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে, "গোবর্দ্ধন—ইন্দ্র কর্তৃক অতিবর্ষণে বিপন্ন হইয়া ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে,—ছত্ররূপে এই পর্ব্বতকে অঙ্গুলীর অগ্রভাগে তুলিয়া ধরিয়া, তন্নিম্নে শ্রীকৃষ্ণ গবাদি-পশু ও অপর সকলকে রক্ষা করিয়াছিলেন।"

শ্রীকৃষ্ণের গিরিরাজ গোবর্ধন ধারণ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্বিংশ এবং পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে শুকদেব মহারাজা পরীক্ষিৎকে কাহিনীর বর্ণনা করেছেন এইভাবে,

"ব্রাহ্মণেরা কংসের ভয়ে নিজ নিজ আশ্রমে থেকেই শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করতে লাগলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে ব্রজে বাস করতে করতে গোপদের ইন্দ্রযজ্ঞ করার জন্য উদ্যোগ করতে দেখলেন। ভগবান সর্বাত্মা এবং সর্বদর্শী ; তাই যদিও নিজে ঐ

বিষয়ের তত্ত্ব অবগত ছিলেন, তবুও বিনয়াবনত হয়ে নন্দ প্রভৃতি বৃদ্ধ গোপদের জিজ্ঞাসা করলেন, পিতা, আপনাদের এই উদ্‌যোগ কি জন্য? শুধু শুধু ব্যস্ততা হয় না, নিশ্চয়ই কোন যজ্ঞ হবে। আর যদি তা হয় তাহলে যজ্ঞে কি ফল, দেবতাই বা কে, কি রকম ব্যক্তিই বা এতে অধিকারী, কি সাধন দ্বারাই বা এই অনুষ্ঠান করতে হয়? পিতা, এ বিষয়ে আপনাদের খুব ব্যগ্রতা দেখছি, তাই আমি শুনতে ইচ্ছা করি, বিস্তারিতভাবে বলুন। পিতা, যাঁরা সর্বত্র আত্মদর্শী, স্থাবর-জঙ্গমেও আত্মা ছাড়া কিছুই দেখেন না, যাঁদের এ আত্মীয়, এ আত্মীয় নয়—এ-রকম ভেদ-দৃষ্টি নেই তাঁদের শত্রু-মিত্র কোন পক্ষই নেই। সে সব পুরুষদের কোন কাজই গোপনীয় নয়। আর যদিও ভেদজ্ঞান থাকে তবু উদাসীন ব্যক্তিই শত্রুর মত পরিত্যাজ্য হয়। সুহৃদজন আত্মতুল্য, তাই গোপন মন্ত্রণায় তারা বর্জনীয় নয়। মানুষের মধ্যে কেউ জেনে, কেউ না জেনে কাজ করে থাকেন। যিনি জ্ঞানবশত কাজ করেন, তাঁরই কাজ সুসিদ্ধ হয়, যিনি অজ্ঞান সহকারে করেন তাঁর কাজ সে রকম সুসিদ্ধ হয় না। আপনাদের অনুষ্ঠেয় কার্য কি শাস্ত্র অনুসারে না লৌকিক আচার মতে হবে? এ বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলুন। ১-৭

নন্দ বললেন, বাছা, ভগবান ইন্দ্র পর্জন্যরূপী, মেঘগুলি তাঁর প্রিয়মূর্তি। সেই সব মেঘ প্রাণীদের প্রীতিসাধক ও জীবনরক্ষার অপরিহার্য জল দান করে থাকে। আমরা ও অন্যান্য মানুষেরা সেই মেঘপতি ঈশ্বর ইন্দ্রকে তাঁরই বর্ষণ করা জলে উৎপন্ন দ্রব্য দিয়ে তাঁর যজ্ঞ করে থাকি। মানুষেরা তাঁরই যজ্ঞাবিশিষ্ট দ্রব্যদ্বারা জীবন ধারণ করে ধর্ম, অর্থ ও কাম সিদ্ধ করে থাকে। বর্ষা ঋতুই মানুষের বৃত্তি ও ব্যবসায়ের ফলোৎপাদক। এই ধর্ম অনেকদিন থেকেই চলে আসছে। যে লোক কাম, দ্বেষ, ভয় বা লোভবশত ইন্দ্রার্চন করে না তার কখনই মঙ্গল হয় না।

শুকদেব বললেন, মহারাজ, নন্দর ও অন্যান্য ব্রজবাসীদের এই কথা শুনে ভগবান কেশব ইন্দ্রের ক্রোধ জন্মিয়ে গর্বরূপ পর্বত থেকে ইন্দ্রকে নামিয়ে আনার অভিপ্রায়ে বললেন, জীবমাত্রই কর্মফলে জন্ম নেয় আর কর্মফলেই লয় পায় এবং সুখ, দুঃখ, ভয় ও মঙ্গল লাভ করে থাকে। নিজে কর্মে নির্লিপ্ত হয়েও অন্য জীবদের কর্মফল-দাতা কোন ঈশ্বর যদি থাকেন তা হলেও তিনি কর্মকর্তারই অধীন, তিনি তাকে ফল দান করতে পারেন না। কাজেই জীবদের যখন কর্মেরই অনুবর্তন করতে হচ্ছে তখন তাদের ইন্দ্রের প্রয়োজন কি? পূর্ববর্তী সংস্কার অনুসারে মানুষের ভাগ্যে যা বিহিত হয়ে আছে, সে কখনই তার অন্যথা করতে পারে না। ৮-১৫

মানুষ স্বভাবেরই অধীন, সে স্বভাবের অনুসরণ করে থাকে। দেবতা, অসুর ও মানুষসহ এই সমস্ত জগৎ স্বভাবেই অবস্থিত। কর্মবশেই জীব উঁচু নীচু নানা দেহ ধারণ করে আবার তা ত্যাগ করে। শত্রু, মিত্র, উদাসীন কর্ম থেকেই উদ্ভূত হয়, কর্মই সকলের গুরু, কর্মই ঈশ্বর, কর্মই পূজ্য। তাই স্বভাবস্থ হয়ে কর্মকারী পুরুষ কর্মেরই সম্মান দেবে। যে যার দ্বারা জীবিত থাকে তা-ই তার দেবতা।

তাই যে লোকে জীবিকার জন্য এক দেবতার উপাসনা করে, তাতে তৃপ্তি না পেয়ে আবার অন্য দেবতায় নির্ভর করে, তার দশা হল কুলটা স্ত্রীর মত, যে স্বামীকে ত্যাগ করেছে আবার উপপতির দ্বারাও অবজ্ঞাত হচ্ছে। কাজেই তা থেকে সে কখনই মঙ্গল বা সুফল পায় না। তাই ব্রাহ্মণ জাতি বেদ অধ্যয়ন, ক্ষত্রিয় পৃথিবী পালন, বৈশ্য কৃষিবাণিজ্যাদি কর্ম ও শূদ্ররা দ্বিজ-সেবা বৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করে থাকে। ১৬-২০

এর মধ্যে বৈশ্যদের বৃত্তি চার রকম—কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা এবং কুসীদ। আমরা গোপজাতি গোরক্ষাই আমাদের বৃত্তি, সে কাজই আমরা সব সময় করে থাকি। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। রজোগুণে বিশ্ব উৎপন্ন হয়, এই রজোগুণেই চালিত হয়ে মেঘেরা সর্বত্র বৃষ্টিপাত করে থাকে, প্রজারা সেই জল দ্বারাই জীবন ধারণ করে। সেখানে ইন্দ্র কি করবেন? আমরা বন ও পর্ব্বতে বাস করি, আমাদের নগর, জনপদ, গ্রাম কিছুই নেই। পর্ব্বতই আমাদের যোগক্ষেমের (অপ্রাপ্ত বিষয়ের লাভ ও প্রাপ্তবিষয়ের রক্ষণ) কারণ। তাই গো, ব্রাহ্মণ ও পর্ব্বতের যজ্ঞ আরম্ভ করুন। ইন্দ্রযজ্ঞের জন্য যে সব দ্রব্য সংগ্রহ করা হয়েছে তা দিয়েই এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হোক।...পিতা, আমার এই মত, যদি ভাল মনে করেন তাহলে এরকমই করুন। এই যজ্ঞ গো, বিপ্র প্রভৃতির প্রিয় আর আমারও অভীপ্সিত। ২১-৩০

শুকদেব বললেন, মহারাজ, কালরূপী ভগবান হরি ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করার জন্য একথা বললে নন্দ প্রভৃতি গোপরা সর্বতোভাবে তাঁর বাক্য গ্রহণ করলেন। তিনি যা যা বললেন সেই ভাবেই সমস্ত কিছু করার আয়োজন করলেন। পরে স্বস্তিবাচন করিয়ে ইন্দ্র-যজ্ঞের সব দ্রব্য দিয়ে পর্ব্বত ও ব্রাহ্মণদের যথাযোগ্য উপহার দিলেন। তাঁরা গরুকে তৃণ দান করলেন আর গোধন আগে রেখে পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। তাঁরা সকলেই উত্তমরূপে অলংকৃত হয়ে বলশালী বৃষযুক্ত শকটে উঠলেন। সুসজ্জিত গোপীরাও শ্রীকৃষ্ণের কীর্তি গান করতে করতে ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ নিয়ে শকটে করে গিরি প্রদক্ষিণ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপদের বিশ্বাসজনক অন্য প্রকার রূপ গ্রহণ করে 'আমিই পর্ব্বত' এই বলে পূজার উপকরণ-গুলি ভক্ষণ করলেন। তখন তাঁর আকৃতি বিশাল হয়েছিল। তারপর ব্রজবাসীদের সঙ্গে তিনি নিজেকেই প্রণাম করলেন ও বলতে লাগলেন, কি আশ্চর্য! দেখ, এই মূর্ত্তিমান পর্ব্বত আমাদের অনুগ্রহ করছে। কামরূপী এই পর্ব্বতই সর্পাদির রূপ ধরে অবজ্ঞাকারী বনবাসীদের হত্যা করেছেন। এস, আমরা নিজেদের ও গোসকলের মঙ্গলের জন্য এঁকে প্রণাম করি। মহারাজ, সেইসব গোপজাতি বাসুদেবের পরামর্শে পর্ব্বত, গো ও ব্রাহ্মণদের যজ্ঞ যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত করে আবার ব্রজে ফিরে এলেন। ৩১-৩৮

শুকদেব বললেন, মহারাজ, সে সময় দেবরাজ ইন্দ্র নিজের অর্চনার উচ্ছেদ জানতে পেরে শ্রীকৃষ্ণ যাঁদের নাথ, সেই নন্দ প্রভৃতি গোপগণের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি ক্রোধে মেঘদের মধ্যে সংবর্তক নামে প্রসিদ্ধ প্রলয়ঙ্কর মেঘদের ব্রজে পাঠালেন এবং বললেন, বনবাসী গোপদের কি আশ্চর্য ধনগর্ব জন্মেছে। তারা সামান্য মানুষ কৃষ্ণকে আশ্রয় করে দেবতা আমাকে অবজ্ঞা করল। যেমন অজ্ঞ পুরুষরা আধ্যাত্মিক চিন্তা ত্যাগ করে ভঙ্গুর, নামে-মাত্র নৌকারূপ ক্রিয়াময় যাগ-যজ্ঞ দ্বারা ভবসাগর পার হতে চায়, তেমনি বাচাল, বালক, অবিনীত, অজ্ঞ, পণ্ডিতম্মন্য মানুষ যে কৃষ্ণ, তাকে আশ্রয় করে গোপগণ আমার অপ্রিয় কাজ করল। কৃষ্ণের জন্যই ধনমদে মত্ত এই সব গোপদের এত স্পর্ধা হয়েছে। তোমরা গিয়ে এদের ঐশ্বর্য-গর্ব দূর কর ও এদের সব পশু ধ্বংস কর। তোমরা ভয় পেয়ো না। আমিও নন্দ-গোপকে ধ্বংস করবার জন্য ঐরাবতে করে মহাবেগে তোমাদের অনুসরণ করেই ব্রজে যাচ্ছি। ১-৭

শুকদেব বললেন, যে সব প্রলয়ঙ্কর মেঘ এতদিন আবদ্ধ ছিল, তারা দেবরাজের আজ্ঞায় বন্ধন মুক্ত হয়ে মহাবলে বৃষ্টিপাত করে নন্দের গোকুলে উৎপাত আরম্ভ করল। তারা প্রচণ্ড বিদ্যুৎ ও বজ্রসহ প্রবল বাতাসের সঙ্গে শিলাবৃষ্টি করতে লাগল। মেঘগুলি স্তম্ভের মত স্থূল জলধারায় অজস্র বর্ষণ করতে থাকলে ভূমি জলরাশিতে প্লাবিত হল, তাই কোন জায়গা আর উঁচু নীচু বোঝা গেল না। প্রচণ্ড জল ও ঝড়ে সমস্ত পশুরা কাঁপতে লাগল। আর গোপ ও গোপীরা ঠাণ্ডায় নিদারুণ কষ্ট পেয়ে গোবিন্দের শরণাপন্ন হলেন। পশুরা বৃষ্টির জলে পীড়িত হয়ে নিজ নিজ দেহদ্বারা শাবকদের আচ্ছাদিত করে গোবিন্দের পাদমূলে এল আর গোপ ও গোপীরা প্রার্থনা করতে লাগলেন, হে কৃষ্ণ, হে প্রভু, আপনিই এই গোকুলের নাথ। হে ভক্তবৎসল, দেবরাজের কোপ থেকে আমাদের এবং এই গোকুলকে রক্ষা করুন। গোপ ও গোপীদের প্রার্থনার আগেই ভগবান শিলাবৃষ্টি আর ঝড়ে গোকুলের এবং গোকলবাসীদের দুর্দশা দেখে অনুমান করেছিলেন যে ইন্দ্রই ক্রোধের বশে এই সব করেছেন।

ভগবান বললেন, বর্ষার সময় গত হয়েছে। তবু এই যে শিলাবৃষ্টি ও ঝঞ্ঝা হচ্ছে এই দেখে বোধ হচ্ছে ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে ধ্বংস করতে চাইছেন? ভয় কি? আমি নিজের সামর্থ্য অনুসারে এর প্রতিকার করব। মোহবশে যাঁরা নিজেকে লোকের ঈশ্বর বলে অভিমান করে তাঁদের ঐশ্বর্য-গর্বরূপ অজ্ঞান নাশ করা প্রয়োজন। যে সব দেবতার সদ্ভক্তি আছে, তাঁরা গর্বের বলে কখনও নিজেদের ঈশ্বর বলে ভাবেন না। আমি অহংকার নষ্ট করলে তাতে অসাধুরা বিনীত হবে। এই গোষ্ঠ আমার শরণাপন্ন হয়েছে, আমি এর আশ্রয় ও প্রভু। তাই আত্মযোগ দ্বারা একে রক্ষা করব, আমি এই প্রতিজ্ঞা করলাম। এই কথা বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক হাতে গোবার্ধন পর্ব্বতকে তুলে, বালক যেমন ছাতা ধরে থাকে তেমনি অবলীলাক্রমে,

তাকে ধরে রইলেন। ৮-১১

পরে তিনি গোপদের সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, মা, বাবা ও ব্রজবাসীরা তোমরা গোধন সহ এই গিরিগর্তে প্রবেশ কর। আমার হাত থেকে পর্ব্বত পড়ে যাবে এ আশংকা করো না। আর বাতাস ও বৃষ্টিকে ভয় করতে হবে না, তার হাত থেকে এবার সবাই ত্রাণ পাবে।

শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাসে গোধন, শকট, ভৃত্য, পুরোহিত প্রভৃতি সহ সব ব্রজবাসী স্বচ্ছন্দে গিরিগর্তে প্রবেশ করলেন। ভগবান ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যথা ও সুখেচ্ছা ত্যাগ করে সাতদিন পর্যন্ত পর্ব্বত ধারণ করে রইলেন, মুহূর্তের জন্যও তিনি স্থান থেকে বিচলিত হলেন না। ব্রজবাসী সকলেই এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে বিস্মিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে দেবরাজ ইন্দ্রও বিস্মিত হলেন। তিনি গর্ব ও অভিমান ত্যাগ করে তাঁর আজ্ঞাবাহী মেঘদের বর্ষণ করতে বারণ করলেন। আকাশ নির্মেঘ হল, সূর্যদেব প্রকাশ পেলেন। বাতাস ও বৃষ্টিপাত বন্ধ হলে গোবর্ধনধারী হরি গোপদের বললেন, গোপগণ, আর ভয় নেই। বাতাস ও বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে, নদীর জল কমে আসছে। এখন তোমরা স্ত্রী-পুত্র, গাভী ও ধনসম্পত্তি নিয়ে গিরি-গর্ত থেকে বেরিয়ে এস। ২০-২৬

তারপর গোপেরা শকটে সব কিছু বহন করে নিজ নিজ গোধন নিয়ে বেরিয়ে এলেন। তখন সকলের সামনেই সেই পর্ব্বতটিকে ভগবান আগের মত যথাস্থানে রেখে দিলেন। পরে ব্রজবাসীগণ প্রেমাবেগে পূর্ণ হয়ে আলিঙ্গন প্রভৃতি দ্বারা তাঁকে অভিনন্দিত করলেন।...... তারপর অনুরক্ত গোপদের নিয়ে ভগবান হরি ব্রজপুরে যাত্রা করলেন। গোপীরাও মহানন্দে তাঁর ঐরকম হৃদয়গ্রাহী কীর্তির কথা গান করতে করতে ঘরে ফিরলেন। ২৭-৩৩

গিরিরাজ গোবর্ধনের মন্দিরটি গোবর্ধন পর্বতের মাঝখানেই অবস্থিত। কিন্তু দেখে মোটে বোঝার উপায় নেই এটা পর্বত। প্রায় সমতলের মতো। পর্বতের অধিকাংশ জুড়ে এখন লোকবসতি ঘর বাড়ীতে ভরে গেছে। তবে এই মূল মন্দিরটি কেন্দ্র করে চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য দর্শনীয় স্থান—যেগুলি গোবর্ধন তীর্থের মধ্যে এবং ব্রজ পরিক্রমার পথে পড়ে। তবে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে ক্রমে ক্রমে কমছে এই পর্বতের উচ্চতা।

গিরিরাজ গোবর্ধন মন্দিরের একেবারে সামনেই রয়েছে একটি বিরাট কুণ্ড। নাম মানসীগঙ্গা। চারদিক এর সুন্দরভাবে বাঁধানো। পরিষ্কার কাচের মতো টলটল করছে জল। মানসীগঙ্গার অর্থাৎ কুণ্ডটির সংস্কার করেছিলেন আকবর বাদশার সেনাপতি মহারাজা মানসিংহ। পবিত্র এই মানসীগঙ্গাতেই একদা শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণ এবং শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে নৌকাবিলাস লীলা করেছিলেন। এই ক্ষেত্রটি শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য লীলাস্থলের মধ্যে একটি।

মানসীগঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে, এক সময় নন্দ-যশোদা গোপাঙ্গ-

নাদের সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করেছিলেন ভাগীরথী গঙ্গায় স্নানের উদ্দেশ্যে। পথিমধ্যে গোবর্ধন পর্বতে এসে রাত হয়ে যায়। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন, ব্রজভূমির মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে সমস্ত তীর্থই ব্রজে বিরাজ করছে অথচ ব্রজবাসীরা এই ভূমির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আদৌ কিছু জানে না। সুতরাং এর একটা সমাধান হওয়া দরকার। এই কথাগুলি মনে মনে চিন্তা করা মাত্রই গঙ্গাদেবী প্রকটিত হলেন সকলের সামনে। অপ্রত্যাশিতভাবে গঙ্গাদেবীর আবির্ভাবে বিস্মিত হয়ে গেলেন নন্দ-যশোদাসহ ব্রজবাসীরা। তখন তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের কথায় জানতে পারলেন, ব্রজভূমির সেবা করার জন্য সমস্ত তীর্থই বিরাজ করছে এই ব্রজতে। সুতরাং গঙ্গাস্নানের জন্য আর ব্রজের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। দেবী গঙ্গা সামনেই উপস্থিত হয়েছেন। সুতরাং এখানে স্নান করলেই গঙ্গা স্নান করা হবে।

কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের মন থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন গঙ্গা—তাই গঙ্গাদেবী গোবর্ধন পর্বতে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে মানসীগঙ্গা নামে। প্রতিবছর দীপাবলী তিথিই মানসীগঙ্গার জন্মতিথি। তাই ওই দিনে বিশেষ উৎসব ও মেলা বসে এখানে।

ব্রজে যমুনার মতো শ্রীকৃষ্ণ-যুগের সাক্ষী এই গোবর্ধন পর্বত। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের কাছে বন্দনীয়—পূজনীয়ও বটে। এই পর্বতেই তো এক সময় ভক্তের দুঃখ গ্রহণ করেছিলেন ভগবান নিজে। এখানকার প্রতিটি পাথরের মধ্যে আজও যেন রয়েছে শরণাগত ব্রজবাসীদের প্রেমভক্তির ছাপ।

মানসীগঙ্গা তীরে—গোবর্ধন মন্দিরের সামনে রয়েছে একটি মন্দির। মন্দির-মধ্যে রয়েছে লাড্ডু গোপালের বিগ্রহ। অনাড়ম্বর মন্দির। গোপালও সজ্জিত নয়।

গোবর্ধন মন্দির চত্বরে ঢুকে ডান দিকে তাকালেই চোখে পড়ে 'ধর্ম ও কর্ম' ভগবানের বিগ্রহ। প্রাচীন এই বিগ্রহ দুটির আকৃতি তেমন বোঝা যায় না।

গিরিরাজ মন্দিরের পিছনেই ভরতপুর স্টেটের মহল এবং কারুকার্যখচিত সুন্দর একটি মন্দির। এই মন্দিরটিতে স্থাপিত রয়েছে অপূর্ব সুন্দর লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহ। এটি লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির।

মানসীগঙ্গার দক্ষিণ তীরে রয়েছে মনসাদেবীর মন্দির। এসে দাঁড়ালাম মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে। ভিতরে মনসাদেবী অবস্থান করছেন অষ্টনাগসহ।

মানসীগঙ্গার দক্ষিণভাগে রয়েছে একটি রমণীয় কুণ্ড। নাম ব্রহ্মকুণ্ড। কথিত আছে, ব্রহ্মা এখানে শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করেছিলেন। ব্রহ্মকুণ্ডের দক্ষিণ পাড়ে স্থাপিত রয়েছে হরিদেব মন্দির। জনশ্রুতি আছে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য হরিদেবজীর দর্শন লাভ করেছিলেন এখানে এসে।

হরিদেবজীর মন্দির দর্শন করে এলাম মানসীগঙ্গার উত্তরতীরে চাকলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে। এই স্থানটির প্রাচীন নাম চক্রতীর্থ। মন্দির মধ্যে স্থাপিত রয়েছে দুর্গা, কার্ত্তিক, গণেশ, নন্দীকেশ্বর এবং চাকলেশ্বর বা চক্রেশ্বর মহাদেবের মূর্তি।

চুরাশীক্রোশ ব্রজমণ্ডলের মধ্যে চারটি স্থানে মহাদেব অবস্থান করে পূজা গ্রহণ করেন। যেমন, বৃন্দাবনে গোপীশ্বর, মথুরায় ভূতেশ্বর, গোবর্ধনে চাকলেশ্বর এবং কাম্যবনে মহাদেব কামেশ্বর নামে খ্যাত। জনশ্রুতি আছে, গোবর্ধনে এসে এই মহাদেবের পূজা না দিলে বৃন্দাবনের তীর্থদর্শন ও তীর্থকর্মের ফল হরণ করেন মহাদেব।
মানসীগঙ্গার উত্তরতীরেই পর পর রয়েছে তিনকড়ি গোস্বামী পাদের মন্দির, সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজীর কঠোর জীবনব্রতের আশ্রম, গৌরনিতাই মন্দির এবং মহাপ্রভুর মন্দির। এগুলি সব দেখতে দেখতে এসে গেলাম সনাতন গোস্বামীর ভজন কুটিরে। বৃন্দাবনে আসার পর এক সময় এই কুটিরে বসে কৃষ্ণপ্রেমে ডুবে থাকতেন সনাতন গোস্বামী। এই গোবর্ধনে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এসে একটি পাথরে তাঁর চরণচিহ্ন দিয়ে যান সনাতন গোস্বামীকে—যেটি নিত্য তিনি পূজা করতেন এই ভজন কুটিরে বসে। একথা উল্লিখিত আছে ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে। বর্তমানে ওই চরণ চিহ্নসহ শিলাটি রয়েছে বৃন্দাবনে শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে। শুধুমাত্র জন্মাষ্টমী তিথিতে এটি সকলে দেখতে পান। আর সারা বছরই থাকে সংরক্ষণে। আচার্য শ্রীনিবাসও তাঁর সাধনজীবনের অনেকটাই অতিবাহিত করেন এই গোবর্ধনে।
সনাতন গোস্বামী প্রভুর ভজন কুটির থেকে আরও একটু এগোতেই পিছন দিকে পড়লো বল্লভাচার্যের বৈঠক। মাঝারী আকারের মন্দির। বল্লভাচার্যের সাধন-ক্ষেত্র।
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এবং আচার্য বল্লভ আবির্ভূত হন সমকালেই। মহাপ্রভুর চেয়ে বল্লভ বয়েসে কিছুটা বড় ছিলেন। বল্লভ ভট্ট মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন—একবার আমন্ত্রণও করেছিলেন তিনি প্রভুকে।
বল্লভ অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন তীর্থদর্শন ও পরিভ্রমণে। যখনই সুযোগ পেতেন তখনই কিছু ভক্তদের নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন বিভিন্ন বৈষ্ণব তীর্থগুলি দর্শন করতে। এসেছিলেন বৃন্দাবনেও। সাধন জীবনে ভারতের বহু তীর্থ ভ্রমণ করেছিলেন। তবে সমস্ত তীর্থের মধ্যে তিনি ব্রজমণ্ডলকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন। তাঁর প্রাণপ্রিয় ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বলে এখানকার অরণ্য, যমুনা, গিরিগোবর্ধন এবং ব্রজের প্রতিটি ধূলিকণাই ছিল তাঁর কাছে পরম পবিত্র এবং রাধাকৃষ্ণের অতীত লীলা-স্মৃতির উদ্দীপক। দীর্ঘকাল তিনি বসবাস করেছিলেন বৃন্দাবনে। বল্লভ সম্প্রদায়ের গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে, ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি এই ব্রজমণ্ডল থেকেই কৃষ্ণপ্রেমের মরমী রসবেত্তা আচার্য বল্লভের অধ্যাত্ম-জীবন শুরু। এখানে তিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন তাঁর প্রধান শিষ্য দামোদর দাসকে। তীর্থ পরিক্রমাকালে তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন গোবর্ধন নাথজীর শ্রীবিগ্রহের। সেই বিগ্রহের সেবা-পূজার জন্য নির্মাণ করেছিলেন একটি ছোট্ট মন্দির। পরবর্তীকালে বল্লভ সম্প্রদায় একটি বড় স্থান অধিকার করেছিল সমগ্র উত্তর ও পশ্চিমভারতের ধর্মজীবন ও জনমনে।

গোবর্ধন পবর্তের কাছেই ভরতপুর। তাই ভরতপুরের শাসকদের একটু বিশেষ আকর্ষণ ছিল এই গোবর্ধনের উপর। রাণী কিশোরীর মহল, 'ভরতপুরকে ছতরিয়া' এবং ভরতপুরের রাজার নির্মাণ করা নতুন গিরিরাজ মন্দিরটিও দেখার মতো।
গিরি-গোবর্ধন মন্দির এবং এর সংলগ্ন অন্যান্য মন্দিরগুলি দেখে এবার হাঁটা পথেই চলতে লাগলাম গোবিন্দকুন্ডের উদ্দেশ্যে। পথ জানা নেই তাই পথচারী আর দোকানীদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে করতে এগিয়ে চললাম গ্রামের পথ ধরে। এপথে অসংখ্য বানর আর ময়ূর ময়ূরীর ছড়াছড়ি। এরা যেন কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে কৃষ্ণকে।
একদা এই গোবর্ধন তীর্থে এসেছিলেন নিত্যানন্দ অবধূত। তখন ত্যাগ তিতিক্ষা আর পবিত্রতার মধ্যে দিয়েই জীবন চলেছে সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ অবধূতের। একবার তিনি বেরিয়েছিলেন পরিব্রাজনে। নানা তীর্থ পর্যটনের পব এলেন শ্রীধাম বৃন্দাবনে। ব্রজভূমিতে পা দিয়েই কৃষ্ণাবেশে মনপ্রাণ উত্তাল হয়ে ওঠে নিত্যানন্দের। দিবারাত্র ঘুরে বেড়ান পথে পথে, কুঞ্জে কুঞ্জে—জঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলীর আনাচে কানাচে। অন্তর খুঁজে বেড়াতে থাকে তাঁর পরম জীবন-সর্বস্ব কৃষ্ণধনকে। তখন নিত্যানন্দ যেন এক উদ্‌ভ্রান্ত কৃষ্ণপ্রেমিক।
এইভাবে ভ্রমণরত অবস্থায় হঠাৎ একদিন চোখে পড়লো পরম ভাগবত এক সন্ন্যাসীর মূর্তি—বসে আছেন বহুভক্ত শিষ্য পরিবৃত হয়ে। কৃষ্ণরসে দেহমন যেন রসায়িত হয়ে আছে এই সন্ন্যাসীর। তিনি আর কেউই নন—চৈতন্য লীলার সহায়ক ঈশ্বরপুরী ও অদ্বৈত আচার্য যাঁর কৃপাপ্রাপ্ত—সেই শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী।
এই সন্ন্যাসীকে দেখামাত্রই ভক্তিরসের জোয়ার জেগে উঠলো নিত্যানন্দের দেহমনে। ভাবে প্রমত্ত হয়ে সম্বিৎ হারালেন মুহূর্তে। লক্ষ্য করলেন মাধবেন্দ্রপুরী। বিস্ময় ফুটে উঠলো তাঁর চোখে মুখে। ভাবলেন, কে এই পরম বৈষ্ণব যে সদা সর্বদা অবগাহন করেন কৃষ্ণরসে?
কিছুক্ষণ পর সম্বিৎ ফিরে পেতেই উঠে বসলেন নিত্যানন্দ। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন মাধবেন্দ্রের কাছে—যেন কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। এ-কথা শুনে মহাপ্রেমিক মাধবেন্দ্র দু-হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরেন কৃষ্ণপ্রেমিক নিত্যানন্দকে।
তারপর একদিন এক শুভলগ্নে এই নবীন সাধককে দীক্ষা দিলেন কৃষ্ণমন্ত্রে। নতুন নামকরণ করলেন—নিত্যানন্দ। মাধবেন্দ্র আর নিত্যানন্দের কৃষ্ণনাম কীর্তনে আনন্দরস উথলে উঠলো সারা বৃন্দাবনে। প্রেমভক্তি সিন্ধ সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্রের পূত-সান্নিধ্য লাভ করে নিত্যানন্দের আর সীমা রইলো না পরমানন্দের।
কিছুদিন বৃন্দাবনে বাস করার পর আবার বেরিয়ে পড়লেন তীর্থ পর্যটনে। স্বেচ্ছাবিহারী এই অবধূত ভাবাবেশে মত্ত হয়ে ঘুরে বেড়ালেন নানা তীর্থে। মাধবেন্দ্র পুরীর কৃষ্ণরসের স্পর্শ উদ্বেল-করে তুলেছে অবধূতের সারা সত্তাকে।

কোথাও তিনি খুঁজে পেলেন না প্রেমের ঠাকুরকে।

কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল নিত্যানন্দ আবার ফিরে এলেন বৃন্দাবনে। এবার ডুবে গেলেন ভাব সাগরে। দিনযাপন করতে লাগলেন প্রচ্ছন্নভাবে, একান্তে। দুটি বছর ব্রজে কেটে গেল এইভাবে। একদিন রাতে অগাধভক্তির আধার নিত্যানন্দকে স্বপ্নে ব্রজেশ্বর কৃষ্ণ বললেন, 'অনেক তো ঘোরাঘুরি হলো অবধূত, আর কেন? চলে যাও শ্রীধাম নবদ্বীপে। সেখানে মহাপ্রভু জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রেমভক্তির সুধাপাত্র হাতে করে বিলিয়ে চলেছেন অধ্যাত্ম-পথের পরম সম্পদ। তোমার এ-দেহ-মন-প্রাণ ঢেলে দাও তাঁরই কর্মে। ভাগবতপ্রেম, ভাগবতধর্ম প্রচারের তুমিই যে আদিষ্ট পুরুষ। সেই মহাব্রত উদযাপিত হয়ে উঠুক তোমারই ভিতর থেকে।'

ঘুম ভেঙে যায়। উঠে বসেন ভাবাবিষ্ট নিত্যানন্দ। প্রেমভক্তির উৎস-সন্ধান পেলেন এতদিনে। আর দেরী করলেন না অবধূত। পরম উৎসাহে, পরমানন্দে বৃন্দাবন ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন নিত্যানন্দ নবদ্বীপের চৈতন্যময় পুরুষ শ্রীচৈতন্যের উদ্দেশ্যে।

আমিও সঙ্গীসহ প্রায় মাইলখানেক পথ হেঁটে এসে পেঁাছালাম আনোর গ্রামের অন্তর্গত গোবিন্দকুণ্ডের তীরে। বেশ বড় আকারের কুণ্ড। সান বাঁধানো সিঁড়ি নেমে গেছে জলে। টলটল করছে জল। প্রাকৃতিক পরিবেশও মনোরম। কুণ্ডের পূর্ব পাড়েই রয়েছে মাঝারী আকারের গোবিন্দ মন্দির। পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালাম নাট-মন্দিরে। ভিতরে স্থাপিত আছে রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ। অপূর্ব সুন্দর সাজে সাজানো। এই কুণ্ডের দক্ষিণ তীরে রাসবিহারী মন্দির দেখে পাশেই গেলাম মদনমোহন মন্দিরে। তারপর শ্রীনাথজীর মন্দির দর্শন করে একটু উত্তরে গেলাম টিলার উপরে আরও একটি মদনমোহন মন্দিরে। এই মন্দিরে রাধা-মদনমোহন ছাড়াও স্থাপিত আছে গৌর নিতাই-এর বিগ্রহ। এরই পাশে রয়েছে মাধবদাস বাবাজীর একটি আশ্রম। মন্দিরগুলি সব ঘুরে দেখে এসে বসলাম কুণ্ডের পাড়ে একটি গাছের তলায়।

কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের কোপানল থেকে ব্রজবাসীদের উদ্ধার করার পর নিজের ভুল বুঝতে পারলেন দেবরাজ ইন্দ্র। তখন কৃষ্ণকে নানা স্তবস্তুতির দ্বারা তুষ্ট করার জন্য স্বর্গের সমস্ত দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন এই ক্ষেত্রটিতে। নির্মাণ করলেন একটি পবিত্র কুণ্ড। একই সঙ্গে সমস্ত পবিত্র তীর্থের জল এনে এই কুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণকে অভিষেক করে তাঁকে গোবিন্দ নামে অভিহিত করেন। সেই থেকে এই কুণ্ডের নাম হয় গোবিন্দকুণ্ড। লোকবিশ্বাস, পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে এই কুণ্ডে তর্পণ ও পারলৌকিক কর্মাদিতে পরলোকগত আত্মা বৈকুণ্ঠলাভ করে। আর বহু যজ্ঞের ফললাভ হয় স্নানে।

কৃষ্ণপ্রেম রসে রসায়িত মাধবেন্দ্রপুরী একদা এসেছিলেন গিরিগোবর্ধনে। অপূর্ব রমণীয় শ্রীকৃষ্ণের রম্য লীলাভূমি গোবর্ধন। মাধবেন্দ্র যেদিকে তাকান সেদিকেই চোখে

ভেসে ওঠে ভুবন ভোলানো রূপে নবকিশোর নটবর। এইভাবেই অপরূপ অপ্রাকৃত লীলা চলতে থাকে দিনের পর দিন। বিরহ মিলনের রঙ্গ দেখেন মাধবেন্দ্র তাঁর প্রাণপ্রিয় রাধা-মদনমোহনের। আনন্দে অধীর হয়ে ওঠেন প্রতিমুহূর্তে। ভাবতন্ময় হয়ে কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও মাটিতে গড়াগড়ি দেন কৃষ্ণপাগল এই সন্ন্যাসী। ব্রজবাসীরা দেখেন অবাক হয়ে।

একদিন নির্লিপ্ত এই প্রেমিক সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করে প্রকট হয় এক দৈবলীলা। ভোরে উঠে গোবর্ধন পরিক্রমা শেষ করলেন মাধবেন্দ্র। তারপর বিশ্রাম নিতে শুয়ে পড়লেন গোবিন্দকুণ্ডের তীরে বৃক্ষছায়ায়। শেষ হয়েছে তাঁর স্নান আর মধ্যাহ্নের ধ্যানজপাদি। এবার শুধু বাকি রয়েছে ইষ্টকে ভোগ দিয়ে প্রসাদ গ্রহণ।

ত্যাগব্রতী এই মহাবৈষ্ণবের দীর্ঘকাল ধরে চলছে অযাচক বৃত্তি। প্রভুর কৃপায় যা জোটে তাই-ই গ্রহণ করেন আনন্দিত মনে ইষ্টকে নিবেদন করে। গ্রীষ্মকালের দুপুর বেলা। কোন জনমানবই নেই কাছাকাছি। আজ বোধ হয় আর কিছু জুটবে না এই মহাসাধকের।

হঠাৎ কোথা থেকে সামনে এসে দাঁড়ালো অপরূপ প্রিয়দর্শন এক গোপবালক। মাথায় ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল। আয়ত চোখদুটি যেন ইন্দ্রজালে ভরা। লাবণ্যশ্রী টলটল করছে সুন্দর সুঠাম শ্যামদেহে। হাতে রয়েছে এক ভাঁড় দুধ। মধুর হাসিতে চারদিক সচকিত করে গোপবালক দুধপাত্র হাতে দিলেন—খেয়ে নিতে বললেন অভুক্ত মাধবেন্দ্রকে।

সম্মোহিতের মত বালকের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মাধবেন্দ্র। চমক ভাঙতেই জানতে চাইলেন, 'কে তুমি? কোন্ গাঁয়ে বাস করো? কি করেই বা জানলে যে এখানে আমি উপবাসে আছি?'

উত্তরে সুমধুর হাসি হেসে বললেন গোপবালক, 'পাশের গাঁয়েই থাকি। তুমি হয়তো জানো না, যাঁরা অযাচক বৃত্তি নিয়ে থাকে—কারও কাছে চেয়ে খায় না, তাঁদের আমিই দুধের যোগান দিই। কুণ্ডের ঘাটে গোপবধূরা স্নান করতে এসেছিলেন। তাঁদের কাছেই শুনলাম তোমার উপবাসের কথা। তাঁরাই দুধ পাঠিয়ে দিল তোমার জন্যে। দুধটুকু খেয়ে নাও। খানিক বাদে এসে ভাঁড়টি নিয়ে যাবো।'

মাধবেন্দ্র শ্রদ্ধাভরে ইষ্টদেবকে নিবেদন করে তারপর পান করলেন দুধটুকু। গাছের তলায় বিশ্রাম করতে করতে বেলা গড়িয়ে গেল। কিন্তু কই সেই গোপবালক তো আর ফিরে এলো না! ভাঁড়টি পড়ে রয়েছে তখন মাধবেন্দ্রের একপাশে। ধীরে ধীরে রাত হলো। গিরিগোবর্ধনের আকাশ ছেয়ে গেল ঘন অন্ধকারে। পূজা কীর্তন জপ সেরে মাধবেন্দ্র আসন বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন মধ্যরাত্রে। শ্রান্ত দেহে মুহূর্তেই ঢলে পড়লেন গভীর ঘুমে।

রাত্রি প্রায় শেষ হতে চললো। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল মাধবেন্দ্রের। তাকিয়ে দেখলেন এক অপরূপ দৃশ্য। দিব্য আলোকের ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো বনভূমি।

তারই মধ্যে দেখলেন দাঁড়িয়ে আছে সেই গোপবালক। বিস্ময়ের আর অবধি রইলো না। উঠে বসলেন মাধবেন্দ্র।

এবার মধুর হাসি ছড়িয়ে নওলকিশোর বললেন, 'মাধবেন্দ্র, তুমি ছাড়া আর কাউকে দিয়ে আমার মূর্তির উদ্ধার কার্য সম্পন্ন হবে না। আমার প্রপৌত্র ব্রজনাভ গোবর্ধন পাহাড়ের কাছে এই গ্রামেরই পাশে স্থাপন করেছিল শিলা বিগ্রহ গোবর্ধন গিরিধারী গোপাল মূর্তি। ভূগর্ভের গভীরে সেই প্রাচীন মূর্তি পড়ে আছে আজও লোকচক্ষুর অন্তরালে। পূজারীরা সেই মূর্তি লুকিয়ে রেখেছিল মুসলমান আক্রমণের সময়। ওই মূর্তি তুমি উদ্ধার করে আনো। প্রতিষ্ঠা করো। কল্যাণ হবে অগণিত মানুষের। তোমার মতো পরম ভক্তের সেবা গ্রহণ করবো বলে বসে আছি অপেক্ষায়।'

কথাটুকু শেষ হতেই অন্তর্হিত হলো দিব্যমূর্তি। মাটিতে আছড়ে পড়লেন মাধবেন্দ্র। কৃষ্ণবিরহ ব্যথায় চোখের জলে বুক ভেসে গেল মাধবেন্দ্রের। তারপর ধীরে ধীরে এক সময় স্থির হয়ে গেলেন মাধবেন্দ্র।

সকাল হলো। গ্রামবাসীদের জানালেন তাঁর রাতের অলৌকিক আদেশের কথা। সারা গ্রামে জেগে উঠলো এক প্রবল উদ্দীপনা। স্বপ্নে প্রাপ্ত নির্দেশ মতো দুর্গম অরণ্যের নির্দিষ্ট কুঞ্জে উপস্থিত হলেন সবাইকে নিয়ে। মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করলেন গোপাল মূর্তি।

মহাপুরুষের কৃপায় প্রকট হলেন গোপালজী। নির্দিষ্ট সময়ে অভিষেক সম্পন্ন করলেন শ্রীবিগ্রহের। মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং বিগ্রহের অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে সারা ব্রজমন্ডলে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠলেন মাধবেন্দ্র। গোবর্ধনের সেই দিনকার এই ভাগ্যবান মহাপুরুষ সম্বন্ধে চৈতন্য ভাগবতে শ্রীবৃন্দাবন দাস লিখেছেন—

"ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার।
গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বার বার।"

(চৈঃ ভাঃ ১।৬।৬১)

গোবিন্দকুণ্ড থেকে আবার ওই একই পথ ধরে এলাম গোবর্ধনে। এখানকার হোটেলে ভালো খাবার বলতে যা—তা পাওয়া যায় না। চাউল রোটি সব্জি দাল—হোটেলে খাবার বলতে এই। এমন রান্না—মুখে রোচে না। এই খেয়েই দিনটা কাটলো। রাতটা কাটালাম গোবর্ধনের ধর্মশালায়।

বেশ ভোরেই উঠলাম ঘুম থেকে। ধর্মশালার বারোয়ারী বাথরুম থেকে সকালের কাজটুকু সেরে নিলাম। লটবহর কিছু নেই। ঝাড়া হাত পা। বেরিয়ে পড়লাম ধর্মশালা থেকে।

একটা দোকানে জিজ্ঞাসা করলাম, গোবর্ধন থেকে রাধাকুণ্ড কত দূর? উত্তরে দোকানী জানালেন, এই তো এখানে। পাস হ্যায়।

আমি দেখেছি, স্থানীয় লোকেরা প্রায় কেউই খবর রাখেন না কোন দেবস্থান বা দর্শনীয় স্থানের দূরত্ব কোথা থেকে কতটা। এটা সর্বত্রই। কেউ কেউ এমন ভাব করে, মনে হয় যেন জায়গাটা একেবারে নাকের ডগায়। এমন কথা শুনে অনেকবার অনেক জায়গায় হাঁটা শুরু করে দেখেছি—হাঁটছি তো হাঁটছিই, পরে জানতে পেরেছি পথচারীর কাছে, অনন্তকাল ধরে হাঁটলেও ওপথ আর শেষ হবে না। শেষ পর্যন্ত অন্য ব্যবস্থা করেছি।

আবার রিক্সা টাঙ্গা কিংবা অটোকে দর্শনীয় স্থানের দূরত্ব জিজ্ঞাসা করে দেখেছি—তারা এমন একটা দূরত্ব ঘোষণা করে, ভাবটা এমন করে যেন সেখানে পেঁছাতে কয়েকটা জন্ম লেগে যাবে। ভাড়াটাও সেই পুনর্জন্মের হার অনুপাতে। সে কথায় বিশ্বাস করে নগদ পয়সা গুণে দিয়ে যেই না বসলাম অটো কিংবা রিক্সায়—ওমা, দেখতে দেখতে পেঁছে গেলাম জায়গা মতো। তাই ভ্রমণ পথে যে সব পথের দূরত্ব লিখছি তা স্থানীয় লোকমুখে, গাড়ীর ড্রাইভার বা অটো টাঙ্গাওয়ালার মুখ থেকে শোনা। তাদের কথায় সঠিক দূরত্ব জানতে না পারলেও কমবেশী দূরত্বের একটা আভাষ যে পাওয়া যায়—এতে কোন সন্দেহ নেই।

এই গোবর্ধন থেকেই একটা টাঙ্গা ভাড়া করলাম। চললো চওড়া পীচের রাস্তা ধরে। পথের দু-ধারে প্রায়ই দেখছি বাবলা কাঁটার ঝোপছাড়। কোথাও দু-চারটে বাড়ী আবার কোথাও ফাঁকা চাষের জমি। দেখার মধ্যে এই—এই-ই দেখতে দেখতে টাঙ্গাওয়ালার কথায় ৪ কি.মি. পথ পেরিয়ে এলাম রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড। চওড়া রাস্তার ধারে নামিয়ে দিয়ে টাঙ্গাওয়ালা একটা গলির মতো রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বললো, এই পথ ধরে সোজা চলে গেলেই শ্যামকুণ্ডে পেঁছে যাবেন।

পথের নির্দেশ পেয়ে সোজা হাঁটতে লাগলাম। রাস্তাটা খুব বেশী চওড়া নয়। দু-ধারেই রয়েছে সারি দিয়ে দোকান-পাট। বেশীরভাগ দোকানেই দেখছি তেলে-ভাজা আর জিলিপি। বেশ কিছুটা সোজা হাঁটার পর আবার বাঁয়ে ঘুরে গেছে রাস্তা। তবে চওড়া অনেক কম। বাঁ পাশের ওই রাস্তা ধরে আরও কিছুটা এগিয়ে যেতেই ডানদিকে পড়লো বিশাল একটি সরোবর—শ্যামকুণ্ড। এসে দাঁড়ালাম মাধবেন্দ্রপুরী ভবনের সামনে।

এই কুণ্ডের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে। যেমন, রাজা কংসের অসংখ্য চরের মধ্যে অন্যতম ছিল অরিষ্টাসুর। যখন তখন সে অত্যাচার করতো ব্রজবাসীদের উপর—একই সঙ্গে অনিষ্টও। কৃষ্ণের কানে গেল একথা। একদা এই অত্যাচারের হাত থেকে ব্রজবাসীদের নিষ্কৃতি দেয়ার জন্য দুর্জ্জয় এই অসুরকে বধ করলেন শ্রীকৃষ্ণ। অরিষ্টাসুরের আকৃতি ছিল বৃষের মতো। তাই এই অসুর বৃষাসুর নামেও প্রসিদ্ধ।

যেদিন অরিষ্টাসুরকে শ্রীকৃষ্ণ বধ করলেন, সেদিনই ব্রজগোপীদের সঙ্গে রাসলীলার প্রার্থনা জানালে রাধা এবং তাঁর প্রিয় সখীরা কৃষ্ণকে জানালেন, তিনি যেন তাঁদের অঙ্গ স্পর্শ না করেন, কারণ বৃষরূপী অসুরকে হত্যা করে কৃষ্ণ গোহত্যার পাপে লিপ্ত হয়েছেন।

একথা শুনে কৃষ্ণ জানালেন, তিনি বৃষ হত্যা করেননি। বধ করেছেন ভয়ংকর এক অসুরকে।

এর উত্তরে ব্রজগোপীরা বললেন, বৃত্রাসুর দেহে ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মহত্যার পাপ স্পর্শ করেছিল ইন্দ্রকে। এরও তো রূপ ছিল বৃষের সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে পাপ স্পর্শ করবে না কেন!

শ্রীকৃষ্ণ গোপবালাদের যুক্তিপূর্ণ কথায় লজ্জিত হয়ে উপদেশ চাইলেন, কি করলে তিনি এই পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবেন?

উত্তরে ব্রজেশ্বরী রাধা বললেন, ত্রিভুবনের সমস্ত তীর্থে স্নান করলে তবেই গো-হত্যার পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবেন তিনি।

শ্রীমতী রাধার কথায় শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন, তিনি যদি সমস্ত তীর্থে গিয়ে স্নান করে আসেন তবে গোপবালারা তা বিশ্বাস করবে না। অতএব এঁদের সামনেই এ-কাজ করা উচিত বলে মনে করলেন। তখন তিনি পায়ের গোড়ালী দিয়ে মাটিতে আঘাত করতেই সৃষ্টি হলো একটি কুণ্ড। ভোগবতী গঙ্গাসহ একে একে সমস্ত তীর্থের আগমন ঘটলো কৃষ্ণের ইচ্ছায়। এবার স্নান করলেন কৃষ্ণ। চোখের সামনে এসব করা সত্ত্বেও বিশ্বাস হলো না রাধারাণী আর তাঁর সহচরীদের। তখন শ্রীকৃষ্ণ আদেশ দিলেন তীর্থদেবতাদের—তাঁরা যেন প্রত্যেকেই নিজমূর্তি ধারণ করে দর্শন দেন সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গোপবালাদের। আদেশমাত্রই আবির্ভূত হলেন লবণ সমুদ্র, ক্ষীর সমুদ্র, সরযূ, সরস্বতী, যমুনা, শোন, গোদাবরী, নর্মদা, পুষ্করবাজ, প্রয়াগরাজ থেকে শুরু করে সমস্ত তীর্থের দেবতারা। রাধারাণীসহ গোপবালাদের অবসান ঘটলো অবিশ্বাসের। এইভাবেই সৃষ্টি হলো শ্যামকুণ্ডের অজ্ঞাত কোন এক সময়ে। কথিত আছে, শ্যামকুণ্ডের মধ্যভাগে রয়েছে ব্রজনাভকুণ্ড। অরিষ্টাসুর বধের পর শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র ব্রজনাভ নিজের নামানুসারেই নির্মাণ করেছিলেন কুণ্ডটি। গরম-কালে শ্যামকুণ্ডের জল কমে গেলে তখন দেখা যায় ব্রজনাভকুণ্ডটি।

শ্যামকুণ্ড সৃষ্টি হওয়ার পর ওই রকম একটি পবিত্র কুণ্ড সৃষ্টি করার ইচ্ছা হলো

রাধারাণীর। তিনি তখন সাহায্য চাইলেন সখীদের কাছে। যেখানে বৃষাসুরের ক্ষুরের ক্ষত ছিল—সেখানেই রাধার এমন অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য তাঁরা সদলে খনন করলেন একটি সুন্দর কুণ্ড—শ্যামকুণ্ডের উত্তরে। কুণ্ডটি হলো কিন্তু কুণ্ডে জলপূর্ণ হতে দিলেন না কৃষ্ণ তাঁর যোগবলে। এটি নিছকই কৃষ্ণের কৌতুক। এতে রাধারাণী এবং গোপবালারা বিস্মিত ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পরে জানতে পারলেন এ কাজ কৃষ্ণেরই। তারপর কৃষ্ণের ইচ্ছায় সমস্ত তীর্থগণের শুভাগমনে পবিত্র জলে পূর্ণ হলো কুণ্ড। নাম হলো রাধাকুণ্ড। এইভাবে সৃষ্টি হলো রাধাকুণ্ডের।

মহাকালের নিয়মে পবিত্র এই কুণ্ডতীর্থ লুপ্ত হয়ে যায়। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রজমণ্ডল ঘুরতে ঘুরতে একদিন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ব্যাকুলভাবে সবাইকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন, 'রাধাকুণ্ড কোথায় বলতে পারো?' কারও কাছ থেকেই কোন উত্তর আসে না।

লুপ্ত এই তীর্থের কথা লোকে ভুলেই গেছিল। সন্ধান পাওয়ার কোন পথও ছিল না। পরিশেষে মহাপ্রভুই একদিন দিব্য ভাবাবেশে আবিষ্ট হয়ে বেরিয়ে পড়লেন রাধারাণীর স্মৃতিপূত রাধাকুণ্ড আবিষ্কারে। মহাপ্রভু ছুটছেন, একই সঙ্গে ছুটছেন কৌতূহলী ভক্ত বৈষ্ণবের দল।

পথ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। চারদিকে ধানক্ষেত। তারই মাঝে রয়েছে ছোট্ট একটি ডোবা। দিব্যভাবে তন্ময় মহাপ্রভু ঘোষণা করলেন—এটাই হচ্ছে রাধারাণীর পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত সেই প্রাচীন পবিত্র রাধাকুণ্ড—যা লুপ্ত হয়ে রয়েছে শত শত বছর ধরে।

কথাটুকু শেষ হতে না হতেই মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই কুণ্ডে। পরমানন্দে স্নান করতে লাগলেন মহাপ্রভু। আর এদিকে ভক্তবৈষ্ণবেরা কীর্তন শুরু করে দিলেন কুণ্ডকে ঘিরে। এরপর থেকে সারা দেশের সাধক ও সাধুসমাজ স্বীকৃতি দিলেন মহাপ্রভুর আবিষ্কৃত পবিত্র এই রাধাকুণ্ডকে।

সেই সময় শোচনীয় অবস্থা চলছিল মথুরা বৃন্দাবনে। মানুষের বসতিও খুব কম ছিল এখানে। চারদিকে ছিল গভীর অরণ্য। মহাপ্রভু আসার পর বনাকীর্ণ পবিত্র এই অঞ্চল ভক্ত সমাজে আলোড়ন তোলে ধীরে ধীরে। প্রচারিত হয় বিস্মৃত প্রায় এই পুণ্যস্থানগুলির মাহাত্ম্য-কথা। একই সঙ্গে উদ্ধার হয় মথুরা বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থগুলি। পরবর্তীকালে মহাপ্রভুর পাঠানো শক্তি গোস্বামীদের প্রচেষ্টায় আবার জেগে ওঠে হারিয়ে যাওয়া বৃন্দাবন আর দেশবাসীর হৃদয়-মঞ্চে নতুন করে স্থাপিত হয় বিশ্বপ্রেমে স্বীকৃত প্রেমিক যুগল—রাধাকৃষ্ণ।

এই তীর্থকুণ্ডের জলে স্নান করলে সমস্ত তীর্থস্নানের ফল পাওয়া যায়। কারণ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সমস্ত তীর্থ এখানে অবস্থান করছেন জলরূপে। তীর্থপদ্ধতি অনুসারে এই কুণ্ড দুটির সেবাপূজা, সংকল্প করে স্নান-তর্পণাদি করলে

মনোবাসনা সিদ্ধ হয়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীসহ ভক্তের পূজা গ্রহণ করেন—এমন বিশ্বাস ব্রজমণ্ডলের প্রতিটি ভক্ত নরনারীর—ভক্তপ্রাণ তীর্থকামীদেরও।
শ্যামকুণ্ড এবং রাধাকুণ্ড—এ দুটি পাশাপাশি। আমি দাঁড়িয়ে আছি শ্যামকুণ্ডের তীরে। আকারে দেখতে একই রকম হলেও সামান্য বড় শ্যামকুণ্ড। অনেকে বলেন, রাধারাণী নাকি শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে বয়েসে বড় ছিলেন। আমার জানা নেই। স্বামীর চেয়ে বয়েসে বড় বউ—এমনটা বাংলা তথা ভারতের অসংখ্য ঘরে। তবে কৃষ্ণের কাছে রাধাকে বুড়ি বুড়ি লাগতো কিনা—সে ব্যাপারটা অজ্ঞাত থেকে গেছে আজও।
যাইহোক, এখনও চলা শুরু করিনি। কুণ্ডের পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, কুণ্ডের চার-পাশ পাথর দিয়ে সুন্দরভাবে বাঁধানো। চওড়া সিঁড়ি নেমে গেছে ধাপে ধাপে। বেশ কয়েকটি বড় বড় প্রাচীন গাছ দাঁড়িয়ে আছে ঘাটের পাশে পাশে। দেখলে মনে হয় যেন রাধাকৃষ্ণের চরণ বন্দনা করছে মাথা নত করে। ব্রজবাসীদের একান্ত ও গভীর বিশ্বাস, সদাসর্বদা সখীসহ রাধাকৃষ্ণ বিচরণ করেন এখানে। ভাগ্যবান ভক্ত সাধক কখনও কখনও শুনতে পায় শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর সুর—শ্রীমতী রাধার নূপুর-ধ্বনি।
এই কুণ্ডতীর্থের পাশে পাশে রয়েছে অসংখ্য ছোট বড় মন্দির। এবার পায়ে হেঁটেই কুণ্ডের পাশ দিয়ে এগোতে লাগলাম মন্দির এবং আশ্রমগুলি দর্শন করতে।
১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এসেছিলেন বৃন্দাবনে। সঙ্গে ছিলেন মথুরবাবু এবং তাঁর স্ত্রী জগদম্বা দাসী। ভাগ্নে হৃদয়ও ছিলেন ঠাকুরের সঙ্গে। ঠাকুর তীর্থে বেরিয়েছিলেন দু-বার। প্রথমবার ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বৈদ্যনাথ ধাম, প্রয়াগ এবং কাশী দর্শন করেছিলেন। দ্বিতীয়বার কাশীধাম, প্রয়াগ এবং বৃন্দাবন। ভাবচক্ষে তিনি দেখেছিলেন—মথুরার ধ্রুবঘাটে বসুদেবের কোলে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবৃন্দাবনে সন্ধ্যা সময়ে ফিরতি গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ গরু নিয়ে যমুনা পার হয়ে আসছেন।
একদিন দক্ষিণেশ্বরে কথা প্রসঙ্গে তাঁর ভক্তদের বলেছিলেন—
“আমি বৃন্দাবনে গিছ্লাম—সেজোবাবুর সঙ্গে।
মথুরার ধ্রুবঘাটে যেই দেখ্লাম অমনি দপ্ করে দর্শন হল, বসুদেব কৃষ্ণ কোলে ল’য়ে যমুনা পার হচ্ছেন।
আবার সন্ধ্যার সময় যমুনা পুলিনে বেড়াচ্ছি, বালির উপর ছোট ছোট খেড়ো ঘর। বড় কুলগাছ। গোধূলির সময় গাভীরা গোষ্ঠ থেকে ফিরে আসছে। দেখলাম হেঁটে যমুনা পার হচ্ছে। তারপরেই কতকগুলি রাখাল গাভীদের নিয়ে পার হচ্ছে।
যেই দেখা, অমনি ‘কোথায়, কৃষ্ণ !’ বলে—বেঁহুশ হয়ে গেলাম।
শ্যামকুন্ড রাধাকুণ্ড দর্শন করতে ইচ্ছা হয়েছিল। পাল্কী করে আমায় পাঠিয়ে দিলে। অনেকটা পথ। লুচি, জিলিপী পাল্কীর ভিতরে দিলে। মাঠ পার হবার সময় এই ভেবে কাঁদতে লাগলাম,

'কৃষ্ণ রে! তুই নাই, কিন্তু সেই সব স্থান রয়েছে। সেই মাঠ তুমি গরু চরাতে।'
হৃদে রাস্তায় সঙ্গে সঙ্গে পেছনে আসছিল। আমি চোক্ষের জলে ভাসতে লাগলাম। বিয়ারাদের দাঁড়াতে বলতে পারলাম না।
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডতে গিয়ে দেখলাম, সাধুরা এক একটি ঝুপড়ির মত করেছে, তার ভিতরে পিছন ফিরে সাধন-ভজন করছে—পাছে লোকের উপর দৃষ্টিপাত হয়। দ্বাদশবন দেখবার উপযুক্ত।
বঙ্কুবিহারীকে দেখে ভাব হয়েছিল, আমি তাঁকে ধরতে গিছিলাম। গোবিন্‌জীকে দুইবার দেখতে চাইলাম না। মথুরায় গিয়ে রাখাল-কৃষ্ণকে স্বপন দেখেছিলাম। হৃদে ও সেজোবাবু দেখেছিল।"
বৃন্দাবন থেকে ফেরার সময় একটি মাধবীলতার গাছ এনেছিলেন ঠাকুর। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দেই রোপণ করেছিলেন দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটিতে। এসব কথা কথামৃতেরই কথা—অষ্টম খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।
মাধবেন্দ্রপুরীর ভবন থেকে সামান্য একটু এগোতেই আমার ডানপাশে পড়লো গোপকুঁয়া। চারপাশ বাঁধানো রয়েছে কুঁয়াটির। বেশ গভীর। প্রবাদ আছে, প্রায় সাড়ে চার থেকে পাঁচ হাজার বছর বয়েস এই কুঁয়াটির। শ্রীকৃষ্ণকে এই কুঁয়ার জল তুলে পান করিয়েছিলেন ব্রজগোপীরা।
এই গোপকুঁয়ার ডানপাশে একটু এগোতে পড়লো 'ব্যাস ঘেরা'। একেবারেই সাদামাটা একটি মন্দির। ভিতরে রয়েছে একটি সমাধিবেদি। অল্প কিছু ফুল ছড়ানো রয়েছে বেদীর উপরে। এটি কৃষ্ণগতপ্রাণ মাধবেন্দ্রপুরীজীর সমাধি মন্দির।
সমাধি মন্দির থেকে একটুখানি এগোতেই ডানপাশে পড়লো রাধাবিনোদ মন্দির। অনাড়ম্বর মন্দির অথচ গর্ভমন্দিরে রাধারাণী এবং রাধাবিনোদের সাজানো বিগ্রহ দুটি অপূর্ব। এখানে দেখতে একটুও সময় লাগলো না।
শ্যামকুণ্ডের ডান পাড় ধরেই হাঁটছিলাম। এবার একটি গলির মতো পথ ধরে এঁকে-বেঁকে খানিকটা যেতেই এসে গেলাম শ্যামকুণ্ডের উত্তরভাগে ললিতাকুণ্ডে। মাঝারী আকারের এই কুণ্ডটিও বাঁধানো। সিঁড়ি নেমে গেছে ধাপে ধাপে। কুণ্ডের পূর্ব পাড়ে এসে দাঁড়ালাম ললিতবিহারী মন্দিরের দাওয়ায়। ভিতরে স্থাপিত রয়েছে রাধা আর ললিতাবিহারীজীর বিগ্রহ। পরিচ্ছন্ন সাজানো মন্দির। এখানেই রয়েছে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরা শ্রীনিবাসাচার্য মহারাজজীর সমাধি মন্দির।
এখান থেকে সামান্য একটু হেঁটে—শ্যামকুণ্ডের পাড়েই এলাম বৃন্দাবনের প্রাণস্বরূপ শ্রীজীব গোস্বামীর ভজন কুটিরে। জীবনের একটা সময় শ্যামকুণ্ডের এই ভজন কুটিরে বসেই কেটে গেছে তাঁর কৃষ্ণপ্রেমের নামগানে। এই ভজন মন্দিরে স্থাপিত রয়েছে গিরিধারীজীর বিগ্রহ—সঙ্গে রয়েছে গোস্বামী প্রভুর চিত্রপট আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণের প্রতিচ্ছবি। এ সবই নিত্য পূজিত হয় এখানে।
শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর ভজন কুটির দর্শনের পর একে একে নন্দিনীমাতার সমাধি

মন্দির, বঙ্কুবিহারী মন্দির, বনমালি রায় বাহাদুর প্রতিষ্ঠিত রাজবাড়ীতে রাধা মদনগোপাল বিগ্রহ, ভক্তনিবাসে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের বিগ্রহ, রাধাবল্লভ মন্দিরে রাধাবল্লভজীর মূর্তি, জগন্নাথ মন্দির, ব্রজমোহন মন্দির এবং বিশ্বম্ভর মন্দিরের বিগ্রহ দর্শন করে হাঁটতে হাঁটতে এসে গেলাম বলরাম কুণ্ডের পাড়ে।

শ্যামকুণ্ড থেকে কিছুটা দূরেই এই বলরাম কুণ্ড। কথিত আছে, শঙ্খচূড় বধের দিন সখাগণের সঙ্গে বলরাম অবস্থান করেছিলেন এখানে।

বলরাম কুণ্ড থেকে সামান্য পথ—এলাম ভানুখোর কুণ্ডে। একটি গলিপথের মধ্যে দিয়েই এলাম। এই কুণ্ডের দক্ষিণ দিকেই রয়েছে রাসমণ্ডল। প্রবাদ আছে, শ্রীগোবর্ধন উৎসবের সময় একদা এই ক্ষেত্রটিতে শিবির স্থাপন করেছিলেন রাধারাণীর পিতা বৃষভানু মহারাজ।

এবার হাঁটতে হাঁটতে এসে গেলাম একেবারে শ্যামকুণ্ডের উত্তর পাড়ে তিনজন গোস্বামীর সমাধি মন্দিরের সামনে। রঘুনাথদাস গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমাধি দেয়া হয়েছে একই মন্দিরে। জনশ্রুতি আছে, এই তিন মহাত্মা নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন একই তিথিতে। তবে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সমাধিস্থানটি নিয়ে মতভেদ আছে। তিনজনের সমাধি একই মন্দিরে দেয়া হয়নি। রঘুনাথদাসজীর সমাধি মন্দিরটি আলাদা জায়গায়। যাইহোক, সমাধি-বেদি আর রাধাগোবিন্দের সুদর্শন বিগ্রহ স্থাপিত রয়েছে এই অনাড়ম্বর মন্দিরে।

এখানকার মন্দিরগুলি একটি থেকে আর একটির দূরত্ব মোটেই বেশী নয়। তাই ঘুরে ঘুরে দেখতে সময় লাগছে না মোটেই। এই সমাধি মন্দির থেকে একটু পূবেই রয়েছে পঞ্চপাণ্ডব বৃক্ষ। কথিত আছে, পঞ্চপাণ্ডব বৃক্ষরূপে অবস্থান করছেন এই শ্যামকুণ্ডের পাড়ে। এ-কথা স্বপ্নাদেশে রঘুনাথদাস গোস্বামী জানতে পারেন পঞ্চপাণ্ডবের কাছ থেকে। তাই শ্যামকুণ্ড সংস্কারের সময় তিনি গাছগুলিকে কাটেননি।

পঞ্চপাণ্ডব বৃক্ষের সামনেই শ্যামকুণ্ডের প্রসিদ্ধ মানস পাবন ঘাট। শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করার মানসে একদা শ্রীমতী রাধারাণী স্নান করেছিলেন এই ঘাটে। তাই এই ঘাটের নাম হয়েছে মানস পাবন ঘাট।

এই ঘাটের পাশেই স্থাপিত রয়েছে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভজন কুটির। অতি সাধারণ এই ভজন কুটিরে দেখলাম রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ। একদা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই ছোট্ট ভজন কুটিরে বসে রচনা করেছিলেন তাঁর অমরগ্রন্থ "শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত"। এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে।

মানস পাবন ঘাটের পাশেই গোস্বামী রঘুনাথদাসের ভজন কুটির। একদা এই কুটিরেই দিনের পর দিন অতিবাহিত করেন বিস্ময়কর ত্যাগ, তিতিক্ষার প্রতীক রঘুনাথদাস গোস্বামী। নীলাচলে মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে তিনি বাস করেন দীর্ঘ ষোল

বৎসর। তাঁর জীবন-তপস্যা সফল হয়ে ওঠে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আর স্বরূপ দামোদরের কৃপায়। নীলাচলে লীলানাট্যের উপর মহাপ্রভু যবনিকা টানার পর নিদারুণ শোকের আঘাতে উন্মত্তের মতো হয়ে ওঠেন ভক্তপ্রবর রঘুনাথ। নীলাচল থেকে চলে এলেন বৃন্দাবনে। সঙ্গে নিয়ে এলেন কৃষ্ণদাসকে। তারপর পায়ে হেঁটে এলেন গোবর্ধনে। এই গিরিগোবর্ধনের পাদদেশে রয়েছে বৈষ্ণব ভক্তদের পরম শ্রদ্ধার ঘাট—উপবেশন ঘাট। এই ঘাটে বসেই এক সময় শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের স্থান মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছিলেন ভাবাবিষ্ট প্রভু শ্রীচৈতন্য। ভক্ত রঘুনাথ এই ঘাটেই দণ্ডবৎ জানিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন একটি গাছের তলায়। সেই সময় বৃদ্ধ সনাতন গোস্বামী ভজন করতেন কাছেই বৈঠান নামক একটি স্থানে। সনাতন গোস্বামীর প্রচেষ্টায় গ্রামবাসীরা একটি পর্ণকুটির বেঁধে দিয়েছিলেন রঘুনাথ এবং তাঁর সেবক কৃষ্ণদাসের জন্য।

চৈতন্য মহাপ্রভু রাধাকুণ্ড এবং শ্যামকুণ্ড আবিষ্কার করলেও সেটি মজে যায় কালের নিয়মে। রঘুনাথ ধ্যান-বলে নির্ণয় করেন পুণ্যময় কুণ্ডদুটির সঠিক অবস্থান। তারপর পশ্চিমদেশীয় এক ধনী বৈষ্ণব ভক্তের আর্থিক সাহায্যে তিনি কুণ্ড দুটি খনন ও সংস্কার করেন। তখন সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল। সম্রাট তামার পাটায় দলিল করে দিলেন রঘুনাথদাসজীকে। তখন থেকে ব্রজবাসীদের কাছে রঘুনাথ প্রসিদ্ধি লাভ করেন রাধাকুণ্ডে দাসগোস্বামী নামে।

রাধাকুণ্ডের পাড়ে এই পর্ণকুটিরেই চলতে থাকে তাঁর সাধনজীবন। তারপর এই কুটিরকে কেন্দ্র করেই রাধাকুণ্ডে নির্মিত হয় অনেকগুলি মন্দির, ঘাট এবং ভজন কুটির। গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব গোস্বামী, ভূগর্ভ গোস্বামী প্রমুখ মহাত্মারা সাধন ভজন করতেন এই অঞ্চলে বসে। বিশেষ করে আরও অসংখ্য বৈষ্ণব সাধকেরা এখানে ভজন কুটির স্থাপন করেন গোস্বামী রঘুনাথের সাধন-মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হয়ে। কালক্রমে রাধাকুণ্ড পরিণত হলো দ্বিতীয় বৃন্দাবনে। প্রায় ৯৪ বৎসর বয়েসে আত্মকাম মহাসাধক ভক্ত রঘুনাথ রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপ দর্শন করতে করতে নিত্য-লীলায় প্রবেশ করেন পবিত্র এই রাধাকুণ্ডের পাড়ে—ভজন কুটিরে।

শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড রক্ষার ক্ষেত্রে রঘুনাথদাস গোস্বামীর প্রচেষ্টা অক্ষয় হয়ে আছে আজও। এই উদ্দেশ্যে লালাবাবুও যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেছিলেন। বৈষ্ণব সাধনার অনেক নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন সনাতন, শ্রীজীব এবং কবিরাজ গোস্বামী—এই কুণ্ডক্ষেত্রে তপস্যা করে।

শ্যামকুণ্ডের পাড় ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে এলাম রাধাকুণ্ডের পূর্ব পাড়ে। আমার মতো অসংখ্য যাত্রী ঘুরে ঘুরে দেখছে আমারই মতো। আবার দলবদ্ধভাবে খোল করতাল বাজিয়ে ভক্তপ্রাণ নারীপুরুষ পরিক্রমা করে চলেছেন এক মন্দির থেকে আর এক মন্দিরে। রাধাকৃষ্ণের নামগানে মুখরিত হয়ে আছে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ডের চারদিক। ঈশ্বর আছেন কি নেই—আমার জানা নেই। তবে এখানে—এই

কুণ্ডক্ষেত্রে যে একটা পরমানন্দের জোয়ার বয়ে চলেছে তা বুঝতে পারছি প্রতিটি পদক্ষেপে।

এসে দাঁড়ালাম গোপালভট্ট গোস্বামীর সাধন কুটিরের সামনে। ছোট্ট কুটির। কোন আড়ম্বর নেই। এমনটা নেই আমার দেখা প্রতিটি বৈষ্ণব সাধকেরই কুটিরে। কি আশ্চর্য বৈষ্ণবীয় দীনতার মধ্যেই দিন কাটিয়েছেন বৈষ্ণব সাধকেরা—তা এই কুটিরগুলি দেখলেই অনুমান করা যায় অনায়াসে। কোন শৈল্পিক আকর্ষণ নেই কোন কুটিরে। সাধারণ একটি ঘরের মতো। এখানে বসেই গোপাল ভট্টের জীবন কেটেছে সাধন-ভজনে—পৌঁছেছেন অভিষ্ট লক্ষ্যে।

এখান থেকে রাধাকুণ্ডের উত্তর পাড়ে এলাম রঘুনাথদাস গোস্বামীর সমাধি মন্দিরে। ছোট্ট মন্দির-মধ্যে রয়েছে সমাধিবেদি। রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ তো আছেই। এই মন্দিরে চলছে অখণ্ড নাম সংকীর্ত্তন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পর এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে। সারা ভারতের তীর্থ পরিক্রমার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা পেয়ে বসে তাঁকে। একদা দিব্যকান্তি এই সন্ন্যাসী বেরিয়ে পড়েন মঠের বাইরে। পরনে গেরুয়া বসন। হাতে দণ্ড কমণ্ডলু।

কালক্রমে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির বৈচিত্র্যে ভরে ওঠে তাঁর পরিব্রাজক জীবন। এক সময় স্বামীজী পা দিলেন বৃন্দাবনে। ঘুরতে ঘুরতে এলেন রাধাকুণ্ডের পাড়ে। পরনের কৌপিনটি পাড়ে খুলে রেখে বিবস্ত্র হয়ে নেমে গেলেন কুণ্ডে। স্নান করে উঠে এসে দেখলেন, একটি বানর তাঁর কৌপিনটি নিয়ে পালিয়ে গেছে অনেক দূরে। অনেক চেষ্টার পর কৌপিনটি পেলেন বটে তবে একেবারেই শতচ্ছিন্ন। লজ্জা নিবারণের কোন উপায়ই রইলো না ওই কৌপিনে। বড় অভিমানে মনটা ভরে ওঠে স্বামীজীর। মনে মনে সংকল্প জানালেন কুণ্ডেশ্বরী রাধারাণীর কাছে—বনেই বাস করবেন তিনি, কিছুতেই আর ফিরে আসবেন না লোকালয়ে। দেখা যাক রাধারাণী কোন ব্যবস্থা করেন কিনা তাঁর জন্যে!

বিবস্ত্র অবস্থায় তিনি প্রবেশ করলেন একটি বনের মধ্যে। সেই সময় ঘটে গেল এক অদ্ভুত কাণ্ড। স্বামীজী দেখলেন একটি লোক তাঁকে পিছন দিক থেকে ডাকতে ডাকতে ছুটে আসছে দ্রুতবেগে। উলঙ্গ সন্ন্যাসী এগিয়ে চলেছেন সামনের দিকে। কিছু পরেই কাছে এসে লোকটি বললেন, 'মহারাজ, এই বনের পাশেই থাকি আমি। সেখানেই ঘর আছে আমার। কৃপা করে সেখানে আপনি চলুন। আপনাকে নতুন বস্ত্র আর কিছু আহার নিবেদন করে ধন্য হই।'

এ-কথায় আনন্দে ভরে ওঠে স্বামীজীর মন। অন্তরে অনুভব করেন রাধারাণীর কৃপার কথা। রাজী হলেন স্বামীজী। নতুন বস্ত্র পরে আহার সেরে আবার তিনি বনমধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন লোকালয়ে।

রঘুনাথদাস গোস্বামীর সমাধিমন্দির থেকে সামান্য একটু এগোতেই পড়লো জাহ্নবা

মন্দির। মাঝারী আকারের মন্দির। শিল্পের কোন ছোঁয়া নেই। মন্দির-মধ্যে স্থাপিত রয়েছে মাঝখানে গোপীনাথ, বাঁদিকে রাধারাণী এবং ডানদিকে জাহ্নবার বিগ্রহ।

জাহ্নবা মন্দির থেকে কিছুটা হেঁটে এলাম রাধাকুণ্ডের দক্ষিণে—কোণের দিকে। এখানে রয়েছে বিহারীজীর মন্দির। তারপর রাধাকুণ্ডের পাড় ধরে সোজা চলে এলাম আরও দক্ষিণে কুণ্ডেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে। কথিত আছে, রাধামাধবের মধ্যাহ্ন লীলাকৌতুক দেখার লোভ সামলাতে না পেরে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় কুণ্ডেশ্বর মহাদেব সদা সর্বদা অবস্থান করছেন রাধাকুণ্ডের কোণে।

কুণ্ডেশ্বর মহাদেবের মন্দির ছেড়ে একটু এগোতেই পড়লো বৃন্দাবনের প্রাণপুরুষ লোকনাথ গোস্বামীর সমাধি মন্দির। এসে দাঁড়ালাম একেবারে মন্দিরের সামনে। ভিতরে রয়েছে পরম বৈষ্ণব লোকনাথের সমাধি-বেদি। বিগ্রহের মধ্যে আছে শুধু রাধাগোকুলানন্দ।

এবার রাধাকুণ্ডের দক্ষিণ তীরে হনুমান মন্দির হয়ে এলাম গোপীনাথ মন্দিরে। এই মন্দিরে স্থাপিত রয়েছে রাধাগোপীনাথের বিগ্রহ। এটিই নিত্যানন্দ প্রভুর বৈঠক। কথিত আছে, প্রভু নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে ভ্রমণকালে উপবেশন করেছিলেন রাধাকুণ্ডের এই পবিত্র স্থানটিতে।

গোপীনাথ মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম রাধাকুণ্ড এবং শ্যামকুণ্ডের সঙ্গম-স্থলে। কুণ্ড দুটির মাঝখান দিয়ে বাঁধানো রাস্তা চলে গেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে।

সঙ্গমস্থলটি ছেড়ে আরও একটু এগোতেই পড়লো মদনমোহন মন্দির। ছোট এই মন্দিরে স্থাপিত আছে রাধা মদনমোহনের বিগ্রহ আর সনাতন গোস্বামীর চিত্রপট। মন্দিরটি শ্যামকুণ্ডের দক্ষিণ পাড়ে।

এখান থেকে সামান্য একটু এগিয়ে গেলাম। পড়লো বল্লভাচার্যের বৈঠক। রয়েছে মাঝারী আকারের মন্দির। একদা শ্যামকুণ্ডের পাড়ে এই ক্ষেত্রটিতে উপবেশন করেছিলেন বৈষ্ণব সাধক আচার্য বল্লভ। তাঁরই পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থে এখানে নির্মিত হয়েছে মন্দির।

আচার্যের বৈঠক থেকে কিছুটা এগোতেই মহাপ্রভুর মন্দির। এই মন্দিরে স্থাপিত আছে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ প্রভু আর অদ্বৈত প্রভুর সুদর্শন বিগ্রহ। কথিত আছে, সেই সময় এখানে ছিল একটি তমাল বৃক্ষ। তারই তলায় বসে কুণ্ড দর্শনে ভাবাবেশে মুগ্ধ হয়ে গেছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভু। এই স্থানটির রজঃ তুলে তিনি তিলক করেছিলেন কপালে। এখানে এলে মানুষের অন্তরে বয়ে চলে পুরনো স্মৃতির ঢেউ—বছরের পর বছর—বয়ে চলেছে আজও।

নামপ্রেমের মহাচারণরূপে প্রভু জগদ্বন্ধু ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে ভূমিষ্ঠ হন পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরে। নানা তীর্থ পর্যটনের পর একদা প্রভু এলেন বৃন্দাবনধামে। শ্রীকৃষ্ণের আহ্লাদিনী শক্তি রাধার শরণাগতি নিয়ে ধ্যানে সদা বিহ্বল হয়ে রইলেন

তিনি। কখনও অস্ফুট স্বরে গাইলেন 'এই ভব কুহক রে—রাই তুমি উদ্ধারণ'। আবার কখনও ব্রজের মাটিতে আছড়ে পড়ে করুণাভিক্ষা চাইলেন বৃষভানুনন্দিনীর। এইভাবেই চলতে লাগলো রাধাকুণ্ডের তীর ধরে তাঁর পরিক্রমা, আকুতি আর বুকফাটা কান্না।
এক সময় খুলে গেল অপ্রাকৃত আনন্দ-নির্ঝরের উৎসমুখ। লাভ করলেন পরম প্রার্থিত কৃপাসম্পদ—আরাধ্যা মহাভাবময়ী রাধারাণীর দর্শন। হতচেতন হয়ে পড়লেন রাধাকুণ্ডের তীরে। সম্বিৎ ফিরে পাওয়ার পর কিছুটা প্রকৃতিস্থ হলেন। এবার দিব্য আনন্দ তরঙ্গায়িত হলো প্রভু জগদ্বন্ধুর জীবনের প্রতিটি স্তরে। তখন অদ্বৈত বংশোদ্ভব ভক্ত রঘুনন্দন ছিলেন বৃন্দাবনে। এই সময় তিনি একদিন মহাভাবময় প্রভু জগদ্বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন,
—প্রভু, কে আপনার গুরু? কোথা থেকে পেলেন এমন অপরূপ প্রেম-সাধনার দীক্ষা?
প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে উত্তর দেন প্রভু,
—তোমাদের বৃষভানুনন্দিনীই যে আমাকে মন্ত্র দিয়েছেন—তিনিই তো আমার গুরু।
এই ঘটনার পর রাধা নাম একবার শুনতে পেলে আর রক্ষা ছিল না। প্রভুর সারা দেহে তীব্র প্রেমবিকারের সৃষ্টি হতো। তাই তিনি পরবর্তীকালে রাধা নাম এড়িয়ে চলতেন সন্তর্পণে।
বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডে রাধারাণীর কৃপালাভের পর আবার তিনি ফিরে যান ফরিদপুরের ব্রাহ্মণকান্দার তাঁর নিজের গ্রামে। রাধারাণীর কৃপাবলে পরম মধুর ব্রজরসে প্রভুর জীবনপাত্র পূর্ণ হয়ে ওঠে কানায় কানায়।
বৃন্দাবনের স্বরূপতত্ত্ব ও সাধ্য-সাধন প্রসঙ্গে প্রভু জগদ্বন্ধু তাঁর ভক্তদের বলতেন, "বৃন্দাবনের স্বরূপ তিন প্রকার। যেমন, নিত্য বৃন্দাবন, লীলা বৃন্দাবন আর ধাম বৃন্দাবন। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপী একা কৃষ্ণ নিত্য বৃন্দাবনে সদা অবস্থান করেন। সেখানে কোন সখাসখি নেই। যুগলকিশোরের নিত্য রাসলীলা হয়ে থাকে লীলা বৃন্দাবনে। আর ভক্ত তীর্থযাত্রী ও দর্শনার্থীরা সকলে যেখানে যায় অর্থাৎ কাম্যবন থেকে মান-সরোবর পর্যন্ত চুরাশী ক্রোশ ব্যাপী—সেটাই হলো ধামবৃন্দাবন। প্রেমিক ভক্তদের কাছে লীলা বৃন্দাবনই ভজনীয় বলে জানবে।"
নিত্য অনিত্যের তত্ত্ব ও ব্রজরস সাধনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রভু জগদ্বন্ধু আরও বলেছেন, "ব্রজ, ব্রজরাখাল, ব্রজসখী অর্থাৎ ব্রজে যা কিছু সম্ভব, তা ভিন্ন সমস্ত কিছুই অনিত্য। অনিত্য স্বয়ং দেবতারাও। প্রলয়কালে তাঁদেরও আর সমস্ত কিছুর মতো লয় হতে হবে। অতএব ব্রজ সম্বন্ধীয় নিত্য যে বস্তু তাতেই করতে হবে স্নেহ মায়া মমতা আসক্তি আর আশা ভরসা।"
সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। একটানা দেখা

হয়নি। হাঁটা পথ সম্পূর্ণটাই। যখন ক্লান্ত হয়েছি তখনই পথে কোথাও বসে, কখনও মন্দিরের চাতালে, কখনও বা কোন দোকানে বসে বিশ্রাম নিয়েছি। দর্শনীয় সমস্ত মন্দির, আশ্রম আর ভজন কুটিরগুলি শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডকে ঘিরেই স্থাপিত হয়েছে। এই কুণ্ডদুটির প্রতিটি ঘাট, প্রতিটি বৃক্ষ, ধূলিকণা যেন নীরবে প্রচার করে চলেছে রাধাকৃষ্ণের মাহাত্ম্য কথা। বহু ধর্মশালা রয়েছে এখানে। রাতে তারই একটাতে পরপর তিনটে রাত কাটিয়ে দিলাম আমি আমার সঙ্গীসহ।

সাধুসঙ্গ—ফলাহারী এক সাধুবাবার কথা

এই শ্যাম আর রাধাকুণ্ড ক্ষেত্রটিতে এত বাঙালী যে, মনেই হয় না বাংলার বাইরে এসেছি। এখানে অনেক সাধুদর্শন হয়েছে—কথাও হয়েছে। অধিকাংশই বৈষ্ণব সাধু। সাধুদের হাট বসেছে যেন। একটা চায়ের দোকানে বিশ্রামের অবসরে বসে চা খাচ্ছি। ভাবছি সেইসব সাধুদের কথা—যাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত কথা হয়েছে। কি অদ্ভুত জীবন তাঁদের! খাওয়ার চিন্তা নেই, থাকার চিন্তা নেই, পরনের বস্ত্রটুকু নিয়েও চিন্তা নেই এতটুকুও। এক অনন্ত শক্তির দর্শন অপেক্ষায়, তাঁর সঙ্গে চির-মিলনের অপেক্ষায় চলছে তাঁদের ত্যাগ তিতিক্ষাময় এক কঠোর তপস্যার জীবন। কাউকে জিজ্ঞাসা করেছি—কি পেলেন? উত্তরে মুখে কোন কথা নেই। শুধু চোখের জলে বুক ভাসিয়েছেন আনন্দে। কেউ বলেছেন, 'কি পাইনি —বলতে পারো বাবা? ভগবান আমাকে সব দিয়েছেন। আমার আর কিছুই চাই না।' কিন্তু আমার এই চর্মচক্ষুতে দেখেছি, ভগবান তাঁকে কাঁধে একটা কম্বল, ঝুলি আর ছেঁড়া নেংটি ছাড়া আর কিছুই দেয়নি। অথচ কথায় তাঁর পাওয়ার এত পূর্ণতা যে, আর কিছুই চাই না তাঁর। এর পরে কিছু পেলে হয়তো তাঁর বোঝা বাড়বে—তাই হয়তো তাঁর এই না চাওয়া। জীবনে আর চাইনা কিছু—এমন মানুষ সংসারে আমার দেখায় পাইনি কোথাও আজও। কাউকে দেখেছি, তাঁকে পাওয়ার কি ব্যাকুল আর্তি। কেউ বা বলেছেন, 'বেটা, একদিন না একদিন মিলবেই মিলবে।'

এক একজন সাধু-মহাত্মার গৃহত্যাগের কাহিনীও বড় অদ্ভুত। কেউ স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য কথা কাটাকাটি করে বেরিয়ে পড়েছেন ঘর ছেড়ে, কেউ সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে, কেউ বা বেরিয়ে পড়েছেন আত্মানুসন্ধানে। এমনতরো অসংখ্য নানা বৈচিত্র্যময় ঘটনার মধ্যে দিয়েই তাঁদের জীবন প্রবাহের স্বাভাবিক গতির মোড় ঘুরে বয়ে গেছে অন্য পথে—অন্য খাতে।

চায়ের দোকানে বসে চা খেতে খেতে একেবারেই অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলাম। হাতে চায়ের গ্লাসটা রয়ে গেছে অথচ দু-এক চুমুকের বেশী পেটে যায়নি। সদ্য সদ্য

সাধুসঙ্গ করে এসেছি। তাঁদের নেশা ধরানো কথায় একেবারে মশগুল হয়েছিলাম। নইলে চট্ করে আমি অন্যমনস্ক হইনা কখনও। হিন্দীভাষী দোকানদারের কথায় আমার তন্ময়তা কাটলো,

—বাবু, আপনার হাতের চা যে একেবারে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

একটু লজ্জিতভাবে বললাম,

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি একটু ঠাণ্ডা চা-ই খাই।

চায়ের দোকানে বসে আছেন আরও কয়েকজন খরিদ্দার। এঁদের চেহারা দেখে মনে হলো, প্রত্যেকেই স্থানীয়। দোকানদার চায়ের গ্লাসে চামচ দিয়ে ঠক্‌ঠক্ করতে করতে বললেন,

—বাবু, আজ দু-দিন ধরে আপনাকে লক্ষ্য করছি, যে মহাত্মাকে পাচ্ছেন, তাঁরই পিছনে পাগলের মতো ঘুরছেন। কখনও হাঁটতে হাঁটতে চলেছেন কথা বলতে বলতে—কখনও দেখেছি কুণ্ডের পাড়ে বসে কথা বলতে। সাধুমহাত্মাদের সঙ্গ করতে আপনার ভালো লাগে বুঝি ?

ঘাড়টা নেড়ে বললাম,

—হ্যাঁ ভাই, ওই একটাই নেশা আছে আমার।

চায়ের গ্লাস খরিদ্দারের হাতে এগিয়ে দিতে দিতে দোকানদার বললেন,

—বাবু, এই রাধাকুণ্ড আর শ্যামকুণ্ড বৃন্দাবনের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র ও জাগ্রত তীর্থ। ভাগ্যবান সাধু গৃহীরা আজও রাধারাণীর দর্শন পায়—শুনতে পায় নূপুরের ধ্বনি। সেইজন্যেই তো অসংখ্য সাধুমহাত্মাদের আগমন ঘটে এই রাধাকুণ্ডে। বারো মাস সাধুদের এখানে আসায় কোন বিরাম নেই। তবে বাবু, সব সাধু 'সাচ্চা' নয়। আমি দেখেছি, অনেক সাধু—সাধু হয়েছেন পেটের দায়ে। তাদের আচার আচরণ দেখেই আমার এই অভিজ্ঞতা। বেশীরভাগই ভিখ্‌মাঙা সাধু। প্রকৃত সাধুমহাত্মারা বাবু কারও কাছে ভিখ্ মাঙে না। সকলে গিয়ে তাঁর কাছে দিয়ে আসে। কারও কাছে তাঁর চাইতে হয় না। এই পর্যন্ত বলে একজন খরিদ্দারের হাত থেকে চায়ের দাম নিতে নিতে বললেন,

—বাবু, আপনি তো সাধু ভালোবাসেন, শ্যামকুণ্ডের পাড়ে রঘুনাথদাস গোস্বামীর ভজন কুটিরের পাশে এক মহাত্মা বসে আছেন। ওখান থেকে তিনি কোথাও যান না। আজ দিন তিনেক হলো ওই মহাত্মা এসেছেন রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড দর্শনে। উনি ফলাহারী বাবা। শুধুমাত্র ফল খেয়েই থাকেন। এখান থেকে কবে চলে যাবেন, কোথা থেকে এসেছেন—কিছুই জানি না। আপনি ইচ্ছা করলে একবার ওই মহাত্মার দর্শন করতে পারেন।

কথাটা শোনামাত্রই আনন্দে মনটা আমার ভরে গেল। আবার নিজেরই অবাক লাগলো, এখানে কয়েকদিন ধরে আছি অথচ এই মহাত্মার দর্শন পাইনি! কোনভাবেই তাঁর সংবাদটা কানে আসেনি। মনে মনে দোকানদারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালাম।

দেরী না করেই উঠে দাঁড়ালাম। চায়ের দামটা দিয়েই হন্‌হন্‌ করে হেঁটে চললাম কুণ্ডের পাড় ধরে। কয়েক মিনিটের মধ্যে এসে গেলাম ভজন কুটিরের সামনে। দেখলাম, কুটিরের বাইরে বসে আছেন এক বৃদ্ধ সাধু। সামান্য ফরসা গায়ের রঙ। টানা টানা চোখ। পথ চলতি সাধুদের গায়ের রঙ ফরসা—এমনটা খুব কম দেখেছি। মাথায় মাঝারী লম্বা জটা। সামান্য ভুঁড়ি আছে। চেহারাটা এইভাবে বললে ভালো হয়—নিরোগ যুবতী মেয়ের হাতের বাহু যেমন পরিপুষ্ট গোলগাল হয় অথচ মোটা নয়, এমন বাহুযুগল সাধুবাবার। পরনে সাদা কাপড়—যাতে ময়লার ছোপ পড়েছে আবছা। কাপড়টি পরা রয়েছে বাউলরা যেমন ভাবে পরেন—সেই ভাবে। একটা কাপড় ভাঁজ করে পরা—কাছা দেয়া নয়। ঝোলা-টোলা কিছু নেই। প্রসন্ন উজ্জ্বল কমনীয় মূর্তি। সাধুবাবার সামনে বসে রয়েছেন তিনজন। বয়স্ক বাঙালী একজন, হিন্দীভাষী বয়স্ক দু-জন। এটা মনে হলো প্রথম দর্শনে চেহারা দেখে। একই সঙ্গে সাধুবাবার মূর্তিটি যে হিন্দীভাষীর—তা বলাই বাহুল্য।
আমি সাধুবাবার কাছে সরাসরি গিয়ে আর দাঁড়ালাম না। বসে পড়লাম তাঁর বাঁ-পাশে। আমার উপস্থিতিতে আর সকলে বিরক্ত হলেন কিনা বুঝলাম না। তবে সকলেই বসলেন একটু নড়ে চড়ে। আমি বসা অবস্থায় প্রণাম করলাম। সাধুবাবা হাতজোড় করে নমস্কার জানালেন। আগের থেকে কি কথা চলছিল—জানি না। আমি যাওয়ার পর হিন্দীভাষী দু-জনের মধ্যে থেকে একজন হাত জোড় করে অনুরোধের সুরেই সাধুবাবাকে বললেন,
—মহারাজ, আপনি কৃপা করলেই আমার বউ-এর রোগটা ভালো হয়ে যাবে। দয়া করে একটা কিছু দিন মহারাজ, নইলে আমি কিছুতেই ছাড়বো না।
এইভাবে হিন্দীভাষী ভদ্রলোক অনুরোধ করছেন আর সাধুবাবার একই কথা, 'বেটা, আমার দেয়ার মতো কিছু নেই। রোগ হয়েছে চিকিৎসা কর। আমি কি ডাক্তার যে ওষুধ দেবো।' এইভাবে সমানে কাটলো প্রায় মিনিট দশেক। এমন অস্বস্তিতে পড়ে বাঙালী ভদ্রলোক উঠে চলে গেলেন। তিনি কি জন্যে এসেছিলেন—জানি না। নাছোড়বান্দা হওয়া সত্ত্বেও সাধুবাবার কাছ থেকে যখন কিছু পেলেন না, তখন হতাশ হয়ে উঠে গেলেন হিন্দীভাষী দুজনে। এটাই মনে মনে আমি চাইছিলাম। সকলে চলে যেতেই সাধুবাবা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। আর আমার খুশীর তো অন্ত রইলো না। পরে জানতে পেরেছিলাম, ভদ্রলোকের স্ত্রী পঙ্গু হয়ে গেছেন বাতে। অনেক চিকিৎসা আর অঢেল টাকা খরচ করেও ভালো হয়নি। ডাক্তাররা বলে দিয়েছেন, ও রোগ আর আরোগ্য হবে না। তাই কোন মহাত্মার কৃপায় যদি ভালো হয়—এই আশায় তিনি সাধুবাবাকে প্রায় এক ঘণ্টার উপর অনুরোধ করেছেন। তারপর যখন দেখলেন কিছু পাওয়ার আশা নেই, তখন তিনি উঠে গেলেন দুঃখিত মনে। আমাকে বসে থাকতে দেখে সাধুবাবাই জিজ্ঞাসা করলেন,
—বেটা, আমি কি ডাক্তার যে ওষুধ দেবো! আসলে ওরা কষ্ট পায় বলেই সাধু-

সন্ন্যাসীদের কাছে আসে—নানা সমস্যা নিয়ে। ভাবে অনেক ক্ষমতা আছে আমাদের। ভগবানের নাম ছাড়া আর সম্বল তো আমার কিছুই নেই। সুতরাং আমার মতো যাঁরা—তাঁদের কাছে গেলে তো হতাশ হতেই হবে।

এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা থামলেন। এতক্ষণ পর আমার সুযোগ এলো কথা বলার। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, এখন আপনার বয়েস কত হবে?

বাবু হয়ে বসেছিলেন সাধুবাবা। দু-চারজন স্থানীয় এবং কিছু তীর্থযাত্রীদের আনাগোনা ছাড়া তেমন কোন ভীড় নেই এই শ্যামকুণ্ডের পাড়ে রঘুনাথদাসজীর ভজন কুটিরের সামনে। সাধুবাবার বয়েস জানার আগ্রহ দেখে বললেন,

—কেন বেটা, হঠাৎ আমার বয়েস জানতে চাইছিস্?

উত্তরে বেশ সরলভাবেই বললাম,

—তেমন কোন উদ্দেশ্য নেই। শুধু জানার ইচ্ছাতেই জিজ্ঞাসা করা।

সাধুসন্ন্যাসীরা কেউই তাঁদের নিজের বয়েস নিয়ে মাথা ঘামান না—এ আমি জানি। তাই বয়েস জিজ্ঞাসা করলে প্রথমেই তাঁদের ভুরু আর কপাল কুঁচকে যায়। স্মৃতির ভাড়ারে টান ধরে। এই সাধুবাবাও ব্যতিক্রম নয়। আগেকার মা বাবাদের অধিকাংশেরই সাল তারিখ রাখার বালাই ছিল না। জিজ্ঞাসা করলে উত্তর মেলে, 'কেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তুই আমার পেটে তিন মাস।' এছাড়াও মায়েদের বয়েস বলার আরও অসংখ্য উদাহরণের মধ্যে একটা—'শ্যামবাবুর মেয়ে সবিতা আর তুই সাতদিনের ছোট বড়।' সবিতার বয়েস কত? 'তা তো জানি না।' আন্দাজ? মা জানালেন, 'কত আর হবে, চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ কিংবা দু-এক বছর এদিক ওদিক হতে পারে। তার বেশী হবে বলে মনে হয় না।' এমন মায়ের সাধুসন্ন্যাসী ছেলের কাছে বয়েস জিজ্ঞাসা করলে তো ভুরু একটু কোঁচকানোরই কথা। তিনি বললেন,

—আমার বয়েস আন্দাজ আশি থেকে পঁচাশীর মধ্যে।

কথাটা শুনে বেশ অবাক হয়ে গেলাম। এমন সুন্দর চেহারায় অত বয়েসের কোন ছাপই নেই। দেখলে মনে হবে পঞ্চান্ন থেকে ষাটের মধ্যে বয়েস। এবার সোজাসুজি জানতে চাইলাম,

—বাবা, আপনি নাকি ফলাহারী—শুধুমাত্র ফল খেয়েই থাকেন?

ঘাড়টা নাড়িয়ে সাধুবাবা বললেন,

—হাঁ বেটা, আমি ফলাহারী। ফল আর জল ছাড়া এ-দেহের জন্য আর কিছুই গ্রহণ করি না।

শুধুমাত্র ফল আহার করে বেঁচে আছেন এমন সাধুবাবা জীবনে এই প্রথম পেলাম। এর আগে আর কখনও ফলাহারীর দর্শন পাইনি কোথাও। দোকানদারের মুখে শোনার পর থেকে মনে অনেক প্রশ্ন এসেছে। তাই জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, কত বছর ধরে ফল খেয়ে আছেন—কটা করে খান, পেট ভরে খান তো ?
কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লাগোয়া প্রশ্ন শুনে আমার মুখের দিকে সাধুবাবা তাকালেন। ভাবটা এমন, 'কি হবে জেনে ? এ-সব জেনে কিস্সু লাভ হবে না।' তবুও বললেন,
—বেটা, আমার গৃহত্যাগ হয়েছিল বছর আঠারো বয়েসে। তার এক বছর পর দীক্ষা হলো এক পাহাড়ীয়া গুরুর কাছে। দীক্ষার পর প্রায় বছর দশেক 'চাউল রোটি' খেয়েছি। তারপর গুরুজী একদিন বললেন, 'নিরামিষ সাত্ত্বিক আহারে দেহ মনে রিপুর বেগ সংযত হয়। রিপুর প্রভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। নিরামিষ ভোজনের চেয়ে আরও ভালো হয় যদি শুধুমাত্র ফল আহার করা যায়। তাতে আরও দ্রুত রিপুর তাড়না কমে দেহ মন একেবারে শুদ্ধ ও মুক্ত হয়।' গুরুজীর এই কথার পর নিরামিষ আহার ছেড়ে দিয়ে ফল খেতে শুরু করলাম। অচিরেই ফল খাওয়ার ফলটা বুঝতে পারলাম। প্রথম প্রথম খুবই অসুবিধে হতো, যদিও পেট ভরেই খেতাম। তারপর ধীরে ধীরে আহারেও সংযম আনলাম। এখন তো সারা দিনরাতে মাত্র দুটো ফল হলেই আমার হয়ে যায়। গড়ে ধর্ আজ প্রায় ৫০/৫৫ বছর ধরে শুধু ফলের উপরেই রয়েছে এই দেহটা।
একেবারে হতবাক হয়ে গেলাম সাধুবাবার কথা শুনে। কিছু ভাবার অবকাশ না দিয়েই সাধুবাবা বললেন,
—বেটা, সাধুসন্ন্যাসীদের জীবনে এটা একটা ব্রতপালন বা এক ধরনের তপস্যাও বলতে পারিস্। এ-ছাড়া কোন কোন সাধুসন্ন্যাসী দেহকে রক্ষা করেন শুধুমাত্র দুধপান করে। আর কোন কিছুই দেহের জন্য গ্রহণ করেন না। তাঁরা দুধাধারী নামে সাধুসমাজে পরিচিত। আর এক ধরনের সাধু আছেন, যাঁরা নিরামিষ আহার গ্রহণ করেন কিন্তু কোন খাদ্যেই লবণ না দিয়ে আলুনী রান্না খাবার খান। এঁরা অলুনা সাধু নামে প্রসিদ্ধ। তবে এমন সাধুর সংখ্যা খুবই কম।
সাধুবাবার কথা শুনছি অবাক হয়ে। এখন এখানে আর কেউ নেই। একভাবেই বসে আছেন সাধুবাবা। তীর্থযাত্রীদের অনেকেই আসছেন। স্নান করছেন শ্যামকুণ্ডে। স্থির হয়ে আমিও বসে আছি সাধুবাবার মতো। এবার বললেন,
—বেটা, এ আর কি রে, আমাদের পেটে তো তবু কিছু পড়ছে। এমন তপস্বীও আছেন, যাঁরা মাসের পর মাস একটা তুলসী অথবা বেলপাতা মুখে দিয়ে একটু গঙ্গাজল পান করে বেঁচে রয়েছেন বছরের পর বছর। এই তপস্বীরা খাদ্য গ্রহণ করেন তবে কেউ তিন মাস, কেউ বা ছয় মাসে একবার। ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে আনতে তপস্যার কি শেষ আছে বেটা।
কত ভাগ্য আমার, আজ এক নতুন ধরনের সাধুবাবার সঙ্গলাভ করছি। আনন্দে আর আবেগে সাধুবাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করে

নমস্কার জানালেন তিনি। জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, আপনি থাকেন কোথায় ?

সাধুবাবা জানালেন,

—আমার বেশীরভাগ সময়টা কাটে পাহাড়েই। ওখানকার পরিবেশ এখন কিছুটা কলুষিত হয়েছে ঠিকই তবে সমতলের মতো এতটা নয়। পাহাড়ে শীত কমলে ত্রিযুগীনারায়ণেই (হিমালয়ে) থাকি। আহারের চিন্তা নেই। দু-বেলা দুটো ফল জুটেই যায়।

এই পর্যন্ত বলে এবার সাধুবাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি করি, কোথায় থাকি, বৃন্দাবনে কি জন্যে এসেছি, কে কে আছে আমার, কি উদ্দেশ্য নিয়ে ভ্রমণ করি ইত্যাদি। সাধুবাবার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিলাম এক এক করে। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, আপনি ঘর সংসার ছেড়ে কেন এলেন এই সাধুজীবনে ?

প্রসন্ন মনেই উত্তর দিলেন সাধুবাবা,

—বেটা, ভগবানের ইচ্ছায় মানুষের জীবন প্রবাহের গতি বয়ে যায় এক এক ভাবে। সংসারে কেউ আসে স্ত্রী সন্তানাদি নিয়ে সংসার করতে, কেউ আসে সারাজীবন অর্থোপার্জ্জন আর সঞ্চয় করতে কিন্তু ভোগ করতে নয়, কেউ আসে সারাটা জীবন দুঃখময় আনন্দহীন জীবন যাপন করতে, কেউ আসে সুখের সাগরে ভেসে বেড়াতে। ভগবান কার জীবনের গতি কোন্ দিকে বয়ে নিয়ে যাবেন বলে ঠিক করে রেখেছেন—তা কি কারও জানা আছে ? আমার জীবনকে তিনি এইভাবে—এই পথে নিয়ে যাবেন বলে ঠিক করে রেখেছেন—এর কি অন্যথা হওয়ার উপায় আছে ? তবে এ-পথে তো মানুষ হুট্ করে আসে না—কোন একটা বিষয় বা ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে তিনি তাঁর নিজের ইচ্ছাই পূর্ণ করেন। সংসারে মা বাবা ভাই বোন—সকলেই ছিলেন। অভাব ছিল না কোন কিছুরই। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠলাম। আনমনে বেরিয়ে পড়লাম ঘর ছেড়ে। কেন বেরোলাম, কি জন্যে বেরোলাম, কি উদ্দেশ্য—কিছুই আমার জানা ছিল না। সাধু হবো—এমনটা আমার ভাবনাতেও ছিল না কখনও। পথে বেরিয়ে পথের নেশায় পথ চলতে চলতে একদিন গুরু মিলে গেল। সাধন পথের সন্ধান পেলাম। তীর্থের পর তীর্থ পরিক্রমা চলতে থাকলো। মানস সরোবর কৈলাস থেকে শুরু করে ভারতের সমস্ত তীর্থ পরিক্রমা করেছি সাধন জীবনের প্রথম পর্বে। তীব্বতের লাসাতেও ছিলাম মাস ছয়েক। সে আজ বহু-কাল আগের কথা। গুরুজীই নিয়ে গেছিলেন আমাকে। গুরুজীর সঙ্গে এক লামার পরিচয় ও হৃদ্যতা ছিল। সেই সূত্রেই ওখানে যাওয়া এবং থাকা। গুরুজীর মুখে শুনেছি, ওই লামার সঙ্গে গুরুজীর পরিচয় হয় বুদ্ধগয়ায়। তিনি কয়েক বছর ছিলেন গয়াতে। এসেছিলেন বুদ্ধের তপস্যাক্ষেত্র দর্শন করতে। এইভাবেই বেটা দেখতে দেখতে 'ম্যায় সাধু বন্ গয়া'।

মানস সরোবর কৈলাসে যাওয়া অনেক সাধুর সঙ্গ করেছি কিন্তু কোন সাধুবাবা লাসায় গেছেন, সেখানে ছিলেন কিছুদিন—এমন কথা কেউই বলেননি কখনও। বিস্মিত হয়ে শুনছিলাম সাধুবাবার গৃহত্যাগের পর বৈচিত্র্যময় ভ্রমণ জীবনের কথা। লাসায় থাকাকালীন কি করতেন, কেমন করে সময় কাটাতেন, কি খেতেন এবং সেখানকার মানুষের জীবন যাপন সম্পর্কে অনেক কথা জেনে নিলাম কথা প্রসঙ্গে। তবে তীব্বতের লাসা সম্পর্কে যে সব ভয়াবহ কাহিনী বইতে পড়েছি—সাধুবাবার মুখে অতটা ভয়ের কোন লক্ষণ আমি ফুটে উঠতে দেখিনি। ফলাহারী সাধুবাবার সঙ্গে কথা হচ্ছিল আজ থেকে প্রায় একুশ বছর আগে। তখন তিনি বলেছিলেন—তখন থেকে প্রায় ষাট বছর আগে লাসায় যাওয়া তাঁর জীবন-কথা। এখন থেকে মোটামুটি আশি বছর আগের কথা। সাধুবাবা কথা প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন,

—বেটা, সাধারণ মানুষের পক্ষে লাসায় যাওয়া এবং থাকাটা সত্যিই অসুবিধা-জনক। বলতে পারিস, এক রকম অসম্ভবই। তবে লাসার লামাসমাজ ভারতীয় সাধুসন্ন্যাসী যোগীদের একটু সম্মানের চোখেই দেখেন। গুরুজীর পূর্ব পরিচিত লামার আমন্ত্রণেই গিয়েছিলাম বলে কোন অসুবিধে হয়নি। তিনিই এদেশ থেকে যাওয়ার সময় সঙ্গে করে নিয়ে গেছিলেন। ওই লামা সামান্য হিন্দি শিখেছিলেন বলে কথা বলার ব্যাপারে তেমন কোন অসুবিধে হয়নি পথে—ওখানেও।

যাইহোক, লাসা-প্রসঙ্গ ছেড়ে সাধুবাবার কাছে জানতে চাইলাম,

—বাবা, আপনার বাড়ী কোথায় ছিল ?

উত্তরে সাধুবাবা জানালেন,

—আমার জন্মস্থান আর বাড়ী ছিল নাগপুরেরই একটা গ্রামে। এখন ওখানে কি আছে, কে আছে না আছে—কিছুই জানি না। কারণ গৃহত্যাগের পর আর বাড়ীতে যাইনি কখনও।

শ্যামকুণ্ডের ধারে রঘুনাথদাসজীর ভজন কুটিরের সামনে বসে কথা হচ্ছে। এখন আর কেউ এসে বিরক্ত করছে না সাধুবাবাকে। আমি আর সাধুবাবা—মুখোমুখি কথা হচ্ছে দু-জনের। প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, আগেকার দিনের অধিকাংশ সাধুমহাত্মারা সাধারণ মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য ছিল। বলতে গেলে তাঁদের ভগবানের মতো দেখতো—সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো। কিন্তু বর্তমানে খুব কম সংখ্যক ছাড়া অধিকাংশের উপরেই সাধারণ মানুষের আগের মতো শ্রদ্ধা বিশ্বাসটা নেই। ভগবানের মতো ভাবা তো দূরের কথা, সংঘবদ্ধ কিছু প্রতিষ্ঠানের সাধুরা ছাড়া আর সব সাধুরাই বলতে গেলে অবহেলিত। সাধুদের এই বিশ্বাস যোগ্যতা বা শ্রদ্ধা হারানোর মূলে সাধুরা দায়ী, না সাধারণ মানুষ—কারা দায়ী বলে মনে হয় আপনার ?

প্রশ্নটা শুনে সাধুবাবা একটু হাসলেন। প্রসন্ন হাসি। তারপর বললেন,

—বেটা সম্মান শ্রদ্ধা বিশ্বাস—এগুলি মানুষের কাছ থেকে জোর করে আদায় করে নেয়ার মতো কোন বস্তু নয়। এগুলি ব্যক্তি মনের শুদ্ধ প্রতিফলন। সেখানে কোন ভাবে কেউ আঘাত পেয়ে থাকলে সে নিশ্চয়ই আহত হয়ে ওগুলি হারিয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সেই সব সাধুরাই দায়ী, যাঁরা আহত করেছে মানুষের মন আর বিশ্বাসকে। তার জন্য গোটা সাধুসমাজটাই দোষী নয়। (সততা, নিঃস্বার্থ দান, অলসতা মুক্ত, সমস্ত বিষয়ে আসক্তিহীন, অটুট ধৈর্য আর নির্বিচারে ক্ষমা—এই ছয়টি গুণ আয়ত্ব করতে না পারলে কোন মানুষের পক্ষেই ভগবানের সান্নিধ্যে যাওয়া সম্ভব নয়) এর কোন একটি যদি কেউ ঠিক ঠিক মতো আয়ত্ব করতে পারে তাহলে তার মধ্যে বাদবাকি গুণের আবির্ভাব হয় আপসে। এই গুণগুলি সাধুদের মধ্যে থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। যার মধ্যে নেই—ভগবান তার থেকে অনেক দূরে। এইসব গুণগুলি সাধুদের সম্মান শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস বাড়ায় সাধারণ মানুষের কাছে। এই গুণের কপট অধিকারী সাধুরা সাময়িক সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন হলেও জীবনের কোন না কোন সময় তা হারিয়ে ফেলে—প্রকটিত হয় কপটতা। তবে একশ্রেণীর মানুষ আছে, যারা কখনও সাধুসন্ন্যাসীদের সত্যমিথ্যা কিংবদন্তীর উপর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-ভক্তি করে আবার তা হারায়—এমন মানুষের সংখ্যাই বেশী। সুতরাং এদের কথা—ওসব ঠুনকো শ্রদ্ধা বিশ্বাসের কথা ছেড়ে দে। যে গুণে মানুষ তাঁকে লাভ করতে পারে—সেই গুণের প্রকাশ যদি কোন সাধুসন্ন্যাসীর মধ্যে ঘটে—সে কি কখনও অবহেলিত হতে পারে? তবে এখানে একটা কথা আছে। অনেক সময় অত্যন্ত বিষয়ী বা সাধারণ সংসারীরা সাধুসন্ন্যাসীদের কাছে আসে বিভিন্ন সমস্যা আর কামনা বাসনা নিয়ে এবং তারা বাক্য আদায় করে নেয় নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য। অনেকক্ষেত্রে সাধুসন্ন্যাসীরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বাক্য দেয়। পরে হয়তো সে বাক্য কার্যকরী বা ফলপ্রসূ হলো না, তখন সাধারণ মানুষের পরোক্ষে একটা অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস বাসা বেঁধে ফেলে অন্তরে। সব সাধু তো আর বাকসিদ্ধ নয়। অনেকক্ষেত্রে সাধুসন্ন্যাসীরা মানসিক বলবৃদ্ধি বা সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন গৃহীদের বাক্যের মাধ্যমে। সেই আশাব্যঞ্জক কথা বাস্তবে রূপায়িত না হলেই তখন একটা অবিশ্বাসের ভাব সৃষ্টি হয় বক্তা সাধুসন্ন্যাসীর উপর। এর জন্য সাধুরাই দায়ী—যেহেতু তাঁরা আশা দিচ্ছেন। অবশ্য দুঃখী মানুষেরা এসে কাতর হয়ে পড়লে সাধুদের তাৎক্ষণিক এটুকু না করে কোন উপায়ও থাকে না।

একটানা এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা থামলেন। এদিক ওদিক একবার দেখে নিলেন। কয়েকজন যাত্রীও এর মধ্যে ভজন কুটিরে এসে প্রণাম করে গেছেন। সাধুবাবা লক্ষ্য না করলেও কথা শোনার ফাঁকে এ-সবই লক্ষ্য করেছি আমি। মিনিটখানেক চুপ করে থাকার পর সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, মানুষের আশা যে কি ভীষণ, এর আকৃতি যে কত বড়, ভয়ংকর—তা তুই এতটুকুও কল্পনা করতে পারবি না। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় পর্বত হিমালয়—তার

চেয়ে অনেক বড় সমুদ্র। সমুদ্রের চেয়ে অনেক অ-নে-ক বিশাল হলো উন্মুক্ত আকাশ। আকাশের চেয়ে বিশালত্বে অনেক বেশী পরম ব্রহ্ম। ব্রহ্মের চেয়ে জগতে বড় কিছু আর নেই। কিন্তু বেটা, এই ব্রহ্মও যেন হার মেনেছে আশার কাছে। মনুষ্য জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা, কামনা বাসনা—পরম ব্রহ্মের চেয়েও অসীম, অনন্ত—নাগালের বাইরে।

সাধুবাবা প্রথম থেকেই প্রসন্ন। ভাবতেই পারিনি এমন সহজভাবে কথা হবে। তাই যে জিজ্ঞাসাটা মাথায় আসছে সেটাই করছি। এবার জানতে চাইলাম,

—বাবা, শাস্ত্রে বলা আছে, আপনাদের মতো যাঁরা—তাঁরাও বলেন, সার্বিক বিষয়ে সংযমতার কথা। এ-তো খুব কঠিন কথা। সংসারে আছি। সংযম করতে বললেন, চট্ করে সংযম করলাম—তা তো হয় না, কারও পক্ষে সম্ভবও নয়। এমন কিছু বলুন, সংসারে থেকে সেটা করলে যেন সংযমতার পথ সুগম হয়।

কথাটা শুনে সাধুবাবা তাকালেন আমার মুখের দিকে। একটা হালকা হাসির রেখা ফুটে উঠলো চোখে মুখে। তারপর বললেন,

—বাহ্ বেটা বাহ্, বেশ প্রশ্ন করেছিস্ তো। তাহলে বলি শোন, সংসারে বিষয়ী মানুষের সংখ্যাটাই বেশী। বিষয়ী বলতে, যারা আমার আমার করছে,—কিছুই হলো না, কিছুই পেলাম না, কি হবে কি হবে, অভাব নেই অথচ আরও পাওয়ার বাসনা, আরও হোক—এমন ভাবনা যার মনকে প্রায়ই পীড়িত করে রেখেছে—সবকিছু থাকা সত্ত্বেও অসন্তুষ্ট চিত্ত যাদের—তাদেরই বেটা বিষয়ী বলে। এদের সংখ্যাটা এত বেশী যে, এদের এড়িয়ে চলাটা খুবই কঠিন। বিষয়ী নারীপুরুষ সংক্রামক ব্যাধির মতো। সঙ্গ করলেই বিষয় বাসনায় আক্রান্ত হতে হবে। এদের সঙ্গ ত্যাগ করলেও সংযমতার পথ অনেক সুগম হয়। বেটা, মধুহীন ফুলকে যেমন মৌমাছি, ফলহীন গাছকে যেমন পাখীরা পরিত্যাগ করে—তেমনই ঈশ্বরে ভজনহীন এবং বিষয়ীদের সংস্পর্শ ত্যাগ করা উচিত—যারা সত্যিই সংযমী হতে চায়। সংসারী হয়ে এ-রকম সংসারীদের সঙ্গ সব সময়েই পরিত্যাগ করা উচিত। সাধুদেরও কলুষিত করে এইসব বিষয়ীদের সঙ্গ—যদি না খুব ভজনশীল সাধু সে হয়।

একটু থামলেন। একটু চিন্তা করে সাধুবাবা আবার বললেন,

—বিষয়ী নারীপুরুষ আর বকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সরোবর বা জলাশয়ে দেখবি, সুন্দর প্রস্ফুটিত পদ্মের সৌন্দর্য ফেলে রেখে বক যেমন ঘাড় ঘুরিয়ে, ঠোঁট বেঁকিয়ে মাছ বা খাদ্যের খোঁজ করে—তেমনি বিষয়ী মানুষ কামনার বশবর্তী হয়ে পরমানন্দময় অনন্ত জীবনের অন্বেষণ না করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে কদর্য ভোগ, অর্থ—তারই চিন্তা করে। সেইজন্যেই এদের সঙ্গ পরিত্যাগ করাই ভালো।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করলাম,

—বাবা, বিষয়ীদের যদি সাধুরাও পরিত্যাগ করেন তাহলে তারা কার সঙ্গ করে বিষয়ের আসক্তি মুক্ত হবে? বিষয়ীদের পরিত্যাগ করা কি সাধুদের ধর্ম?

কথাটুকু শেষ হতে না হতেই সাধুবাবা বললেন,
—বেটা, যারা বিষয়াসক্ত তারা চট্ করে সাধুসঙ্গ তো করেই না—মানসিক দিক থেকে সাধুসন্ন্যাসীদের পাত্তাও দেয় না। বরং অবজ্ঞাই করে। তবুও যারা সাময়িকভাবে সাধুদের কাছে আসে—তারা সাধুসঙ্গ করতে আসে না। বিষয়ী নারীপুরুষ যারা আসে, তারা আসে কোন সমস্যায় পড়ে তার সমাধানের উদ্দেশ্যে। এক কথায় বিষয়ীদের সাধুসঙ্গটা বলতে পারিস্ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে—মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির ভাবনাটা তাদের থাকেই না। সুতরাং এমনিতে তাঁরা নিজেরাই পরিত্যক্ত হয়ে রয়েছে—সাধুরা আর নতুন করে পরিত্যাগ করবে কেমন করে! তবে বিষয়ীদের মধ্যে এমন কিছু নারীপুরুষ আছে, যাদের কয়েকদিনের সাধুসঙ্গ লোক দেখানো এবং এক ধরনের বিলাসিতা বললে বেশী বলা হবে না। অনেক সময় সাধুদের কাছে আসে তারা সময় কাটাতে—হাতে সময় থাকলে। হাজার কাজের মধ্যেও যারা সময় করে নিয়ম মতো সাধুসঙ্গ করে—সেটাকেই তো প্রকৃত সাধুসঙ্গ বলে।
একটু থামলেন। সামান্য একটু ভাবলেন, তারপর বললেন,
—বেটা, চাষের অনুপযুক্ত জমিতে চেষ্টা করলেও ভালো ফসল হয় না কারণ ওই জমির এমনই গুণ—যা হতে দেয় না। বিষয়ীদের ক্ষেত্রে ওই একই কথা। তাদের যতই জ্ঞানের কথা বলো না কেন—নিজের বিষয়-স্বার্থসিদ্ধির কথাটুকু ছাড়া আর কিছুই সে গ্রহণ করে না কারণ তার প্রবৃত্তিই তা গ্রহণ করতে দেয় না—বুঝলি ?
এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ সাধুবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,
—বেটা, তোর কি 'দিক্সা' হয়েছে ?'
ঘাড় নেড়ে জানালাম—হয়েছে। হুট্ করে প্রসঙ্গ পাল্টে দীক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করায় সাধুবাবাকে বললাম,।
—বাবা, হঠাৎ দীক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করলেন কেন ?
সাধুবাবা মাথাটা নাড়তে লাগলেন। কোন কথা বললেন না। মিনিট খানেক কাটাতেই আবার জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, দীক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করলেন কেন ?
এবার উত্তরে সাধুবাবা বললেন,
—বেটা, মানুষের সাধন ভজন জপ তপস্যা—সবই নির্ভর করে দীক্ষার উপর। পাথরে বীজ বপন করলে তা যেমন ফলপ্রসূ হয় না—তেমনই অদীক্ষিতদের জপ-পূজাদি নিষ্ফল হয়। দীক্ষা যেমন সিদ্ধিলাভে সহায়তা করে—তেমনই সদগতিও করায়। মৃত্যুর পর পিশাচত্ব দূর হয় না অদীক্ষিতদের। সেইজন্যেই জিজ্ঞাসা করলাম তোকে।
সাধুবাবার এই কথায় একের পর এক প্রশ্ন এলো মনে। কোন ব্যাপারে কোনদিনই আমার তর সয় না। কাউকে কিছু বলতে হলে এখনই বল, কাউকে কিছু দিতে হলে এখনই দাও, কাউকে মারতে হলে বিকেলে নয়—এখনই মার। অর্থাৎ যা কিছু

তা পরে নয়, এখনই হোক। কোন ব্যাপারে ঝুলে থাকতে রাজী নই। সাধুসঙ্গের ক্ষেত্রেতো নয়ই। কথা শেষ হওয়ামাত্রই আমার প্রশ্নের শুরু। জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, আপনি বললেন, যাদের দীক্ষা হয়নি তারা জপতপ পূজোদি করলে তাতে কোন ফল হবে না বা হয় না। অর্থাৎ ভগবানের নাম করাটা ভস্মে ঘি ঢালার সমান। আরও বললেন, দীক্ষা না নেয়া লোকেদের মৃত্যুর পর পিশাচত্ব দূর হয় না। আমার দুটো প্রশ্ন—অদীক্ষিত লোকেদের জপতপ পূজোদি কেন ভস্মে ঘি ঢালার সমান হবে? কেন তাদের মৃত্যুর পর পিশাচত্ব দূর হবে না? অদীক্ষিত সৎলোক যারা—তাদের মৃত্যুর পর কি হবে—পিশাচত্ব দূর হবেনা কেন—অপরাধটা কোথায়? দীক্ষিত হলেই তার পিশাচত্ব দূর হবে বললেন। দীক্ষিত অসংখ্য মানুষকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিনি এবং জানি—যারা বিশেষ বিশেষ নামী সম্প্রদায় থেকে দীক্ষিত এবং গুরুও বরেণ্য ও সর্বজন পরিচিত। সেই সব শিষ্যদের মধ্যে আছে লম্পট, প্রতারক, নিজের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অন্য নারীতে আসক্ত, অসৎ পথে এবং ঠকিয়ে অর্থোপার্জন করছে স্রোতের মতো। এরা তো দীক্ষিত। এই সব পাপকর্মের জন্য দীক্ষিত হয়েও কি এদের পিশাচত্ব দূর হওয়া উচিত বলে কি আপনি মনে করেন?

প্রশ্নটা শোনামাত্রই সাধুবাবা আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন একদৃষ্টিতে। মুখখানা গম্ভীর নয়, উজ্জ্বল অথচ প্রসন্নতার একটা হালকা হাসিতে ভরা। তবে সাধুবাবার চোখের দৃষ্টিতে, এরকম একটা প্রশ্ন করবো—ভাবতেই পারেননি—এমন ভাবটাও বেশ ফুটে উঠেছে। চুপ করে রইলেন। আমিও সময় দিলাম ভেবে উত্তর দেয়ার জন্য—যদিও জানি এর উত্তর এই বৃদ্ধের জানা আছে—তবে আমার তো নেই। মিনিট খানেক চুপ করে থেকে সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, শাস্ত্রের কথা সহজভাবে বললাম অথচ এমনভাবে প্যাঁচ মেরে প্রশ্ন করলি যার মানে দাঁড়ায় সব উল্টো। সংসারীরা যে কেন অশান্তি ভোগ করে—তার প্রমাণ তোকে সামনে রেখে সকলকে দেয়া যায়। সামান্য কথাকে পেঁচিয়ে নিয়ে যে মানুষ কত জটিলতার সৃষ্টি করে—কত অশান্তি ভোগ করে, তার কোন সীমা পরিসীমা নেই।

একটু থামলেন। চুপ করে রইলাম। এবার সাধুবাবা আমার জিজ্ঞাসার উত্তর শুরু করলেন বেশ কোমল অথচ গম্ভীর কণ্ঠে,

—বেটা, অদীক্ষিতদের জপপূজোদি নিষ্ফল হয় বলেছি। কথাটা ঠিকই বলেছি। তুই মানে বুঝেছিস অন্য। কেউ ভগবানের নাম করলে তার কল্যাণ হবেই হবে। সেখানে কোন মার নেই। তবে পৃথিবীতে এসে মানুষের সংসারে থেকেও একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত ভগবানকে লাভ করা। সেই ভগবানকে লাভ করতে হলে কিছু নিয়ম আছে। সেই নিয়মের বাইরে গিয়ে কোন কাজ করলে তাতে কোন ফল হয় না। বিভিন্ন দেবদেবীকে আকর্ষণ করার জন্য—লাভ করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু মন্ত্র আছে বীজ সংযুক্ত। যেমন ধর, এক জায়গায় বহু নারীপুরুষ বসে আছে। তার

মধ্যে থেকে তোর একজনকে দরকার কথা বলার জন্য। তুই যদি এখন অতগুলো লোকের মধ্যে—'এই যে দাদা' বা 'এই যে দিদি' শুনছেন—বলিস্, তা হলে তোর এই ডাকের উত্তর কে দেবে এবং কাকে উদ্দেশ্য করে ডাকছিস্—সেটা কে বুঝবে? কিন্তু কারও সঠিক নাম যদি তোর জানা থাকে—তাহলে হাজার ভিড়ের মধ্যেও ঠিক ঠিক নাম ধরে ডাকলে সে উত্তর দিয়ে কাছে এসে দাঁড়াবে কি না—বল্! দাঁড়াবেই। বেটা, দীক্ষার মন্ত্রটাও ঠিক সেই রকম। অদীক্ষিতদের তাঁর নামটা অর্থাৎ যে মন্ত্র জপে তিনি আসবেন তা জানা থাকে না। তাই শুধু শিব শিব, দুর্গা দুর্গা, কালী কালী বা গণেশ গণেশ করলে কোন ফল হয় না। নামে কল্যাণ হয়, তবে মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ তাঁকে লাভ হয় না। জপতপ পূজাদি নিষ্ফল হয় আমি সেই উদ্দেশ্যেই কথাটা বলেছি। আর জপ তপস্যা তো নির্ভর করে মানুষের দীক্ষায় লাভ করা মন্ত্রের উপর—সেই মন্ত্র যদি কারও জানা না থাকে অর্থাৎ অদীক্ষিতরা কি নিয়ে জপ বা তপস্যা করবে?

এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা থামলেন। পরিতৃপ্তির একটা হালকা হাসি ফুটে উঠলো মুখখানায়। মিনিটখানেক চুপ করে রইলেন—আমিও। জনাতিনেক যাত্রী এসে দাঁড়ালেন আমাদের সামনে। দেখে মনে হলো, সকলেই হিন্দীভাষী। দুহাত জোড় করে নমস্কার করলেন সাধুবাবাকে। তিনিও প্রতি নমস্কার জানালেন তাঁদের। পায়ে পায়ে তাঁরা চলে যেতেই সাধুবাবা শুরু করলেন,

—বেটা, দীক্ষিত লোকের মৃত্যুর পর সদ্গতি হওয়ার বিষয়ে অনেক কথা বলার আছে এবং সেটা সম্পূর্ণ পরলোকতত্ত্বের কথা। সে সব কথা তুই বুঝবি না আর বুঝলেও তোর মন বিশ্বাস করবে না। সে-এক আলাদা জগতের বিশাল আলোচনা। আমি অত গভীরে যাবো না। খুব অল্প কথায় বলি। দীক্ষিত লোকের স্বাভাবিক মৃত্যু হলে—মৃত্যুর পর সূক্ষ্মদেহকে শুধুমাত্র বায়ুকে আশ্রয় করে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে হয় না। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে সম্প্রদায় থেকে দীক্ষিত সেই সম্প্রদায়ের পরম্পরা কোন গুরু—যাঁরা ইতিপূর্বে দেহরক্ষা করেছেন অথবা দীক্ষিত শিষ্যের গুরু যদি দেহরক্ষা করে থাকেন কিংবা পরলোকগত গুরু পরম্পরার কোন গুরুর আদেশে মুক্ত কোন শিষ্য এসে দীক্ষিত মৃত শিষ্যের সূক্ষ্মদেহকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে যায় পরলোকে তার কর্মানুসারে বিভিন্ন স্তরের কোন একটিতে। অর্থাৎ দীক্ষায় গ্রহণ করা নামের গুণে মৃত্যুর পর পরলোকে আশ্রয়হীন অবস্থায় তাকে ঘুরে বেড়াতে হয় না। এক কথায় বলতে পারিস, দীক্ষিতদের মৃত্যুর পর পরলোকে কোন না কোন মুক্ত আত্মা সঙ্গী করে নিয়ে যায় তাকে। অদীক্ষিতদের ঘুরে বেড়াতে হয় কখনও সঙ্গীহীন অবস্থায়, নাহলে মুক্ত নয় এমন কোন আত্মার সঙ্গী হয়ে কষ্ট ভোগ করে অর্থাৎ সদ্গতি প্রাপ্ত হয় না।

এই পর্যন্ত বলে মিনিটখানেক থামলেন। একটু নড়েচড়ে বসে সাধুবাবা আবার বললেন,

—এবার বলি তোর সৎলোকের কথা। পৃথিবীতে কোন মানুষই সৎ হতে পারে না বাহ্যত সৎ মনে হলেও। কারণ সত্ত্ব তমো আর রজো—এই তিনটি গুণ মানুষের থাকেই। সত্ত্বগুণের প্রভাবে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কিছু না কিছু সৎ কর্ম মানুষ করেই। তমো আর রজো এই গুণ দুটির প্রভাবে কিছু না কিছু অসৎ বা পাপকর্মও সারাজীবনে মানুষ কমবেশী করেই থাকে। পাপ বা অসৎ কর্ম সব সময়েই যে প্রত্যক্ষ হবে—তা না-ও হতে পারে। সেটা মানসিক ভাবেও হতে পারে। যেমন ধর, মুহূর্তের জন্য কারও ক্ষতির চিন্তা করা, পরস্ত্রীর সৌন্দর্যে আকর্ষিত হয়ে মুহূর্তের জন্য তাকে পাওয়া বা ভোগের বাসনা জাগা—এমন অসংখ্য মানসিক অপরাধ বা পাপ মানুষ করে থাকে তমো ও রজোগুণের প্রভাবে। বাহ্যত দেখা যায় না ঠিকই তবে এগুলিও অসৎ বা পাপকর্মের অন্তর্গত। সুতরাং তোর দৃষ্টিতে কাউকে সৎ বলে মনে হলেও ভগবানের হিসাবটা অন্য। অতএব 'অদীক্ষিত সৎলোক' বলতে তুই যা বুঝিস্—সেটা ঠিক বোঝা নয়, বুঝলি? এবার তোর প্যাঁচমারা কথার উত্তরে বলি, 'মৃত্যুর পর পিশাচত্ব দূর হয় না অদীক্ষিতদের' —একথাটা যে নির্মল সত্য তার কারণ তোকে একটু আগেই বলেছি। কিন্তু আমি কি একথা বলেছি—'মৃত্যুর পর দীক্ষিতদের পিশাচত্ব দূর হবে?' তা বলিনি। বেটা, জন্মান্তরের কোন সংস্কারে মানুষ অনেক সময় সিদ্ধ গুরুবংশে সদ্গুরুর আশ্রিত হয় বটে, তবে দীক্ষিত হয়েও নারী পুরুষ জন্মান্তরের উৎকট সংস্কারে—তুই যেটা বলেছিস্, লম্পট, প্রতারক, চরিত্রহীন এমনকি নানা ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়ে পাপ কর্ম করতে পারে—অনেকে করেও থাকে। সেখানে বেটা ভগবানের রাজত্বে কারও ক্ষমা নেই। সদ্গুরুর কাছে দীক্ষিত হলেও শিষ্যের পাপ বা অসৎ কর্মের জন্য গুরু পৈশাচিক জীবন যাপন করাতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। মানুষের অপরাধের ক্ষেত্রে দীক্ষিত আর অদীক্ষিতের সাজার কোন তফাৎ নেই ভগবানের দরবারে। তবে দীক্ষিত অপরাধীদের সাজার পরও সদ্গতি হয় কারণ গুরুর সঙ্গে ইষ্টনামের সুতোয় শিষ্য বাঁধা থাকে বলে। বেটা, আশ্রিত মানুষ অন্যায় করে সাজা পেলেও সে কখনও আশ্রয়হীন হয় না—আশ্রয় আছে বলে। আশ্রয়হীন সাজা পেলেও সে অনাশ্রিতই থাকে—যেহেতু সে কারও আশ্রয়ে নেই। বেটা, ইহকাল পরকালের আশ্রয় বলতে একমাত্র গুরুকেই বোঝায়—বুঝলি?

কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জনা দশ-বারো হিন্দীভাষী তীর্থযাত্রী এসে দাঁড়ালেন আমাদের সামনে। সকলেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন সাধুবাবাকে। বয়েসে ছোট বলে আমাকে তাঁরা নমস্কার জানালেন হাত জোড় করে। আমিও জানালাম। অদ্ভুত ব্যাপার, অতগুলো তীর্থযাত্রীদের মধ্যে থেকে একজন বৃদ্ধা দুটো মাঝারী আকারের আপেল সাধুবাবার পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করলেন। সাধুবাবা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আমিও অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে হাসলাম। তীর্থযাত্রীরা সকলে চলে যেতেই জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, সকাল থেকে কিছু খেয়েছেন ?

হাসিমাখা মুখে সাধুবাবা জানালেন,

—না বেটা, কিছুই খাইনি। এই তো রাধারাণী আজ জুটিয়ে দিলেন সারাদিনের খাবার।

সঙ্গে সঙ্গেই আবার জিজ্ঞাসা,

—বাবা, সারাদিনে দুটো ফলই আপনার আহারের জন্য প্রয়োজন। তাতেই আপনার চলে যায় ! আমার জিজ্ঞাসা, দুটো ফল প্রয়োজন—এলো মাত্র দুটোই। এটা কি করে সম্ভব ? তিনটেও তো দিতে পারতো অথবা ফলের বদলে অন্য কিছু ? তা না দিয়ে শুধু ফলই দিল কেন—দয়া করে বলবেন ?

আমার প্রশ্নটা শুনে সাধুবাবা খুব হাসতে লাগলেন। হাসিতে ভুড়িটা বেশ নাচতে লাগলো। তবে নিঃশব্দ হাসি। সাধুবাবা হাসলেও আমি কিন্তু বিস্ময়ে গম্ভীর হয়ে রইলাম উত্তরের আশায়। ধীরে ধীরে হাসিটা মুখ থেকে মিলিয়ে যেতেই তিনি বললেন,

—বেটা, এতে তোর আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এটা আমার কেন—তোর মতো সমস্ত গৃহীদের জীবনেও প্রতি মুহূর্তে হতে পারে। বেটা, সাধুসন্ন্যাসীই হোক আর গৃহীই হোক—ভগবানের উদ্দেশ্যে কেউ যদি নিষ্ঠা নিয়ে কোন ব্রত পালন করে অথবা গুরুপ্রদত্ত কোন নিয়ম যদি কেউ রক্ষা বা পালন করতে দৃঢ় সংকল্প হয়—তাহলে নিশ্চিত জানবি, সেই ব্রত পালন বা নিয়মকে যথাযথভাবে রক্ষা করার জন্য ভগবান তার সহায় হয়ে, সঙ্গী হয়ে তার জন্য যা যা প্রয়োজন এবং যতটুকু প্রয়োজন—তা ঠিক ঠিক ভাবে যোগান দিয়ে সাহায্য করেন। এর মধ্যে এতটুকুও ফাঁক রাখেন না। তিনি দেখেন শুধু ব্রত পালনকারীর নিষ্ঠা। তীর্থক্ষেত্রে ব্রত বা নিয়ম পালনকারীদের সাহায্য করেন সেই তীর্থের স্বয়ং তীর্থদেবতা। আজকের এই আহার জুটিয়ে দিলেন স্বয়ং রাধারাণী। আমি তো বেটা বসে আছি রাধারাণীর কোলে। আহার জুটিয়ে দেয়ার দায়িত্ব তাঁর। না দিলে আমার কি হবে—কলঙ্ক হবে তো রাধারাণীর। বাড়ীতে অতিথি এলে তার মর্যাদা না দিলে বদনামটা কার হয় গৃহকর্ত্রীর, না পাড়ার লোকের ?

এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা আবার হাসতে লাগলেন প্রাণ খুলে। হাসিতে এক অপার্থিব আনন্দের ফোয়ারা যেন ছুটতে লাগলো। নিঃশব্দ হাসির এই ফোয়ারার তোড়ে শ্যামকুণ্ডের জল মনে হলো যেন থর থর করে কেঁপে উঠলো। কি বিশ্বাস—বাপরে ! কি শরণাগতি ! অবাক হলেও এই মুহূর্তে আর সময় নষ্ট করলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, আপনার কথানুসারে ধরে নিলাম রাধারাণীই এই ফল দুটো দিয়েছেন। আমরা দেখলাম, এক বৃদ্ধা আপনাকে ফল দুটো দান করলেন। এই দানে বা যে কোন দানে মানুষ কিছু না কিছু ফললাভ করে থাকেন বলে সকলে বলে থাকেন—

শাস্ত্রেও নাকি সে কথাই আছে। আমার জিজ্ঞাসা, দানে কি ফল লাভ করে থাকেন দানকারী ?

আমার প্রশ্ন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, তোর দেখছি কথার আর শেষ নেই। একটা শেষ হতে না হতেই চেপে বসছে আর একটা। পারিসও বটে !

বলে একটু হাসলেন। হাসিতে সাধুবাবারা দেখেছি কেউই 'কমতি' যান না। আমি আর কিছু না বলে অপেক্ষায় রইলাম। সাধুবাবাও মিনিটখানেক চুপ করে রইলেন। ভাবলেন কিছু—ভাব দেখেই বুঝলাম। তারপর বললেন,

—বেটা, কোন কিছু পাওয়ার আশা না করে নির্বিচার দানের ফল অসামান্য। তবে সাধুসন্ন্যাসীদের জীবনপথে প্রয়োজনের অতিরিক্ত এতটুকুও কোন দান গ্রহণ করতে নেই—শুধুমাত্র শরীর রক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন—ততটুকু ছাড়া। তবে সাধুসন্ন্যাসী বা গৃহী—যে কেউই দান গ্রহণ করলে প্রথমেই দানগ্রহীতার স্বাধীনতা নষ্ট হয় মনের। যিনি দান করেন—তার ভিতরের যা কিছু ধর্মপথে অগ্রসরতার ক্ষেত্রে শুভ বিরুদ্ধভাব তা অবশ্যই দানগ্রহীতার মধ্যে প্রবেশ করে অতি সূক্ষ্মভাবে। চোখে দেখা যায় না—কালে ক্রিয়া করে। দানগ্রহণে গ্রহীতার বিষয়ে আকর্ষণ বাড়ে, দেহের শান্তি নষ্ট হয়—মনেরও। দাতার এসব কমে। দান করলে দাতার দেহের প্রতি ভালোবাসা নষ্ট হয় অর্থাৎ দেহাত্মবোধ কেটে যায় ধীরে ধীরে—বিষয়ের প্রতি নষ্ট হয় আকর্ষণও। আর দান গ্রহণ এমনই যে, পূর্বজন্মের স্মৃতিকে নষ্ট করে দেয়। জীবনে কেউ কখনও দান গ্রহণ না করলে বা করে না থাকলে পূর্বজীবনের স্মৃতির উদয় হয় ক্ষেত্রবিশেষে। দান করলে মন নির্মল হয়—নির্মল জ্ঞানের বিকাশ হয় অর্থাৎ মন হয় ধীরে ধীরে বাসনাবিহীন। মন বাসনাবিহীন হলো মানেই তো প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হলো—তাঁকে লাভ করার পথ সুগম হলো।

কথাটা শেষ হওয়ামাত্রই জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, দাতার তো দেখছি সবদিক থেকেই লাভ হলো কিন্তু ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে, দানগ্রহীতা সবদিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে—বিশেষ করে দেহমন ও অধ্যাত্মবাদের উন্নতিতে। সুতরাং কারও দান গ্রহণ না করাই ভালো। আর একটা কথা, আমার দান যদি আমার কল্যাণ করে অপরের অমঙ্গল করে—তা হলে সে দান করে অপরের ক্ষতি করার কোন যুক্তি আছে কি ?

আবার হাসতে শুরু করলেন সাধুবাবা। একটু রহস্যেভরা হাসি। বললেন,

—বেটা, দাতার দেহ ও মনের পরিপন্থী যে সব ভাব তা দানগ্রহীতার মধ্যে সূক্ষ্ম-ভাবে প্রবেশ করে ঠিকই—তবে দানগ্রহীতাও জীবনে কোন না কোন সময় কিছু না কিছু দান তো করছে কাউকে না কাউকে। একটা পয়সা যদি কাউকে কেউ দান করে, তাহলে পূর্বে দান গ্রহণের ফলে যে বিরুদ্ধভাব তার ভিতরে সংক্রামিত হয়েছিল—তা তৎক্ষণাৎ অন্যের ভিতরে সংক্রামিত হচ্ছে। এই ভাবেই ক্রিয়া চলতে

থাকে। দীক্ষিতদের ক্ষেত্রে দান গ্রহণমাত্রই দাতার বিরুদ্ধভাব গ্রহণ করেন গুরু। ফলে এতটুকুও ক্ষতি হয় না তার। কারণ দীক্ষার পরই গুরু আশ্রয় করেন শিষ্যের দেহকে। অদীক্ষিত যারা—তারাও দান গ্রহণের দায় মুক্ত হয়—যদি সে নিজে দান নাও করে কোন দেবালয়ে পুজো অথবা তাঁর উদ্দেশ্যে কিছু দেয়—কারণ দান গ্রহণের ফলে তাকে আশ্রয় করা দাতার বিরুদ্ধভাবের ফল সংক্রামিত হয় দেবতায়। সুতরাং বুঝতেই পারছিস্, গড়ে দাতা আর দানগ্রহীতা—কারও কোন ক্ষতি তো হচ্ছেই না, বরং লাভ হচ্ছে দানে—দেহাত্মবোধ কাটছে, বিষয়ে আকর্ষণ নষ্ট হচ্ছে, দেহ মনের শান্তি আসছে, মন নির্মল হয়ে হচ্ছে জ্ঞানের বিকাশ—মোটের উপর তাঁকে পাওয়ার পথ পরিষ্কার হচ্ছে। যারজন্যেই তো শাস্ত্রে দানকে সবচেয়ে পুণ্যের কাজ বলে অভিহিত করেছেন শাস্ত্রকারেরা।

সাধুবাবা থামলেন। কথাটা শুনে মনটা আনন্দে আমার ভরে গেল। আরও অনেকক্ষণ কথা হলো। অনেক কথা হলো। এবার উঠতে হবে। জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, কোথায় থাকেন, এখানে ক-দিন থাকবেন, এখান থেকে যাবেনই বা কোথায় ?

এতটুকু বিরক্ত না হয়েই সাধুবাবা বললেন,

—আমি থাকি রুদ্রপ্রয়াগে। হিমালয় ভালো লাগে তাই ওখানেই পড়ে থাকি। অনেকদিন পাহাড় থেকে সমতলে আসিনি তাই এবার একটু এলাম বৃন্দাবনে। আর মাত্র দিনকয়েক থাকবো এখানে। তারপর আবার চলে যাবো রুদ্রপ্রয়াগে।

ওঠার আগে শেষ প্রশ্ন করলাম প্রণাম করে,

—বাবা, ঈশ্বরকে কিভাবে পেতে পারি—কিভাবে পেতে পারে আর সকলে ?

এ-প্রশ্ন শুনে প্রসন্ন উজ্জ্বল হাসিতে ভরে উঠলো বৃদ্ধ সাধুবাবার মুখখানা। স্নেহভরা কণ্ঠে তিনি বললেন,

—বেটা, কামনা আর ঈশ্বর—এ-দুয়ের সম্পর্ক সাপে নেউলে। যেখানে কামনা, যার মধ্যে কামনা—সেখানে, তার মধ্যে ঈশ্বর নেই।

ব্রজ চুরাশী ক্রোশ পরিক্রমা

ব্রজ ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমা সম্পর্কে পাঠক পাঠিকাদের কিছু জানাবার আছে। সমগ্র বৃন্দাবন আমি ঘুরেছি তবে আমার ব্রজপরিক্রমা করা হয়নি। এখানে ব্রজপরিক্রমার অধ্যায়টি সংগ্রহ করেছি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীনারায়ণচন্দ্র সাহার কাছ থেকে। পরিক্রমাকালীন প্রতিদিনের খুঁটিনাটি বিষয় এবং তাঁর পথচলার অভিজ্ঞতার ডায়েরী যদি না পেতাম, তাহলে বৃন্দাবন ভ্রমণ কাহিনী আমার অসম্পূর্ণই থেকে যেতো।

এবার বলি, নারায়ণদার সঙ্গে আমার, আমাদের পরিবারের সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই ঘনিষ্ঠ পরিচয়। আমরা থাকিও পাশাপাশি। অসংখ্য তীর্থভ্রমণ করেছেন নারায়ণদা তীর্থমনা হয়ে। সংসারে থেকেও যে নির্লিপ্ত অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতে দেখছি, তাতে আমার চোখে তাঁকে একজন পরম বৈষ্ণব বলে মনে হয়েছে। তাঁর মতো গুরুগতপ্রাণ সংসারীর সংস্পর্শেও আমি জীবনে খুব কমই এসেছি। সংসারে থেকে আজও তিনি গোপনে চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর পরমপথের সাধনা।
তাঁর লেখা ডায়েরীতে আমি ক্ষেত্রবিশেষে ভাব ঠিক রেখে ভাষার পরিবর্তন এবং বিভিন্ন স্থানে করেছি নানা কাহিনীর সংযোজন। কোন কিছু প্রাপ্তির আশা না করে অমানুষিক পরিশ্রমের ফসল তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ ডায়েরী দিয়ে এই লেখায় সাহায্যের জন্য তাঁর কাছে আমার মানসিক ঋণ কখনও পরিশোধ হওয়ার নয়।—লেখক

পদব্রজে ব্রজ পরিক্রমা করবো—এ আমার অনেকদিনের আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু একে যে বাস্তব রূপ দিতে পারবো তা স্বপ্নেও ভাবিনি কখনও। তাই ব্রজ পরিক্রমার উপর লেখা বই সংগ্রহ করে পড়তাম—বেশ ভালো লাগতো। আর ব্রজেশ্বরকে প্রার্থনা করতাম—তিনি কি কোনদিন তাঁর সেই লীলাক্ষেত্র ব্রজমণ্ডল দর্শন করাবেন? এইভাবে মনের মধ্যে বাসনার একটা ঢেউ সব সময়েই বয়ে যেতো। এ বাসনা যে রাধাবল্লভ এত তাড়াতাড়ি পূরণ করবেন তা ভাবিনি। আমার মতো একজন দোকানীর পক্ষে এ সম্ভব নয়। তবুও রাধারাণীর অশেষ করুণায় একদিন বসে আছি দোকানে। আশ্বিন মাসের প্রথমদিকে। রাস্তার ধারে তাকাতেই একজন বাবাজীকে দেখে মনে হলো ইনি আমার পরিচিত। বৃন্দাবনবাসী শ্রী পিতাম্বরদাস। কারণ আগে কয়েকবার বৃন্দাবনে গেছি তাই চিনতে অসুবিধে হয়নি।
দোকান থেকে বেরিয়ে এসে প্রণাম করলাম। মহারাজ চিনতে পারলেন আমাকে। কথায় কথায় তিনি বললেন, "আগামী দামোদর মাসে (কার্ত্তিক) ৮৪ ক্রোশ বন ভ্রমণ করার ইচ্ছে আছে। তাই কলকাতায় এসেছি—যে সব ভক্তরা যেতে ইচ্ছুক তাঁদের সঙ্গে একটু আলোচনা করতে।"
বাবাজী মহারাজ আমাকেও যেতে বললেন। তাঁর স্বভাব সুলভ স্নেহের ডাকের বশবর্তী হয়ে কেমন যেন চমকে উঠলাম। এতটুকু দেরী না করেই বললাম, "আপনি যে যে বন পরিক্রমা করেছেন, যা যা দর্শন করেছেন—সব দেখাবেন?" বাবাজী বললেন, "হ্যাঁ, তার থেকেও বেশী কিছু দেখানো হবে। যেমন, কোকিলা বন, পাণোপা, আরও অনেক বন উপবন। যদি তোমার যেতে ইচ্ছে হয় তাহলে আগামী বিজয়া দশমীর দিন হাওড়া স্টেশনে তুফান এক্সপ্রেসে যেতে পারো আমার সঙ্গে।"
বাবাজীর কথা শুনে মনে মনে একটু দুঃখের হাসি হাসলাম। কারণ, ঠিক এই সময়ে কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। এখন পুজোর সময়—দোকান সামলাবে কে?

মহারাজ চলে গেলেন। কিন্তু আমার মনের অবস্থাটা যে কি হলো—তা কাউকে বলে বোঝাতে পারবো না। পরে বাড়ীতে এলাম। স্ত্রীকে বললাম বাবাজীর কথা—আমার মনের বাসনার কথাও। আবার এ-কথাও বললাম, এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ করে কোথাও বেরিয়ে পড়া একেবারেই অসম্ভব।

স্ত্রী টের পেল আমার অন্তরের কথা। সে-ও আমাকে বলতে লাগলো যাওয়ার জন্যে। আমি নারাজ। বললাম, "দেখো, এটা দীর্ঘদিনের ব্যাপার। সংসার কে দেখবে ?"

স্ত্রী বললো, "তোমার যদি বড় অসুখ হয়, দু-মাস যদি হাসপাতালে পড়ে থাকতে হয় বা বিছানায় পড়ে থাকো—তখন যিনি আমাদের দেখবেন, তুমি তীর্থে গেলে তিনিই দেখবেন। এভাবে তোমার বাসনা অপূরণ রেখো না।"

একথা শুনে একেবারে মোহিত হয়ে গেলাম। বললাম, যদি না ফিরি ?

হাসিমুখেই স্ত্রী উত্তর দিল, দেখো, ভাগ্যে যা আছে তা আমাদের হবেই। সুতরাং অতশত চিন্তা করে লাভ নেই। তুমি বেরিয়ে পড়ো।

এরপর একদিন গুরুদেবের অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে এলো আমার স্ত্রী। আমিও গুরুদেবের অনুমতি পেয়ে তৈরী হয়ে নিলাম যাত্রার উদ্দেশ্যে। দোকানে ছেলেদের বলাতে রাজী হয়ে গেল তারাও। এবার গেলাম অনুমতির জন্যে গর্ভধারিণী মায়ের কাছে। সেখানেও নিরাশ হলাম না।

এ-সব সত্ত্বেও মোহময় মায়াবদ্ধ মন আমার কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। একবার এগোয় তো আবার খানিকবাদে পড়ে পিছিয়ে। বিষয়বুদ্ধিতে ভরা মন কিছুতেই যেতে চাইছে না। শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র দর্শনের অভিলাষী মন জয়ী হলো।

যাত্রার দিন আমার বড় মেয়ে কৃষ্ণা গুছিয়ে দিল টুকিটাকি জিনিষ আর বিছানাপত্র। স্ত্রী ভোররাতে উঠে রান্না সেরে রেখেছে। খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম সকালে।

হাওড়ায় প্ল্যাটফরমে ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল পাণ্ডা কালীচরণ ব্রজবাসীর সঙ্গে। জেনে নিলাম এই গাড়ীতেই রয়েছেন শ্রী পিতাম্বরদাস বাবাজী। নিশ্চিন্তে কামরায় উঠে বসলাম জানলার পাশে।

আমার টিকিট হয়েছে কিনা জানিনা। সহযাত্রী একজনের কাছে জানলাম, তিনিও যাচ্ছেন বৃন্দাবনে। পিতাম্বরদাস বাবাজীর সঙ্গেই যাচ্ছেন। সকলের টিকিট রয়েছে মহারাজের কাছে। দেখলাম, গোবিন্দের অশেষ করুণায় আমি ঠিক কামরায় উঠেছি।

ট্রেন ছাড়লো। যথা সময়ে দেখা হলো পিতাম্বরদাস বাবাজীর সঙ্গে। পরিচয় হলো কলকাতা থেকে এ-পথের যাত্রী যাঁরা—তাঁদের অনেকের সঙ্গেও। পরদিন বিকেল চারটের সময় এলাম মথুরা স্টেশনে।

স্টেশনের কাছ থেকেই বাস ছাড়লো। প্রায় সন্ধ্যের সময় এলাম বৃন্দাবনে। উঠলাম সিদ্ধির ধর্মশালায়। দোতলায় ছোট্ট একটা ঘর দেয়া হলো আমাকে। বিছানাপত্র

রেখে স্নান করে এলাম যমুনা থেকে। আলাপ হলো সদা নাম মুখে শ্রীশ্রী দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংস বাবার আশ্রিতা ভক্তিমতী এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে। নাম রুণু। আলাপ হলো বলাইদা—মহারাজের-একনিষ্ঠ শিষ্য ও কর্মী, গোপালের মায়ের (আভাদি) মতো মহাবৈষ্ণবীর সঙ্গে। নিঃসন্তান। গোপালের সেবাযত্ন করেন পুত্র বাৎসল্যে—তাই তিনি গোপালের মা। যেমন বুদ্ধিমতী তেমনই সদা হাসিখুশীতে ভরা ভাব।

এ-ছাড়াও পরিচয় হলো রেণুদি, ক্ষমাদি, নীলিমাদি, ডঃ মেঘনাথ সাহার ভ্রাতার পুত্রবধূ সাহাদি—এমন আরও অনেকের সঙ্গে। এখানে যাত্রাপথে ব্রজ পরিক্রমায় ছোটবড় সকলেই দাদা দিদি। একমাত্র উনিশ বছরের একটি মেয়ে আর আট বছরের ছেলে তমাল ছাড়া।

সব থেকে মজার কথা হলো, এই আভাদির স্বামীর নাম আর আমার নাম এক বলে (নারায়ণ) তিনি আমাকে ডাকতেন নারুদা বলে। যাইহোক, আমাদের সকলের সঙ্গে সকলের পরিচয়ের প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে। আগামীকাল থেকে পরিক্রমা শুরু।

ব্রজ পরিক্রমার প্রথম দিন

সকালে উঠেই আমাদের বনযাত্রার পথ-প্রদর্শক ও তীর্থগুরু কালীচরণ ব্রজবাসীর সঙ্গে গেলাম যমুনা পুজো আর সাত দেবালয় দর্শন করতে। আগেও কয়েকবার এসেছি বৃন্দাবনে। তাই একাই যমুনায় স্নান আহ্নিক সেরে চললাম রাধা মদন-মোহন দর্শনে। তার আগে ইমলিতলার নিতাই গৌর দর্শন করলাম।

দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ নিভৃতে এখানে কেলি করতেন রাধার সঙ্গে। কেলিস্থান নামেই এর প্রসিদ্ধি। একদা বৃন্দাবনের এই ইমলিতলায় এসেছিলেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। তাঁর পদচিহ্ন রয়েছে এখানে।

ইমলিতলা থেকে এবার এলাম বঙ্কুবিহারীজীর মন্দিরে। প্রণাম ও দর্শন করলাম। রাধাদামোদর দর্শনের শেষে মন্দির পরিক্রমা করে চলে এলাম শ্রীরূপ গোস্বামীর ভজনকুটির ও সমাধিস্থলে। মনোরম এই তমাল কুঞ্জে বসে মনের কথা জানিয়ে যেই উঠেছি—অমনি হঠাৎ পড়ে গেলাম চিৎ হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে এক বৈষ্ণবী মায়ের চিৎকারে মুথায় হাত দিয়ে দেখলাম রক্তপাত হচ্ছে ভীষণভাবে। রুমাল দিয়ে চেপে ধরে গোঁসাইজীদের দরজায় গিয়ে জলের ধারা দিতেই রক্ত বন্ধ হয়ে গেল। তারপর মলম কিনে ক্ষতস্থানে লাগাতে যন্ত্রণার উপশম হলো। ভীষণ লেগেছে।

একেই তো আসার সময় ট্রেনে ভুগছিলাম চোখের অসুখে, তার মধ্যে গেল আবার মাথা ফেটে। এতে মনটা আমার খুবই বিষণ্ণ হয়ে পড়লো। ভাবলাম, আমার ভাগ্যে বোধ হয় আর গোবিন্দের লীলাময় স্থান পরিক্রমা করা হবে না। গোবিন্দজীকে

জানালাম আমার কষ্টের কথা। কিন্তু পাথরের মূর্তি তো, তাই সাড়া মিললো না। তবে কে যেন সাড়া দিয়ে বললো, 'তুমি পরিক্রমায় যাও। আর কোন বিপদই হবে না তোমার।' সে আর কেউই নয়—সে আমার মন।

যাইহোক, গোপালের উপর ভরসা করে ফিরে এলাম আশ্রমে। দুপুরের প্রসাদ পেলাম। তারপর একটু বিশ্রাম করে মহারাজের আজ্ঞায় তৈরী হলাম যাত্রার জন্যে। আমাদের জিনিষপত্র কিছু তুলে দেয়া হলো মহিষের গাড়ীতে। আর কিছু রেখে গেলাম আশ্রমে। কার্ত্তিক মাস। ঠাণ্ডা তো এখন একটু আছেই। তাই সোয়েটার চাদর জড়িয়ে নিলাম গায়ে। আমার মতো আরও অনেকেই।

৪ঠা কার্ত্তিক মঙ্গলবার ১৩৮৭, বিকেল ঠিক চারটের সময় শুরু হলো পরিক্রমা। প্রথমে বৃন্দাবন প্রদক্ষিণ করে মথুরার পথে চললাম পাকা রাস্তা ধরে। গোধূলী বেলায় সহযাত্রীদের সঙ্গে প্রেমানন্দে চলেছি নাম কীর্ত্তন করতে করতে। সঙ্গে রয়েছেন ব্রজবাসী শ্রী কালীচরণ পাণ্ডা আর তাঁর কর্মচারী শ্রী তারক রায়। এঁরাই আমাদের পথ প্রদর্শক। প্রায় ১২ কি.মি. পথ পার হয়ে এলাম। রাত আটটার মধ্যে আমাদের নিয়ে এলেন তাঁবুতে। কিন্তু আসার পথে দর্শন করতে হয় প্রথমে মথুরার ভূতেশ্বর মহাদেবকে। ওই মন্দির দর্শন না করিয়েই আমাদের এগিয়ে নিয়ে এসেছেন পাণ্ডাজী। এতে রাগারাগি শুরু করলাম আমরা সকলে। পরে আবার উল্টো পথে ২ কি.মি. হেঁটে গিয়ে প্রণাম করলাম বাবা ভূতেশ্বর মহাদেবকে। মন্দিরস্থ মহামায়া যোগমায়ার আশীর্বাদ নিয়ে ফিরে এলাম তাঁবুতে।

কথিত আছে, বর্তমানে ভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দির যেখানে—একদা সেখানেই নির্মিত হয়েছিল বুদ্ধদেবের শিষ্য সারিপুত্তের একটি স্তূপ। পরবর্তীকালে তা অপসারিত হয়ে নির্মিত হয় এই মন্দির। মথুরা থেকে এই মন্দিরটির দূরত্ব প্রায় ৯ কি. মি.। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন মহাদেব এবং পাতালদেবী।

ঘুম ভাঙলো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি ভোর চারটে। মহারাজ গোপাল আর গিরিধারীজীকে নিয়ে শুরু হলো মধুর ব্রজের পদযাত্রার প্রথম ভোর। ভোরের আবছা অন্ধকারে আরতির কাঁসর ঘণ্টার সুমধুর ধ্বনি মনের মধ্যে সৃষ্টি করলো এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় আনন্দ-ধারা। এমনটা এর আগে কখনও হয়নি। ঘুরেছি অনেক তীর্থ তবে ব্রজের মতো এমন তীর্থ-স্বাদ আগে অনুভব করিনি কোথাও।

শুরু হলো আমাদের যাত্রা—পরিক্রমা। সকলের সঙ্গেই ছিল শীতবস্ত্র আর সঙ্গে চলেছে বিছানাপত্র নিয়ে মহিষের গাড়ী। কীর্ত্তনীয়া বৈষ্ণবেরা শুরু করলেন কীর্ত্তন। গোপালজী এবং গিরিধারীজীর বাল্যভোগের প্রসাদ পেয়ে পিতাম্বর

বাবাজী মহারাজের আশীর্বাদ নিয়ে চলতে শুরু করলাম সকলে।

যে পর্যন্ত এসেছি—এখান থেকে মথুরা শহরের দূরত্ব মাইল খানেক। তারপর কিছুটা রেললাইন আবার কিছুটা পীচের বাঁধানো রাস্তা ধরে আমরা চললাম তালবন দর্শনে। কয়েকজন বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজ আসছেন টাঙ্গাতে। চলছি তো চলছিই। পথ যেন আর কিছুতেই ফুরোতে চায় না। মাঝে মাঝেই পথচারীদের জিজ্ঞাসা করি—আর কতদূর ?

এইভাবে প্রায় ১০ কি. মি. পথ—মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যে ভরপুর। ময়ূর ময়ূরী ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে ওখানে—মনের সুখে। পথের ধারে ফুলে ফুলে সাদা হয়ে রয়েছে কাশবন। আমাদের প্রথম দল এসে দাঁড়ালো একটি সুন্দর গ্রামের শেষ প্রান্তে। চারদিকে সবুজে ভরা। তখনও কিন্তু পিছনে রয়েছেন আমাদের অনেক সহযাত্রী। ধীরে ধীরে এলো সকলেই। এবার একসঙ্গে কিছুটা পথ হেঁটে এসে পৌঁছালাম তালবনে—একদা শ্রীকৃষ্ণ আর বলরাম যেখানে বধ করেছিলেন ধেনুকাসুরকে।

এই তালবনে ধেনুকাসুর প্রসঙ্গে শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০ম স্কন্দের ১৫শ অধ্যায়ে শুকদেব এইভাবে বলেছিলেন রাজা পরীক্ষিৎকে,

“রাম-কৃষ্ণের সখা শ্রীদাম, সুবল, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি গোপবালকেরা এক সময় ভালবাসার সঙ্গে বললেন, হে মহাবল রাম, হে দুষ্টদমনকারী শ্রীকৃষ্ণ, এই গোবর্ধন পর্বতের কাছে একটি বড় বন আছে, সেই বনে অনেক ভাল তালগাছ। সেখানে গাছের তলায় অজস্র তালফল পড়ে রয়েছে এবং এখনও পড়ছে। কিন্তু দুরাত্মা ধেনুকাসুর সেই তালগুলিকে আটকে রেখেছে। হে রাম, হে কৃষ্ণ, সেই অসুর নিজে অত্যন্ত ভয়ংকর এবং অন্যান্য জ্ঞাতি অসুররা তার সহায়। হে শত্রুনাশন, ঐ অসুর নরখাদক, তার ভয়ে কোন মানুষ সেই বনের সুন্দর সুগন্ধ ফল ভোজন করতে পারে না। সেখানে অনেক ফল পড়ে রয়েছে। ঐ দেখ তার সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কৃষ্ণ, এই সুগন্ধে আমাদের প্রলোভন হচ্ছে। ঐ সব ফল অনেকদিন থেকেই আমাদের খাবার ইচ্ছে। চল সেখানে যাই। সখাদের কথা শুনে তাঁদের আনন্দ দেবার জন্য রাম ও কৃষ্ণ গোপবালকদের নিয়ে সেই তালবনে গিয়ে ঢুকলেন। তারপর মদমত্ত হাতীর মত দুহাতে গাছগুলোকে ঝাঁকিয়ে তাল মাটিতে ফেলতে লাগলেন। ২০-২৮

তাল পড়ার শব্দ শোনামাত্র গর্দভাকৃতি ধেনুকাসুর পর্ব্বত-বন কাঁপিয়ে সেখানে এসে পেছনের দু'পা দিয়ে বলদেবের বুকে আঘাত করল ও কর্কশ স্বরে চিৎকার করে চারদিকে ছোটাছুটি করতে লাগল। তারপর সে প্রচণ্ড রাগে আবার এগিয়ে এসে বলরামকে মারবার জন্য পেছনের দুই পা তাঁর দিকে ছুঁড়ল। রাম একহাতে সেই পা দুটো ধরে ঐ অসুরকে তুলে ঘোরাতে লাগলেন এবং তাতেই তার মৃত্যু হল। তখন তিনি মৃতদেহটাকে তালগাছের গায়ে ছুঁড়ে মারলেন। তার আঘাতে উঁচু

তালগাছ কেঁপে পাশের গাছকে কাঁপিয়ে ভেঙে পড়ল। ভাঙা গাছের ভারে আবার তার কাছের গাছ ভেঙে পড়ল। এমনি করে পর পর বহু তালগাছ ভেঙে পড়ল। তালবনে যেন একটা ঝড় বয়ে গেল। কাপড়ে যেমন সুতো, তেমনি জগদীশ্বরে এই বিশ্ব ওতপ্রোত রয়েছে। তাঁর পক্ষে এই কাজ আশ্চর্যের নয়। তারপর ধেনুকাসুরের গর্দভাকৃতি আত্মীয়রা সক্রোধে রাম-কৃষ্ণকে আক্রমণ করল কিন্তু রাম ও কৃষ্ণ তাঁদেরও পেছনের পা ধরে অবলীলায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে তালগাছগুলির উপর ফেলতে লাগলেন। ২৯-৩৭

দৈত্যদের মৃতদেহ, পতিত তাল এবং তালগাছের মাথায় সমাকীর্ণ হয়ে সেই স্থানটি মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত শোভা ধারণ করল। আর রাম-কৃষ্ণের এই সুমহান কর্মের বিবরণ জেনে দেবতারা স্বর্গ থেকে পুষ্প-বৃষ্টি, দুন্দুভি ধ্বনি ও নানা রকম স্তব-স্তুতি করতে লাগলেন। সেই থেকে তালবনটি ফলাদির জন্য মানুষ ও তৃণাদির জন্য পশুদের গমনযোগ্য হল। তারপর যাঁর নাম শোনা ও কীর্তন করা পুণ্যজনক, সেই কমলাক্ষ শ্রীকৃষ্ণ অনুচর গোপদের উচ্চারিত স্তব শুনতে শুনতে বলরামের সঙ্গে ব্রজমণ্ডলে প্রবেশ করলেন।" ৩৮-৪৪

এখন এখানে আর তালবন নেই। আমরা ধীরে ধীরে এই বনের প্রধান দরজা পার হয়ে এলাম। এবার দুদিকে দেখলাম দুটো তাল গাছ। সম্ভবত আজকের কোন সেবাইত ওই নামকরণের সঙ্গে মিল রাখার জন্য হয়তো বছর পাঁচ ছয়েক আগে লাগিয়েছে গাছ দুটি। এসে দাঁড়ালাম মাঝারী আকারের একটি মন্দিরের সামনে। ভিতরে রেবতী মহারাণী, বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ দর্শন করলাম। বাংলা হিন্দী আর ব্রজবুলি মিশিয়ে স্থান মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন পাণ্ডাজী।

মন্দিরের পাশে—একটু নীচে রয়েছে একটি কুণ্ড। পাড়ে এসে জলস্পর্শ করে মাথায় দিয়ে বসলাম একটু বিশ্রামে।

মিনিট দশেক কাটলো। এবার আমাদের চলা শুরু হলো মধুবনের পথে। কাঁচা পথ। এ-পথে কাঁটার আঘাত সহ্য করে এগিয়ে চললাম কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে। আমার সহযাত্রী মা বোনেরা একেবারেই চলায় অনভ্যস্ত। তাই তাঁরা পিছিয়ে পড়ছে মাঝে মাঝেই। তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে এলাম প্রায় ৬ কি. মি.। আজ এখানেই থাকতে হবে। তাঁবু পড়েছে এখানে। মধুবন।

মহারাজ আমাদের আগেই এসে গেছেন। তিনি রান্নার ব্যবস্থাও করেছেন। আমি চট্ করে স্নান সেরে নিলাম মধুকুণ্ডে। কুণ্ডের দক্ষিণ পাড়েই রয়েছে সুন্দর একটি মন্দির। দর্শন করলাম মন্দিরে স্থাপিত বিগ্রহ তুলসী এবং লক্ষ্মণজীকে। পৌরাণিক যুগে এই বনে বাস করতো মধু নামে এক দৈত্য। তার নামানুসারেই নাম হয়েছে বনের—মধুবন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বধ করেছিলেন মধুদৈত্যকে।

মধুকুণ্ডের উত্তর-পূর্ব কোণে রয়েছে একটি ইদারা। সেখানে কোন লোকজন নেই। এদিক ওদিক তাকাতেই চোখ পড়লো পূর্বদিকে আর একটি ইদারায়। সেখানে

কয়েকজনকে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে গেলাম। কাছে গিয়ে খাবার জন্য একটু জল চাইতেই বললো, 'বাবু, হামলোগ ডাঙ্গি হ্যায়, হামলোগকা পানি আপলোগকো নেহি দেনা স্যাকতা হ্যায়। ইয়ে ডাঙ্গিকা ইদারা হ্যায়। আপ ক্যায়সে পানি পিয়েগা।'
এখনও ভারতে এমন ব্যবস্থা আছে আমার জানা ছিল না। নিরুপায় হয়ে হাঁটতে হাঁটতে এলাম একটি বস্তিতে। বস্তির এক বুড়িমা ঘোল খাওয়ার জন্য খুব অনুরোধ করলেন আমাকে। একটু অসুবিধে থাকায় খাওয়া হলো না। জল খেয়ে ফিরে এলাম তাঁবুতে। বেলা আড়াইটে নাগাদ দুপুরের প্রসাদ পেলাম।
একটু বিশ্রামের পর মধুকুণ্ডের ঠিক উত্তরপাড়ে এলাম মধুবন বিহারীজীর মন্দিরে। প্রাণভরে দর্শন করলাম সকলে। এই কুণ্ডের পশ্চিমপাড়ের রাস্তা পার হয়ে একটি গ্রাম্য স্কুলের সামনেই আমাদের তাঁবু।
এখন আমরা সকলে চললাম ভক্ত ধ্রুব মহারাজের ভজনটিলা দর্শন করতে। কিছুটা পথ চলে গেছে মেঠো জমির মধ্যে দিয়ে। পদে পদে কাঁটা আর ঝোপঝাড়। দু-পাশ থেকে টেনে ধরছে ধুতি। রাধে রাধে বলে ছাড়াতে ছাড়াতে এলাম একটি অপূর্ব মনোরম টিলায়। অসংখ্য ময়ূর ময়ূরী পরিবেষ্টিত এ যেন এক স্বর্গরাজ্য। এখানেই রয়েছে ধ্রুবরাজের মন্দির।
এখান থেকে একটু দূরে যমুনতীরে ধ্রুবঘাট। কথিত আছে, একদা মাতৃ উপদেশে এখানে বসে তপস্যা করেছিলেন বালক ধ্রুব। কঠোর তপস্যায় প্রীত হয়ে দর্শন দিয়েছিলেন শ্রীবিষ্ণু।
মন্দিরে স্থাপিত রয়েছে বালক ধ্রুব, নারদজী এবং সাক্ষীগোপালের বিগ্রহ। মন ভরে গেল এক অপার্থিব আনন্দে। দর্শনমাত্রই সারাটা পথের কষ্ট যেন লাঘব হয়ে গেল মুহূর্তে। এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটি ব্রজবালক। ময়ূরের পালক হাতে দিয়ে ওরা পয়সা চাইলো আমাদের কাছে। এমন চাওয়া ওদের আর সকলের কাছেই— যারা আসে এখানে।
এবার ব্রজবালকেরা আমাদের নিয়ে গেল গহন বনের ভিতরে এক সাধুর আশ্রমে। চারদিকে ঘন জঙ্গল। দেখলাম, আশ্রমে একমনে ভজন করছেন এক সাধুবাবা। কে এলো বা কে গেল—সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই নেই তাঁর। তিনি কি খান, মধুবন বিহারীজি এই গভীর বনে কিভাবে তাঁকে খাবার পাঠান—জানি না। কোন কথা বলে বিরক্ত বা ভজনে ব্যাঘাত ঘটালাম না। প্রণাম করলাম দূর থেকে।
দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নেমে এলো। যখন তাঁবুতে ফিরে এলাম তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। ঠাকুরের সন্ধ্যারতি হলো। নিয়ম সেবার এই মাস কার্ত্তিক মাস। আমাদের সঙ্গে বৃন্দাবন থেকে একজন ভাগবত পাঠকের আসার কথা ছিল। কোন কারণে আসতে পারেননি। তাই মহারাজকে বলে এখানকার মধুবন বিহারীজীর সেবাইত শাস্ত্রীজীকে ডেকে আনা হলো। এই শীতের মধ্যেই এসে তিনি উদাত্ত সুললিত কণ্ঠে পাঠ করলেন মধুবনের মাহাত্ম্য আর ভাগবত-কথা। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক

তিনি হিন্দিতে গোবিন্দের কথা শুনিয়ে চলে গেলেন। আমরা সকলে তাঁকে প্রণামী দিলাম আমাদের সাধ্যমত।
এরপর রাতের প্রসাদ পেয়ে, ডায়েরী লিখে ঘুমিয়ে পড়লাম। আবার কাল থেকে শুরু হবে চলা আর চলা।

ঘুম ভাঙলো ভোর চারটেয়। অন্যান্য দিনের মতো কীর্ত্তনসহ বেরিয়ে পড়লাম পথে। আজ সঙ্গের ঝোলায় ছিল আশ্রম থেকে পাওয়া চিঁড়ে আর গুড়। চললাম কুমুদ বনের দিকে। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন কালীচরণ পাণ্ডাজী।
একেই তো অন্ধকার, তার মধ্যে সারাটা পথে ছড়িয়ে রয়েছে কাঁটা ঝোপঝাড়। পায়ে ফুটছিল। অসম্ভব পথ-কষ্ট। চলা যায় না। কাঁটার খোঁচা খেতে খেতে প্রায় ৬ কি. মি. পথ পার হয়ে এলাম কুমুদ বনে। এখন আকাশ একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তবে ঠাণ্ডা পড়েছে জব্বর।
একদা শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সখাদের সঙ্গে নিয়ে জলক্রীড়া করতেন এই কুমুদবনে। ব্রজবালক সখারা মনের আনন্দে পদ্মফুল দিয়ে সাজাতেন কৃষ্ণকে।
কুমুদবন একটি বিরাট কুণ্ডের মতো। কয়েক বছর আগেও নাকি এখানে ভরা থাকতো পদ্মফুলে। এখন আর তা নেই। কুণ্ডের জল স্পর্শ করলাম মহারাজের নির্দেশে। এরপর এলাম ঘাটের উপর কপিলমুনির মন্দিরে। জানিনা কবে কপিল মুনি এসেছিলেন এই কুমুদবনে। মন্দিরে মুনির বিগ্রহ দর্শন করে সকলে এলাম বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের মন্দিরে। এই মন্দিরের পাশেই মহাপ্রভুর বৈঠক। একদা মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এসেছিলেন এখানে। এটা তাঁর বিশ্রামস্থল। পর পর এগুলি দর্শন করে আবার নেমে এলাম পথে।
এই বনের পরিবেশ দেখলে আপনিই ত্যাগ ও ভক্তিভাব জেগে ওঠে প্রাণে। প্রাচীন ভারতের তপোবনজীবন যে কত মধুর—কত যে সৌন্দর্য ও শান্তিতে ভরা ছিল তা এখানে না এলে বোঝানো যাবে না কাউকে।
এবার আমরা চললাম শান্তনুকুণ্ডের পথে। চলছি তো চলছিই। পথে চলার ক্লান্তি ক্লান্ত করে তুলেছিল সকলকেই। একসঙ্গে কেউই আমরা চলতে পারছিলাম না। বিশ্রামের জন্য পথে হারিয়ে যাচ্ছিলাম বার বার। তাই যাত্রীদের একত্রিত করার জন্য বসতে হয় মাঝে মাঝে। বসতেও হলো কিছুক্ষণ। তারপর আমরা সবাই চলতে লাগলাম একত্রিত হয়ে।
পথ যেন আর ফুরোয় না। কাঁচা রাস্তায় যেমন কাঁটা, পাকা রাস্তায় তেমনি কাঁকর ফুটে যায় পায়ে। আমাদের কারও পায়ে কিন্তু জুতো চটি কিছু নেই। এই পথ ও বন পরিক্রমা করতে হয় খালি পায়ে।
একটি গাছের তলায় সকলে একসঙ্গে হয়ে এবার চলতে লাগলাম একটা মাঠের মধ্যে

দিয়ে। এ-মাঠেও কাঁটা আছে তবে কিছুটা কম। জঙ্গল আর কাশবন বলে চলতে লাগলাম ধীরে ধীরে। আমাদের এই চলায় সব থেকে বেশী পিছিয়ে পড়েছেন কলকাতার নেতাজী কলোনীর বাসিন্দা খুকুর মা। একটু অপেক্ষা করে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এসে পৌঁছালাম শান্তনুকুণ্ডের পাড়ে। দেখলাম, এখানে আমাদের তাঁবু খাটানো রয়েছে।

এই ভ্রমণে সহযাত্রীদের মধ্যে কম বয়েসের আছে আবার বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সংখ্যাও কম নয়। তাই হাঁটা সকলের একসঙ্গে সমান তালে হয় না। কয়েকজনের দেরী দেখে টাঙ্গা পাঠিয়ে দিলেন মহারাজ। কিন্তু পাছে পুণ্য কমে যায়—এই ভয়ে টাঙ্গা ফেরত পাঠিয়ে দিলেন সহযাত্রী বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। সবাই ফিরে এলেও বাতে আক্রান্ত এক দিদিকে নিয়ে কষ্ট হয়েছিল একটু। অসুস্থ এই দিদির নাম রাজলক্ষ্মী কুণ্ডু। ছেলেরা সকলেই শিক্ষিত। এক ছেলে বগুলা কলেজের অধ্যাপক।

এরপর আমরা সকলে স্নান সেরে নিলাম শান্তনুকুণ্ডে। সুন্দর স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো জল এই কুণ্ডের। সদা সর্বদা আকাশের প্রতিচ্ছবি ধরে রেখেছে বুকে। একদা এইক্ষেত্রে পুত্রকামনায় তপস্যা করেছিলেন মহারাজ শান্তনু। তাই তাঁর নামানুসারেই হয়েছে কুণ্ডের নাম। প্রবাদ আছে, কোন সংকল্প করে এই কুণ্ডের জল স্পর্শ করলে তার মনোবাসনা সিদ্ধ হয়। মথুরা শহর থেকে শ্যামকুণ্ডের পথেই পড়ে এই শান্তনুকুণ্ড। বাস রিক্সা এবং টাঙ্গায় আসা যায় এখানে।

এই কুণ্ডের মধ্যে বেশ বড় একটা টিলার উপরে রয়েছে মাধবজিউর মন্দির। একটি পোলও আছে মন্দির পর্যন্ত। তাঁবুতে এসে আভাদিকে নিয়ে অসংখ্য বানরদের ডানে বায়ে রেখে গেলাম মন্দিরে। দরজা বন্ধ। তাই শান্তনু বিহারীজীর আর দর্শন হলো না। ফিরে এলাম তাঁবুতে। দেখলাম রান্না হয়ে গেছে। থালা গ্লাস নিয়ে বসে পড়লাম ব্রজের ধুলায়।

"ধুলো নয়, ধুলি নয়, গোপী-পদ রেণু,
এই ধুলি মেখেছিল, নন্দ বেটা কানু।"

এবার বিশ্রাম করতে করতে যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি ক্লান্ত শরীরে—জানি না। কীর্ত্তনের শব্দে যখন ঘুম ভাঙলো তখন রাত চারটে। উঠেই চলে গেলাম সোজা শান্তনু বিহারীজীকে দর্শন করতে। মাঝারী আকারের মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন এবং মন্দির পরিক্রমা করে ফিরে এলাম তাঁবুতে। প্রবাদ আছে, একদা এখানকার কুণ্ডে নন্দরাজ এবং মা যশোদা স্নান করেছিলেন পুত্রলাভের জন্য।

খুব ভোরে কীর্ত্তনসহ যাত্রা শুরু হলো রাধাকুণ্ডের পথে। শান্তনুকুণ্ডের পূর্বপাড় ধরে বহুলা বনের দিকে যাওয়ার পর এলাম একটা ছোট্ট সুন্দর গ্রামে। এই গ্রামটা পার হতেই দেখলাম একটু উঁচু জায়গার উপরে একটি মন্দির। আরও এগিয়ে

এলাম মন্দিরে। এটি রাধারমণের মন্দির। এর ডানদিকেই রয়েছে বিরাট একটি কুণ্ড—বহুলা কুণ্ড।
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় গাভীর নাম ছিল বহুলা। তার নামানুসারেই নাম হয়েছে এই বনের। এই বনে কৃষ্ণকুণ্ড নামে আছে আরও একটি কুণ্ড। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এক সময় এসেছিলেন এই বনে। গো-বৎসাদি দেখে ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন তিনি। এখানে স্নান সেরে নিলাম। আমাদের পথপ্রদর্শক কালীচরণ পাণ্ডাজী আবার সকলকে নিয়ে এগিয়ে চললেন বম্বার (খাল) পাড় ধরে। হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়লাম একটা পাকা রাস্তায়। কিন্তু রাস্তা আর শেষই হয় না। একটু চলছি আর বিশ্রাম নিচ্ছি পথের ধারে গাছের ছায়ায়। এদিকে পিচের রাস্তা একেবারে গরম হয়ে গেছে। পা রাখা যায় না। তারই উপর দিয়ে ক্রমাগত হেঁটে রাধাকুণ্ডের পাড়ে যখন এলাম তখন বেলা প্রায় তিনটে। বহুলা বন থেকে এই পর্যন্ত ৮ কি.মি.। এখানে ভাস্কর বাবাজী তাঁবু ফেলেছেন রাস্তার ধারে কুণ্ডের পাড়ে। দেরী না করে রাধাকুণ্ডে স্নান করে আহ্নিক সেরে নিলাম।
কার্ত্তিক মাস। অসংখ্য সাধুসন্ন্যাসী আর তীর্থযাত্রী এসেছেন এই রাধাকুণ্ডে। অগণিত মন্দির রয়েছে এখানে। রাধাকৃষ্ণের নাম গানে মুখরিত হয়ে উঠেছে প্রতিটি মন্দির। এখানে দর্শন করলাম এ যুগের সিদ্ধপুরুষ বৈষ্ণব সাধক তিনকড়ি গোস্বামীর শ্রীচরণ। আনন্দে মনটা আমার ভরে গেল। রাতে আমি আর রুণুদি একটি মন্দিরে ভাগবত পাঠ শুনে ফিরে এলাম তাঁবুতে। তারপর খিচুড়ী প্রসাদ পেলাম একসঙ্গে। আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। একটু লেখালিখি সেরে শুয়ে পড়লাম।

আজ খুব ভোরে উঠলাম। একাই চললাম শ্যামকুণ্ড আর রাধাকুণ্ড পরিক্রমায়। যাওয়ার পথে ভাগবত পাঠ শুনলাম তিন জায়গায়। তারপর রাধাকুণ্ড এবং শ্যামকুণ্ডের পাড় ধরে পরিক্রমা করে ফিরে এলাম তাঁবুতে। এসে দেখি সহযাত্রীরা সবাই চলে গেছেন রাধারাণীর মামার বাড়ী মুখরা দর্শনে।
মুখরা গ্রাম আমাদের তাঁবু থেকে সামান্য পথ। মাত্র ৩ কি. মি.। কেউ নেই সঙ্গে তাই একাই চললাম। পথে সহযাত্রীদের কারও সঙ্গেই দেখা হলো না। কিছুটা পাকা রাস্তা। তারপর শুরু হলো গ্রাম্য পথ। দুপাশে কাশ বন। চলতে লাগলাম পরমানন্দে। পথে কয়েকজন রাখাল বালককে জিজ্ঞাসা করতে করতেই পৌঁছে গেলাম মুখরা গ্রামে।
একটি ব্রজবালকের সঙ্গে পরিচয় হলো এখানে। তার সহযোগিতায় ঘুরে ঘুরে দেখলাম ভজন কুটির, মন্দির এবং একজন গৌড়ীয় বাঙালী বৈষ্ণব ভজনান্দীকে। আর দেখলাম ব্রজেশ্বরীর মামার বাড়ীতে রাধারাণীর খেলার বাজনা। এ-যুগের

পিয়ানোর মতো একটি বেশ বড় পাথর। ঘা মারলেই সুন্দর একটি মিষ্টি আওয়াজ হয়। এমন বাজনা-পাথর আগে দেখিনি কখনও। অথচ ওই রকম একই পাথর পড়ে রয়েছে আরও কয়েকটা। তাতে ঘা মারলে বাজে না। রাধারাণীর দিদিমার নাম ছিল মুখরা দেবী। তাঁর নামানুসারেই গ্রামটির নাম হয়েছে মুখরা গ্রাম।
এরই পশ্চিমদিকে রয়েছে একটি পুরনো দিঘী। পাড়ে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম, ঘাট প্রায় নিশ্চিহ্নই হয়ে গেছে। এখানে দেখা হলো কয়েকজন সাধু বৈষ্ণবের সঙ্গে। জানতে চাইলাম, তাঁদের খাওয়া পরা চলছে কেমন করে? বৈষ্ণবী-বিনয়ে তাঁরা বললেন, রাধারাণীর কৃপাতেই চলছে আমাদের। কোন কষ্ট নেই। ব্রজবাসীরা এই গ্রাম থেকে এনে দেন প্রয়োজন মতো কিছু আটা ঘি দুধ। ঋতু অনুযায়ী কিছু ফলমূল এবং সব্জীও দেন। রাধারাণীর কৃপায় তাতেই চলে যায় আমাদের। আর দর্শনার্থীরা এলে কেউ কেউ ৫/১০ পয়সা দেন। অভাবটা থাকে না।
কথাটা শেষ হতেই একটু এগিয়ে গেলাম। দূরে দেখলাম একটা স্কুল হচ্ছে। আমার গাইড ব্রজবালকটি স্কুলের কাছে নিয়ে গেল না। কারণ ও আজ আর স্কুলে যায়নি। যদি পণ্ডিতজী দেখে বেত মারে—এই ভয়ে। ওকে কিছু পয়সা দিয়ে ফিরে এলাম তাঁবুতে। প্রসাদ পেলাম যথা সময়ে।
এখানে ভাগবত পাঠ হচ্ছে প্রতিটি মন্দিরে। আজ আমাদের তাঁবুতেও ভাগবত পাঠ করবেন একজন বাঙালী ব্রজবাসী পাঠক। রাতে তাঁর মুখে শুনলাম ভগবত-কথা আর শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের মাহাত্ম্য-কথা। পাঠের পর কীর্তন শোনালেন আনন্দ বাবাজী। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে। গরম গরম খিচুড়ী খেয়ে সকলেই আশ্রয় নিলাম নিদ্রাদেবীর কোলে।

ঘুম ভাঙলো ভোর চারটের সময়। তবে অন্ধকার কাটেনি এখনও। ইতিমধ্যে সহযাত্রীরা প্রায় সকলেই উঠে পড়েছেন। চারদিক থেকে ভেসে আসছে মঙ্গল আরতির কাঁসর আর ঘণ্টার ধ্বনি। আজ এখান থেকে যাত্রা শুরু হবে গিরি গোবর্ধনের পথে। সবাই প্রস্তুত হয়ে নিলাম। কীর্ত্তনসহ যাত্রা শুরু হলো। আনন্দবাবাজীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে ভজন গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চললাম একসঙ্গে। প্রায় ১ কি.মি. চলার পরে দেখলাম কুসুম সরোবর। এখনও অন্ধকার রয়েছে। এই সরোবরের পাড়েই স্থাপিত আছে সুন্দর একটি মন্দির। মন্দির খোলেনি তাই বিগ্রহ দর্শন হলো না।
ভরতপুরের মহারাজার অবদান আছে এই কুসুম সরোবরে। তাঁর প্রচেষ্টায় সুন্দর-ভাবে সংস্কার হয়েছে এই সরোবর। এর চারপাশের বন এমন সুন্দর—বসন্ত ঋতু যেন অন্য কোন ঋতুকেই এখানে আসতে দিতে চায় না। কুসুম সরোবরের এই বনে একদা শ্রীমতী রাধা তৈরী করতেন কৃষ্ণের জন্য প্রেম-মালা। সরোবরের ফুল তুলে তিনি

অর্ঘ্য সাজাতেন সূর্যদেবের।

কুসুম সরোবরের কাছেই রয়েছে নারদ কুণ্ড। এই কুণ্ডের পশ্চিম-পাড়ের একটি মন্দিরে রয়েছে দেবর্ষি নারদের প্রতিমূর্তি। গোপবালাদের প্রেমাকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন বৃন্দাবনে—বৃন্দাবনলীলা করতে। একদা এ-লীলার আকর্ষণ প্রলুব্ধ করেছিল দেবতা, মহাদেব এমনকি নারদকেও। এরজন্য তপস্যা করতে হয়েছিল নারদকে। এই কুণ্ডক্ষেত্রে কৃষ্ণলীলা দর্শনার্থে তপস্যা করেছিলেন তিনি।

এখানে সামান্য বিশ্রাম আর দর্শনের পর শুরু হলো আবার চলা। হাঁটা পথ। রাস্তা একেবারেই ভালো নয়। বড্ড কষ্ট হয় পথ চলতে। অসমর্থ যাত্রীদের টাঙ্গায় করে পাঠিয়ে দিলেন পীতাম্বরদাস বাবাজী। তিনি প্রায়ই আমাদের সঙ্গে থাকতে পারছেন না। কখনও টাকা আনার জন্য যাচ্ছেন বৃন্দাবনে, কোথায় তাঁবু ফেলা হবে তার ব্যবস্থা, রান্নার জোগাড় আবার কখনও ছুটছেন থানায় তাঁবু পাহারার ব্যবস্থার জন্যে। নানা কাজে ব্যস্ত থাকছেন তিনি।

কাণ্ডারীহীন পালতোলা নৌকার মতো একবার এখানে, একবার ওখানে ঠেকতে ঠেকতে চললাম প্রায় মাইল খানেক। তারপর দেখা হলো মহারাজের সঙ্গে। তিনি চলে গেলেন চাকুলেশ্বর মহাদেব দর্শন করতে। আর আমরা গোবর্ধন শহরের বাড়ীঘর আর অসংখ্য মন্দির দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম ডানদিক ধরে। এখনও গোবর্ধন পাহাড়কে দেখা যাচ্ছে না। দূর থেকে দেখতে পেলাম সুন্দর একটি মন্দির—রঙ্গনাথজীর মন্দির। বাইরে থেকে প্রণাম জানিয়ে ভরতপুর-মহারাজের রাজবাড়ী ছেড়ে এলাম বিশাল একটি সরোবরের তীরে। এর নাম মানসীগঙ্গা। কথিত আছে, একদা মকরবাহিনী গঙ্গা নন্দ-যশোদাকে স্নান করাবার জন্যে ব্রজেশ্বর কৃষ্ণের ডাকে এসেছিলেন এখানে।

এবার এ-পথ সে-পথ করে এলাম চাকুলেশ্বর মহাদেবের ঘাটে। ঘাটের শোভা আর মানসীগঙ্গার রূপ দেখে একেবারে অভিভূত হয়ে গেলাম। একজন পাণ্ডার সাহায্য নিয়ে পুজো দিলাম মানসীগঙ্গার। ঘাটের উপরেই রয়েছেন চাকুলেশ্বর মহাদেব আর গিরি গোবর্ধনজী। দর্শন করে গেলাম সনাতন প্রভুর ভজনস্থলীতে। এই মন্দিরে রয়েছে গৌর নিতাই-এর সুদর্শন বিগ্রহ।

মহারাজের তাড়ায় আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সকলে এসে আবার মিলিত হলাম ঘাটে। তারপর এক সঙ্গে মিলে চলতে লাগলাম। মানসীগঙ্গার দক্ষিণ পাড়ে রয়েছে হরিমন্দির। এলাম মন্দিরে। প্রবাদ আছে, হরি পাথরের বিগ্রহ হয়েও এখানে একদা নৃত্য করেছিলেন ভাবতন্ময় প্রেমের ঠাকুর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সঙ্গে।

এবার মহারাজের নির্দেশে পাণ্ডাজী আমাদের নিয়ে চললেন একটি রাজপথ ধরে—গিরিরাজকে ডান হাতে রেখে। প্রায় একঘণ্টা চলার পর এসে পৌঁছালাম চন্দ্র সরোবর। এখানেই শ্রীকৃষ্ণ মহারাসলীলা করেছিলেন ছয় মাস ব্যাপী। সরোবরের পূর্বদিকের পাড়েই রয়েছে দাউজির মন্দির। বিগ্রহ দর্শন করে একটু এগিয়ে

যেতেই পড়লো চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ। কিন্তু এখানে না দেখলাম রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণকে, না পেলাম চন্দ্রাবলীর দর্শন। ঘুরে এলাম বিফল মনে। তবে একসময় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে চন্দ্রাবলী কৃষ্ণলীলার আনন্দ স্রোতে ভেসে বেড়িয়ে ছিলেন এখানে। চন্দ্রসরোবর শ্রীকৃষ্ণের লীলাতীর্থ। ব্রজবালারা কখনও চতুর্ভুজ নারায়ণের কামনা করতেন না। তাঁরা ছিলেন দ্বিভুজ কৃষ্ণের অনুরাগী-প্রেমিকা। শ্রীকৃষ্ণের বিশালতা ব্রজাঙ্গনাদের আকৃষ্ট করতে পারেনি। প্রেমই তাঁদের তুলে দিয়েছিল সমস্ত বোধ ও বন্ধনের ঊর্দ্ধে।

চন্দ্রসরোবরের পাশেই রয়েছে শৃঙ্গার মন্দির, রাসমণ্ডপ বলদেবজীর মন্দির আর সংকর্ষণকুণ্ড। এখানেই আছে ভক্ত সুরদাসের ভজন কুটির। গোবর্ধন থেকে দূরত্ব এর ২ কি.মি.।

এবার সুরদাস মহাবিদ্যালয়কে বাঁয়ে রেখে আমাদের কীর্ত্তনকে অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম গোবর্ধন গিরিরাজকে দর্শন করতে। আমরা যাত্রী সংখ্যায় প্রায় আশিজন। হাঁটতে হাঁটতে একটা গ্রামের প্রান্তে এসে দেখলাম অনেকগুলি পাথরের চাঁই পড়ে আছে। এগুলি ক্লান্ত পথিকদের বসার জন্যে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার! এখানে গোবর্ধন পাহাড়ের পাথরে একমাত্র ব্রজবাসী ছাড়া আর কারও বসার অধিকার নেই। আমরা সকলে ক্লান্ত হলেও বসলাম না। একটু হাঁটার পর এলাম একটি মন্দিরে। গোপীনাথসহ অন্যান্য বিগ্রহ দর্শন করে এগিয়ে গেলাম। এখানে চারদিকে ভেসে আসছে নানা পাখী আর ময়ূর-ময়ূরীর ডাক। গোবর্ধনজীর শেষপ্রান্ত পার হয়ে ডানহাতে পেলাম একটি সুন্দর মন্দির। রাধাগোবিন্দের এই মন্দিরটি বেশ পুরনো।

গোবিন্দ মন্দিরের পাশেই গোবিন্দকুণ্ড। অপূর্ব মনোরম পরিবেশ। চারপাশের গাছের ছায়া পড়েছে কুণ্ডে। নির্মল জল। একদা এই ক্ষেত্রটিতেই দেবতারা শ্রীকৃষ্ণকে গোবিন্দ নামে ভূষিত করেন।

গোবিন্দকুণ্ডের পূর্বদিকে গোবিন্দ মন্দিরে রাধাগোবিন্দ, দক্ষিণ পাড়ে মদনমোহন মন্দিরে রাধা মদনমোহন, রাসবিহারী মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ, শ্রীনাথ মন্দিরে শ্রীনাথজীর বিগ্রহ দর্শন করে এলাম পশ্চিমপাড়ে। এখানেই বিরাজ করছেন গোবর্ধন মহারাজ। দর্শন ও প্রণাম করে উত্তরতীরে একটি টিলার উপরে প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন মন্দিরে নিতাই গৌর এবং রাধা মদনমোহনের বিগ্রহ স্থাপিত আছে। এই মন্দিরের পাশেই রয়েছে বৈষ্ণব সাধক মাধবদাস বাবাজীর আশ্রম। একে একে সব দর্শন করে এবার আমরা এলাম কাছেরই সনাতন প্রভুর ভজনস্থলীতে। এরই পাশে রয়েছে দাউজীর মন্দির। পায়ে পায়ে তাও দর্শন করলাম।

এবার চললাম গিরিরাজের অপর প্রান্তে—উত্তর দিকে। এমন অপূর্ব সুন্দর পথ আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—দেখে চোখ যেন আর ফেরানো যায় না। দেখতে দেখতে এলাম ঐরাবত কুণ্ডে। হাতির আকারে কালো পাথরের মধ্যে রয়েছে জল।

শ্রীসুরভী কুণ্ডের উত্তর দিকে অবস্থিত রয়েছে শ্রীকদম্বখণ্ডি। শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে,

"এই যে 'কদমখণ্ডি—কৃষ্ণ এইখানে।
চাহি' রহে রাধিকাগমনপথ-পানে॥"

শ্রীকদম্বখণ্ডির মাঝখানে রয়েছে ঐরাবত কুণ্ড। শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় কদম্বখণ্ডি নামক একটি বন রয়েছে সুরভী কুণ্ডের উত্তরে। এই বনের মধ্যেই আছে ঐরাবত কুণ্ড। এই বন এবং কুণ্ড দর্শন করলে মানুষ ভক্তি ও মুক্তিলাভ করে।

সকলে কুণ্ডের জল মাথায় দিয়ে ডানদিকে একটু এগিয়ে যেতেই দেখলাম একটি নির্জন আশ্রম। একাই ভিতরে ঢুকলাম। দেখলাম, ভিতরে নিতাই গৌর রাধাবিহারী-জীর বিগ্রহ। আর রয়েছে আমার পরম প্রভু রাধারমণজী এবং পরমপ্রভু শ্রীপাদ রামদাস বাবাজীর বিগ্রহ। এমন নির্জন জায়গায় আমার আরাধ্যকে দেখবো—মোটেই ভাবিনি। এই জায়গার নামই কদম্বখণ্ডি। এখানে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই রয়েছেন লীলাযুক্ত হয়ে।

এবার এলাম পাশেই যতীপুরায়। এই গ্রামের প্রাচীন নাম শ্রীগোপালপুরা গ্রাম—হরজী কুণ্ডের উত্তরে অবস্থিত। এখানে শ্রীনামজী ও গোপালজীর মুখ দর্শন করলাম। গিরিরাজ গোবর্ধনের জিহ্বা ও মুখ রয়েছে এখানে। আর আছে দুধের নালা। সকলে দুধ তুলসী ফলসহ পুজো দেন। সেই দুধের স্রোত বয়ে চলে যায় নালা দিয়ে।

গিরিরাজের এখানে একদা শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী নানা উপকরণে অন্নকূট মহোৎসব করেছিলেন। আজও কার্ত্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে সে উৎসব পালিত হয় মহাসমারোহে। এর কাছেই রয়েছে শ্রীপাদ বল্লভাচার্যের উপবেশন স্থান। এই গ্রামেই আছে শ্রীমদনমোহন, শ্রীনবনীত প্রিয়াজী ও শ্রীমথুরেশজীর মন্দির।

ঘুরতে ঘুরতে সবাই ক্লান্ত এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বেশ কাতর হয়ে পড়েছি। এখনও অনেক পথ বাকি। শরীর যেন আর চলছে না। তবুও আবার শুরু হলো চলা। চললাম সোজা গিরিগোবর্ধন পাহাড়ের পাদদেশ ধরে বনের শোভা দেখতে দেখতে। অনেকটা পথ হেঁটে বেলা প্রায় তিনটের সময় এলাম তাঁবুতে। প্রসাদ পেতে বেলা প্রায় চারটে গড়িয়ে গেল। আজ প্রসাদ পেলাম অন্ন ডাল আর পাঁচ-মিশালি একটা তরকারী। এই পরিক্রমা পথে ভালো খাবার কিছু জোটে না। কখন ডাল অন্ন আর একটা তরকারী নইলে খিচুড়ী আর সঙ্গে একটা ঘ্যাট। এমন খাওয়া চলে দুবেলা। ক্ষিদের মুখে এই খাবারই সকলের মুখে হয়ে ওঠে যেন অমৃত।

যাইহোক, ক্লান্ত দেহে একটু বিশ্রাম করছি, হঠাৎ দেখি আকাশ একেবারে কালো হয়ে রাজস্থানের 'আঁধি' নেমে এলো। চারদিক ছেয়ে গেল ঘন অন্ধকারে। শুরু হলো প্রবল ঝড় আর সঙ্গে দারুণ বৃষ্টি। কার্ত্তিক মাসে এমন ঝড় বৃষ্টি বড় একটা হয় না।

এরই মধ্যে মোহন্ত মহারাজ ছুটে এলেন তাঁবুতে। প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করলেন, সঙ্গে কেউ গোবর্ধন শিলা এনেছে কি না? কারও কাছে থাকলে তা পাণ্ডাজীকে প্রণামীসহ দিয়ে দিতে বলে চলে গেলেন অন্য তাঁবুতে।
এদিকে ঝড় আরও বেড়ে চললো। আমাদের তাঁবুও গেল একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে। ঝড় জলের মধ্যে হুড়োহুড়ি করে অধিকাংশ সহযাত্রীই চলে গেলেন ভরতপুর মহারাজের পুরনো হাসপাতালে। রাতটা কাটলো কোনরকমে। তবে রাত্রে আজ আর রান্না খাওয়া হলো না। অনেকক্ষণ একনাগাড়ে ঝড় বৃষ্টি হওয়ার পর কমে গেল ধীরে ধীরে। এবার জানতে পারলাম, আমাদের দলেরই এক বুড়িমা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন গোবর্ধন শিলা। পরে প্রণামীসহ সেটি ফেরৎ দিয়েছিলেন পাণ্ডাজীকে।

আজ বাংলা কার্ত্তিক মাসের ১০ তারিখ, ১৩৮৭। ঘুম থেকে সকলেই উঠে পড়লেন খুব তাড়াতাড়ি। কীর্ত্তনসহ যাত্রা শুরু হলো ভোর পাঁচটায়। ঘন ঘন উলুধ্বনি দিলেন দিদিরা। মন্ত্রপাঠ করলেন পাণ্ডাজী। আনন্দবাবাজীর সঙ্গে প্রভাতী সুরে সুর মিলিয়ে এগিয়ে চললাম সকলে। প্রায় ৪ কি.মি. পথ হেঁটে আমরা এলাম গোধুলি গ্রামে। এই গ্রামের আরও ভিতরে রয়েছে গুলাল নামে একটি কুণ্ড। পথকষ্টের কথা ভেবে আর দর্শনে গেলাম না কেউই।
এই গোধুলি গ্রাম থেকেই আমাদের চলা শুরু হলো ডিগের দিকে। বাঁধানো পিচের রাস্তা ধরে প্রায় ৪ কি.মি. আসতেই পেলাম রাধামাধবজীর মন্দির। এখানে একটু বিশ্রাম এবং দর্শনের পর শুরু হলো আবার চলা।
হাঁটতে হাঁটতে এবার প্রবেশ করলাম যোধপুর শহরে। ফোর্টের এলাকা ছাড়তেই দেখলাম ভরতপুর রাজপ্রাসাদের বিরাট ফটক। পাণ্ডাজী ফটকের বাইরে বসে রইলেন। আমরা ভিতরে ঘুরে দেখে এলাম। অনেক কিছুই দেখার আছে তবে কৃষ্ণলীলার নামগন্ধ নেই। এটা ঠিক যে, রাজবাড়ী না দেখলে সত্যিই আফশোষ থেকে যেতো। এখানে বিশ্রামের অবসরে কৃষ্ণলীলার মাহাত্ম্য কথা শোনালেন পিতাম্বরদাস বাবাজী। সামনেই গণেশজীর মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করে জনবহুল শহরের মধ্যে দিয়ে চললাম ডিগের পথে। শহরের কেন্দ্রস্থলে সকলে দর্শন করলাম লছমন্‌জীর মন্দির।
বেলা প্রায় সাড়ে বারোটায় ডিগ-এ এলাম আমাদের তাঁবুতে। মহিষের গাড়ীতে রান্নার জিনিষপত্র দেরীতে আসায় প্রসাদ পেতে বেলা তিনটে বেজে গেল। আজকের যাত্রা এখানেই শেষ। গোবর্ধন থেকে ডীগ এলাম সাড়ে ৯ কি.মি.।
ডীগ পড়েছে রাজস্থানের মধ্যে। এর আর এক নাম লাঠাবন। এটি ব্রজমণ্ডলের ৮৪ ক্রোশ পরিধির মধ্যেই পড়ে। ভরতপুরের মহারাজা এই বনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিলেন। স্কন্দপুরাণে দীর্ঘপুর নামে যে পবিত্র তীর্থের বর্ণনা আছে সেটিই

আজকের এই লাঠাবন বা ডীগ। শ্বেতপাথরের কারুকার্যখচিত একটি সুন্দর ভবন আছে এখানে। এর প্রতিটি মহলই সুন্দর। দিল্লী এবং আগ্রার তৎকালীন বাদশাদের লুট করা বহু জিনিস, নুরজাহানের শ্বেতপাথরের দোলনা ইত্যাদিও রাখা আছে এখানে। এই ভবনের পাশেই রয়েছে একটি কুণ্ড—কৃষ্ণকুণ্ড।

এগুলি দেখার পর ঘুরে ঘুরে দর্শন করলাম লাঠাবনের সাক্ষীগোপাল মন্দির, গোবর্ধননাথের মন্দির, দ্বারকাধীশ মন্দির এবং লালকুণ্ড। এই লাঠাবনে যাত্রীদের থাকার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। ধর্মশালা আর আশ্রমেরও অভাব নেই।

লাঠাবনে আসার পথে গোধূলি গ্রাম শ্রীকৃষ্ণের একটি লীলাস্থল। একদা শ্রীকৃষ্ণ এখানে রাধা এবং সখাসখীদের সঙ্গে মেতে উঠেছিলেন দোলখেলায়। গোধূলি গ্রামকে হিন্দীভাষীরা গাঠুলি গ্রামও বলে।

আজ অসম্ভব ঠাণ্ডা পড়েছে এখানে। রাতের প্রসাদ পেয়ে ডায়েরী লিখে শুয়ে পড়লাম কম্বল গায়ে দিয়ে।

ভোর চারটের সময় উঠে যাত্রা শুরু করলাম কীর্ত্তনের সঙ্গে। পথের জলখাবার দেয়া হলো চিঁড়ে গুড়। লাঠাবন থেকে কিছুটা এগোতেই পড়লো নৃসিংহদেবের মন্দির। বিগ্রহ দর্শন করে আরও এগিয়ে গেলাম সকলে। দেখলাম, একটা রাস্তা দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেছে এখানে। কোন্‌দিকে যাবো বুঝতে পারলাম না। বসে রইলাম মহারাজের আসার অপেক্ষায়। এরই মধ্যে কয়েকজন গ্রামবাসী নিয়ে এলেন মাঠা-ঘোল। সেবা করালো আমাদের। মহারাজের জন্যেও রেখেছিলাম। আধঘন্টা পর মহারাজ এলেন। যাওয়ার নির্দেশ দিলেন ডানদিকে। টানা হেঁটে এলাম প্রায় ৯ কি.মি. রাস্তা। ঢুকলাম সুদামাপুরী গ্রামে। এখানেও আমাদের কীর্ত্তনের আওয়াজ শুনে গ্রামবাসীরা গরম দুধ আর ঘোল এনে দিলেন। সকলে তা সানন্দে পান করলাম।

এখানকার মন্দিরে দর্শন করলাম দেবী রুক্মিনী, দ্বারকানাথ এবং কৃষ্ণসখা সুদামার বিগ্রহ। মন্দিরের সামনে—এখানেও রয়েছে কৃষ্ণকুণ্ড। চট্ করে স্নানটা সেরে নিলাম। তারপর একজন অসুস্থ এবং কয়েকজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চললাম ধীরে ধীরে। সাড়ে ৩ কি.মি. পথ এলাম এক ঘণ্টায়। এখানে রয়েছে বুড়ো বদ্রীনাথের মন্দির। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমণ্ডলে এনেছিলেন সমস্ত তীর্থকে—বাদ রাখেননি একটিকেও। যারজন্যই তো বলা হয় ব্রজ ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমা করলে ভারতের সমস্ত তীর্থ দর্শন করা হয়। এই গ্রামের মধ্যে দিয়েই বয়ে গেছে একটি নদী—নাম অলকানন্দা।

বুড়ো বদ্রীনাথ দর্শন করে এবার আমরা ধরলাম বন-জঙ্গলের পথ। প্রায় সাড়ে ৪ কি.মি. পথ হাটার পর এসে পৌঁছালাম ঘোবনে। সুন্দর মনোরম এই বনে একদা

ব্রজগোপীদের কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিলেন শ্যামসুন্দর। একটি প্রাচীন মন্দির রয়েছে এখানে। মন্দিরে দর্শন করলাম রাধারমণ, রাধারাণী আর গোপেশ্বরকে। এই বনে আলাপ হলো অতি মিষ্টভাষী এক সাধুজীর সঙ্গে। তারপর ফিরে এলাম তাঁবুতে। দেখতে দেখতে কেটে গেল দিনটা। রাতের প্রসাদ পেয়ে শুয়ে পড়লাম। রাতটাও কেটে যাবে দেখতে দেখতে, যেমন কেটে গেছে দিনটা।

আজ আমরা একটি বনে বাস করবো। বনের নাম পসুপা। প্রতিদিনের মতো আজও উঠলাম ভোর পাঁচটায়। কীর্ত্তনসহ শুরু হলো যাত্রা। মাত্র মাইল খানেক গ্রামের পথ। তারপর পেলাম পাথর আর কাঁকরে ভরা পাহাড়ী রাস্তা। এই পথ ধরেই পৌঁছাবো আদি বদ্রীনারায়ণ। চড়াই উৎরাই আর পাকদণ্ডীর পথে প্রথম পাহাড়টা পার হতে বেশ কষ্ট হলো। মাঝে মাঝে সরু পথের দুদিকে বনফুলের গাছ যেন টেনে ধরছে। আর পায়ে পাথরের খোঁচা খেতে খেতে এগিয়ে চললাম সকলে। এইভাবে কিছুটা চলার পরই এসে গেলাম দুটি পাহাড়ের মাঝখানে। পাণ্ডাজী দাঁড়াতে বললেন। তারপর এই স্থানটির মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বললেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা নন্দ মহারাজ এবং মাতা যশোদাকে এই ৮৪ ক্রোশ ব্রজের মধ্যেই দেখিয়েছিলেন সমস্ত তীর্থধাম। তাই আমরা ব্রজের পথে চলতে চলতেই দর্শন করছি একের পর এক ভারতের সমস্ত তীর্থ।

আবার শুরু হলো চলা। ঘণ্টা খানেক চলার পর এলো সমতল রাস্তা। আমরাও এলাম অলিপুর গ্রামে। চারদিক এর পাহাড়ে ঘেরা। মনোরম পরিবেশ। এখানকার গ্রামবাসীরা জাতে গুজ্জর। গরু ছাগল পালনই এদের প্রধান জীবিকা।

হাঁটাই আমাদের একমাত্র কাজ। এবার এলাম গ্রামের শেষ প্রান্তে। দেখতে পেলাম ছোট একটা পাহাড়ের উপর বদ্রীনারায়ণের মন্দির। শুরু হলো অপূর্ব সুন্দর বন। নাম না জানা কত ফুল ফলের গাছ রয়েছে চারপাশে। ঝাঁকে ঝাঁকে কত বিচিত্র ধরনের পাখী। দেখছি অসংখ্য ময়ূর-ময়ূরী ঘুরে বেড়াচ্ছে নির্ভয়ে। আর পাহাড়ের এখানে ওখানে বসে আছে বেশ কিছু হনুমান।

ধীরে ধীরে পাহাড়ে উঠে দর্শন করলাম বদ্রীনারায়ণজীকে। মন্দিরের কাছেই রয়েছে একটি কুণ্ড। সকলেই স্নান সেরে নিলাম এখানে। এরই মধ্যে আমাদের ব্রজবাসী পথপ্রদর্শক কালীচরণ পাণ্ডা বললেন, এখানকার যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, হৃষিকেশ, লছমনঝোলা, হর কি পেয়ারী—দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে নিতে। দেরী না করে সীতারাম নামে একজন স্থানীয় পথপ্রদর্শককে নিয়ে এগিয়ে গেলাম। প্রায় ৩ কি.মি. পাহাড়ী পথে চলার পর এলো হর কি পেয়ারী, লছমনঝোলা, হৃষিকেশ। এগুলো দর্শন করতে করতে উঠে এলাম পাহাড়ের আরও কিছুটা উপরে। এখান থেকেই দর্শন করলাম যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী। এখানে কিন্তু জল নেই—বরফও নেই।

আছে শুধু সাদা পাথরের পাহাড়। এসব দর্শন শেষে আবার ফিরে এলাম বদ্রীনারায়ণ মন্দিরে।

আজ এই মন্দিরে ভোগের খরচা দিয়েছেন পীতাম্বরদাস বাবাজী। বেলা দেড়টায় হলো ভোগ আরতি। উৎকৃষ্ট ঘিয়ে ভাজা পুরি, আলুর শাক, তরকারী আর খাঁটি দুধের পরমান্ন প্রসাদ পেলাম আকণ্ঠ।

ঘণ্টাদুয়েক বিশ্রামের পর বেলা সাড়ে চারটে নাগাদ রওনা দিলাম সকলে—পসুপার পথে। আবার শুরু হলো পাথর কাঁকরে ভরা রাস্তা আর জলা-জঙ্গল। অসম্ভব পথকষ্ট সহ্য করে পরবর্তী তাঁবুতে যখন এলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

এখানে আর বিশ্রাম করলাম না। কয়েকজন মিলে বেরিয়ে পড়লাম স্থানীয় মন্দিরগুলি দর্শন করতে। একটু হেঁটে উঠলাম পাহাড়ের উপরে। সুন্দর একটি মন্দির রয়েছে এখানে। দর্শন করলাম মনোহর বনবিহারীজীসহ রাধারাণীকে। সারা পথের কষ্ট ভুলে গেলাম মুহূর্তে। এই মন্দিরের ভিতরে তিনদিকে এমন সুন্দরভাবে আয়না টাঙানো আছে—এক যুগল বিগ্রহকে চার যুগল বিগ্রহ বলে দর্শন হয়। সন্ধ্যা হয়ে এলেও এখনও পরিষ্কার সব দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে ব্রজভূমির চারদিকের শ্রীকৃষ্ণ লীলাক্ষেত্রের রূপ এমন অপূর্ব সুন্দর—দেখে আর চোখ ফেরানো যায় না। একটা পাথরের চাঁই-এ বসে রইলাম কিছুক্ষণ। এরই মধ্যে বেতো দুলালী দিদিও এসে গেছেন ভাস্করদার সাহায্য নিয়ে। অদ্ভুত ভক্তিমতী। পায়ে এমন বাতের ব্যথা। চলা-ফেরাটাই কষ্টসাধ্য। এসব সত্ত্বেও তিনি কোন দর্শনই বাদ দিচ্ছেন না।

এবার ফিরে এলাম তাঁবুতে। সন্ধ্যায় আরতির পর স্থানীয় একজন বাবাজীকে ডেকে আনা হলো। তিনি হিন্দিতে এই স্থানটির মাহাত্ম্য আর ভাগবত-কথা শোনালেন।

রাতে প্রসাদ পেতে বসেছি, হঠাৎ শুরু হয়ে গেল তুমুল ঝড় বৃষ্টি। বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। কারণ আমাদের তাঁবু থেকে লোকালয় অনেকটা দূরে। কোন অসুবিধে হলে যাওয়ার কোন উপায় নেই। তাই এই সময় উচ্চস্বরে নাম শুরু করলেন মহারাজ। একই সঙ্গে আমরাও। ধীরে ধীরে ঝড় বৃষ্টি থেমে গেল। তারপর রাতের প্রসাদ পেলাম। লেখার কাজটুকু সেরে ঘুমিয়ে পড়লাম। বৃষ্টির জন্যে বেশ ঠাণ্ডা পড়লো।

আজ আমরা যাত্রা শুরু করলাম একটু দেরীতে—ভোর ৬ টায়। পাণ্ডাজী সর্টকাট পথে দুঘণ্টায় নিয়ে এলেন ব্রজের অন্তর্গত কেদারনাথ পাহাড়ের নীচে। মহানন্দে সকলে উঠে এলাম কেদারনাথ পাহাড়ের মাথায়। সাদা ধবধব করছে পাথর। মাঝারী আকারের মন্দির। দর্শন করলাম কেদারনাথকে। তারপর নীচে নেমে

এলাম গৌরীকুণ্ডের পাড়ে। এখানে স্নান সেরে এগিয়ে চললাম মেঠোপথ আর বনের মধ্যে দিয়ে। এলাম ভরতপুরে। এবার এখান থেকে কখনও কাঁচা আবার কখনও পাকা রাস্তা ধরে চলতে চলতে এসে পৌঁছালাম একটি পাহাড়ের পাদদেশে। কোথাও না থেমে পথ চলা হলো প্রায় সাড়ে ৪ কি.মি.।
একটু বিশ্রাম নিলাম। সামনেই উঠে গেছে সিঁড়ি। ২৮০ টা সিঁড়ি আর কিছুটা পাথুরে পথ ভেঙে উঠে এলাম মন্দিরে। ব্রজের কাম্যবনের অন্তর্গত এই স্থানটির নাম চরণ পাহাড়ী। শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন রয়েছে মন্দির-মধ্যে। এখান থেকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভুবনকে মোহিত করেছিলেন তাঁর সুমধুর বাঁশীর ধ্বনিতে।
গোবিন্দের চরণচিহ্ন দর্শন করে নেমে এলাম নীচে। এদিকে বেলা বাড়ছে—রোদের তাপও বাড়ছে ক্রমশ। এখান থেকে আবার শুরু হলো চলা। বেলা প্রায় দেড়টার সময় এসে পৌঁছালাম কাম্যবনে। কেদারনাথ মন্দির থেকে ধরলে কাম্যবনের দূরত্ব ৯ কি.মি.।
এখনও তাঁবু খাটানো হয়নি। তাই কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম স্নান করতে। এই কাম্যবনে বিমলাকুণ্ড, গয়াকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড ছাড়াও রয়েছে আরও কয়েকটি কুণ্ড। আমরা স্নান করলাম বিমলাকুণ্ডে। কয়েকটা ডুব দিতেই সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল মুহূর্তে। স্নান সেরে ফেরার সময় দেখা হলো সহযাত্রী সুবোধদার সঙ্গে। আক্ষেপের সুরে জানালেন, তিনি ঠিক মতো নজর দিতে না পারায় আমার বিছানাপত্র ছিঁড়ে দিয়েছে বাঁদরে। মনটা খারাপ হয়ে গেল কথাটা শুনে। ফিরে এলাম তাঁবুতে। দেখলাম, বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি আমার। অন্য ব্রজবাসীদের তাঁবুতে ঢুকে সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে বাঁদরেরা।
যাইহোক, দুপুরে প্রসাদ পেয়ে স্থানীয় একজন ব্রজবাসীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কাম্যবনে দেখার যা কিছু আছে—দেখতে। প্রথমে মহাবীর হনুমানজীর মন্দির ও বিগ্রহ দর্শন করলাম। তারপর বন পেরোতেই দেখলাম একটা বিরাট জলাশয়। এর উপরে রয়েছে ভাঙা সেতু। প্রিয় সখী ললিতাকে শ্রীরামের লীলা প্রদর্শনের জন্য একদা এই কাম্যবনে সেতুবন্ধ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজগোপীরা যেভাবে যেরূপে শ্রীকৃষ্ণকে চেয়েছিলেন—সেইভাবে সেইরূপেই তাঁকে পেয়েছিলেন তাঁরা। তাই এখানে পাথর দিয়ে সেতুবন্ধ করে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের মনের ক্ষোভ দূর করেছিলেন। ভাবেই প্রত্যক্ষ করলাম এই ভাঙা সেতুতেই সুদূর দক্ষিণের রামেশ্বর সেতুবন্ধ।
এবার এখান থেকে উঠলাম আরও উপর দিকে। পথে অসম্ভব কাঁটা আর ঝোপঝাড়ে ভরা। এর মধ্যে দিয়েই এগোলাম গাইডের নির্দেশে। এবার চোখে পড়লো ৮৪টি স্তম্ভের একটি সভাগৃহ। কথিত আছে, যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সঙ্গে অজ্ঞাতবাসের সময় কিছুকাল এখানে ছিলেন। ভারতীয় শিল্পকলার এক অনবদ্য অবদান এই গৃহটি। তবে রক্ষীহীন অবস্থায় এবং অনাদরে পড়ে থাকায় এটির সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

এই কাম্যবনে বিরাজ করছে ৮৪টি তীর্থ। এগুলির মধ্যে অনেকগুলিই এখন লুপ্ত হয়ে গেছে।

কাম্যবনকে অনেকে প্রাচীন বৃন্দাবন বলে মনে করেন। কাঁটার জন্যে কয়েকজন চেষ্টা করেও এই সভাগৃহে আসতে পারলেন না। যাইহোক, রাজস্থানের অন্তর্গত হলেও এগুলি পড়েছে ব্রজক্ষেত্রের চুরাশী ক্রোশ পরিক্রমার মধ্যে। শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা-ক্ষেত্রগুলি আলাদা আলাদা ভাবে দেখা যায় ঘুরে ঘুরে। তবে পরিক্রমা করলে দেখা যায় সারি দিয়ে। শ্রীকৃষ্ণের বনলীলার স্থলগুলি প্রদক্ষিণ করলে মন আপনা থেকেই হয়ে ওঠে উদাসীন—কৃষ্ণময়।

এবার আমরা এলাম শ্রীগোবিন্দ ও বৃন্দাদেবীর মন্দিরে। গোবিন্দজীর বিগ্রহটি যেমন অপূর্ব তেমনই চিত্তাকর্ষক। মুসলমান শাসনকালে বিশেষ করে ঔরঙ্গজেবের সময় বৃন্দাবনের বহু মন্দির বিনষ্ট হয়। সেই সময় বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ বিগ্রহ-গুলিকে স্থানান্তরিত করা হয় জয়পুরে। বৃন্দাদেবীকেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল জয়পুরে। কথিত আছে. পথিমধ্যে কাম্যবনে এসে স্বপ্নে বৃন্দাদেবী জানালেন যে ব্রজমণ্ডল পরিত্যাগ করে আর কোথাও যাবেন না। সেই থেকেই তিনি আজও অধিষ্ঠিতা আছেন কাম্যবনে—এটাই লোকবিশ্বাস। বৃন্দাদেবীর কৃষ্ণপ্রীতি মর্মস্পর্শী।

ব্রজমন্ডলের দ্বাদশ বনের মধ্যে একটি অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ বনই হলো এই কাম্যবন। তাই বৃন্দাদেবী ব্রজধাম ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারেননি। বৃন্দা-বনের প্রতিটি ধূলিকণায়, প্রতিটি বস্তুতে মিশে আছেন শ্রীকৃষ্ণ। আমাদের চোখ নেই তাই চোখে পড়ে না। এখানে প্রগাঢ়ভাবের সৃষ্টি করেন ব্রজেশ্বর তাঁর ভক্তমনে। কাম্যবনে শুধু আস্বাদনের আবাহন—বিসর্জন নেই। ব্রজধাম তাকে শুধু আলিঙ্গনই করে—সারা জগৎ যাকে উপেক্ষা করে। এর চেয়ে ভাগবত মাহাত্ম্য আর কিভাবে প্রকাশ পেতে পারে!

আজ বারংবার মনে পড়ছে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কথা। একদা তিনি ব্রজের পথে উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন আর আকুল কণ্ঠে বলেছিলেন কোথায় যমুনা—কোথায় বৃন্দাবন? এক ভক্ত তাঁকে বলেছিলেন, 'প্রভু, কেন এত আত্মহারা হয়ে পড়ছেন? যেখানে আপনি—সেখানেই তো বৃন্দাবন—সেখানেই তো বয়ে চলেছে যমুনা।'

স্থানীয় ব্রজবাসী পথপ্রদর্শককে দশ পয়সা করে প্রত্যেক যাত্রীরই দেবার কথা ছিল। কিন্তু কেউই তা দিলেন না। কারণ তিনি কাঁটা পথ দিয়ে নিয়ে গেছেন—এই তাঁর অপরাধ। তাই সাধ্যমতো আমার প্রণামী দিয়ে ফিরে এলাম তাঁবুতে। শুধু ভাবছি, এই ব্রজমণ্ডল ভ্রমণ আমার জীবনে এক দুর্লভ ভ্রমণ। শ্রীগোবিন্দ কৃতার্থ করেছেন আমার জীবন, জন্ম। অপার করুণা তাঁর।

আজ সকাল সাতটার মধ্যে স্নান আহ্নিক সেরে এলাম বিমলাকুণ্ডে। এর পাড়েই রয়েছে সুন্দর একটি মন্দির। এখানে প্রথমে শ্বেত দাউজীকে, পরে জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা এবং আর একটি মন্দিরে দর্শন করলাম রাধারাণীর বিগ্রহ। এবার কুণ্ডের পশ্চিম দিক দিয়ে বেরোতেই পড়লো আবার একটি মন্দির। এখানে স্থাপিত বিগ্রহ দুটি বাংলার গৌরসুন্দর এবং নিত্যানন্দ প্রভুর। এমন সুন্দর বিগ্রহ ব্রজের পথে একমাত্র দর্শন হলো এখানেই। অপূর্ব এক আনন্দে মনটা আমার ভরে উঠলো। চোখের পলক ফেলতে পারলাম না।

আবার শুরু হলো চলা। কিছুটা চলার পর আমরা উঠে এলাম একটি উঁচু মাটির রাস্তায়। পথটি নতুন। একটা লোকও নেই। চলতে চলতে এসে পৌঁছালাম পিছলী পাহাড়ে। থিশলনী শীলা নামে একটি সুন্দর পিছল ঢালু পাথর রয়েছে এখানে। কথিত আছে, কাম্যবনের এই পিছলী পাহাড়ে শ্যামসুন্দর এবং রাধারাণী গোপবালক বালিকাদের সঙ্গে গড়াগড়ি খেলতেন।

এই পিছলী পাহাড়ের পাশেই রয়েছে একটি ধর্মরাজ মন্দির। এখান থেকে সমস্ত অধিকার ত্যাগ করে গিয়েছিলেন ধর্মরাজ যম। যারজন্য একমাত্র কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কারও শক্তিই কর্তৃত্ব করতে পারে না কৃষ্ণভক্তদের উপর। প্রেমশক্তি ছাড়া আর কোন শক্তিরই প্রকাশ নেই এই কাম্যবনে। ধর্মরাজ যমের মন্দির এখানে থেকে বৈষ্ণবদের কাছে পরাজয় ঘোষণা করছে ধর্মরাজের।

এবার প্রায় আধ কিলোমিটার হেঁটে আসতেই পড়লো একটি পাহাড়। এটি পড়লো আমাদের বাঁ-পাশে। কষ্ট করে উঠে এলাম একবারে পাহাড়ের চূড়ায়। দেখলাম ব্যোমাসুরের গুহা। কৃষ্ণসখার বেশ ধরে গোবৎস্য হরণ করতো অসুর। এখানেই তিনি বধ করেছিলেন ব্যোমাসুরকে। কয়েকজন রাখাল বালককে সঙ্গে নিয়ে একটু কষ্ট করেই ঢুকলাম গুহার ভিতরে। দেখলাম পাথরের উপরে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন।

ব্যোমাসুরের গুহা দর্শনের পর বালকেরা আমাদের সোজাপথে নামিয়ে দিল নীচে। আবার শুরু হলো চলা। সমানে চলতে চলতে বেলা একটার সময় এলাম ভোজন-থালীতে। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ এখানে সখাদের সঙ্গে বনভোজন করে আনন্দ উপভোগ করতেন।

আবার হাঁটতে লাগলাম। লাঠাবন থেকে কাম্যবন ২৪ কি.মি. এবং কেদারনাথ মন্দির থেকে মাত্র ৯ কি.মি. দূরে অবস্থিত। সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা পাহাড়ী রাস্তা। পথচলার সমস্ত ক্লান্তিই দূর করে দেয় গাছের সুশীতল ছায়া। এখানে অসংখ্য কুণ্ডের মধ্যে একটি মণিকুণ্ড। এসে দাঁড়ালাম তারই পাড়ে। একদা এই ক্ষেত্রটিতে তপস্যা করেছিলেন রাজা হরিশচন্দ্র।

এখান থেকে আবার সকলে কিছুটা হেঁটে এলাম কাম্যবনের লুকোচুরি কুণ্ডে। একদা শ্রীকৃষ্ণ জলক্রীড়া করতেন এই কুণ্ডে। গোপবালকদের সঙ্গে জলে ডুবে থাকার খেলা হতো। একদিন এই খেলায় সকলের অলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণ জল থেকে উঠে চলে এলেন কাছেরই একটি পাহাড়ের চূড়ায়। গোপবালকেরা ডুবের পর ডুব দিতে দিতে হঠাৎ খেয়াল করলো কৃষ্ণ নেই। মুহূর্তে খেলার নেশা পরিণত হলো ব্যাকুলতায়। কৃষ্ণের অদর্শনে বৎসহারা গাভীর মতো হাহাকার করতে লাগলো কৃষ্ণহারা গোপ-বালকেরা। চোখের জলে বুক ভেসে গেল তাদের।

শোকের এমনি সময়েই তাদের কানে এলো বহুদূর থেকে সুমধুর বাঁশীর সুর। চমকে উঠলো গোপবালকেরা। পাহাড়ের দিকে চেয়ে দেখলেন দাঁড়িয়ে আছেন কৃষ্ণ। মুখখানা সুমিষ্ট—দুষ্টুমির হাসিতে ভরা। চেয়ে আছেন সখাদের দিকে। খুশীতে ভরে উঠলো সখাদের মনপ্রাণ। এই পাহাড়ের নাম হলো চরণ পাহাড়ী। আজও শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বহন করে চলেছে এই পাহাড়ের প্রতিটি শিলা।

এখান থেকে সোজা চলে এলাম বিমলাকুণ্ডে আমাদের তাঁবুতে। সময় লাগলো প্রায় একঘণ্টা। দুপুরের প্রসাদ পেয়ে একটু বিশ্রাম করে এলাম মদনমোহন মন্দিরে। এই মন্দির এবং চন্দ্রমাসির (গোকুলচন্দ্র) মন্দির খোলা থাকে দিনে চারবার—১০ মিঃ থেকে ২০ মিঃ পর্যন্ত। এখানে গোপাল বিগ্রহের সেবাযত্ন চলে বাৎসল্যভাবে। এক সঙ্গে সকলে মহানন্দে দর্শন করলাম মদনমোহন। চারমহলের সুন্দর এই মন্দিরটিতে আরও কয়েকটি বিগ্রহ আছে।

এবার এখান থেকে বেরিয়ে দর্শন করলাম কামেশ্বর মহাদেবকে। তারপর এলাম গোপীনাথজীর মন্দিরে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মন্দির—বেশ বড়। এখন এই মন্দিরের খরচ বহন করেন রাজস্থান সরকার। এই মন্দিরের বিপরীত দিকে অনেকটা পথ হেঁটে এসে দর্শন করলাম বৃন্দাজী আর রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ। কাম্যবনের মুখ্যদর্শন আজ শেষ হলো। সকলে ফিরে এলাম তাঁবুতে। দেখতে দেখতে দুটো দিন কেটে গেল কাম্যবনে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের কথা। পশ্চিমবঙ্গের এক সাধননিষ্ঠ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব সাধক সিদ্ধ জয়কৃষ্ণদাস বাবাজী।

উত্তর-জীবনে এক সময় তিনি আসেন ব্রজমণ্ডলের কাম্যবনে। তারপর আত্মনিয়োগ করেন দুঃসহ কৃচ্ছ্র ও ভজনময় তপস্যায়। একদা সৌভাগ্যক্রমে এই বনেরই নিভৃত অরণ্যে পরম বৈষ্ণবের দর্শনলাভ ঘটে সদ্‌গুরুর। গুরু নির্দেশিত পথে তপস্যা করে পান ইষ্টদেব ব্রজেন্দ্রনন্দন আর মহাভাবময়ী রাধারাণীর দর্শন।

দিন মাস বছর কেটে কেটে এক সময় জয়কৃষ্ণদাস বাবাজী এসে দাঁড়িয়েছেন জীবনের একেবারে শেষপ্রান্তে। বাইরের সমস্ত সংস্পর্শই ত্যাগ করেছেন তিনি। সদা সর্বদা ডুবে আছেন নিগূঢ় প্রেমসাধনার গভীরতম স্তরে। কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই সাধনভজনে বিঘ্ন ঘটে বাবাজীর। কোথা থেকে একদল গোপবালক এসে কোলাহল

আর উপদ্রব করতো তাঁর ভজন কুটিরের সামনে। কিছু বলতে পারেন না মুখে। ভজনের অসুবিধা হয়। অগত্যা নির্জনপ্রিয় জয়কৃষ্ণদাস ত্যাগ করলেন তাঁর কুটির। সাধনের সুবিধার কথা ভেবে গ্রামবাসীরা সকলে মিলে একটি নতুন কুটির বেঁধে দিলেন গভীর অরণ্যে—আরও নিভৃতে। এবার একান্তে চলতে থাকে তাঁর সাধন ভজন।

একদিনের কথা। বাবাজী গভীরভাবে মত্ত রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীর অন্তরঙ্গ সেবা ও লীলা আস্বাদনে। হঠাৎ কোথা থেকে সেই গভীর অরণ্যে এসে উপস্থিত হলো একদল গোপবালক। চিৎকার শুরু করে দিল বাবাজীর কুটির প্রাঙ্গণে। বালকদের উৎপাত সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা আছে তাঁর। তাই উপেক্ষা করে মন দিলেন নিজ সাধনায়। কিন্তু বালকদল পিপাসায় কাতর হয়ে সমানে জল চাইতে থাকে চিৎকার করে। তবুও কোন সাড়া মিললো না ভজন কুটিরের ভিতর থেকে। বাবাজী রয়েছেন একেবারে ভাবতন্ময় অবস্থায়। কৃষ্ণলীলারস পান করে চলেছেন একমনে।

বিরক্ত বালকেরা এবার গালাগাল দিয়ে বলতে থাকে, পিপাসায় আমাদের বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে আর কুটিরে বসে উনি করছেন সাধন ভজন। সংসারে কিংবা সংসারের বাইরে যাঁরা দয়ামায়াহীন ভজনকারী, ঈশ্বরবিশ্বাসী—এঁরা কশাই ছাড়া আর কিছুই নয়। একটু বেরিয়ে এসো কুটির থেকে—তৃষ্ণার জল দিয়ে প্রাণ বাঁচাও আমাদের।

কথাটা শুনে চমকে উঠলেন জয়কৃষ্ণদাসজী। বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন ভজন কুটির থেকে। মুহূর্তে একেবারে শান্ত ও প্রসন্ন হয়ে গেলেন দিব্যকান্তিযুক্ত গোপবালকদের দেখে। জানতে চাইলেন, এখানে কোথা থেকে এলে? থাকোই বা কোথায়? নাম কি তোমাদের?

শ্যামকান্তি একটি বালক এগিয়ে এসে বলে, তার নাম 'কানাইয়া' আর পাশে দাঁড়ানো সঙ্গীটির নাম 'বলদেও'।

কুটির থেকে বাবাজী করঙ্গ এনে জল ঢেলে দিলেন তাদের করপুটে। আকণ্ঠ পান করলো গোপবালকেরা। যাওয়ার সময় হাসতে হাসতে বলে গেল, বাবাজী কুটিরে তুমি বসে থাকো ধ্যানমগ্ন হয়ে। আর রোজই আমরা এসে ফিরে যাই ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে। কাল থেকে রোজ আসবো। আমাদের জন্যে কিছু বালভোগ আর একটু জল রেখে দিও তুমি।

কথা-কটি বলে নাচতে নাচতে চলে গেল গভীর বনের মধ্যে। প্রসন্নমনে বাবাজী ঢুকলেন ভজন-কুটিরে। হঠাৎ হুঁস ফিরে এলো বাবাজীর। ভাবলেন, এরা কারা? সত্যিই কি এরা গোপবালক? অপরূপ সুন্দর সুঠাম দেহ, যেন দিব্যলোকের অধিবাসী। দ্রুত বেরিয়ে এলেন কুটির থেকে। দেখলেন, কেউই নেই কুটির-অঙ্গনে। তারপর আসনে বসে ধ্যানস্থ হয়ে উপলব্ধি করলেন, তাঁরই আরাধ্য কৃপাময়

কৃষ্ণ-বলরাম ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়ে গেলেন ছলনা করে। বাবাজীর দুচোখ বেয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা। পরমদৈন্য ও আর্তিতে গড়াগড়ি দিলেন কুটির-অঙ্গনে—যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর প্রাণের ঠাকুর।
হঠাৎ দৈববানী হলো। উঠে বসলেন বাবাজী। শুনলেন, মুরলীধর কৃষ্ণের কথা, মনে যেন কোন খেদ না রাখেন বাবাজী। আগামীকাল থেকে কুটিরে উপস্থিত হয়ে প্রতিদিন তিনি গ্রহণ করবেন বাবাজীর নিজের হাতের সেবাপুজো।
এরপর পরমানন্দে দিন কেটে গেল বাবাজীর। কেটে গেল রাতও। খুব ভোরে হঠাৎ এক ব্রজমায়ী এসে দাঁড়ালেন ভজন কুটিরের সামনে। হাতে একটি মনোহর গোপালমূর্তি। সেটি বাবাজীর হাতে দিয়ে বললেন, 'অনেক বয়েস হয়ে গেছে আমার। বড় অশক্ত হয়ে পড়েছি। কিছুতেই আর ভালোভাবে পারি না প্রভুর সেবা পরিচর্যা করতে। এখন থেকে তুমিই সব ভার নাও গোপালের।'
কাঙাল সাধক শঙ্কিত হয়ে উঠলেন মহাজাগ্রত দিব্যমধুর বিগ্রহ হাতে নিয়ে। বললেন, 'মায়ী, আমার সামর্থ্য কোথায়—প্রভুর উপযুক্ত ভোগরাগ দিয়ে সেবা করবো ? আমি যে নিজেই কাঙাল। ঠাকুরের দুধছানা জোগাড় করবো কোথা থেকে ?'
উত্তর দিলেন ব্রজমায়ী, 'সেজন্য তোমার চিন্তা নেই বাবাজী। ঠাকুরজীর সেবার জন্য যা দরকার—তা আমিই তোমায় জুটিয়ে দেবো।'
আনন্দবিহ্বল জয়কৃষ্ণদাস আর কোন কথা বললেন না। বিগ্রহ নিয়ে ঢুকলেন ভজন কুটিরে। সেই রাতেই স্বপ্নে জানতে পারলেন, ব্রজমায়ী আর কেউই নয়—স্বয়ং বৃন্দাদেবী। নিজেই উপস্থিত হয়েছিলেন বিগ্রহ হাতে।
শেষজীবনে প্রেমাশ্রুর ঢল বইয়ে দিয়ে সিদ্ধ জয়কৃষ্ণদাস তাঁর পরম অভিসারের পথে চিরতরে চলে গেছিলেন এই বৃন্দাবনেই।

১লা নভেম্বর, শনিবার

আজ আমরা কাম্যবন ছেড়ে চললাম রাধারাণীর বাপের বাড়ী বর্ষাণায়। কীর্ত্তনসহ যাত্রা শুরু হলো। বিমলাকুণ্ড থেকে একটু ডাইনে পাকা রাস্তা ধরে মাইলখানেক আসার পর বাঁহাতে মাঠের মধ্যে দর্শন হলো মহাবীর হনুমানজীর মন্দির। তারপর এলাম কর্ণছেদন কুণ্ডে। এখান থেকে শুরু হলো পাথর কাঁকরে ভরা অসমতল পথ। অনেকটা হেঁটে এলাম আলতা পাহাড়ের নীচে। চারদিকে অসংখ্য ময়ূর ময়ূরী ঘুরে বেড়াচ্ছে ডেকে ডেকে। ডাকছে যেন কানাই কানাই বলে।
একটা লোকও চোখে পড়লো না এই বনে। ধীরে ধীরে সকলে উঠে এলাম পাহাড়ের উপরে। দেখলাম, পাথরের উপরে লালরেখা ভর্তি শ্রীরাধার আলতা পরার স্থানটি। এখানে বসে আলতা পরতেন রাধারাণী। প্রাণপ্রিয়তম কৃষ্ণের জন্য কখনও শৃঙ্গারের অবহেলা করতেন না তিনি।

আমার সহযাত্রিনী অনেক দিদিরা আলতা এনেছিলেন সঙ্গে করে। তাঁরা ভক্তি-সহকারে ঢাললেন ওই পাথরের উপরে। গড়িয়ে অনেকটা নীচে জমা হচ্ছে এক জায়গায়। কিন্তু আলতা নেয়ার মতো একটা লোকও দেখলাম না এই আলতা পাহাড়ে।

আবার শুরু হলো চলা। এবার আর বেশী নয়, কিছুটা এগোতেই পড়লো ললিতা সখীর বাড়ী। উচ্চতায় বাড়ীটি প্রায় তিনতলার কাছাকাছি। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলাম উপরে। এটি এখন মাঝারী আকারের মন্দির। দারুণ সুন্দর। মন্দির-অঙ্গনে রয়েছে একটি মুক্তা ফুলের গাছ। উপর থেকে দূরে বর্ষাণা গ্রামকে দেখাচ্ছে যেন ছবির মতো। ধীরে ধীরে নেমে এলাম নীচে—পাশেই দেহদান কুণ্ডের পাড়ে। এখন খুব উত্তরে হাওয়া বইছে তাই বেশ শীত শীত করছে। একদা এখানে শ্রীকৃষ্ণ দান করেছিলেন তাঁর প্রাণেশ্বরী রাধারাণীকে। কাছে তখন কিছু ছিল না বলেই তিনি একাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরে তিনি হাসির সমান ওজন সোনা দিয়ে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন রাধাকে। শ্রীকৃষ্ণের রাধা ছাড়া কে-ই বা আছে! এখানে সোনা দান করাই বিধি।

দেহদান কুণ্ড থেকে আমরা সকলে আবার চলতে শুরু করলাম। এখান থেকে বর্ষাণা আর মাত্র ৩ কি. মি. পথ বাকি। সামনেই একটা খালের পাড় দিয়ে সোজা চলে গেছে রাস্তা। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি শ্রীজীর মন্দির।

১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে কার্ত্তিক মাসে বৃন্দাবনে এসেছিলেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বলভদ্র ভট্টাচার্য। পরে আরও একজন এসে সঙ্গ নেন। তাঁর নাম কৃষ্ণদাস রাজপুত। শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে বেরিয়ে বৃন্দাবন, মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, কাম্যবন, খদিরবন, ভদ্রবন, ভাণ্ডিরবন, বেলবন, লোহবন এবং মহাবন—এই বারোটি বন তিনি পায়ে হেঁটে পরিক্রমা করেন। সেই থেকেই শুরু হলো বৃন্দাবনে বন-যাত্রা। আজও সে ধারা অব্যাহত গতিতে চলেছে—এ ধারা ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে সারা ভারতের তথা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের অগণিত মুমুক্ষু যারা—তাদের।

পরবর্তীকালে এই বন-যাত্রার বিশেষ প্রচার হয় ভগবদ-ভাবে বিমুগ্ধ হওয়া নারায়ণ ভট্টাচার্যের মাধ্যমে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাকেই আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে এই বন পরিক্রমা। আজ সীমার মাঝে অসীম যিনি তাঁরই লীলাক্ষেত্র দেখতে পাই মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের অপার করুণায়।

অনেক আগে বন পরিক্রমার সময় পথে চুরি ডাকাতি হতো। ইংরাজ রাজত্বকালে সেটা অনেক কমে যায়। তবে বৃন্দাবনকে রক্ষার মূলে জয়পুর রাজ্যের অবদানও কম নয়। বন যাত্রার সময় যাত্রীদের পথে কোন অসুবিধা না নয় সেজন্য উপযুক্ত প্রহরীর ব্যবস্থাও করেছিল জয়পুর রাজ্য সরকার।

দেখতে দেখতে এসে গেলাম বর্ষাণায় শ্রীজীর মন্দিরের কাছে। গোবর্ধন পর্বতশ্রেণী

ডিগ এবং কাম্মো হয়ে এসেছে এই বর্ষাণা পর্যন্ত। এখানে পর্বত দুটিভাগে ভাগ হয়েছে। একটি বিষ্ণুপর্বত এবং অপরটি ব্রহ্মাপর্বত নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মাপর্বতেই শ্রীজীর মন্দির। এখানে উঠলাম প্রিয়া সরোবরের তীরে একটি ধর্মশালায়। আজ আর তাঁবু খাটানোর দরকার হলো না। ধর্মশালায় উঠতেই আমাদের সঙ্গে ভীড়ে গেলেন লণ্ডনবাসী এক সাহেব-সন্ন্যাসী। মুখে অবিরাম হরিনাম করেই চলেছেন তিনি।

এদিকে মহিষের গাড়ীতে রান্নার ঠাকুর আর জিনিষপত্রও সব এসে গেল। প্রসাদ পেতেও আজ আর বেশী দেরী হলো না।

প্রসাদ পেয়ে একটু বিশ্রাম করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম সবাই। একটা খাল পার হয়ে সামান্য একটু পথ পেরোতেই পাহাড়ের উপর শ্রীজীর মন্দিরে যাওয়ার সিঁড়ি। ব্রহ্মাপর্বতের উপর স্থাপিত আছে—রাধাকৃষ্ণের মন্দির, নীচে বৃষভানু মন্দির, প্রিয়াজীর মন্দির, দানমন্দির, হিণ্ডোলা মন্দির, ময়ূর কুটির, রাসমণ্ডপ, ললিত নৃত্য মন্দির, বিলাস মন্দির, গহ্বর বন, ব্রজেশ্বর মহাদেবের মন্দির। আর বিষ্ণু পবর্তে রয়েছে চিকসোলী মানমন্দির, জয়পুর মহারাজের মন্দির, মানগড়, অষ্ট সখীর মন্দিরসহ আরও অনেকগুলি মন্দির। বর্ষাণার চারদিকে রয়েছে সরোবর। এগুলি কুণ্ড নামেই প্রসিদ্ধ।

আমরা ডানদিকে না গিয়ে কীর্ত্তনসহ চললাম বাঁদিকে শ্রীজীর অর্থাৎ রাধারাণীর বাপের বাড়ী। রাজপথ ধরে কিছুটা এগোতেই পড়লো একটি পাহাড়ী পথ। আরও একটু এগিয়ে যেতেই পড়লো একটি গলি। এ-গলির নাম দানগলি। দেখলাম অনেকগুলি ব্রজবালক দাঁড়িয়ে আছে গলির মধ্যে। এখানে কিছু দান না করলে ব্রজবালকেরা যাত্রীদের পথ ছাড়ে না। তাই প্রত্যেকেই ৫/১০ পয়সা দিয়ে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে পাথুরে সরু পথ ধরে দানবিহারীজীকে স্মরণ করে এগিয়ে চললাম সকলে। কিছুটা চলার পর এলাম পাহাড় আর বনে ঘেরা একটি গ্রামে। এখানে চারদিকে লতা-পাতা আর গাছে ঘেরা মাটির বাড়ী। তারই মধ্যে দিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে গ্রামের শেষ প্রান্তে এলাম গহ্বর বনে। এখানে দর্শন করলাম গোপাল মন্দির।

আমরা আরও এগিয়ে চললাম। দেখছি ঝাঁকে ঝাঁকে ময়ূর ময়ূরী ঘুরে বেড়াচ্ছে বনে। ফুলের মিষ্টি গন্ধ বইছে বাতাসে। মনে হয় যেন ভক্ত আর ভগবানের মহামিলন কুঞ্জ সাজানো রয়েছে এখানে।

এবার পাহাড়ের উপরে আরও সরু রাস্তা ধরে এগোতে লাগলাম। অসম্ভব পথ কষ্ট। পা যেন আর চলছে না। বয়স্ক যারা তাদের তো কোন কথাই নেই। পাহাড়ের অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম শ্রীজীর মন্দিরে। পথেই পড়লো একটি মন্দির। এর আঙিনায় বাঁদিকে রয়েছে একটি বেশ বড় ঝুলন মণ্ড। ডানদিকে দেখলাম বাঁধানো ছোট্ট একটি কুণ্ড। এই মন্দিরে কোন বিগ্রহ নেই।

শুনলাম চুরি হয়ে গেছে কিছুদিন আগে। তাই শূন্যমন্দির দেখে উল্টো পথে চললাম ময়ূর কুটির মন্দির দেখতে। পাহাড়ের উপরে মন্দির। চড়াই উৎরাই করে অনেক কষ্টে এলাম ময়ূর-কুটির মন্দিরে। অনাড়ম্বর এই মন্দিরে স্থাপিত বিগ্রহ রাধা শ্যামসুন্দরের।

একটু বিশ্রামের পর আবার শুরু হলো চলা। বেশ কিছুটা পথ চলার পরেই পেলাম সুন্দর রাস্তা। এখানে পাহাড়ের দুদিকেই রয়েছে সুন্দর সাজানো ফুল আর নানা বাহারি গাছ। এগুলি লাগানো হয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকারের বনবিভাগ থেকে।

এখন গোধূলি সময়। পাহাড় থেকে নীচে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে বর্ষাণা শহরকে। চারদিকে পাখির কলরব, ময়ূরের কেকাধ্বনি—সব মিলিয়ে এখানে যেন স্বর্গোদ্যান। জানিনা স্বর্গের শোভা এর চাইতেও সুন্দর কিনা! সারা পথের সমস্ত কষ্ট কোথায় যেন মিলিয়ে গেল মুহূর্তে। পায়ে পায়ে এসে ঢুকলাম জয়পুর রাজার প্রতিষ্ঠিত রাধাগোপাল মন্দিরে। এর সারা দেয়ালে রয়েছে অপূর্ব সুন্দর রাজস্থানী চিত্রকলা। গর্ভ-মন্দিরে স্থাপিত মনোহর সাজে সাজানো রাধাগোপাল বিগ্রহ দর্শন করলাম প্রাণভরে।

এরপর আবার একটু পাহাড়ী পথে এগিয়ে এলাম শ্রীজীর মন্দিরাঙ্গনে। মহানন্দে দর্শন করলাম বর্ষাণার বৃষভানুনন্দিনী রাধারাণী আর নন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে। শ্রীরাধারমণ মন্দির প্রাঙ্গণে রয়েছে একটি তুলসীমঞ্চ। সেখানে ঘুরে ঘুরে নৃত্যকীর্ত্তন করছেন আনন্দ বাবাজী। সঙ্গে আমরাও যোগ দিলাম।

'ব্রজেশ্বরী রাধার জন্মভূমি এই বর্ষাণা। বড় সৌভাগ্য এই বর্ষাণার। এর মাটি জল ব্রজেশ্বরীর পাদস্পর্শে পবিত্র হয়ে আছে শত শত বছর ধরে। শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমের সাক্ষী হয়ে রয়েছে এখনকার তরুলতা বন—সবই। রাজা বৃষভানুর রাজধানী ছিল এই বর্ষাণা। এখানে এসে দাঁড়ালে মনে এক অপূর্বভাবের সৃষ্টি হয় সমস্ত আবিলতা মুছে গিয়ে।

বৃন্দাবনে এসে যারা বন পরিক্রমা করতে পারেন না—তারাও এখানে আসতে পারেন সহজেই। বৃন্দাবন থেকে মোটরে আসা যায়। নন্দগ্রাম আর বর্ষাণা দর্শন না করলে বৃন্দাবন দর্শনই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে—যারা ভালোবাসে বৃন্দাবনবিহারী আর শ্রীমতী রাধাকে।

রাধার জন্মস্থান গোকুলের অন্তর্গত এই বর্ষাণায়। পদ্মপুরাণের মতে, একদা যজ্ঞস্থল প্রস্তুত করার সময় রাজা বৃষভানু কুড়িয়ে পান রাধাকে। আবার ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের কথায়, শ্রীদামা শঙ্খচূড় হয়েছিলেন গোলকবাসী রাধারই অভিশাপে। একই সঙ্গে পাল্টা অভিশাপ দিয়েছিলেন শ্রীদামা। ফলে বৃষভানু ও কলাবতীর কন্যারূপে রাধা জন্মগ্রহণ করেন মর্ত্যে।

আমরা সকলে ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়ালাম কদমবনে। একদা এখানে বনক্রীড়া

করতেন শ্রীকৃষ্ণ। তমাল আর কদম—এই দুটো গাছকেই ভালোবাসতেন তিনি। কদমফুলে শ্রীকৃষ্ণকে মনের মতো সাজিয়ে চোখ সার্থক করতেন ব্রজগোপীরা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেন উথলে উঠছে এই কদমবনে। এখানকার গাছগুলির দিকে তাকালে মনে হয় যেন ডালে ডালে শ্যামসুন্দর বসে আছে বাঁশী হাতে।
প্রকৃত ভক্তপ্রাণ তীর্থযাত্রীদের মন আকুল হয়ে উঠবে রাধা-কৃষ্ণের লীলাভূমি এই বর্ষাণায় এসে দাঁড়ালে। প্রতিবছর ফাল্গুন মাসে এখানে মহাসমারোহে হোলি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নন্দগাঁও-এর বাসিন্দারা একাদশীর দিনই এসে হাজির হয়ে যায় বর্ষাণায়। আর আসে দূর-দূরান্তর থেকে হাজার হাজার মানুষ। এখানকার 'লটামার হোলী' নিজস্ব ঢঙে একেবারে অনুপম। বর্ষাণায় বড় চারটি কুণ্ডের মধ্যে বৃষভানু কুণ্ডই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। পরমানন্দে সব দর্শন করে যখন ধর্মশালায় ফিরলাম তখন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত ৯ টা।
রাতে আজ এক সাধুবাবার আশ্রমে তাঁদের মাধুকরী করে পাওয়া প্রসাদ পেলাম। তারপর আজকের ডায়েরী লিখে যখন ঘুমিয়ে পড়বো ভাবছিলাম, তখন এসে হাজির হলেন সেই সাহেব সন্ন্যাসী। জাতে বৃটিশ। বাড়ী ইংল্যাণ্ডে। ঝোলা থেকে গীতা বের করে পড়ে শোনালেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মঠের আশ্রিত এই সাহেবের কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমি। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি—তা নিজেই জানি না।

২রা নভেম্বর, রবিবার

আজ আমরা যাবো নন্দগ্রামে। এখানে হিন্দিতে সকলে বলে নন্দগাঁও। যাত্রার সময় বৃষ্টি নেমে এলো হুড়মুড় করে। ভাবলাম, আজকের দিনটা বোধ হয় আমাদের এখানেই কাটবে। যাক, রাধারাণীর কৃপায় বৃষ্টি থেমে গেল প্রায় সাড়ে সাতটার সময়। আমাদের শোভাযাত্রার একটা দল চললেন ভাস্কর বাবাজীর সঙ্গে নন্দগ্রামের পথে। আর একটা দল আজ আবার যাত্রার সময় চললো দিনের আলোয় শ্রীজীর মন্দির দর্শনে। আমি চললাম শেষের দলে। সুন্দরভাবে শ্রীজীর মন্দির দর্শন ও পরিক্রমা করে সংকীর্ত্তনসহ নেমে এলাম পাহাড় থেকে। নন্দগ্রামে যাওয়ার পথে চললাম একটা খালের পাড় ধরে। কিছুটা চলার পরে এসে উঠলাম রাজপথে। এ-পথ ধরে চলতে চলতে দর্শন হলো প্রেমবিহারীজী আর প্রেম সরোবর।
আবার চলতে লাগলাম দলের সঙ্গে। এলাম বিনোদবিহারী মন্দিরে। দেখলাম, নদীয়াবাসী একজন বৃদ্ধ ডাক্তার আর একজন বড় ব্যবসায়ী দেশের সমস্ত মায়া ত্যাগ করে এখানে এসে রাধাকৃষ্ণের ভজন আর মাধুকরী করে দিন যাপন করছেন।
প্রেম সরোবরের কাছেই রয়েছে সংকেতবট আর সংকেতকুণ্ড। এই সংকেতবটের কাছেই প্রথম মিলন হয় রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের। পাশেই বিহ্বল কুণ্ড। বন ভ্রমণ-কালীন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বিশ্রাম করেছিলেন এখানে বসে। এছাড়াও রাধারমণজীর

মন্দির, রামচবুতরা, ঝুলো মণ্ডপ, সংকেতবিহারী মন্দির, বল্লভাচার্যের বিশ্রামস্থান এবং সংকেতদেবীর মন্দির দর্শন করলাম একে একে।

ভক্তিমার্গের একটা প্রধান সোপানই হলো বনযাত্রা। অধ্যাত্মজীবনে প্রেমের সর্বোচ্চ সোপানে উঠতে হলে বনযাত্রাকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। ভক্তিমার্গের একটা পরোক্ষ-দীক্ষার স্থলই হলো বনযাত্রা। অনেক আগে বনযাত্রায় অনেক অসুবিধা ছিল। বর্তমানে স্থানীয় ব্রজবাসীরা সরকারী সাহায্যে সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন এই যাত্রা। বাংলায় অনেক চিত্তাকর্ষক বন আছে কিন্তু কোন্ বন এই বৃন্দাবন সমান? এখানকার প্রতিটি বনের শোভা আর ভাবই রাধার কৃষ্ণ আর কৃষ্ণের রাধাপ্রেমে ভরপুর। বনপরিক্রমার পথে পথ চলায় বড় কষ্ট হয় তবে সমস্ত পথকষ্টই সহজে মুছে ভগবানের এই লীলাস্থলে পা দিলে।

আমরা সকলে প্রায় ২ কি. মি. পথ পেরিয়ে এসে দেখলাম একটা ভাঙা মন্দির। কোন বিগ্রহ নেই মন্দিরে। চুরি হয়ে গেছে। নির্জন এই বনে ভজন করেন একজন বাঙালী আর দুজন হিন্দীভাষী বৈষ্ণব। পুরনো দিনের একটি বড় দিঘীও আছে এখানে।

এখান থেকে অনেকটা পথ হাঁটার পর দূর থেকে নন্দীশ্বর পাহাড়কে দেখতে দেখতে আমরা চলে এলাম নন্দগ্রামে। এখন পা-দুটো আর চলছে না। জিজ্ঞাসা করতে করতে এলাম পাবন সরোবরের তীরে। এখানেই আজ আমাদের তাঁবু পড়েছে। একটু বিশ্রামে বসলাম তাঁবুতে।

সখী বিশাখার পিতা পাবন আহীরের নামানুসারেই নাম হয়েছে সরোবরের। সুন্দর ছোট্ট একটি ভজন কুটির আছে সনাতন গোস্বামীর। এখানে সনাতন গোঁসাইকে গোপবালক বেশে দর্শন দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ।

একটু বিশ্রামের পরেই মহারাজের সঙ্গে চললাম মন্দির দর্শনে। ২৮০টা সিঁড়ি ভেঙে পাহাড়ে উঠতে হবে শুনে সঙ্গী সংখ্যা একটু কমই হলো। তাঁবু থেকে আধ কিলোমিটার এসে সিঁড়ি ভেঙে অনেক কষ্টে উঠে এলাম নন্দীশ্বর পাহাড়ে। বেলা প্রায় একটা বাজে। এদিকে পায়ের বারোটা বেজে গেছে। মহারাজ আমাদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলেন। মন্দিরের পিছনেই ঝাড়বন। এর আরও একটা নাম আছে—হাউবন। গোপাল যখন দুষ্টুমি করতো তখন মা যশোদা 'ওই হাউ এলো বলে' ভয় দেখাতেন। তাই নাম হয়েছে হাউবন। এখানেই দধিমন্থন স্থান। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় আহার ননী তৈরী করতেন নন্দরাণী। এটি কৃষ্ণের বাল্যলীলা-ক্ষেত্র।

ভোগ-আরতির পর মন্দিরের দরজা খোলা হলো। এখানেই দুপুরের প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা করলেন মহারাজ। বাইরের লোক কেউ বড় একটা প্রসাদ পায় না। কয়েকজন সাধুবৈষ্ণব ভক্তের সঙ্গে প্রসাদ পেতে বেলা প্রায় দুটো হলো। নন্দরাজের গৃহে আজ প্রসাদ পেয়ে মনটা আনন্দে ভরে গেল। কেবলই ভাবছি, সার্থক আমার জন্ম—সার্থক আমার পিতাম্বরদাস বাবাজীর সঙ্গে বন পরিক্রমা।

ভক্ততীর্থযাত্রীর অস্থির মনও শান্ত হয় এই নন্দভবন দর্শন করলে। নন্দগ্রাম আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে জন্মাষ্টমী আর হোলী উৎসবে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোর জীবনের দিনগুলি চোখের সামনে ভেসে ওঠে—যে কথা ও কাহিনীর কথা এতদিন পড়ে এসেছি ভাগবত আর বিভিন্ন পুরাণে। মহাভারতীয় যুগ থেকে আজও নন্দগ্রাম বুকে ধরে রেখেছে কৃষ্ণপ্রেম—রাখবেও অনাগত ভবিষ্যতে।

তাঁবুতে ফিরে এসে একটু বিশ্রামের পর আবার বেরিয়ে পড়লাম টেরিকদম আর খদিরবন দেখতে। এবার আমার সঙ্গ নিলো আভাদি, নীলিমাদি আর রেণুদি। প্রায় আধ মাইল রাস্তা আসার পর কয়েকজন সাধুর সঙ্গে দেখা হলো। তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানলাম খদিরবন অনেক দূর। রাত হয়ে যাবে। তাই আর গেলাম না। চললাম মাইল খানেক দূরে টেরিকদম খণ্ডি—শ্রীরূপ গোস্বামীর ভক্তিরসে মূর্ত ভজনস্থলীতে। কিছুটা পথ গিয়ে দিদিরা সবাই ফিরে গেলেন তাঁবুতে। আমি একাই মেঠোপথ ধরে চলতে চলতে এলাম টেরিকদম খণ্ডির আশ্রমে। ভিতরে দেখলাম শ্রীরূপ গোস্বামীর ভজনস্থান। তারপর ঘুরে ঘুরে দেখে নিলাম পদ্মভর্তি কুমুদকুঞ্জ আর বিরাট একটি বনভবন। এর চারদিকে রয়েছে জনমানবহীন গোচারণভূমি। একদা নন্দরাজ দিনক্ষণ দেখে শুভদিনে কৃষ্ণ-বলরামকে প্রথম গোচারণে পাঠিয়েছিলেন এই ভূমিতে। এ-সব কথা শুনলাম এখানকারই মন্দিরের সেবাইত-এর মুখে।

এরপর সেবাইত বেরিয়ে পড়লেন মাধুকরী করতে। আমিও একসঙ্গে মাইল দেড়েক চলার পর উনি চলে গেলেন অন্যদিকে। আমি ফিরে এলাম তাঁবুতে। ওনার মুখে খুব সুন্দর ব্রজবুলি শুনেছি।

রাতের প্রসাদ পেয়ে ডায়েরী লিখে শুতে শুতে রাত ১১টা বাজলো। আজ প্রচণ্ড শীতের হাওয়া বইছে বাইরে।

৩রা নভেম্বর, সোমবার

প্রতিদিনের মতো আমাদের যাত্রা শুরু হলো সংকীর্ত্তনসহ। প্রথমে বন মহারাজের কলেজের পাশে সনাতন প্রভুর ভজনস্থান দেখে, পরে কুণ্ড প্রদক্ষিণ এবং কয়েকটি মন্দির দর্শন করে সোজা চললাম যাবটের দিকে।

কিছুটা যাওয়ার পর পড়লো উদ্ধব কেয়ারী। "যখন উদ্ধব শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলেন, রাখালগণ ও ব্রজগোপীগণ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। সকলেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণ কেমন আছেন? তিনি কি আমাদের ভুলে গেছেন? তিনি কি আমাদের নাম করেন?' এই বলিয়া কেহ কাঁদিতে লাগিলেন, কেহ কেহ তাঁহাকে লইয়া বৃন্দাবনের নানা স্থান দেখাইতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন, এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ করিয়াছিলেন, এখানে ধেনুকাসুর বধ, এখানে শকটাসুর বধ করিয়াছিলেন। এই মাঠে গরু চরাইতেন, এই যমুনাপুলিনে তিনি বিহার করিতেন। এখানে রাখালদের লইয়া

ক্রীড়া করিতেন ; এই সকল কুঞ্জে গোপীদের সহিত আলাপ করিতেন। উদ্ধব বলিলেন, 'আপনারা কৃষ্ণের জন্য অত কাতর হইতেছেন কেন? তিনি সর্বভূতে আছেন। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান। তিনি ছাড়া কিছুই নেই।'
গোপীরা বলিলেন, 'আমরা ওসব বুঝিতে পারি না। আমরা লেখাপড়া কিছুই জানি না। কেবল আমাদের বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে জানি, যিনি এখানে নানা ক্রীড়া করিয়া গিয়াছেন।' উদ্ধব বলিলেন, 'তিনি সাক্ষাৎ ভগবান, তাঁকে চিন্তা করিলে আর এ সংসারে আসিতে হয় না, জীব মুক্ত হয়ে যায়।' গোপীরা বলিলেন, 'আমরা মুক্তি—এ সব কথা বুঝি না। আমরা আমাদের প্রাণের কৃষ্ণকে দেখিতে চাই।'
মহাত্মা উদ্ধব এখানে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন কৃষ্ণবিরহ শোকে মুহ্যমান ব্রজবাসীদের। ব্রজদর্শনের আগে ব্রজের কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে একটু গর্ব ছিল উদ্ধবের মনে। গোপীদের কৃষ্ণভক্তি দেখে তাঁর সে অহঙ্কার দূর হয়ে যায় মন থেকে। ভক্তি আর সখাপ্রেমের নিগূঢ় শিক্ষা এবং প্রেমের জন্যই যে ভগবান কৃষ্ণ অপেক্ষা সখাকৃষ্ণই একমাত্র ব্রজবাসীদের কাম্য—এ-শিক্ষা উদ্ধব লাভ করেছিলেন এখানে। তিনি ব্রজরজ অঙ্গে মেখে নিজেকে ধন্য করে দশমাস অতিবাহিত করেছিলেন এই মধু-বৃন্দাবনে।
এখান থেকে সদলবলে হাঁটতে হাঁটতে এলাম যাবটে আয়ান ঘোষের বাড়ীতে। এখানকার মন্দিরে দর্শন করলাম রাধা ব্রজেশ্বর, জটিলা কুটিলা, লাঠি হাতে আয়ান এবং কৃষ্ণকালী সেবারত রাধারাণী। এই কৃষ্ণকালী দর্শন করতে আমাদের দলকে ভেট দিতে হলো পাঁচ টাকা। এবার উঠে গেলাম ছাদে। সরু সিঁড়ি, পুরনো বাড়ী। ছাদে রয়েছে রাধারাণীর চরণচিহ্ন। এখান থেকে স্পষ্ট দেখলাম নন্দগ্রাম আর শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ ভূমি।
সকলে নেমে এলাম নীচে। এবার দেখলাম রাধার নিজের হাতে লাগানো একটি বুড়ো ফুলগাছের বংশধর। স্থানীয় লোকেরা একে বলে পারিজাত ফুল। এ-ফুল আর দেখা যায় না কোথাও।
জটিলা কুটিলাই আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেমের দৃঢ়তা। রাধা যে আয়ানের স্ত্রী ছিলেন না—একথা বলা আছে কোন কোন পুরাণে। তিনি কৃষ্ণেরই সহধর্মিনী ছিলেন বলে কথিত আছে। প্রবাদ এই যে, বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে, রোহিনী নক্ষত্রে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করেন রাধাকে। মর্ত্যধামে বিষ্ণু অবতীর্ণ হন শ্রীকৃষ্ণরূপে আর রাধারূপে আসেন লক্ষ্মীদেবী।
একটা বিষয় লক্ষ্য করার মতো—সম্পূর্ণ ভাগবতে কোথাও রাধা নামের উল্লেখ নেই। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেই প্রথম স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে রাধা নামের। এই পুরাণের মতে, শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রী। দুগ্ধ ও তার ধবলতা, অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি যেমন অভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধা তেমনি অভিন্ন।
এই নন্দগ্রামে দেখার আছে অনেক কিছুই। যেমন দেখলাম কিশোরী কুঞ্জ। এখানে

শ্রীকৃষ্ণ হোলী খেলতেন রাধার সঙ্গে।

আবার শুরু হলো চলা। আমাদের চলার যেন আর বিরাম নেই। সুন্দর বনময় পথের মধ্যে দিয়ে কিছুটা চলার পরেই এলাম কোকিলাবনে। এমন সুন্দর বনশোভা এর আগে দেখিনি কখনও। কোকিলাবনও রাধাকৃষ্ণের মিলনস্থল। এখানে শ্রীকৃষ্ণ কোকিলের কণ্ঠ নকল করে ডাকতেন রাধাকে। আকুল হয়ে ছুটে আসতেন তিনি। আনন্দে আত্মহারা হয়ে মিলিত হতেন একে অপরে সঙ্গে।

মনোরম এই বনভূমি দর্শন করে চলতে লাগলাম সকলে। অনেকটা পথ হেঁটে এসে পৌঁছালাম একটা গ্রামে। এই গ্রামটির নাম বৈঠান। এখানে প্রথমেই দর্শন করলাম মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এসে যে স্থানটিতে বসে বিশ্রাম করেছিলেন সেই ক্ষেত্রটি। তারপর বৈঠানের অধিপতি বলরামকে।

আজ একাদশী। ব্রজমায়ীদের ঘর থেকে ঘোল সংগ্রহ করে আনলেন অনেকেই। জাতিধর্ম নির্বিশেষে ব্রজমায়ীদের এই অকাতর দানের কোন তুলনাই হয় না। এঁদের ভাবটা এমন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রজপরিক্রমাকারীদের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে ঘোল পান করেন। মায়েদের এই সেবা-দানের মধ্যে থাকে বাৎসল্যপ্রেমের এক অমৃতধারা।

বৈঠান গ্রাম ছেড়ে একটা বড় রাস্তার পাশে মাঠের মধ্যে তাঁবু হলো আমাদের। ঘণ্টাখানেক বিশ্রামের পর একটি গ্রামবাসী ছেলেকে নিয়ে প্রথমে হনুমানজী, পরে রামসীতার মন্দির দর্শন করলাম বলরামকুণ্ডের উত্তরপাড়ে। এবার গেলাম গ্রামের উত্তরদিকের একটি পুরনো মন্দিরে। ভিতরে স্থাপিত রয়েছে রাধা-বিহারীজীর সুন্দর একটি বিগ্রহ। এটাই বলা যায় বৈঠানের মুখ্যদর্শন। কুণ্ডের পাড় ধরে এগিয়ে গেলাম আরও অনেক দূর পর্যন্ত। এলাম সনাতন গোস্বামীর ভজনস্থানে। রাধানাথ আর রাধারাণীর বিগ্রহ দর্শন করলাম এখানে। এখানকার সেবাইত বাঙালী মোহন্ত মহারাজের সঙ্গে আলাপ হলো। সংসারের সব ছেড়ে চলে এসেছেন আট বছর আগে। পূর্বাশ্রমে ইনি থাকতেন বনগাঁর চাঁদপাড়ায়। মহারাজের কাছে বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম তাঁবুতে।

৪ঠা নভেম্বর, মঙ্গলবার

আজ আমরা যাবো কোটবনে। সংক্ষিপ্ত পথে চললেও হাঁটতে হবে ১৮/১৯ কি. মি. বিছানাপত্র তুলে দিলাম মহিষের গাড়ীতে। তারপর শুরু হলো যাত্রা। কিছুদূর গিয়ে বড় বৈঠানে দর্শন করলাম গোপাল মন্দিরে গোপালজীকে। এগিয়ে গেলাম আরও প্রায় ৪ কি. মি.। এলাম বড়চরণ পাহাড়ে। তবে পাহাড়টি কিন্তু বেশী বড় বা উঁচু নয়। এখানে ঘুরে ঘুরে দেখলাম পাথরে অসংখ্য পদচিহ্ন। শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজবালা, হাতি উট ঘোড়া হরিণ ময়ূর প্রভৃতির পায়ের ছাপ ভর্তি। এই পাহাড়ের নীচেই রয়েছে চরণগঙ্গা। এখানে কৃষ্ণসখারা ফুলের অলংকার দিয়ে মনের মতো

করে সাজাতেন সখাকৃষ্ণকে। শ্রীকৃষ্ণের মোহন বাঁশীর ডাকে গোপবালক আর পশু-পাখীরা ছুটে আসতো এখানে আনন্দে আত্মহারা হয়ে। তাদের প্রেমাশ্রুতে পাহাড় গলে ছাপ পড়ে যায় চরণের—সে জল নীচে গড়িয়ে এসে হয় চরণগঙ্গা। একদা ভক্তগণের সঙ্গে এ-পথেই পরিক্রমা করেছেন বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ গোঁসাইরা—চৈতন্য মহাপ্রভু নিজেও।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কথায়, "চরণপাহাড়ীতে যেয়ে দেখলাম, পাহাড়ের প্রস্তরে গরু বাছুর এবং মনুষ্যের অসংখ্য পদচিহ্ন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে বংশী ধ্বনিতে সমস্ত বৃন্দাবন মুগ্ধ হতো, সেই মধুর বংশীরবে এক সময়ে ঐ পাহাড়ও দ্রবীভূত হয়েছিলেন। সেই সময়ে ধেনু, বৎস ও রাখাল বালকগণ, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ঐ পাহাড়ে ছিলেন, সকলেরই পদচিহ্ন ঐ প্রস্তরে অঙ্কিত হয়ে পড়ল। আজও সে সকল চিহ্ন পাহাড়ে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, উহা কখনও মানুষের খোঁদা নয়। ওরূপটি মনুষ্যের দ্বারায় কখনও হতে পারে না।"

বড় চরণ পাহাড়ী দর্শনের পর শুরু হলো আবার চলা। এবার যে পথে চলছি—কাঁটা গাছ আর কাঁটাবনে ভরা। একটা লোকও চোখে পড়লো না। অসহ্য পথ কষ্ট সহ্য করে প্রায় ৮ কি. মি. হেঁটে এলাম কোটবনে। যেখানে আমাদের তাঁবু হয়েছে তার পাশেই দেখলাম একটি ধর্মশালা। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি এই বনটা পার হলেই আমরা গিয়ে পড়বো হরিয়ানা রাজ্যে।

বিকেলে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের সঙ্গে চললেন মহারাজ। প্রথমে একটি মন্দিরে রামসীতার বিগ্রহ, তারপর ভরতপুরের মহারাজার পুরনো বাড়ী এবং কেল্লা দেখলাম—যা এক সময় গুর্জররা দখল করেছিল। এখনও গুর্জর গোয়ালাদের অনেক বাড়ীই ভাঙা, তবুও সেগুলি দেখার মতো। ঘুরে ঘুরে গ্রামটি দেখলাম। ব্রজের পথে দেখেছি প্রায় সকলের বাড়ীতেই রয়েছে গরু মহিষ। ঘুরতে ঘুরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো। আমরা ফিরে এলাম তাঁবুতে।

রাত হলো। বার বার শুনছি বন্দুকের আওয়াজ। আমাদের রক্ষীরাও চিৎকার করছে রাধে রাধে বলে। পরে জেনেছি, মোহন্ত মহারাজ ধর্মশালা দেখাশুনা এবং ফাঁকা আওয়াজ করেন যাতে চোর ডাকাত না পড়ে।

প্রতিদিন নতুন নতুন জায়গা দেখা আর জানার লোভে ভুলে যাই সারা পথের ক্লান্তি, রোদে আগুনের মতো তেতে ওঠা রাস্তা, কণ্টকর কাঁকর পাথরের পথ আর পায়ের তলায় ফুটে যাওয়া কাঁটার কথা। নিত্যনতুন জায়গাগুলির মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে জুড়িয়ে যায় প্রাণ—উদ্বেল আনন্দে ভরে ওঠে মনটা। শুধু তাঁবুতে এসে বসলেই দেহের কষ্ট আর পেটটা চায় তাদের প্রাপ্য। সারাদিন শুধু চলা আর চলা। মাঝে মধ্যে পথের ধারে একটু বিশ্রাম। রাতটা কেটে যায় দেখতে দেখতে। ভোর হতেই আবার এগিয়ে যাওয়ার নেশায় ছোটা—এক বন থেকে অন্য বনে। এ যে কি আনন্দ—এ-পথে যারা না এসেছে তাদের কল্পনাতেও আসবে না

সকাল সাড়ে সাতটা। আজ কোটবন ছেড়ে আমরা চললাম শেষশায়ীর পথে। বেশ কিছুটা হাঁটার পর পেলাম বড় রাস্তা। এটি দিল্লী-মথুরা ভি. আই. পি. রোড। অসংখ্য গাড়ী আসা যাওয়া করছে দ্রুতবেগে। আমরা যতদূর সম্ভব রাস্তার ধার দিয়েই চলতে লাগলাম খুব সতর্ক হয়ে।

এবার হরিয়ানা রাজ্যে প্রবেশ করলাম। হরিয়ানার মধ্যে দিয়ে আমরা পরিক্রমা করবো করমণ্ডল। শত শত বছরের লোকবিশ্বাস, কর্মবন্ধন কেটে যায় এই করমণ্ডল পরিক্রমায়। সময়ের অভাবে পাণ্ডাজী বিশেষ কিছু দর্শন করালেন না। এখান থেকে শেষশায়ী অনন্তশয্যায় সজ্জিত নারায়ণ দর্শনে যেতে হলে হাঁটতে হবে আরও প্রায় ১০/১১ কি. মি.। এই পর্যন্ত আসতে আমরা এরই মধ্যে তিনটে খাল পার হয়েছি। আবার এসে গেলাম উত্তরপ্রদেশে।

সমানে হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়ালাম শেষশায়ীর প্রবেশ-পথে। এখানে দর্শন করলাম একটি শিব মন্দির। তারপর আরও কিছুটা এসেই পড়লাম ক্ষীরসাগর সরোবরের পাড়ে। অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা এই শেষশায়ী। এক সময় নন্দ-যশোদাকে অনন্তশয্যায় নারায়ণকে দেখিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ এই ক্ষীরসাগরে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও বৃন্দাবনে এসে এখানে দর্শন করেছিলেন নারায়ণকে। শ্রীমতী রাধার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ করে নারায়ণরূপে দর্শন দিয়েছিলেন রাধাকে। এরপর দেখলাম অনন্ত বাসুদেব মন্দির।

এখন বেলা ১১ টা। আবার মাঠের পথ ধরলাম আমরা। ক-দিন ধরে এক সাধুবাবাজী পথেই যোগ দিয়েছেন আমাদের দলে। তিনি সমস্ত পথই চেনেন। সাধুজী আসছেন ধীরে ধীরে। আভাদি, বেলুড়ের বৌদি, রুণুদি এবং উড়িয়া বৌদি—আমরা চারজন চললাম খালের উত্তর পাড় দিয়ে—আঁকা বাঁকা পথ ধরে। এখন আর কাঁটা নেই। সুন্দর বালি মাটির পথ। তবে এত চলছি, তবুও রাস্তা যেন আর শেষই হয় না।

বেলা প্রায় দেড়টায় এলাম তাঁবুতে। আজ দুপুরের প্রসাদ পেতে বেলা প্রায় চারটে হলো। তারপর মহারাজকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম শহর দেখতে। সুন্দর সুন্দর সাজানো সব দোকানপাট। দেওয়ালীর বাজার। চারদিকে সব রঙ করা—চক্‌চক্‌ করছে। বিরাট বাজার।

করমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা—রত্নসাগর, বিহারীজীর মন্দির, গোমতীকুণ্ড, ভিক্ষাকুণ্ড, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির এবং একটি শিবমন্দির দর্শন করলাম ঘুরে ঘুরে। মুসলমান রাজত্বকালের দু-একটি মসজিদও আছে এখানে। সুন্দরভাবে সাজানো দ্বারকাপুল, দাউজীর মন্দির, গোপাল মন্দির দেখে ফিরে এলাম তাঁবুতে। ফিরতে একটু রাত হয়ে গেল।

একবার দেখে সব মনে রাখা যায় না। গাইড যা বলেন তাই-ই মেনে নিতে হয়।

দু-তিনবার পরিক্রমা করলে তবে অনেক কিছুই জানা যায়। ব্রজে চলার পথে সত্যমিথ্যা যেটুকু শুনেছি—লিখে রেখেছি। যা দেখেছি তা জীবনে ভুলবো না কখনও।

৬ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার

ভোর পাঁচটা। এখনও বেশ অন্ধকার রয়েছে। খালে প্রাতঃকৃত্য স্নান আহ্নিকাদি সেরে শীতে কাঁপতে কাঁপতে এসে দেখি তাঁবু ভাঙা হয়ে গেছে। কোথায় আমার জামা কাপড়, কোথায়ই বা বিছানাপত্র! এদিক ওদিক খোঁজার পর দেখলাম সব রয়েছে রাঁধুনী ঠাকুরের তাঁবুতে। তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে গায়ে শাল জড়িয়ে নিলাম। বাপরে কি ঠাণ্ডা! বাঁচলাম। এদিকে সংকীর্ত্তনের দল বেরিয়ে গেছে একটু আগেই। আমার ভিজে জামাকাপড় একটা থলের মধ্যে ভরে লাঠির মাথায় ঝুলিয়ে কাঁধে নিলাম। অনেকটা পথ একা চলার পর যে সাধুবাবা আমাদের সঙ্গ নিয়েছিলেন তাঁকে দেখতে পেলাম। মনে বেশ জোর এলো। কারণ সমস্ত পথটাই তিনি চেনেন। একটু জোরে পা চালিয়ে ধরে ফেললাম আমার দলের অন্যসব যাত্রীদের।

আজকের যাত্রাপথে শেষশায়ী থেকে কিছুটা দূরে প্রথমে এলাম প্রহ্লাদকুণ্ডে। এখানে রাত্রিবাসের নিয়ম। তবে আমরা কেউই থাকলাম না। মন্দিরে ভক্ত প্রহ্লাদের বিগ্রহ, ব্রজগোপাল মন্দিরে গোপালজী এবং ব্রজেশ্বর মন্দিরে রাধারাণীকে দর্শন করে এগিয়ে চললাম শেরগড়ের দিকে। শেরগড়ের আর এক নাম খেলন বন।

এ-পথে চলতে চলতে পথেই পড়লো পায়েল গ্রাম। এখানে দর্শন করলাম রাধারাণীর মন্দির, রাধাকুণ্ড আর রাধাবিহারীজীর মন্দির। বিহারীজীর মন্দিরে সেবাপূজো করে একটি আট বছরের বালক।

সুন্দর ছোট্ট এই গ্রামে রয়েছে সূর্যকুণ্ড নামে আরও একটি কুণ্ড। জটিলার আদেশে শ্রীমতী রাধা সূর্যার্ঘ্য দিতেন এখানে। মধুমঙ্গলের সঙ্গে সূর্যপূজোর পৌরহিত্য করতেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

রাধারাণী মন্দিরের পাশে একটু বিশ্রাম করতে দেখে একজন ব্রজমা আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে বললেন। এমন অনুরোধে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তবে আমাদের খাবার ব্যবস্থা রয়েছে জানিয়ে ব্রজমায়ের কাছে বিদায় নিলাম। এবার গ্রামের মেঠোপথ ধরে এসে পৌঁছালাম বড় রাস্তায়। আমরা মাত্র চারজন যাত্রীই শুধু পায়েল গ্রাম দর্শন করলাম। আর সবাই চলে গেছেন সোজা পথে।

এবার চোখ পড়লো মাইল স্টোনের দিকে। দেখলাম শেরগড়—৮ কি. মি.। মাথার উপরে প্রখর তাপ আর পায়ের নীচে গরম পীচের রাস্তা—সারাটা দেহ একেবারে জ্বলে যাচ্ছে। যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আমরা মাইল স্টোন গুণতে গুণতে এগিয়ে চললাম। জীবন যেন বেরিয়ে আসছে। দেখলাম, এখনও ৩ কি. মি.

পথ বাকি। একটা গাছের তলায় বসে একটু বিশ্রাম নিলাম। আর সব যাত্রীরাও ক্লান্তিতে বিশ্রাম করতে করতে আসছে। বেলা প্রায় দুটোর সময় এসে পৌঁছালাম আমাদের শেরগড় তাঁবুতে।

আজ খাওয়া হলো বেলা তিনটের পর। তারপর কীর্ত্তনসহ বেরিয়ে পড়লাম পীতাম্বরদাস বাবাজীর সঙ্গে। স্থানীয় একটা বাজারের ভিতর দিয়ে কিছুটা যাওয়ার পর দর্শন করলাম দাউজীর (বলরাম) মন্দির। একদা অন্যপথে প্রবাহিতা যমুনাকে বলরাম হালের সাহায্যে টেনে এনেছিলেন এপথে—গাভীদের জলপানের সুবিধার জন্যে। তারপর একটু ভিতরে গোপীনাথজী, মদনমোহন আর বাঁকে বিহারীজীকে দর্শন করে একে একে সবাই ফিরে এলাম তাঁবুতে।

৭ই নভেম্বর, শুক্রবার

ঘুম থেকে উঠলাম ভোর সাড়ে চারটের সময়। প্রাত্যহিক কাজটুকু সেরে নিলাম। শুরু হলো চলা। আজ মহারাজও চলেছেন আমাদের সঙ্গে। যমুনার পাড় ধরেই রাস্তা। এ-পথে প্রথমেই পড়লো মনোরম বিহার বন। দারুণ সুন্দর এই বনের মধ্যে রয়েছে বনবিহারীজীর মন্দির আর অনেক সাধুসন্ন্যাসীদের ভজনাশ্রম।

এরপর হাঁটতে হাঁটতে এলাম রামঘাটে। যমুনার এই ঘাটে বলরাম এবং গোপ-বালকদের সঙ্গে জলক্রীড়া করতেন শ্রীকৃষ্ণ। এখান থেকে আরও একটু এগিয়ে দর্শন এবং পরিক্রমা করলাম যমুনাতীরে অক্ষয়বট।

এবার চললাম তপোবনের পথে। নন্দঘাট এখান থেকে প্রায় ৪ কি. মি. ঘুর পথে। ওই ঘাটে যাওয়ার সোজা রাস্তাও আছে। আমরা জঙ্গল আর কাশবনের মধ্যে দিয়েই চলতে লাগলাম। একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম এখানে একপাশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর একদিকে যমুনার রূপ দেখে। কবির কথায় বলতে ইচ্ছে করে,

"সেই কদম্ব মূল যমুনার তীর
সেই যে শিখীর নৃত্য
এখনও হরিয়া নেয় চিত্ত।"

এসে গেলাম তপোবনে। সত্যিই এটা সাধন-ভজন করার মতোই জায়গা। আশ্রমের পরিবেশ। এখানেই বর্তমানের বৈষ্ণব সাধক শিরোমণি তিনকড়ি গোস্বামী প্রভু সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাঁর ভজনাশ্রম দেখলাম। এখানকার মন্দিরে স্থাপিত রয়েছে রাধারাণী আর কুঞ্জবিহারী।

এখান থেকে যমুনার পাড় ধরেই চলতে লাগলাম কাঁটাবন আর কাশবনের ভিতর দিয়ে। কোন লোকালয় নেই এখানে। কিছুটা আসার পর পথ একটু নীচে নেমে গেছে। বালি আছে, কাঁটা কম। অনেকটা পথ এইভাবে চলতে চলতে এসে দেখলাম একটা গাছের তলায় বসে বিশ্রাম করছেন আমাদের বাবাজী মহারাজ। অনেক বড় বড় গাছ রয়েছে এখানে। তিনি বললেন, এটাই আসল চিরঘাট বা বস্ত্রহরণ

ঘাট। এই ঘাটের মন্দিরে স্থাপিত মূর্তিগুলির মধ্যে রাধাকৃষ্ণ আর গোপিনীদের মূর্তিগুলিই দেখার মতো—অপূর্ব।

ব্রজমণ্ডলে ২৪টি উপবন এবং ১২টি প্রসিদ্ধ বন নিয়েই শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান। উপবনগুলির মধ্যে আছে—গোকুল, গোবর্ধন, বর্ষাণা, নন্দগ্রাম, সংকেত, পরিমদিরা, অড়ীঙ্গ, শেষশায়ী, শ্রীকুণ্ড, মাঠগ্রাম, খেলনবন, কচ্ছবন, উচোগ্রাম, গন্ধর্ববন, বিচ্ছুবন, আদিবদরী, করহলা, কোকিলাবন, দধিবন, অজনোখর, কোটবন, পিসায়ো, রাবল এবং পারসোলী।

ব্রজের ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমা করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কথানুসারে শুধুমাত্র পঞ্চক্রোশী বৃন্দাবন পরিক্রমা এবং ২৪টি বনের পরিবর্তে রাধাকৃষ্ণের লীলাবিজড়িত রমণীয় প্রসিদ্ধ ১২টি বন-পরিক্রমা করলেই ব্রজমণ্ডল বা ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমার ফললাভ হবে।

যাইহোক, এই বস্ত্রহরণ ঘাটে বস্ত্রদান করার একটা প্রথা প্রচলিত আছে। তাই সহযাত্রীদের অনেকেই বস্ত্রদান করলেন মহারাজ এবং পাণ্ডাজীকে। এই ঘাটের কাছেই রয়েছে দেবী কাত্যায়নীর প্রাচীন সুন্দর মন্দির। আমরা বিগ্রহ দর্শন করলাম সকলে।

আবার শুরু হলো চলা। একে একে এগিয়ে চললেন সবাই। শুধু পিছনে পড়ে রইলেন ইছাপুরের রুণুদি। আজ তিনদিন ধরে আমাশায় ভুগে শুধু ঘোল খেয়ে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছেন বটে, কিন্তু কিছুতেই তিনি টাঙ্গায় উঠলেন না পুণ্যলাভের আশায়।

টানা হেঁটে বেলা প্রায় দুটোর সময় আমরা এসে পৌঁছালাম তাঁবুতে। দেখলাম, তাঁবু সম্পূর্ণ হয়নি। ক্লান্ত শরীরে বসে পড়লাম এক জায়গায়। সারাটা দেহ যেন ভেঙে আসছে। আজ আমরা টানা হেঁটেছি প্রায় ২৭/২৮ কি. মি.। বেলা তিনটে নাগাদ প্রসাদের ব্যবস্থা হলো। এলাম নন্দঘাট।

একটু বিশ্রামের পর বেরিয়ে পড়লাম গ্রাম দেখতে। আজ দেওয়ালী। মনটা খুব খারাপ লাগছিল দোকানের চিন্তায়। আমার দোকানে বাজিও বিক্রি হয়। দেওয়ালীতে তাই কি হলো না হলো—এমন চিন্তা মাঝে মধ্যেই অস্থির করে তুললো মনটাকে।

ঘুরতে ঘুরতে এলাম নন্দরাজ মন্দিরে। প্রাচীন ভাঙা মন্দির এখন সংস্কার হচ্ছে। কংসের ভয়ে একসময় নন্দরাজ এখানে বাস করেছিলেন কিছুদিন। রাজা নন্দের নামানুসারেই ঘাটের নাম হয়েছে নন্দঘাট।

এখানেই রয়েছে শ্রীজীব গোস্বামীর ভজন গুহা। স্থানীয় লোকেরা বলে কুমারী গুহা। একসময় রূপ গোস্বামীর কাছ থেকে বিতাড়িত হয়ে প্রভু শ্রীজীব গোস্বামী এখানেই কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন। কাহিনীটি এই রকম—

তখন বিখ্যাত পণ্ডিত শিরোমণি বাসুদেব সার্বভৌমের প্রিয় শিষ্য ছিলেন মধুসূদন

বাচস্পতি। তিনি ছিলেন কাশীধামে শ্রেষ্ঠ আচার্য। নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে শ্রীজীব গোস্বামী কাশীতে এলেন। বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন বাচস্পতির কাছে। অল্পদিনের মধ্যেই মহাপ্রতিভাধর বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী পারঙ্গম হয়ে ওঠেন বেদান্তশাস্ত্রে। প্রতিভার স্ফুরণ দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে যান বাচস্পতি। তারপর শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করে, বেদ-বেদান্তে কৃতি হয়ে বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হলেন তরুণ তাপস শ্রীজীব কাঙাল সাধকের বেশে। সেখানে তখন একচ্ছত্র প্রভুত্ব ছিল তাঁর পিতৃব্যদ্বয় সনাতন ও রূপ গোস্বামীর। সে সময় গোস্বামীরা শাস্ত্র রচনা আর সাধন প্রণালী নির্ণয়েই ব্যস্ত ছিলেন। দিনের পর দিন তখন সমাগম ঘটছিল বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাধকদলের। একই সঙ্গে চারদিকে গড়ে উঠছিল নতুন নতুন মন্দির আর কুঞ্জ।

বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়ে শ্রীজীব প্রথমেই পদ-বন্দনা করলেন রূপ ও সনাতনের। তিনি ছিলেন রূপ সনাতনেরই ভ্রাতুষ্পুত্র। শ্রীজীবের নয়নাভিরাম আনন্দময় মূর্তি, অতুলনীয় প্রতিভা আর শ্রদ্ধাভক্তি দেখে প্রশংসা করলেন সকলেই। কৃষ্ণ-সেবার জন্য অদ্ভুত আর্তিভরা মুখখানা দেখে রূপ সনাতনের মনে বয়ে যায় এক অপূর্ব আনন্দধারা।

তখন সুবর্ণযুগ চলছিল বৃন্দাবনে। আগের থেকেই পবিত্র এই ধামে এসে বাস করছিলেন লোকনাথ ও ভূগর্ভ গোস্বামী। তারপর একে একে আগমন ঘটেছে প্রবোধানন্দ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল প্রমুখদের। গোস্বামী প্রধানদের মধ্যে সবার শেষে এলেন সর্ব কনিষ্ঠ শ্রীজীব।

সনাতনের নির্দেশে শ্রীজীবকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলেন রূপ। রূপই তাঁকে দিলেন বৈষ্ণবীয় দীক্ষা।

সিদ্ধসাধক রূপ গোস্বামীর চৈতন্যময় দীক্ষামন্ত্র পাওয়ার পরই শ্রীজীবের সর্বসত্বায় ওঠে কৃষ্ণ প্রেমভক্তির উত্তাল তরঙ্গ। গুরুতে শরণাগত হয়ে শ্রীজীব নিষ্ঠা ভরে এগিয়ে চলেন ভক্তিশাস্ত্রের নিগূঢ় সাধনার পথে।

সেই সময় ব্রজমণ্ডলে আসতেন সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতেরা। বৈষ্ণব আচার্যদের নেতা ছিলেন শাস্ত্রবিদ রূপ গোস্বামী। পণ্ডিতেরা প্রথমেই আসতেন তাঁর কাছে। কিন্তু নিরহংকার রূপ কখনই জড়াতেন না শাস্ত্রীয় বিচার বিতর্কে। বৈষ্ণব তিনি, ঘৃণা করতেন প্রতিষ্ঠাকে। তাই কেউ কখনও তাঁকে তর্ক বিচারে আহ্বান করলে সাড়া দিতেন না। বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতকে তিনি তুষ্ট করতেন আনন্দের সঙ্গে জয়পত্র লিখে দিয়ে।

এমনটা গুরুগতপ্রাণ শ্রীজীব দেখেন বছরের পর বছর ধরে। ক্রমেই এসব তাঁর অসহ্য হয়ে ওঠে। পণ্ডিতেরা ফাঁকি দিয়ে লিখে নেয় জয়পত্র। ভগবৎ-দত্ত মহা-প্রতিভার অধিকারী শ্রীজীব নিজে। আত্মবিশ্বাসের ডালি ভরপুর। তাই সুযোগ পেলে কখনও ছেড়ে দিতেন না পণ্ডিতদের। গুরু গোস্বামীজী কাছে না থাকলে

তিনি নাস্তানাবুদ করে ছাড়তেন তাঁদের।

একবার এ-রকম করতে গিয়ে বড় বিপদে পড়ে গেলেন তিনি—ঘটে গেল জীবনের অদ্ভূত পরিবর্তন—যা স্বপ্নেও কল্পনা করেননি কখনও। সেই সময় রূপ গোস্বামী রচনা শুরু করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ—'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু।' শ্রীজীব কাছে বসে গুরুর সেবা যত্ন এবং নানাভাবে সাহায্য করেন। কখনও করেন অনুলিখন। কখনও খুঁজে দেন পুঁথি, আবার কখনও দেন আকর গ্রন্থের সন্ধান। এমন সময় একদিন রূপের কুটিরে এসে উপস্থিত হলেন দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব নেতা বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আচার্য বল্লভ ভট্ট। পরম সমাদরে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন রূপ গোস্বামী। কথায় কথায় প্রসঙ্গ উঠলো রূপের সদ্যরচিত গ্রন্থের কথা। কিছুটা পড়ে শোনালেন রূপ। বল্লভ ভট্ট দু-চারটি ভুল দেখিয়ে দিলেন মঙ্গলাচরণ শ্লোকের।

উভয়ের এ-সব কথা একপাশে বসে শুনছিলেন শ্রীজীব। ভট্টজীর অভিমত মোটেই যুক্তিসিদ্ধ বলে মনে হলো না তাঁর। গুরু বসে আছেন সামনে। তাই প্রতিবাদ করতে পারলেন না তিনি। ক্ষুব্ধ হলেন মনে মনে। রূপ গোস্বামী কিন্তু সবিনয়ে মেনে নিলেন ভট্টজীর সিদ্ধান্ত।

ইতিমধ্যে বেলা বেড়ে গেছে। গোস্বামীপ্রভু যমুনায় গেলেন স্নান করতে। এসে করবেন ঠাকুরজীর ভোগ-রাগের আয়োজন। ভজন কুটিরে শুধু বসে রইলেন বল্লভ ভট্ট আর শ্রীজীব গোস্বামী।

এবার সুযোগ পেলেন শ্রীজীব। গুরুজী দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিতর্কে আহবান করলেন ভট্টজীকে। ভক্তিশাস্ত্র থেকে অসংখ্য প্রমাণ তুলে দেখিয়ে দিলেন তাঁর গুরুর লেখায় এতটুকুও ভুল নেই কোথাও। ভট্টজী একেবারে দমে গেলেন শ্রীজীবের অকাট্য যুক্তিজাল আর রূঢ় মন্তব্যের আঘাতে।

যমুনা থেকে স্নান সেরে ফিরে আসছেন রূপ গোস্বামী—এদিকে অপমানিত বল্লভ উত্তেজনায় অস্থির হয়ে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন গোস্বামীকে—'তরুণ এই বৈষ্ণবটি কে বলুন তো? অপ্রতিরোধ্য এঁর সিদ্ধান্ত যেমন—তেমনই এঁর বিদ্যাবত্তা অসাধারণ!'

ব্যাপারটি বুঝতে এতটুকুও দেরী হলো না রূপের। শ্লোক সংশোধনের প্রশ্ন নিয়ে শ্রীজীবের সঙ্গে নিশ্চয়ই বিচার বিতর্ক হয়েছে ভট্টজীর। মুহূর্তে পরিবর্তন হয়ে গেল বৃদ্ধতাপস রূপ গোস্বামীর বৈষ্ণবীয় দৈন্যময় প্রেমভক্তির রূপটি।

দ্রুত এসে ভজন কুটিরের কাছে ডাকলেন শ্রীজীবকে। তিরস্কার করে বললেন, 'মূর্খ অর্বাচীন, তুমি কেন তর্ক করেছো প্রবীন আচার্যের সঙ্গে। যদি এতটুকু সংযম না থাকে, তবে কেন এসেছো এ-পথে—কেন নিলে এই ত্যাগ বৈরাগ্যময়, দৈন্যময় এই বৈষ্ণব-জীবন? কি লাভ হবে মালা-কণ্ঠি আর তিলক ধারণ করে? তোমার মতো

অপদার্থের মুখ-দর্শন করতে চাইনা আমি। এখনই দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে।'

রূপ গোস্বামীর সিদ্ধান্তে নড়চড় হয় না কখনও। সামান্য এই অপরাধে শ্রীজীবকে চলে যেতে হলো তখনই। গুরুর আদেশ মাথায় নিয়ে শিষ্য শ্রীজীব সেদিন দৈন্যভরে আশ্রয় নিলেন যমুনাতীরে নন্দঘাটের অরণ্যমধ্যে। শুরু করলেন কৃচ্ছ্রব্রত ও কঠোর সাধন। সারাদিন রাতে কোনভাবেই চেষ্টা করেন না আহার সংগ্রহের। ধীরে ধীরে শুকিয়ে আনতে লাগলেন নয়নাভিরাম দেহটিকে। আর সর্বদা অন্তরে জ্বলতে থাকে আত্মগ্লানির তুষানল।

প্রতিদিন ভজন শেষ হলে পর্ণকুটিরে বসে থাকেন শ্রীজীব আকাশবৃত্তি অবলম্বন করে। আর শুধু ভাবতে থাকেন আত্মশোধন ও ইষ্টপ্রাপ্তির কথা—

"দেহ হইতে প্রাণ ভিন্ন করিয়া ত্বরিতে।
প্রভু পাদপদ্মে পাব এই চিন্তা চিতে।"—ভক্তি রত্নাকর

এইভাবেই নন্দঘাটের গভীর বনে বয়ে চলেছে শ্রীজীবের জীবন-তরী। এই সময় হঠাৎ একদিন কি একটা কাজে সনাতন গোস্বামী চলেছেন নন্দঘাটের বনের মধ্যে দিয়ে। স্থানীয় লোক-মুখে তিনি শুনলেন, কৃচ্ছ্রব্রতী এক পরম বৈষ্ণব সাধক সাধনায় রত আছেন এখানে। কৌতূহল বশে এসে দাঁড়ালেন পর্ণ কুটিরের দরজায়। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন কৃষ্ণরসের রসিক সনাতন গোঁসাই। এ কি? এ যে তাঁদেরই প্রাণের আপনজন শ্রীজীব! চেনার কোন উপায় নেই। অস্থিচর্মসার হয়ে গেছে দেহখানি। শ্রীজীব দেখামাত্রই একেবারে লুটিয়ে পড়লেন মহাসাধক পিতৃব্যের পদতলে।

এবার সমস্ত ঘটনার কথা শুনলেন সনাতন। হৃদয় ভরে গেল করুণায়। আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'কোন ভয় নেই শ্রীজীব। এতটুকু খেদ রেখো না মনে। তুমি আরও কিছুকাল থাকো এখানে। এমনই দুঃখদহনের ভিতর দিয়ে আবার ফিরে এসো শুদ্ধতর হয়ে। তোমার কথা আমি নিশ্চয়ই বলবো রূপকে।'

বৃন্দাবনে ফিরে সনাতন দেখা করলেন রূপ গোস্বামীর সঙ্গে। প্রথমেই শ্রীজীবের চরম কণ্টকর শঙ্কাজনক অবস্থার কথা জানালেন না তিনি। কথা প্রসঙ্গে জানতে চাইলেন, ভক্তিরসামৃত গ্রন্থ শেষ হতে আর কত বাকি? এই গ্রন্থের আশায় যে দিনের পর দিন গুণছে ভক্তসমাজ।

সনাতন নিশ্চিতভাবেই জানেন, শ্রীজীব ছিলেন এই রচনায় রূপের একমাত্র প্রধান সহায়। তাই কাজের গতি হয়েছে মন্থর—সৃষ্টি হয়েছে চরম অসুবিধা। সুকৌশলে আসল কথাটি তোলাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। এ-কথা শুনে রূপ চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। শ্রীজীবের প্রসঙ্গ আসার পর থেকেই সন্তান স্নেহের অব্যক্ত ব্যথা আর যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়েছে অন্তরে—

"শ্রীরূপ কহেন প্রায় হইল লিখন।

জীব রহিলেই শীঘ্র হয় শোধন।
গোস্বামী কহেন জীব জীয়া মাত্র আছে।
দেখিনু তাহার দেহ বাতাসে হালিছে।"—ভক্তিরত্নাকর

প্রাণপ্রিয় শিষ্য শ্রীজীবের সমস্ত কথাই সেদিন রূপ শুনলেন সনাতনের মুখে। করুণায় ভরে উঠলো হৃদয়-কন্দর। ক্ষমার সাগর রূপ গোস্বামী। ক্ষমা করলেন শ্রীজীবের সমস্ত অপরাধ। দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়ে শ্রীজীবের সাধন জীবনের সোনার সম্পদ সেদিন আরও উজ্জ্বল—আরও জ্যোতির্ময় হয়ে ফুটে উঠেছে। রূপ ডেকে আনলেন আপন সাধন-কুটিরে।

শ্রীজীবের কৃচ্ছ্র সাধনার পর্ব শেষ হলো বৃন্দাবনে নন্দঘাটের গভীর বনে। ফিরে এলেন এক নতুন মানুষ হয়ে—নতুন জীবন নিয়ে। ত্যাগ তিতিক্ষাময় জীবনে শ্রীজীবের ফুটে উঠলো ঐকান্তিক ভক্তি ও আত্মবিলুপ্তির পরম চেতনা। গুরুর আঘাতে এবার তাঁর সারা অন্তরে জুড়ে বসলো মানবপ্রেম আর কল্যাণের পরম-বোধ।

শিষ্যের আমূল রূপান্তর দেখে আনন্দ আর ধরে না রূপের। এবার তিনি তাঁর জন্য আলাদা ব্যবস্থা করে দিলেন বিগ্রহ সেবার। বৃন্দাবনের শৃঙ্গারঘটের এক কোণে স্থাপন করলেন এক সুরম্য মন্দির। রূপ ও শ্রীজীবের ভজন কুঞ্জেরই কাছে। মন্দিরে স্থাপিত দেবতার নাম হলো শ্রীরাধা-দামোদর।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমল। তাঁর অত্যাচারে অস্থির হয়ে উঠলেন বৃন্দাবনবাসীরা। অত্যাচার এড়াবার জন্য এই মন্দির থেকে বৈষ্ণবেরা জয়পুরে সরিয়ে দেন মূল বিগ্রহ। তার পরিবর্তে স্থাপিত হলো শ্রীরাধা-দামোদরেরই এক প্রতিভূবিগ্রহ। বৃন্দাবনে সেই মন্দিরে আজও চলেছে সেই বিগ্রহেরই সেবা পুজো।

বর্তমানে নন্দঘাটের গ্রামটিতে বেশীরভাগ মানুষই গরীব। সন্ধ্যার সময় নন্দরাজের মন্দিরে আরতি দেখে যমুনার দিকে তাকিয়ে ভাবছি নানা কথা—তাঁর করুণার কথা। এখন যমুনার জল এই ঘাট থেকে সরে গেছে প্রায় মাইলখানেক দূরে। আবার চলে আসে বর্ষার সময়। এমন সময় তাঁবু থেকে আভাদি এসে পাঁচটি ঘিয়ের প্রদীপ দিলেন হাতে। একটি জম্বুজীকে, একটি নন্দরাজের মন্দিরে, একটি শ্রীজীব গোস্বামীর ভজন গুহায়, একটি বৃন্দাদেবীকে এবং আর একটি জেলে দিলাম পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে। কি মহৎ ব্রত করালেন আমাকে মহারাজ আভাদিকে দিয়ে। সার্থক হলো আমার বন ভ্রমণ যেমন—জীবনও। ভুলে গেলাম বাড়ীর কথা। ভাবছি কেবল মহারাজ আর আভাদির ভালোবাসার কথা। রক্তের সম্পর্কে তাঁরা আমার কেউই নয় অথচ এ-ভালোবাসার ঋণ কখনও শোধও হওয়ার নয়। আজ এমন পবিত্র জায়গায় এমনভাবে দেওয়ালীর ব্রত করালেন—এ-আমার এক পরম সৌভাগ্য। এ-সব কথা ভাবতে ভাবতেই ফিরে এলাম তাঁবুতে। আগামীকাল অন্নকূট উৎসব। আমরা যাবো বেলবনে।

আজ ঘুম থেকে উঠলাম ভোর পাঁচটায়। সকালের কাজকর্ম সেরে বিছানাপত্র তুলে দিলাম মহিষের গাড়ীতে। তারপর সংকীর্ত্তনসহ শুরু হলো যাত্রা। আমাদের নন্দঘাট পার হয়ে ভদ্রকবন এবং ভাণ্ডারীবন হয়ে ঘাটবন দর্শন করে যাওয়ার কথা ছিল বেলবন। কিন্তু এখানে যমুনা পার হওয়া বেশ অসুবিধা। আবার হেঁটেও পার হওয়া যাবে না। নৌকায় যাবো—তারও ব্যবস্থা নেই। বাধ্য হয়ে কাঁটা বনের মধ্যে দিয়ে অতিকষ্টে গাড়ীসহ এলাম ভাণ্ডারীবন বরাবর যমুনার ঘাটে। এখানেও একটা নৌকা নেই। যমুনার পাড়ে এসে যাত্রী, গাড়ী, দারোয়ান—সকলেই দাঁড়িয়ে রইলাম একসঙ্গে। এবার এক এক করে নেমে পড়লাম জলে। প্রায় কোমর জল। পার হয়ে গেলাম সকলেই। তবে স্নান করে নিলাম আমি আর সাধুবাবা। এবার পাড়ে উঠেই একটি মসজিদকে দেখে সহযাত্রীরা প্রণাম করলেন মন্দির ভেবে। আমি মসজিদের কথা বলতেই সবাই রাধে রাধে বলে চলতে শুরু করলেন। মহারাজ বললেন, এটা তো উপাসনার স্থান। একসময় এখানে মন্দিরই ছিল একটা। ঔরঙ্গজেবের প্ররোচনায় এখানকার অনেক মন্দিরকে ভেঙে করা হয়েছে মসজিদ।

যাইহোক, হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তা পার হয়ে এলাম ভদ্রকবনে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ জলক্রীড়া করতেন। এক সময় শ্রীজীব গোস্বামীও তাঁর ভক্তিগ্রন্থ রচনা করেছিলেন এই বনে বসে।

কয়েকটি মন্দির দর্শন করে আবার শুরু হলো চলা। চলতে চলতে এসে গেলাম ভাণ্ডির বনে। মহারাজ গাড়ী নিয়ে চলে গেছেন বৃন্দাবনে। কারণ যমুনা পার হতে পারেননি গাড়ী নিয়ে।

এই বনে রয়েছে শ্রীদামের মন্দির। রাধারমণসহ দর্শন করলাম রাধারাণীকে। এখানে সুবল বেশে রাধা মিলিত হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে। রাধাকে দর্শন করতে না পারলে শ্রীকৃষ্ণ চঞ্চল হয়ে উঠতেন—অন্তরের বেদনা প্রকাশ করতেন সুবলের কাছে—সাক্ষী হিসাবে। ব্রজেশ্বরীর বিরহে কৃষ্ণ কতটা চঞ্চল, উতলা হতেন—তা দেখার জন্যই রাধিকা একবার সুবলের বেশ ধারণ করেছিলেন—মিলিত হয়েছিলেন তাঁর প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণের সঙ্গে।

এখানকার বনের এমন সৌন্দর্য—এত মনোহর যে, অপার্থিব এক আনন্দে মনটা আমার ভরে গেল। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি আর বিশ্রাম করে আবার চলতে শুরু করলাম সকলে।

প্রায় ৩ কি. মি. হাঁটার পর আমরা এসে পৌঁছালাম মাঠবনে। নামে মাঠবন, আসলে এটি মফঃস্বল শহর। একসময় এখানে ছিল শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ ক্ষেত্র। সখাদের সঙ্গে আসতেন তিনি আনন্দে। তাঁর বাঁশীর সুর শুনতে পেলে গাভীরা মুগ্ধ হয়ে এসে দাঁড়াতো তাঁর সামনে। স্বর্গের দেবতারাও ছদ্মবেশে এখানে এসে দেখতেন গোপবালকদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার ক্রীড়া-কৌতুক।

মাঠবনের প্রধান দর্শনীয় মন্দিরটি হলো—শ্বেত দাউজী। পায়ে পায়ে এসে প্রথমে শ্বেত দাউজী এবং পরে দর্শন করলাম নিতাই গৌর আর রাধাগোবিন্দের মন্দির। একইসঙ্গে এখানকার একটি মন্দিরে দর্শন হলো আমার পরম প্রভু বড় বাবাজী আর রামদাসবাবাজীর।

আবার সবাই এগিয়ে চললাম বেলবনের উদ্দেশ্যে। এখান থেকে বৃন্দাবন মাত্র ৬ কি. মি.। আমরা চলতে লাগলাম কাঁটা আর কাশবনের মধ্যে দিয়ে। অনেকটা পথ হেঁটে, অনেক কষ্টে এসে পৌঁছালাম বেলবনে।

একসময় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা দেখার লোভ সংবরণ করতে পারেননি লক্ষ্মীদেবী। তিনিও এসেছিলেন বৃন্দাবনে। কথিত আছে, লক্ষ্মীদেবী সর্বদাই এখানে অবস্থান করেন বিষাদমনে। কারণ শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে রাসলীলায় মত্ত—তখন সমস্ত গোপবালারা দেখতে গিয়েছিলেন—একমাত্র লক্ষ্মীদেবী অভিমান ভরে না গিয়ে এই বনে বসে তপস্যা করেছিলেন বিষন্নমনে। তবে তিনিও একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন গোপিনীদের নিরহঙ্কার ভাব, আকুল প্রেম আর সরলতা দেখে।

বেলবনের প্রধান আকর্ষণই হলো লক্ষ্মীদেবীর মন্দির। বিগ্রহ দর্শনের পর বসলাম একটু বিশ্রামে। সুন্দর এই বনে রয়েছে অসংখ্য বেলগাছ। পরিবেশও বড় মনোরম। আজ বেলবনেই আমাদের তাঁবু পড়লো। প্রসাদ পেলাম বেশ দেরীতে—সন্ধ্যা প্রায় ৬টা হবে। অন্নকূটের জন্য অনেক রকম রান্না হয়েছে। তাই সময়ও লেগেছে অনেক। রাতে আজ আর খাওয়ার পাট নেই। আগামীকাল যাবো মানসরোবর। ওপারে বৃন্দাবন—এপারেও বৃন্দাবন দেখলাম আমরা।

৯ই নভেম্বর, রবিবার

খুব ভোরে উঠে স্নান সেরে নিলাম। তারপর কীর্ত্তনসহ সকলে যাত্রা শুরু করলাম বেলবন থেকে। পথপ্রদর্শক আনন্দবাবাজী আর ব্রজবাসী পান্ডাজী। ডান পাশে দেখতে পাচ্ছি সুন্দর শহর বৃন্দাবন। চোখ ফেরাতে ইচ্ছেই করে না। যে স্পর্যন্ত এলাম—এখান থেকে বৃন্দাবন মাত্র ১'৬ কি. মি.। বৃন্দাবনকে ডান পাশে রেখে আমরা চলতে লাগলাম মাঠের মধ্যে দিয়ে।

কিছুক্ষণ চলার পর এলাম মানসরোবরে। একদা শ্রীমতী রাধার অভিমান হয় কৃষ্ণের ওপর। তখন নিজে কেঁদে এবং আর সব সখীদেরও তিনি কাঁদিয়ে ছিলেন। তাঁর চোখের জল থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে এই মানসরোবর। পরে অভিমানিনী রাধার মান ভেঙে ছিলেন কৃষ্ণ নিজের মান বিসর্জন দিয়ে—রাধার পা-দুটি ধরে।

এমন মাহাত্মপূর্ণ স্থান দর্শন করে আমি মোহিত হয়ে গেলাম। একটু বিশ্রামের পর এলাম রাধার মন্দিরে। রাধারাণীর মান ভরা সুন্দর চোখের পট রয়েছে মন্দিরে। অভিমান করে সমস্ত শরীর লুকিয়ে কেবল জল ভরা চোখ দুটিই রেখেছেন বৃন্দাবনের দিকে। চারদিকেই এখানে বিরাজ করছে এক অপূর্ব প্রশান্তি—

পবিত্রতাও। মুহূর্তে ভুলে গেলাম সারা পথের পথ-কষ্টের কথা। আনন্দময় অবস্থায় ঘুরে ঘুরে দেখলাম বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের আশ্রম ও মহাপ্রভুর বৈঠক। এখানে সমস্ত বনটাকে যেন সাজিয়ে রেখেছেন বনদেবী।

কিছুক্ষণ সকলে কাটালাম মানসরোবরের বনে। তারপর আবার শুরু হলো চলা। এবার বৃন্দাবনকে পিছনে ফেলে চলতে লাগলাম মাঠের মধ্যে দিয়ে। প্রায় ৩ কি.মি. পথ পেরিয়ে এলাম রায়া শহরে। জায়গাটির নাম গোপালবাগ। এখানেই তাঁবু খাটানো হয়েছে আমাদের।

একটু বিশ্রাম করে বেরিয়ে পড়লাম। তাঁবুর কিছুটা আগেই দেখলাম সুন্দর একটি মন্দির। মূল প্রবেশদ্বারটি খোলা দেখে ঢুকে পড়লাম ভিতরে। মন্দির-মধ্যে বিগ্রহটি দশভুজার। আর আছে মহাবীরের মূর্তি। অবশ্য ব্রজের পথে প্রায় সব জায়গাতেই দর্শন হয়েছে মহাবীর এবং মহাদেবের। এই গোপালবাগেও দর্শন পেলাম এঁদের। যাত্রার প্রথমে এঁদের কাছে শক্তি আর ভক্তি চেয়েই আসতে হয় ব্রজ-পরিক্রমায়। যাইহোক, এই মন্দিরে একা একটু বিশ্রাম করে ফিরে এলাম তাঁবুতে।

বেলা প্রায় চারটে নাগাদ প্রসাদ পেয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম আমি একাই। এবার বেরোলাম শহর দেখতে। বাজার ঘুরতে ঘুরতে এলাম রাই-রাজা মন্দিরে। এখানে রয়েছে অষ্টধাতুর রাই-রাজা আর সখীদের বিগ্রহ। একটা বিষয় বলতে ভুলে গেছি —সেটা হলো, সমগ্র বৃন্দাবনে যেখানে যত মন্দির আছে, প্রায় সব মন্দিরের সেবাইত পুরোহিত বাঙালী। খুব কম সংখ্যক মন্দিরই পেয়েছি যেখানে পুরোহিত অবাঙালী।

এখানকার মন্দির বিগ্রহ দর্শন করে একটা রাস্তার কিছুটা এগোতেই পড়লো আর একটা মন্দির। এখানে স্থাপিত বিগ্রহ হলো রাধামাধব আর গোপালজী। চমৎকার বেশ-বাসে সুন্দর সাজানো বিগ্রহ। মন্দিরটি দেখে মনে হলো বেশীদিনের পুরনো নয়।

মোটামুটি শহর আর বাজার ঘুরে ফিরে এলাম তাঁবুতে। এরই মধ্যে আমাদের বনভ্রমণের প্রধান মহারাজ পীতাম্বরদাস বাবাজী বৃন্দাবন থেকে নিয়ে এলেন চিঠিপত্র, টাকা পয়সা। অনেকের চিঠি এলো। আমার কিছু এলো না। বিষয়ী মন আমার। কিছুতেই ভুলতে পারছি না বাড়ী আর অন্যের উপর ফেলে আসা দোকানের কথা। মনটা একটু খারাপ হলো। কিন্তু কি আর করা যাবে। রাতে আজ রুটি তরকারী আর একটু দই খেয়ে, ডায়েরীটা লিখে শুয়ে পড়লাম।

১০ই নভেম্বর, সোমবার

আজ চললাম দাউজীর পথে। সারিবদ্ধভাবে প্রায় ৫ কি. মি. পথ হেঁটে এলাম পানিগাঁও বা পানিগ্রামে। এখানে ক্ষীরসাগর নামে একটি সরোবরের পাশেই রয়েছে বলদেবের মন্দির। মন্দিরে দর্শন করলাম আনন্দি বিনোদি আর ইচ্ছাপূরণ

দেবীকে। এই পানিগ্রামেই একদা আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন দুর্বাসা মুনি। ব্রজে এসে আপন ক্রোধ ভুলে ব্রজরজ তুলে সারা দেহে মেখে ধন্য হয়েছিলেন মুনিবর।
একটু বিশ্রামের পর আবার শুরু হলো চলা। পীচের রাস্তা তেতে একেবারে গরম হয়ে গেছে। পা রাখা যাচ্ছে না। কষ্ট হচ্ছে অসম্ভব। তবুও চলতে হবে—থামার কোন প্রশ্নই নেই। আমাদের তাঁবু আর মালপত্রসহ গাড়ী চলছে সঙ্গে সঙ্গে—বড় রাস্তা ধরে। এইভাবে সমানে চলতে চলতে যেখানে তাঁবু হবে—এসে পড়লাম সেই জায়গায়।
আজ এখনও স্নান করা হয়নি। তাই আগে ফেলে আসা প্রায় ২ কি.মি. হেঁটে এলাম ক্ষীরসাগর কুণ্ডে। যা রোদ—গা হাতপা একেবারে যেন জ্বলে গেল। স্নান সেরে তাঁবুতে ফিরে বিছানাপত্র নামালাম গাড়ী থেকে।
দুপুরের পর সকলে বেরিয়ে পড়লাম একসঙ্গে। এখানে একলা পেলে পাণ্ডারা জোর জুলুম করে। তাই মহারাজ বার বার বলে দিলেন কেউ যেন একা কোন মন্দির দর্শনে না যায়।
কীর্ত্তনসহ এলাম রেবতী মহারাণীর মন্দিরে। অপূর্ব সাজে সাজানো হয়েছে বিগ্রহকে। রেবতী মহারাণী হলেন বলরামের স্ত্রী—লম্বায় অনেকটা বড় বলরামের বিগ্রহের চেয়ে। এবার দাউজীর (বলরাম) মন্দির পরিক্রমা, সাক্ষীগোপাল, আরও কয়েকটি মন্দির এবং ক্ষীরসাগর সরোবর পরিক্রমা করে ফিরে এলাম তাঁবুতে।
এই দাউজীর মন্দির সম্পর্কে কয়েকটি কথা আছে। মথুরা থেকে এই মন্দিরের দূরত্ব ২২ কি. মি.। বহুকাল আগে এই স্থানটি পরিচিত ছিল রিঠা গ্রাম নামে। দাউজীর মন্দিরটি প্রাচীন। মন্দিরে স্থাপিত শ্যামল রঙের এই মূর্তিটির বয়স প্রায় চারশো বছর। এটি ক্ষীরসাগর কুণ্ড থেকে পেয়েছিলেন গোস্বামী কল্যাণদেব। অসংখ্য কদম গাছ আছে এখানে। প্রবাদ আছে, রাজা ব্রজনাভ এখানে একটি মন্দির স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে বিধর্মীদের অত্যাচারে ধ্বংস হয়ে যায় প্রাচীন মন্দিরটি। বর্তমানের মন্দিরটি নির্মাণ করেন শেঠ শ্যামাদাস।

১১ই নভেম্বর, মঙ্গলবার

আজ সকাল সাড়ে ছটায় যাত্রা করলাম গোকুল মহাবনের উদ্দেশ্যে। পথে পড়লো রাবল গ্রাম। এই গ্রামের পরম সৌভাগ্য—একদা এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাধারাণী।
রাবল গ্রামে হনুমান বাগে চলতে চলতে এলাম প্রথমে ব্রহ্মাণ্ড ঘাটে। এখানে মা যশোদাকে নন্দলাল হাঁ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখিয়েছিলেন নিজের মুখের ভিতরে। যমুনার ঘাটের উপর একটি মন্দিরে রয়েছে গোপাল-বিগ্রহ। এখানেও পুরীর মতো আটকা বাঁধার ব্যাপার আছে।
এখান থেকে গেলাম গোকুলের নন্দালয়ে। রাস্তায় দেখলাম পুতনা খাল। কংসের

ইচ্ছায় পূতনা সুন্দরী স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করেছিলেন মায়াবলে। তারপর নন্দের গৃহে প্রবেশ করে শ্রীকৃষ্ণকে দিয়েছিলেন বিষময় স্তন পান করতে। শ্রীকৃষ্ণ সেই স্তন আকর্ষণ করে সংহার করেন পূতনাকে। তারপর মৃত পূতনাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় গর্তের মতো খালের সৃষ্টি হয়েছিল—সেটিরই নাম হয়েছে পূতনা খাল। গোকুল মহাবন থেকে ১ কি. মি. দূরে রমণীয় একটি স্থানের নাম রমনরেতী। সেখানেই টেনে নিয়ে যাওয়া হয় পূতনার দেহ—তারপর যমুনায়। রমনরেতীতে রমণবিহারীজীর মন্দিরের বিগ্রহটি ভারি সুন্দর।

রমণরেতী থেকে সামান্য একটু এগোলেই পড়বে কবি রসখানের সমাধি। জাতিতে তিনি ছিলেন পাঠান মুসলমান। পরে তিনি বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে হয়ে ওঠেন শ্রীকৃষ্ণের একজন অনন্য উপাসক। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'সৈয়া' যেমন ভক্তিভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তেমনই ভক্ত সমাজের মর্মস্পর্শীও।

পূতনা খাল থেকে কিছুটা এগোতেই দেখলাম ব্রজ বালক বালিকারা হাত দুটো বাঁশির মতো করে মুখে দিয়ে কেউ শুয়ে, কেউ বা বসে আছে পথ জুড়ে। আবার পয়সা চাইছে। ৫/১০ পয়সা করে দিতেই পথ ছেড়ে দিল ওরা। আরও কিছুটা যেতেই এলাম শ্রীকৃষ্ণের উদূখলে বন্ধন ও যমলার্জুন উদ্ধার ক্ষেত্রে।

এই স্থানের কাহিনীটি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম অধ্যায় ১০ম স্কন্ধ এবং দশম অধ্যায় ১০ম স্কন্ধে শুকদেব বলেছেন রাজা পরীক্ষিৎকে এইভাবে—

"একদিন গৃহের দাসীরা অন্যকাজে নিযুক্ত থাকায় নন্দপত্নী যশোদা নিজে দধি মন্থন করতে শুরু করলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার কথা স্মরণ করে তিনি তা গান করছিলেন। যশোদার পরিধানে ছিল অতি সূক্ষ্ম বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত ক্ষৌমবস্ত্র, কটিতটে বদ্ধ ছিল কাঞ্চী (মেখলা)। মন্থনরজ্জুর আকর্ষণে তাঁর ক্লান্ত বাহুদ্বয়ে কঙ্কন ও কানে কুণ্ডল দুলছিল। তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপছিল আর পুত্রস্নেহে স্তনযুগল থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হচ্ছিল। তাঁর মুখমণ্ডলে বিন্দু বিন্দু স্বেদ উদ্গত হয়েছিল এবং দেহ-সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ কবরী থেকে মেঘনির্মুক্ত জলবিন্দুর মত মালতী ফুল ইতস্তত খসে পড়ছিল। জননী যশোদা এভাবে দধি মন্থন করছেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ স্তন্যপানের জন্য তাঁর কাছে এসে একহাতে মন্থনদণ্ড ধরে তাঁর কাজ বন্ধ করলেন। এতে যশোদার আনন্দ হল। তিনি কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিয়ে পুত্রের সহাস্য মুখ দেখতে দেখতে স্তন্যপান করাতে লাগলেন। স্নেহে স্তন থেকে অতিরিক্ত দুগ্ধ ক্ষরণ হতে লাগল। এর মধ্যে চুল্লীর উপর যে দুধের ভাণ্ড চাপানো ছিল, তা উথলে উঠলো। তাই যশোদা শিশুকে কোল থেকে নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি সেইদিকে ছুটলেন। তখনও স্তন্যপানে শ্রীকৃষ্ণের পরিতৃপ্তি হয়নি। তাই তিনি রেগে রক্তবর্ণ ওষ্ঠ দাঁত দিয়ে কামড়ে কপটভাবে কাঁদতে কাঁদতে নুড়ি দিয়ে দধিভাণ্ড ভেঙ্গে ফেললেন ও ঘরের মধ্যে ঢুকে নির্জনে ননি খেতে আরম্ভ করলেন। যশোদা দুধের কড়া নামিয়ে ফিরে এসে দেখেন, দধিপাত্র ভাঙ্গা, কৃষ্ণও সেখানে নেই। তাই

নিজের পুত্রেরই একাজ তা বুঝতে পেরে হাসতে লাগলেন। ঘরের মধ্যে তাকিয়ে দেখলেন যে শ্রীকৃষ্ণ উদুখল উলটে তার উপর দাঁড়িয়ে শিকা থেকে ননি নিয়ে নিজের খুশিমত বানরদের দিচ্ছেন। মাকে লুকিয়ে এই কাজ করছেন বলে তাঁর চোখের দৃষ্টি চঞ্চল। এ দেখে যশোদা চুপি চুপি তাঁর পিছনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পেরে পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলেন যে মা লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। অমনি তিনি যেন ভয় পেয়ে উদুখল থেকে নেমে ছুটে পালাতে লাগলেন। যশোদাও তাঁর পেছনে পেছনে ছুটলেন। যোগীরা তপস্যা দ্বারাও যাঁর নাগাল পান না, যশোদা সেই শ্রীকৃষ্ণকে ধরার জন্য ছুটেছিলেন! তাঁর বিশাল নিতম্বভারে গতি মন্থর হল, কেশবন্ধন থেকে ফুলগুলি খসে পড়তে লাগল; এইভাবে কিছুদূর গিয়ে তিনি কৃষ্ণকে ধরে ফেললেন। ১-১০

তিনি দেখলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অপরাধ করেছেন বলে কাঁদছেন, নিজের হাতে চোখ মুছছেন, তাঁর চোখের চার পাশে কাজল লেপটে গেছে। মা যশোদা কৃষ্ণের হাত দুটি ধরে ভয় দেখিয়ে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। পুত্র ভয় পেয়েছেন দেখে পুত্রবৎসলা মা হাতের লাঠি ফেলে তাঁকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে উদ্যত হলেন। যাঁর অন্তর নেই, বাহ্য নেই, পূর্ব নেই, পর নেই, যিনি জগতের পূর্ব, পর, বাহ্য ও অন্তর, যিনি নিজেই জগৎ, গোপী যশোদা সেই অব্যক্ত অধোক্ষজকে পুত্র মনে করে সাধারণ শিশুর মত দড়ি দিয়ে উদুখলে বাঁধতে গেলেন। যশোদা অপরাধী পুত্রকে যে দড়ি দিয়ে বাঁধছিলেন তা দুই আঙুল ছোট হল দেখে তিনি আরেক গাছি দড়ি যোগ করলেন। কিন্তু তাও একই পরিমাণে ছোট হল। তখন তিনি আরও এক গাছি দড়ি যোগ করলেন, কিন্তু তাও সেই দুই আঙুল ছোট হল, শিশুকে আর বাঁধা গেল না। এভাবে নিজের এবং গোপীদের ঘরে যত দড়ি ছিল সব যোগ করেও যশোদা যখন শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধতে পারলেন না, তখন তিনি বিস্মিত ও লজ্জিত হলেন। অন্যান্য গোপীদেরও অতিশয় বিস্ময় জন্মাল। ১১-১৭

শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধবার চেষ্টায় শ্রান্ত হয়ে যশোদা ঘামে প্রায় স্নান করে উঠেছিলেন, তাঁর খোঁপার ফুলের মালা খসে পড়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ মায়ের পরিশ্রমে কৃপাপরবশ হয়ে নিজে স্বেচ্ছায় বন্ধ হলেন।

মহারাজ, শ্রীহরি আত্মবশ, ঈশ্বর প্রভৃতি সহ সমস্ত জগৎ তাঁর বশবর্তী, তিনি স্বতন্ত্র হয়েও এভাবে ভক্তবশ্যতা দেখালেন। মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে গোপী যশোদা যে অনুগ্রহ লাভ করলেন তা ব্রহ্মা (পুত্র হয়ে), শিব (আত্মীয় হয়ে) এবং স্বয়ং লক্ষ্মীও (অঙ্গাশ্রিতা ভার্যা হয়ে) লাভ করেননি। কারণ গোপীনন্দন ভগবান ভক্তিমান মানুষের কাছে যে রকম সুখলভ্য, দেহাভিমানী তপস্বীদের বা আত্মভূত জ্ঞানীদের কাছে ততটা নন। ১৮-২১

মা যশোদা যখন ঐ ভাবে তাঁকে বেঁধে রেখে ঘরের অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হলেন, যমলার্জুন নামের দুটি গাছের দিকে শ্রীকৃষ্ণের চোখ পড়ল। ঐ গাছ দুটি আগের

জন্মে কুবেরের পুত্র নলকুবর ও মণিগ্রীব নামে বিখ্যাত ঐশ্বর্যশালী যক্ষ ছিল। গর্বে অন্ধ হওয়ায় জন্য নারদের শাপে তারা গাছ হয়েছিল। ২২-২৩

পরীক্ষিৎ বললেন, ভগবান, ঐ দুজন কি কারণে অভিশপ্ত হয়েছিল, তা বলুন। শুকদেব বললেন, মহারাজ, কুবেরের ঐ দুই পুত্র রুদ্রের অনুচর হওয়াতে অত্যন্ত গর্বিত ও মদমত্ত হয়ে পড়ে। তারা কৈলাস পর্বতের রমণীয় পুষ্পময় উপবনে ও মন্দাকিনীর তীরে মদ্যপান করে ঘূর্ণিতচোখে নারীদের সঙ্গে বিচরণ ও নৃত্যগীত করত। একদিন তারা পদ্মবনে শোভিত গঙ্গার জলে নেমে হস্তি যেমন হস্তিনীদের সঙ্গে বিহার করে, সেরকম ভাবে যুবতীদের সঙ্গে জলকেলিতে মত্ত হল। হে কৌরব, এই সময়ে দেবর্ষি নারদ ঘুরতে ঘুরতে ঐ জায়গায় এসে তাদের দেখতে পেলেন। বিবস্ত্রা অপ্সরারা তাঁকে দেখে অভিশাপের ভয়ে তাড়াতাড়ি নিজের নিজের বস্ত্র পরলেন ; কিন্তু ঐ দুই গুহ্যক দিগম্বর হয়েই রইল।

নারদ দেখলেন যে কুবেরের ঐ দুই পুত্র সুরা এবং ঐশ্বর্য এই দুই মদেই মত্ত হয়েছে। তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্যই শাপ দিয়ে বললেন, হায়, ঐশ্বর্যমদের প্রভাবে নারী, দ্যুত এবং মদ্য এই তিনেরই সমাবেশ ঘটে। এই সবে আসক্ত পুরুষের যে রকম বুদ্ধিভ্রংশ হয়, সৎকুলে জন্মের জন্য অভিমান বা রজোগুণের ফলে ক্রোধ ইত্যাদি থেকেও সে রকম হয় না। সম্পদের গর্বে গর্বিত হয়ে নির্দয় মানুষরা এই নশ্বর দেহকে জরামৃত্যুহীন চিরস্থায়ী মনে করে পশুহত্যা করে। এই নশ্বর দেহ নরদেব, ভূদেব প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত হলেও শেষে কৃমি বিষ্ঠা বা ভস্মে পরিণত হয়। এই রকম দেহের জন্য যে প্রাণি হিংসা করে সে কখনই নিজের মঙ্গলসাধন করতে পারে না, কারণ জীবহিংসাই নরকে যাওয়ার প্রথম সোপান। ১-১০

যে দেহের জন্য এত যত্ন তা কি নিজের, অন্নদাতার, পিতামাতার, না পিতামহের ? না কি তা ক্রেতার বা বলবানের, অগ্নির বা কুকুরের ? কিছুই তো জানা যায় না। যখন এরকম সন্দেহ, তখন তো দেহ সাধারণ সম্পত্তি। প্রকৃতি থেকে তা উৎপন্ন হয়, আবার প্রকৃতিতেই বিলীন হয়ে যায়। তাই মূঢ় ব্যক্তি ছাড়া কোন্ জ্ঞানী এরকম দেহে আত্মবুদ্ধি করে তাঁর জন্য প্রাণি-হত্যা করে ? ঐশ্বর্যমদে যাদের চোখ অন্ধ হয়েছে, দারিদ্র্যই তাদের উৎকৃষ্ট অঞ্জন। দরিদ্রলোক নিজের সঙ্গে তুলনা করে সবাইকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে। যার দেহে কাঁটা বিঁধছে সে-ই অপরের মুখের যন্ত্রণা ও চিহ্ন দেখে তার দুঃখ জানতে পারে। অন্যে তার মত দুঃখ পাক তা সে চায় না। কিন্তু যার দেহে কাঁটা বেঁধেনি সে কখনও পরের দুঃখ বুঝতে পারে না, তাই পরোপকারও করতে পারে না। দরিদ্রের 'আমি' ও 'আমরা' এইরকম অহংবোধ দূর হয়ে যায়। সর্ব অহংকার থেকে সে মুক্ত। তার জীবনে যে সব দুঃখ উপস্থিত হয় সে সব সহ্য করাতেই তার পরম তপস্যার ফল লাভ হয়। অন্নহীন দরিদ্রের দেহ ক্ষুধায় প্রায় প্রত্যহ ক্ষীণ হয়ে আসে, ইন্দ্রিয়গুলি নিস্তেজ হয়ে পড়ে, তাই নরক

প্রভৃতির কারণ হিংসারও নিবৃত্তি হয়। সমদর্শী সাধুপুরুষরা দরিদ্রের সঙ্গ করেন। এভাবে সাধুসঙ্গ হওয়ার ফলে তার বিষয়তৃষ্ণা ক্ষয় হয় এবং শীঘ্রই চিত্তশুদ্ধি হয়ে পরমানন্দ লাভ হয়। যে সাধুব্যক্তি শুধু মুকুন্দের চরণের অভিলাষী, ধনগর্বিত অসৎ লোকের সঙ্গ তাঁর কি প্রয়োজন? তাই আমি মদমত্ত, ঐশ্বর্যগর্বে অন্ধ, স্ত্রৈণ ও ইন্দ্রিয়পরবশ এই দুই গন্ধর্বের অজ্ঞানকৃত অহংকার নাশ করব। এরা লোকপাল কুবেরের পুত্র হয়েও এমন অজ্ঞানান্ধ ও দুর্বিনীত হয়েছে, যে নিজেদের বিবস্ত্র বলে বুঝতেও পারছে না। এই অপরাধে এরা বৃক্ষযোনি লাভ করুক। ঐ স্থাবর শরীর লাভ করেও আমার প্রসাদে এদের পূর্বস্মৃতি থাকবে। একশত দিব্য বৎসর অতীত হলে এরা বাসুদেবের সান্নিধ্যলাভ করে আবার স্বর্গে এসে কৃষ্ণভক্তি লাভ করবে। ১১-২২

শুকদেব বললেন, দেবর্ষি নারদ এই কথা বলে বৈকুণ্ঠধামে চলে গেলেন। নলকুবর ও মণিগ্রীব তাঁর শাপে দুই যমজ অর্জুনবৃক্ষ হয়ে গোকুলে বাস করতে লাগল। ভগবান শ্রীহরি পরম ভাগবত দেবর্ষির বাক্য সত্য করার জন্য যেখানে ঐ যমলার্জুন ছিল ধীরে ধীরে সেদিকে গেলেন। দেবর্ষি আমার প্রিয়তম, আর এরাই সেই কুবের-পুত্রদ্বয়। মহাত্মা নারদ যা বলেছেন আমি তা সফল করব। মনে মনে এই বলে ভগবান যমজ অর্জুন গাছদুটির মাঝখানে গেলেন। তিনি যে উদূখলের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিলেন তা উল্টে গিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে চলতে বাঁকাভাবে গাছদুটিতে আটকে গেল। শ্রীকৃষ্ণ সজোরে উদূখল টানলেন এবং যমলার্জুন মূলসহ উৎপাটিত হল। শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রমে ঐ গাছদুটি শাখাপ্রশাখা ও স্কন্ধপত্র সহ কাঁপতে কাঁপতে সশব্দে মাটিতে পড়ে গেল। সেই দুটি গাছের মধ্য থেকে আগুনের মত মূর্তিমান দুজন সিদ্ধপুরুষ আবির্ভূত হলেন। তাঁদের সৌন্দর্যের ছটায় চারদিক উদ্ভাসিত হল। মাথা নিচু করে অখিল লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে নম্রতা ও বিনয়ের সঙ্গে বলতে লাগলেন, হে কৃষ্ণ, হে মহাযোগী, আপনি বালক নন, আপনি পরমপুরুষ আদ্যকারণ।······৩৭-৩৮

শুকদেব বললেন, মহারাজ, গোকুলেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদূখলে বদ্ধ থেকেও এই স্তুতি সংকীর্তন শুনে হাসতে হাসতে গুহ্যকদের বললেন, করুণাময় দেবর্ষি নারদ তোমাদের মদান্ধ দেখে অনুগ্রহ করে যে শাপ দিয়েছিলেন, আমি তা আগেই জেনে-ছিলাম। আমাতে অনুরক্ত সাধু ও সমদর্শী মহাপুরুষদের দর্শন করলেই জীবমাত্রের বন্ধন দূর হয়, যেমন সূর্য দেখলে চোখের বন্ধন বা অন্ধকার দূর হয়। অতএব কুবেরনন্দন, তোমরা দুজনে নিজেদের গৃহে চলে যাও। আমার প্রতি তোমাদের পরম প্রীতি জন্মেছে, তোমাদের আর বন্ধনভয় নেই। শুকদেব বললেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই দুই গুহ্যককে (যক্ষকে) একথা বললে তাঁরা উদূখল-বদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে এবং সম্ভাষণ জানিয়ে উত্তরদিকে চলে গেলেন।" ৩৯-৪৩

যমালর্জুন দর্শন করে আমরা এবার এলাম গোকুলানন্দ গোপালজীর মন্দির অর্থাৎ

নন্দভবনে। ৮৪টি থামের উপর নির্মিত হয়েছে এই মন্দিরটি। প্রত্যেকটি থামের কারুকার্যই আলাদা আলাদা। কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই। আরও মজার কথা হলো, থামগুলি গুণবার সময় কখনও ৮৪ আবার কখনও হয় ৮৩টি। ছাদে উঠে সমস্ত বনের দৃশ্য আর যমুনাকে দেখলাম—অপূর্ব।

উপর থেকে নেমে এলাম নীচে। মন্দিরের দরজার কাছে পাণ্ডারা গোপালকৃষ্ণের নাম করে বসিয়ে রাখলেন কিছুক্ষণ। তারপর পাণ্ডাদের নির্দেশে হামাগুড়ি দিয়ে আমরা গেলাম মন্দিরের ভিতরে। আমাদের মহারাজ মন্দিরের পাণ্ডাদের হাতে সঁপে দিয়ে চলে গেলেন। এবার ওরা সুন্দর সুন্দর কথায় ভুলিয়ে কয়েকজনকে ১৫৬ টাকা থেকে ৫ টাকা পর্যন্ত আটকা করিয়ে নিলেন। এ ব্যাপারে সহযাত্রীরা কেউ বাধা দিলে পান্ডারা অসম্ভব পীড়ন করে থাকে। তাই কাউকে কিছু বললাম না। সত্যিই তারিফ করতে হয় এদের ব্যবসায়ী বুদ্ধির।

মন্দিরের ভিতরে একটা দোলনায় রয়েছে গোপালের মূর্তি। তাতে বাঁধা আছে লম্বা শিকল। ওই শিকল টানলেই টাকা দিতে হয়। না দিলে জোর করে কেড়ে নেয়। আমাদের সহযাত্রী বেলুড়ের নিতাইদা নিঃসন্তান। তাঁর সন্তান লাভ হবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ১৫৬ টাকা পাণ্ডারা নিল মাথা মুড়িয়ে। এইভাবে টাকা আদায় করলো কারও কাছ থেকে ৫২, কারও কাছ থেকে ২৪ টাকা আবার কারও কাছ থেকে ৫ টাকা। এই মন্দিরে কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেয়া হয় না। হয় বসো, নইলে চলে যাও। বসলেই শুরু হয়ে যায় টাকা আদায়ের খেলা।

এখান থেকে বেরিয়ে আমরা ডানে বাঁয়ে একের পর এক মন্দির দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম। এলাম রোহিনী মন্দিরে। ভিতরে বিগ্রহের মধ্যে আছে যোগমায়া, বাসুদেব ও রোহিনী।

গোকুলের মন্দিরগুলি দর্শন করে প্রায় সাড়ে ৪ কি.মি. পথ চলে আমাদের তাঁবু বারল গ্রামের হনুমানবাগে যখন এলাম, তখন বেলা প্রায় দেড়টা। প্রখর রোদে পথ একেবারে তেতে পুড়ে ছিল—এতটা পথ মাথায় রোদ নিয়ে পা জ্বালিয়ে হেঁটে তাঁবুতে এসে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। একটু বিশ্রামের পরেই দুপুরের খাওয়া হলো।

এবার বিশ্রামের অবসরে বিছানা আর টুকটাক জিনিষপত্র গুছিয়ে রেখে ভাবছি, আজই আমাদের তাঁবুতে বাস শেষ হচ্ছে। আগামীকাল যাবো মথুরায়—থাকবো ধর্মশালায়। একথা ভাবতেই মনটা আমার আনন্দে ভরে উঠলো। আবার পরক্ষণেই দুঃখে মনটা একেবারে মুষড়ে গেল। আনন্দ হলো এই ভেবে যে, বেশ কয়েক দিন ধরে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে ব্রজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পদধূলিতে পবিত্র লীলাময় স্থানগুলি দর্শন করলাম পরমানন্দে। দেখলাম অজানা অচেনা জায়গা, পরিচয় হলো কত মানুষের সঙ্গে, পেলাম ব্রজের পথে পথচারী আর ব্রজ মায়েদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা—যা কখনও ভুলে যাওয়ার নয়। এই অভিজ্ঞতায় ভরা

সাজানো ডালি নিয়েই বেঁচে থাকবো জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। আর দুঃখ হচ্ছে এই কারণে যে, আজকের এই আনন্দের হাট ভেঙে যাবে দুদিন পরে। সহযাত্রী থেকে শুরু করে যাঁদের সঙ্গে পথে পরিচয়—পথেই যাবে শেষ হয়ে। আর এ জন্মে এভাবে পরিক্রমা করা সম্ভব হবে না কখনও। মহাকালের নিয়মে কে কোথায় চলে যাবে—জানি না কিছুই। কারও সঙ্গে কারও দেখাই হবে,না হয়তো কোনদিন—আবার হতেও পারে! এ বিরহ মিলন তো কালের হাতে।

আমাদের লাইটম্যান সদাহাস্যময় রামভরসী, টাঙ্গাওয়ালা, মহিষের গাড়ীর গাড়োয়ান, জলতোলার নানুলাল—এরা সকলেই ব্রজবাসী। অনেক সময় অধৈর্য হয়ে মুখ করেছি, এদের তোলা জলে পা হাত মুখ ধুয়েছি—এমন কত না অপরাধ করেছি এদের কাছে। এসব কথা ভেবে মনটা একেবারে অস্থির হয়ে উঠলো। উঠে গেলাম পীতাম্বরদাস বাবাজীর তাঁবুতে। মহারাজকে জানালাম আমার মনের কথা। তিনি বললেন, 'এদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিও, তাহলে আর কোন তীর্থদোষ হবে না।'

মহারাজের কথায় আমার মতো সকলেই ক্ষমা চেয়ে নিলেন এই সব গরীব ব্রজবাসীদের কাছে। মনটা অনেক হালকা হলো। তারাও আমাদের জলভরা চোখে হাসিমাখা মলিন মুখে ক্ষমা করেছিলেন।

এখন বিকেল। রোদের তেজ অনেকটা কমে গেছে। চললাম পুরনো গোকুল দর্শনে। আমার সঙ্গী হলো শুধু ধীরেন ভাই। অনেকটা পথ। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম সন্ধ্যার আগে। সারাটা পথে মাঝে মাঝেই আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছে ময়ূর ময়ূরীরা—কেকা-রবে।

পুরনো গোকুলে প্রথমেই পড়লো একটা সরোবর। একটু এগোতেই মন্দিরের তোরণ। পথে কোথাও গাড়ী ঘোড়া চোখে পড়লো না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সিমেণ্টে বাঁধানো রাস্তা। ডানে বাঁয়ে সাজানো বাজার, ঠাকুর বাড়ী, পোষ্ট অফিস, দই আর দুধের দোকান। যমুনার পাড়েই সুন্দর নন্দভবন। ভিতরে দেখলাম গোপাল বসে আছে রুপোর দোলনায়। মন্দিরের জানলা দিয়ে দেখলাম হিমালয়ের স্রোতস্বিনী যমুনা সারাটা পথে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে এখানে বয়ে চলেছে একেবারে ক্লান্ত হয়ে। যমুনার দেহ যেন আর বইতে চাইছে না। তবুও বয়ে চলেছে যমুনা—অন্তরে রাধার ভালোবাসা, ব্রজবালাদের কৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্য আর সখাকৃষ্ণের পদধূলি মাথায় নিয়ে।

এখানকার গোপাল-সেবা আর মন্দির পরিচালনার ভার বল্লভ সম্প্রদায়ের হাতে। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা এখানে খুব একটা আসেন না। এখানে মা যশোদার সূতিকা গৃহ, পুতনার স্তনদান, কৃষ্ণ বলরাম মন্দির, গোপালের শয়নকক্ষ দেখে সিঁড়ি বেয়ে নেমে দেখলাম যোগমায়ার মন্দিরে অপূর্ব সুন্দর অষ্টধাতুর বিগ্রহ। এখানে পাণ্ডাদের কোন জোর-জুলুম নেই। আর একটা ভিখারীকেও দেখলাম না সারাটা পথে—মন্দিরের আশপাশে।

এখানকার দর্শনীয় যা কিছু দেখে চললাম তাঁবুর দিকে। একেবারে নির্জন রাস্তা। ভয় করছিল। রাধাকে স্মরণ করে অন্ধকারের মধ্যে দিয়েই এসে উঠলাম বড় রাস্তায়। তাঁবুতে যখন এলাম তখন রাত ৯টা। রাতে প্রসাদ পেয়ে ডায়েরী লিখতে লিখতে ভাবছি, আজ তেইশ দিন ধরে একসঙ্গে থেকে চলাফেরা করে সকলেই যেন একে অপরের আপনজন হয়ে গেছি। অথচ কালকের পর থেকে আমরা কে কোথায় থাকবো—কোথায় চলে যাবো—এই মুহূর্তে তার কিছুই জানি না।

১২ নভেম্বর, বুধবার

আজ সকাল সাতটায় আমরা যমুনার পূর্ব পাড় ধরে চলতে লাগলাম মথুরার দিকে। খানিকটা পিচের রাস্তা হেঁটেই বাঁ-পাশে মাঠের মধ্যে নিত্য সঙ্গী কাঁটা ঝোপঝাড়ের উপর দিয়ে এলাম যমুনার পাড়ে রাজা বৃষভানুর প্রথম বসতবাড়ী আর রাধারাণীর জন্মস্থানে। এখানে প্রাচীনত্বের কোন ছাপ নেই কোথাও। এগুলি এখন মন্দিরে রূপান্তরিত হয়ে দর্শনীয় স্থান হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে তীর্থযাত্রী—দর্শনার্থীদের কাছে।

এখানে একটু বিশ্রাম এবং দর্শন করে আবার চলতে লাগলাম সকলে। পাণ্ডাজী যে পথে চলেছেন—সে পথে গেলে লৌহবন দর্শন হবে না। তাই আমি আভাদি রুনুদি এবং আরও জনাদশেক দিদিদের সঙ্গে নিয়ে চলতে লাগলাম বড় রাস্তার দিকে—লৌহবনের উদ্দেশ্যে।

আমাদের চলার যেন আর বিরাম নেই। অবশ্য মাঝে মাত্র আর একটা দিন আছে—তারপর চলা শেষ। আমরা পীচের রাস্তা ধরে প্রায় ৫ কি.মি. টানা হাঁটার পর ধরলাম গ্রামের পথ। আরও বেশ কিছুটা চলার পর এলাম লৌহবনে—একটা বিশাল কুণ্ডের পাড়ে। বাঁধানো ঘাটের সিঁড়িতে বসে একটু বিশ্রাম করছি—দেখছি লৌহবনের বনশোভা, এমন সময় পাণ্ডা বলে পরিচয় দিয়ে গুণ্ডার মতো কয়েকজন ছেলে এসে দাঁড়ালো আমাদের সামনে। তারপর সোজাসুজি বললো, প্রণামী না দিলে এই বনের কোন কিছুই দর্শন করা যাবে না।

আমি বললাম, আমরা সকলেই বনযাত্রী। পথ-কষ্টে পরিশ্রান্ত। সঙ্গে টাকা পয়সা তেমন কিছুই নেই। মন্দিরে প্রণামী দেয়ার জন্য খুচরো কিছু পয়সা আছে। সবাই মিলে টাকা তিনেক দিতে পারি। একথায় অসন্তুষ্ট হলেও রাজী হলো। তারপর সঙ্গে নিয়ে দর্শন করালো লৌহদানবের গুহা।

প্রবাদ আছে, লৌহাসুর একদা শারীরিক শক্তি লাভ করে উপেক্ষা করতে লাগলো ধর্মের শক্তিকে। তার অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেল সারা বৃন্দাবনে। বিশেষ করে এই লৌহবনে কেউ ঢুকতেই পারতো না। ব্রজবাসীদের মনে করতো একেবারে নিকৃষ্ট জীব বলে। একদিন নিজের শক্তি পরীক্ষার জন্য আহ্বান জানালেন কৃষ্ণকে। তার ডাকে সাড়া দিলেন কৃষ্ণ। চরম শিক্ষালাভ করে উদ্ধার পেল লৌহাসুর। ত্রাসমুক্ত হলো ব্রজের ভক্তরা।

এরপর লোহবনে মদনমোহন মন্দির আর একটি মহাদেব মন্দির দর্শন করলাম। এখন বেলা এগারোটা। আমরা চললাম মথুরায়। হাঁটতে হাঁটতে পার হয়ে এলাম যমুনার উপর মথুরা পোল। এই পোল থেকেই দেখলাম কোলগ্রাম। একসময় কংসের কারাগার থেকে বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে আসেন নন্দগ্রামে। পথে যমুনা পার হওয়ার সময় বসুদেবের কোল থেকে জলে পড়ে যান কৃষ্ণ। যেখানে যমুনা শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নিয়েছিলেন—সেই স্থানটিই প্রাচীনকাল থেকে আজও কোলগ্রাম নামে প্রসিদ্ধ। যমুনা স্রোত পরিবর্তন করে সরে গেছে অন্য ধারে—কোলগ্রাম রয়ে গেছে যমুনার বুকে সাক্ষী হয়ে।

আমরা লোহবনে আসায় দল ছাড়া হয়ে গেছিলাম। সঠিক রাস্তা জানা ছিল না, তাই পথে জিজ্ঞাসা করতে করতে এসে গেলাম আমাদের নির্দিষ্ট ধর্মশালায়। আজ দুপুরের খাওয়া হলো বেলা তিনটেয়।

এবার বসে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি—এমন সময় এসে হাজির হলেন মথুরার এক পাণ্ডা। তিনি কয়েকজন যাত্রীর কাছ থেকে পাঁচ টাকা করে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন দর্শনে। আমরাও কয়েকজন তাঁর সঙ্গী হলাম। প্রথমে দ্বারকানাথজীর মন্দির দর্শন করে এলাম যমুনায় বিভিন্ন ঘাট দর্শন করতে।

মথুরার প্রসিদ্ধ ঘাটটির নাম বিশ্রাম ঘাট। এই ঘাটের উত্তরদিকে বারোটি এবং দক্ষিণ দিকেও ঘাট আছে মোট বারোটি।

পর পর ঘুরে দেখলাম বেশ কয়েকটি ঘাট যেমন, স্বামীঘাট। দীর্ঘদিন কংসের কারাগারে বাস করার পর মুক্ত হয়ে এই ঘাটে স্নান করে বসুদেব দূর করেছিলেন কারাবাসের গ্লানি। এই লোকবিশ্বাসের কথা চলে আসছে শত শত বছর ধরে।

বুদ্ধতীর্থ ঘাট—প্রবাদ আছে, লঙ্কেশ্বর রাবণ একদা তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এই ক্ষেত্রটিতে।

ধ্রুবঘাট—প্রসিদ্ধ ঘাটগুলির মধ্যে ধ্রুবঘাট অন্যতম। উত্তানপাদ রাজার পুত্র ছিলেন ধ্রুব। এই ঘাটের কাছে বসে তপস্যা করে তিনি দর্শন পান বিষ্ণুর। তাই তাঁর নামানুসারেই নাম হয়েছে ঘাটের।

একের পর এক ঘাটগুলি দর্শন করতে করতে এলাম যমুনাতীরে যোগঘাটে। এই ঘাটের আরও একটি নাম আছে—গো-ঘাট। কথিত আছে, নন্দরাজার কন্যা যোগনিদ্রাকে কংস আছাড় মেরে হত্যা করেছিলেন এই ঘাটে—যিনি দৈববাণী করেন কংসের মৃত্যুর কথা। যোগনিদ্রার নামেই নাম হয়েছে যোগঘাট।

এরপর সূর্যঘাট, দশাশ্বমেধ ঘাট, চক্রতীর্থ ঘাট পায়ে পায়ে ঘুরে এসে বসলাম মথুরার ঐতিহ্যময় বিশ্রাম ঘাটে—বিশ্রামে, একদা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর পরে অনেক বিখ্যাত বৈষ্ণব মহাত্মারাও ব্রজপরিক্রমা করার পথে বিশ্রাম করেছিলেন এই ঘাটে বসে। এঁদের কথা ভেবে মনটা আনন্দে ভরে উঠলো আমার। তাঁদের পাদ-স্পর্শে পবিত্র হয়ে রয়েছে যে ঘাট—সেই ঘাটেই আজ বসে আছি ঠিক একইভাবে—

ব্রজ পরিক্রমার পথে।

মথুরার এই যমুনাতীরে সমস্ত ঘাটগুলির মধ্যে বিশ্রামঘাটের প্রসিদ্ধিই বেশী। প্রাচীনও বটে। কিংবদন্তী আছে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলরামসহ কংসকে বধ করে এসে এই বিশ্রামঘাটে এসে বিশ্রাম করেছিলেন। সেই কারণে নাম হয়েছে এর বিশ্রাম ঘাট। পৌরাণিক যুগে হিরণ্যাক্ষকে বরাহদেব এবং শত্রুঘ্ন বধ করেছিলেন দৈত্য লবণাসুরকে—তারপর তাঁরা বিশ্রাম করেছিলেন এই বিশ্রামঘাটে। এসব প্রবাদ প্রচলিত আছে এই বিশ্রামঘাটকে কেন্দ্র করে।

ব্রজের যেমন ৮৪ ক্রোশ তেমনই মথুরা পরিক্রমা করা হয় পঞ্চক্রোশ। এই পঞ্চক্রোশী পরিক্রমার শুরু হয় বিশ্রামঘাট থেকেই। ব্রজ পরিক্রমা শুরু করা যায় সারা বছরের যে কোন দিনে। তবে একটা নিয়ম প্রচলিত আছে, প্রতি বছর ভাদ্র মাসের শুক্ল-পক্ষের একাদশীতে শুরু—শেষ হয় কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে। যেখান থেকে যাত্রা শুরু করা হয়—পরিক্রমা শেষ করতে হয় সেখানেই। তবে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীতে বনযাত্রা করেছিলেন সনাতন গোস্বামী।

এই বিশ্রামঘাটে বসার আগেই ঘুরে এসেছি পাণ্ডাজীর সঙ্গে রঙ্গভূমি। ধ্রুবঘাট থেকে দূরত্ব সামান্যই—আধ মাইল পশ্চিমে। এখানে কংসের আদেশে অক্রুর রথে করে বালক কৃষ্ণকে এনেছিলেন গোকুল থেকে। উদ্দেশ্য যজ্ঞ দর্শন করাবেন। পরে এখানেই কংসের সমস্ত বীর যোদ্ধাদের প্রাণে মেরে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করেছিলেন নিজের মহিমা। তাই এই ক্ষেত্রটির নাম হয়েছে রঙ্গভূমি।

এখন এখানকার ছোট্ট মন্দিরে স্থাপিত বিগ্রহগুলি সব মাটির। তার মধ্যে আছে কংস এবং তাঁর যোদ্ধাদের। মন্দিরে আকর্ষণীয় কিছু নেই। একমাত্র আকর্ষণ হলো রঙ্গভূমির কাছেই রয়েছে প্রাচীন 'কংসাকা কিল্লা' বা কংস টিলার ধ্বংসা-বশেষ।

বিশ্রামঘাট থেকে পর পর দশটি ঘাটের পরই ধ্রুবঘাট। ব্রজ পরিক্রমা না করলেও যে কোন ভ্রমণকারী বা তীর্থযাত্রী মথুরা বৃন্দাবনে এলে এগুলি দেখে যেতে পারেন অনায়াসে।

বাঁধানো বিশ্রামঘাট থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে ঘাটের চত্বরে। অসংখ্য পুণ্যার্থীদের ভিড়ে গমগম করছে ঘাট। কেউ নেমেছেন স্নানে—কেউ করছেন পারলৌকিক ক্রিয়াদি। অধিকাংশই হিন্দী ভাষাভাষির মানুষ। কচ্ছপের এক বিশাল মেলা বসেছে এই ঘাটে।

এখানকার পঁচিশটি ঘাটের মধ্যে বারোটি ঘাটের যে কোনটিতেই সংকল্প করার বিধি। লোক বিশ্বাস, বিশ্রামঘাটে স্নান দান এবং পারলৌকিক ক্রিয়াদিতে ভক্তপ্রাণ তীর্থ-যাত্রীদের তীর্থের ফল অক্ষয় হয়। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘাটটি বাঁধিয়ে দেন শেঠ গোকুল দাস পারেখ।

সমস্ত ঘাটগুলির মধ্যে বিশ্রামঘাটই স্থাপত্য-নৈপুণ্যে ভরপুর। এই ঘাটেই রয়েছে

যমুনাদেবীর মন্দির। আরও অনেকগুলি মন্দির রয়েছে এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে। যমুনার পূর্বতীরে কারুকার্যখচিত অসংখ্য চূড়াযুক্ত বিশাল দ্বারকাধীশ মন্দির রয়েছে ঘাটের কাছেই। দেখলে মন ভরে ওঠে আনন্দে।

শহর মথুরার যমুনাতীরের অধিকাংশ ঘাট, ধর্মশালা এবং মন্দিরগুলি নির্মাণ করেন তৎকালীন ভরতপুরের মহারাজা। তবে এগুলি নির্মাণে জয়পুরের মহারাজাদের দানও কিন্তু কম নয়। এছাড়াও অনেকের দানে এখানে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ধর্মশালা, আশ্রম ও মন্দির। যেমন রাজা বীরসিংহদেব এই ঘাটের উদ্দেশ্যে দান করেছিলেন ৮১ মণ সোনা। পরবর্তীকালে এখানে সোনা দান করেন জয়পুর, রীয়া এবং কাশীর রাজারাও।

'যমদ্বিতীয়া মাহাত্ম্য' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, সূর্যকন্যা যমুনার জন্ম চৈত্রমাসে। তাই প্রতিবছর ওই মাসে এবং যমদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটার দিন এই ঘাটে স্নান করেন দূর-দূরান্তর থেকে আসা লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী। কথিত আছে, যমকে এই দিন চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে, ভোজন করিয়ে যমুনাদেবী এই বর পেয়েছিলেন যে, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়াতে যে ভাই বোন এখানে স্নান করবে, তারা মৃত্যুর পর যমলোক প্রাপ্ত হবে না কখনও।

অর্ধচন্দ্রাকারে মথুরার বুকে বয়ে গেছে যমুনা। ঠিক মাঝখানে বিশ্রামঘাট। ঘাট প্রতিযোগিতায় কাশীর চেয়ে কম যায় না মথুরা। এখানে রয়েছে গণেশ ঘাট—এই ঘাটে স্নান করলে কোটি গো-দানের ফললাভ হয়। সরস্বতী ঘাট—এখানে স্নানার্থী পাপমুক্ত হয়। দশাশ্বমেধ ঘাট—স্নানে স্বর্গলাভ হয়। চক্রতীর্থঘাট, কৃষ্ণগঙ্গা ঘাট, গো-ঘাট, কংসকেল্লার কাছে ব্রহ্মাতীর্থ ঘাট, ওই কেল্লার নীচে বৈকুণ্ঠতীর্থ ঘাট, ঘণ্টাভরণ ঘাট, নাগ ঘাট, স্বামী ঘাট, অসকুণ্ডা ঘাট, বাঙালী ঘাট, সতীঘাট বা গুপ্ততীর্থ ঘাট, নৌকা ঘাট, কনখল ঘাট, সূরজঘাট, বটু ঘাট, ধ্রুব ঘাট, সপ্তঋষি ঘাট, মোক্ষ ঘাট বা মহাদেব ঘাট, রাবণ কোটি ঘাট, বুদ্ধ ঘাট এবং বিশ্রাম ঘাট—এই পঁচিশটি ঘাট নিয়েই সেজে গুজে বসে আছে শহর মথুরা।

আমি বসে রইলাম বিশ্রাম ঘাটে সন্ধ্যায় আরতি দেখার জন্যে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এলো। সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অসংখ্য মানুষ জড়ো হলো এই ঘাটে। আনাচে কানাচেও নৌকায় যমুনার বুকে—চারদিকে শুধু লোক আর লোক। এখানে আসা প্রথম দর্শনার্থীদের অনেকেই ঘিয়ের প্রদীপ কিনে পাতার নৌকায় ভাসিয়ে দিলেন যমুনায়।

কয়েক মিনিটের মধ্যে শত শত প্রদীপ ভাসতে লাগলো জলে—যেন আলোর মালায় সেজে উঠেছে যমুনা। মুহূর্তে এক স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি হলো এখানে। এ-দৃশ্য কখনও ভুলে যাওয়ার নয়। আমরাও প্রদীপ জেলে ভাসিয়ে দিলাম জলে। সাড়ে সাতটা বাজতেই প্রতিদিন সন্ধ্যায় হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডে গঙ্গাদেবীর আরতির মতো এখানেও শুরু হলো যমুনাদেবীর উদ্দেশ্যে আরতি।

আমার কাছে এ এক দুর্লভ দর্শন। আমার মতো দেখছেন শত শত তীর্থযাত্রী—দর্শনার্থীরা। এমনকি বিদেশী পর্যটকরাও সারি সারি দাঁড়িয়ে আছেন এখানে—দেখছেন অবাক বিস্ময়ে। বড় বড় ১০৮টি ঘিয়ের প্রদীপ দানিতে করে বাদ্যের তালে তালে আরতি করলেন যমুনা মন্দিরের নিত্য পূজারী ব্রাহ্মণেরা। তাকিয়ে রইলাম অপলক দৃষ্টিতে। আগেও কয়েকবার এসেছি মথুরায় তবে এমন দর্শন কোনবারই ভাগ্যে ঘটেনি। এ আরতি দর্শনের বর্ণনা—যে দেখেনি কখনও, তাকে লিখে কিছুতেই বোঝানো যাবে না—আনা যাবে না কারও কল্পনাতেও।
টানা রাত ৯টা পর্যন্ত আরতি হলো। ভীড় একটু কমতেই যম আর যমুনা মন্দিরে প্রণাম করে আমরা ফিরে এলাম ধর্মশালায়। আগামীকাল আমরা যাবো কংসের কারাগার, ভুতেশ্বর মহাদেব আর যোগমায়ার মন্দিরে। তাহলেই আমাদের পরিপূর্ণ হবে ব্রজের বনভ্রমণ।

১৩ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার

আজ খুব ভোরেই উঠলাম ঘুম থেকে। চটপট যমুনায় স্নান সেরে ফিরে এলাম ধর্মশালায়। তারপর বাবাজী মহারাজের সঙ্গে সমারোহে কীর্ত্তন করতে করতে চললাম যমুনার ঘাট ধরে। এ-ঘাট সে-ঘাট হয়ে এলাম আবার বিশ্রাম ঘাটে। এবার এখান থেকে চললাম বাজারের পথ ধরে। এসে পড়লাম আম্বেদকার সরকার রোডে। একটু পিছিয়ে এসে দর্শন করলাম শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান। মন্দিরের দেয়ালে আঁকা রয়েছে কৃষ্ণলীলার কিছু ছবি। এগুলি দেখে উপর থেকে নেমে এলাম কংসের কারাগার কক্ষে। দেখলাম বসুদেব দেবকিসহ সদ্যজাত কৃষ্ণের বিগ্রহ। এবার এক এক করে বেরিয়ে এলাম বাইরে। এই জন্মস্থান মন্দিরের গায়েই রয়েছে একটি বিশাল লাল রঙের মসজিদ। মন্দির সংলগ্ন সুন্দর সাজানো দোকানগুলিতে ক্রেতার ভীড় যেন একেবারে উপছে পড়ছে। যারা আসে বেড়াতে—তারা কিছু স্মৃতি নিয়ে যেতে চায় নিজের—আত্মীয় পরিজনের জন্য, তাই হয়তো ভীড়।
এবার মহানন্দে কীর্ত্তনসহ চলতে চলতে এলাম ভূতেশ্বর যোগমায়ার মন্দিরে। সিঁড়ি দিয়ে গর্ভগৃহে অনেকটা নেমে দর্শন করলাম যোগমায়া। তারপর উপরে এসে আর একটি মন্দিরে দর্শন হলো রাধানাথ আর রাধারাণীর।
এখান থেকে কয়েকজন সহযাত্রী বৃন্দাবনে চলে গেলেন বাসে। আর আমরা অনেকেই চললাম পায়ে হেঁটে। এলাম মথুরা শহরের শেষ প্রান্তে। এক জায়গায় একটু বিশ্রাম করে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম বৃন্দাবনের দিকে।
পথেই যমুনাতীরে পড়লো অক্রুর ঘাট। এখানেও একটু বিশ্রাম করে দর্শন করলাম। এক সময় মহারাজ নন্দের গৃহ থেকে মথুরায় কংসের রাজসভায় যাওয়ার সময় ভক্ত অক্রুরকে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন যমুনার জলে। বর্তমানে

এই স্থানটি অক্রুর ঘাট নামেই প্রসিদ্ধ।

আবার শুরু হলো চলা। কিছুটা চলার পর দেখলাম একটি উঁচু টিলার উপরে ভাতরোল রাধারাণীর মন্দির। কিন্তু যাওয়ার রাস্তায় ভীষণ কাঁটা গাছ। তা সত্ত্বেও অনেক কণ্ট করে উঠে এলাম মন্দির-প্রাঙ্গণে। কিন্তু আমাদের কপাল খারাপ তাই আর দর্শন করা হলো না। মন্দির বন্ধ। অনেকেই বসে ছিলেন নীচে—উপরে ওঠেননি। তাই বাইরে থেকেই প্রণাম করে নেমে এলাম নীচে। যারা অপেক্ষা করেছিলেন তাদের নিষেধ করলাম যেতে।

এবার পাগলাবাবার মন্দির দর্শন করে যাবো বলে ঠিক করলাম। সহযাত্রীরা সকলে চলে গেলেন—আমি চললাম একাই। অন্য পথে। একেবারে সোজা দেখা যাচ্ছে পশ্চিমদিকে মন্দির। দূর থেকে ভেসে আসছে ভজন গানের সুর। মাঠের মধ্যে দিয়ে ভজন গানের আওয়াজ অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম সোজা পথ ধরে। মাথার উপরে কড়া রোদের তাপ, পায়ের তলে কাঁটার খোঁচা সহ্য করে অনেকটা এগোনোর পর দেখছি মাঠের পথটি আর নেই। তবে বুঝতে পারলাম, বেশ কিছুটা উঁচুতে উঠে গেছি। এখানে চারদিকে জঙ্গল আর কাঁটাগাছে ভরা। এখন না পারছি এগোতে—না পারছি পিছিয়ে যেতে। কোন মানুষ তো দূরের কথা—প্রাণের চিহ্নটুকুও নেই। গাছ পাথর ধরতে ধরতে অনেক কষ্টে নেমে এলাম সরু একফালি রাস্তার মতো জায়গায়। দেখি নীচে একটা শুকনো বড় খালের মতো। পথের কোন নিশানা পেলাম না। তবে মন্দিরের যে অনেক কাছেই এসে গেছি তা বুঝতে পারলাম, কারণ ভজন কীর্ত্তনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে আরও স্পণ্টভাবে।

যাইহোক, বন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এদিক ওদিক করে অনেক কণ্টে—অনেক পরে একটা রাস্তা পেলাম। কিন্তু এত খোয়া পাথরে ভর্তি যে চলে কার সাধ্য! তবুও তার উপর দিয়ে চলতে চলতে বাঁদিকে দেখলাম কোন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এবার এসে গেলাম বড় রাস্তায়। এখান থেকে আরও কিছুটা এগাতেই দেখলাম ডানপাশে একটা পুকুর—তার সামনে বিরাট একতলা মন্দির। মন্দিরে গিয়ে দেখি মা কালীর পুজো হচ্ছে। বাঁ-পাশে পাগলাবাবার সমাধি মন্দির। সমাধিতে প্রণাম করে প্রবেশ করলাম মূল মন্দিরের ভিতরে। অসংখ্য মাটি আর পাথরের মূর্তি রয়েছে এখানে।

মথুরা-বৃন্দাবন রোডে টি. বি. স্যানেটোরিয়ামের আগেই হাইডল সাব স্টেশনের কাছে এই সমাধি মন্দির। জায়গাটির নাম লীলাবাগ। লুটেরিয়া হনুমান মন্দিরের পাশে। বৃন্দাবনে ঘুরতে এসে টাঙ্গা বাস অটো এমনকি রিক্সাতে আসা যায় সহজে।

বিশাল এই সমাধি মন্দিরটি নয়তলা। এই মন্দিরের নির্মাণ শুরু হয় ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে। মন্দিরটি সম্পূর্ণ শ্বেত পাথরের। এটি নির্মাণ করেন একজন বাঙালী

বৈষ্ণব সাধু—যিনি আসাম থেকে এসে বৃন্দাবনের জ্ঞান-গদাড়িতে অবস্থান করেন এবং পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধিলাভ করেন পাগলাবাবা নামে। অখণ্ড নামসংকীর্তন চলছে এখানে। এই মন্দিরের নির্মাণ-শৈলী বৃন্দাবনের অন্যান্য মন্দিরের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। মন্দির সংলগ্ন বাগানটিও বড় সুন্দর।

আমি সিঁড়ি দিয়ে একতলা দো-তলা করে উঠে এলাম সাত-তলায়। এর উপরে আর উঠলাম না। এই সাত-তলা থেকেই ব্রজধামকে দেখাচ্ছে অপূর্ব—যেন বাঁধানো ছবির মতো। দেখলাম, বৃন্দাবনকে তিনদিক থেকে বেড় দিয়ে বয়ে গেছে যমুনা। অজস্র মঠ মন্দির দাঁড়িয়ে আছে মাথা তুলে—দেখতে লাগছে পাতা কাপড়ে দেয়া টোপরের মতো ডালের বড়ি। এমন সৌন্দর্য দেখে পথের ক্লান্তি মুহূর্তে কোথায় যেন চলে গেল। ধীরে ধীরে নেমে এলাম নীচে।

এবার পাগলাবাবার মন্দির থেকে ধীর পায়ে হেঁটে এলাম প্রায় আড়াই কিলোমিটার পথ—বৃন্দাবনে। দেখা হলো সহযাত্রীদের সঙ্গে। তারপর মদনমোহন ঘেরায় এসে উদাত্ত-কণ্ঠে হরিধ্বনি দিয়ে সকলেই লুটিয়ে পড়লেন ব্রজের ধূলিতে। সহযাত্রীদের সকলেরই চোখ বেয়ে নেমে এলো আনন্দ-ধারা। কারও মুখে কোন কথা নেই। অব্যক্ত আনন্দে ভরে রয়েছে মন। ব্রজে ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমা করতে আমাদের লাগলো ২৪ দিন। আজ সম্পূর্ণ হলো আমাদের বনযাত্রা।

সারাটা পথে আভাদির যত্নের কথা কোনদিন ভুলবো না—ভুলবো না পীতাম্বরদাস বাবাজীর স্নেহের কথা, করুণার কথা। শ্রীশ্রী রামদাস বাবাজী মহারাজ, খড় বাবাজী শ্রীশ্রী রাধারমণদাস বাবাজী মহারাজের অপার কৃপায় আর আমার শ্রীগুরুর অফুরন্ত আশীর্বাদে নির্বিঘ্নে ভ্রমণ করে এসেছি ব্রজমণ্ডল। এঁদের সকলের পাদপদ্মে রইলো আমার শতকোটি প্রণাম। আর প্রণাম রইলো সমগ্র বৃন্দাবনের কৃষ্ণভাবে ভাবায়িত বৃক্ষলতা, তপ্তরোদে যে বৃক্ষের ছায়ায় বসে ক্লান্তদেহে বিশ্রাম করেছি, ব্রজবাসী এবং সহযাত্রীদের চরণে—যাঁদের নিঃস্বার্থ সহযোগিতায়, পরমানন্দে রাধাগোবিন্দের লীলাক্ষেত্র দর্শনের সৌভাগ্য আমার মতো এই অধমেরও হয়েছে

আমি বিদ্বান ও ভক্তিমান নই। সামান্য একজন দোকানী। লেখার ক্ষমতা, ভাষাজ্ঞান আমার কোনদিনই ছিল না—আজও নেই। চলার পথে যেখানে যেটুকু দেখেছি—যা উপলব্ধি করেছি, তাই-ই কিছু কিছু লিখে রেখেছি নিজের ভাষায়। যদি কেউ কোনদিন এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়ে বন-পরিক্রমায় যেতে উৎসাহী হয়—শ্রীরাধারমণের চরণে অগ্রসর হয়—তাহলেই সার্থক হবে আমার লেখার এই শ্রমটুকু।

১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে জন্ম শিখ ধর্মগুরু নানকের। গৃহত্যাগের পর পরিব্রাজন জীবনে একবার তিনি এসেছিলেন মথুরায়—শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি দর্শনে। লীলাময় প্রভু কৃষ্ণের অগণিত লীলাস্মৃতি ছড়ানো রয়েছে মথুরা বৃন্দাবনের আকাশে বাতাসে—অসংখ্য নানা পুণ্যক্ষেত্রে। এখানে পৌঁছানো মাত্রই কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দময় রসে ডুবে গেলেন ভারতবিশ্রুত ভক্তিবাদী মহাপুরুষ নানক।

একদিন স্নান সেরে ফিরছেন যমুনা থেকে। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো এক অন্ধ ভিখারী। পরনে শতচ্ছিন্ন বস্ত্র। পথের ধারে ছাইপাঁশ ফেলে গেছে গৃহস্থেরা। তারই মধ্যে দু-এক কণা খাবারের সন্ধান করছে হাতড়িয়ে।

থমকে দাঁড়ালেন নানক। একটা পা-ও আর এগোলো না। করুণার হৃদয় তাঁর বিগলিত হলো। ভিখারীর কাছে গিয়ে শান্ত মধুর কণ্ঠে তিনি বললেন, 'বাবা, এ কি করছো তুমি ? এমন নোংরা না ঘেঁটে কৃষ্ণের নামগান করে পথে পথে ভিক্ষে করো। তাতে দু-মুঠো অন্নের অভাব হবে না তোমার। তিনিই তোমাকে জুটিয়ে দেবেন।'

কাতর কণ্ঠে ভিখারী বললেন, 'প্রভু, সেই করেই তো চলছিল এতদিন। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে! কিছুদিন যাবৎ দু-চোখের দৃষ্টিই আমার চলে গেছে। অন্ধ হয়ে গেছি। এখন আমি আর পথ চলতে পারি না। দু-দিন ছিলাম অনাহারে। ঘরে থাকতে পারিনি। ঘরের পাশেই এই আস্তাকুঁড়। তাই দেখছি, পেটের জন্যে কিছু মেলে কি-না ?'

এ-কথা শুনে চোখদুটি জলে ভরে উঠলো দয়ার প্রতিমূর্তি নানকের। করোয়া থেকে এক অঞ্জলী জল নিয়ে ছিটিয়ে দিলেন অন্ধভিখারীর চোখে। সময় কাটলো মুহূর্তমাত্র। বিস্ময়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন ভিখারী—'তবে কি স্বপ্ন আমার সত্যিই সফল হলো ? সবকিছুই দেখতে পাচ্ছি দু-চোখে। এখন আমি আর অন্ধ নই। আপনিই কি তবে আমার প্রভু নানকজী। আমি যে আপনারই আশাপথ চেয়ে দিন গুণছি।'

ভিখারী প্রণাম করলেন সাষ্টাঙ্গে। অবাক হয়ে নানক প্রশ্ন করেন, 'কি ব্যাপার বলতো বাবা ?'

আবেগভরা কণ্ঠে ভিখারী বললেন,

—প্রভু, কয়েকদিন আগে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। তাতে প্রত্যাদেশও পেয়েছি। গোবিন্দজী ডেকে আমায় বললেন, 'ওরে আর দুঃখ করিস্‌নে তুই। শিগ্‌গীরই মথুরায় আসবেন নানক নিরংকারী। তিনিই ফিরিয়ে দেবেন তোর দৃষ্টিশক্তি—

করবেন অন্ধত্বমোচন। এ আমার এক পরম সৌভাগ্য। আজ আপনার দর্শনলাভ করলাম আমি।'

নানক আশীর্বাদ করলেন ভিখারীকে। এবার রওনা হবেন তিনি—এমন সময় তাঁর পথ আগলে দাঁড়ালেন সেই ভিখারী। কাতর কণ্ঠে বললেন, 'প্রভু, বাইরের দৃষ্টি তো ফিরিয়ে দিলেন। কৃপা যখন করেছেন, তখন ভিতরের চোখ দুটি এবার ফুটিয়ে দিন। পরম প্রভুর দর্শন যাতে লাভ করি, সে শক্তি—সে সাধন দিন আমাকে।'

মথুরা নগরীতে এই ভিখারীই প্রথম—যিনি নানকের কাছ থেকে প্রথম সাধনপ্রাপ্ত হন। উত্তরকালে তিনিই পরিচিত হয়ে ওঠেন একজন সার্থক শিখ সাধকরূপে। এ ঘটনার সময়কাল আনুমানিক পাঁচশো বছর আগের।

খুব বেশী বলা হবে না যদি সমগ্র উত্তরপ্রদেশকেই রামায়ণ মহাভারতের দেশ বলা যায়। কারণ এখানকার নদ-নদী পাহাড়-পর্বত এমনকি প্রতিটি ধূলিকণা কোন না কোন ভাবে রামায়ণ মহাভারতের প্রসিদ্ধ চরিত্রগুলির কাহিনী বিজড়িত।

রামায়ণী যুগের কথা। লোলার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন মহাসুর মধু। একদা তিনি প্রতিষ্ঠা করেন মথুরা নগরী। পৌরাণিক নাম এর মধুপুরী। আজকের মথুরার পৌরাণিক যুগে মধুপুরী নাম হয়েছিল তারই নামানুসারে।

মধুদৈত্যের পুত্রের নাম লবণ। তিনি অযোধ্যার রাজা রামের বশ্যতা স্বীকার না করে যমুনাতীরবাসী তপস্বীদের উপর অত্যাচার ও উপদ্রব করতেন। রাজা রাম শত্রুঘ্নকে পাঠালেন মধুপুরীতে। শুরু হলো প্রবল যুদ্ধ। লবণাসুরকে নিহত করলেন শত্রুঘ্ন। "লবণবধের পর দেবগণ প্রীত হয়ে শত্রুঘ্নকে বর দিলেন, এই দেব-নির্মিত রমণীয় মধুপুরী তোমার আবাস হবে। শ্রাবণ মাস থেকে শত্রুঘ্নের সৈন্যগণ সেখানে বসতি করতে লাগল। শূরসেনার উপনিবেশের ফলে শত্রুঘ্নের যত্নে দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে যমুনাতীরে এক অর্ধচন্দ্রাকার সুশোভিত সুসমৃদ্ধ বহু প্রজা-সমন্বিত নগর স্থাপিত হল।" পরবর্তীকালে মধুপুরীর নাম মধুরা বা মথুরা হয়। তার পরিধিস্থ প্রদেশের নাম শূরসেন। (বাল্মীকি রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, সর্গ ৭০-৭১।) তবে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে মথুরাকে 'মধুপুর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

উত্তরকাণ্ডে ৮৩ সর্গে মহর্ষি বাল্মীকি মথুরাকে 'মধুপুরী' বলে উল্লেখ করেছেন, "ইয়ং মধুপুরী রম্যা মধুরা দেব নির্মিতা।"

বসুদেব এবং কুন্তীর পিতা "শূর" এই প্রদেশের রাজা ছিলেন এবং নিজের নামানু-সারে স্বরাজ্যের নামকরণ করেছিলেন "শূরসেন"। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল মথুরা। (হরিবংশ অধ্যায়—৫৫, ৯১, বৃহৎসংহিতা অধ্যায়—১৪)

তারপর শূরসেন-ক্ষত্রিয়বংশেই কালক্রমে আবির্ভাব ঘটে রাজা যযাতির। যযাতির পুত্র যদুর অধস্তন বংশীয় যাদবেরা মহাপরাক্রান্ত হয়ে ওঠেন মথুরায়। এই যাদবদেরই

বৃষ্ণি শাখায় একসময় আবির্ভূত হয়েছিলেন অবতার পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ।
মথুরায় জন্মের পর যমুনার অপর তীরে গোকুলে কৃষ্ণ বড় হয়ে গোকুলবাসীসহ চলে আসেন বৃন্দাবনে। বাল্য ও কৈশোরলীলা তাঁর বৃন্দাবনেই।
কালক্রমে কংসের মৃত্যুর দৈববাণীর কথা মনে রেখেই মথুরারাজ কংস হত্যার ষড়যন্ত্র করলেন কৃষ্ণকে। মল্লক্রীড়ার অনুষ্ঠান করলেন কংস তাঁর সভায়। এই ক্রীড়া দেখাবার ছল করে অক্রূরকে দিয়ে মথুরায় আনালেন কৃষ্ণকে। দৈববাণী সফল হলো। কংসকে বধ করলেন কৃষ্ণ।
কংসের মৃত্যুর পর মগধরাজ মহাপরাক্রমী যোদ্ধা শ্বশুর জরাসন্ধ প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সতেরো বার আক্রমণ করেন মথুরা। অতিষ্ঠ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা নগরী স্থাপন করে, সঙ্গে যাদবদের নিয়ে চলে গেলেন দ্বারকায়।
অযোধ্যায় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। মনুর দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন নভগ। পৌরাণিক যুগে তিনি রাজ্যস্থাপন করেছিলেন যমুনাতীরে মথুরায়।
মহাভারতীয় যুগে ১৬টি জনপদের কথা উল্লিখিত হয়েছে মহাভারতে। তার মধ্যে কাশী, পাঞ্চাল, কোশল, মৎস্য দেশের (রাজস্থান) মতো শূরসেন (মথুরা) জনপদের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। মহাভারতীয় যুগে (আনুমানিক ৪,৪৩৮ বছর আগে) এই মথুরা নগরী যে কতটা সমৃদ্ধিশালী ছিল তারও উল্লেখ আছে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৪১শ অধ্যায়ে—
"...ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরা দর্শনের ইচ্ছায় গোপগণ পরিবৃত হয়ে বলরামের সঙ্গে অপরাহ্নে মথুরায় প্রবেশ করলেন। তাঁরা দেখলেন উচ্চ নগরদ্বার, স্ফটিক নির্মিত গৃহদ্বার ও বৃহৎ সুবর্ণ কপাটযুক্ত তোরণগুলি শোভা পাচ্ছে। তামা ও পিতলময় ধানের পাত্রে পূর্ণ, পরিখা দ্বারা দুর্গম, উদ্যান এবং রমণীয় উপবন প্রভৃতি দ্বারা শোভিত মথুরাপুরী তিনি দর্শন করতে লাগলেন। স্বর্ণময় চতুষ্পথ, ধনীদের গৃহ, গৃহোচিত উপবন, ব্যবসায়ীদের সভাস্থান ও অন্যান্য গৃহগুলি মথুরাপুরীকে অলঙ্কৃত করে রেখেছে। গৃহগুলির সামনের বারান্দার বাঁকা কাঠ, তার নীচের বেদী, গবাক্ষ এবং কুট্টিম (চাতাল) সমস্তই বৈদুর্য, হীরক, স্ফটিক, নীলকান্ত মণি, মুক্তা ও মরকতমণি খচিত। সেই সমস্ত কুট্টিমে ময়ূর ও পায়রাগুলি শব্দ করছে। রাজপথ, পণ্যপথ, সাধারণ পথ ও চত্বরগুলি সমস্তই অভিষিক্ত এবং সেখানে মালা, যব প্রভৃতির অংকুর, খই ও চাল ছড়ান রয়েছে। আর সেখানকার সমস্ত ভবন দধি ও চন্দনচর্চিত অজস্র কুম্ভে সুন্দরভাবে সাজান। কুম্ভগুলির চারদিকে ফুল ও দীপশ্রেণীতে বিভূষিত এবং মুখে পল্লব ও কণ্ঠে প্রটিযুক্ত। এভাবে ভবনগুলি কলাগাছ, সুপারি ও তোরণে সুসজ্জিত হয়েছিল। রাম-কৃষ্ণ গোপালগণ পরিবৃত হয়ে রাজপথ দিয়ে সেই সুসজ্জিত উৎসবময় পুরীতে প্রবেশ করলেন।"...
"বর্তমান মথুরানগরীর পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব অংশে, লবণাসুরের পিতা

মধুদৈত্যের নামানুসারে "মধুপুরী" নগরী প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহাকে "মধুবনও" বলা হইত। ঐ স্থানেই শত্রুঘ্ন "মথুরা নগরীর" স্থাপন করেন।" (হরিবংশ, প্রথম অধ্যায়—৫৪) (Growse's Mathura. ch. 4.)

মথুরায় যমুনা নদীর উত্তর সীমায় রয়েছে একটি প্রাচীনদুর্গের ধ্বংসাবশেষ। জনশ্রুতি আছে, প্রাচীনকালে এখানে কংসের কেল্লা ছিল এবং এটি তারই ভগ্নাবশেষ। তাই এখনও এর নাম "কংস কা কিলা।' তবে ঐতিহাসিকদের মত, ওসব কংস-টংস কেউ করেননি। ওটি নির্মাণ করেন জয়পুরের মহারাজা মানসিংহ। কালক্রমে ধ্বংস হয়ে যায় দুর্গটি।

ভূতাত্ত্বিকদের গবেষণায় প্রাচীনকালের উজ্জ্বল গৌরবমণ্ডিত সভ্যতা ও ইতিহাসের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে কৌশাম্বি, হস্তিনাপুর, কনৌজের মতো এই কৃষ্ণনগরী মথুরায়। খ্রীষ্টীয় শতক আরম্ভ হওয়ার ঠিক পূর্ব পর্যন্ত পৌরাণিক কণ্বরাজ বংশ ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে রাজত্ব করেছিলেন। সেই বংশের বসুদেবের শিলালিপি মথুরায় আবিষ্কৃত হওয়ায় ক্যানিংহাম সাহেব বলেন, হয়তো ওই বংশ এই স্থানেও রাজত্ব করেছিলেন।

২৪ জন জৈন তীর্থঙ্করদের মধ্যে মল্লিনাথ জন্মগ্রহণ করেন মথুরায়। স্বয়ং ব্যাসদেবের জন্ম যমুনাতীরে কল্পিনামক স্থানে। পরে কিছুকাল বসবাস করেন ঝাঁসীর কাছে বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশে বাবিনায়। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে আছে, চ্যবন এবং ভৃগুমুনির বংশধরেরা একদা বসবাস এবং তপস্যা করতেন মথুরায়—যমুনাতীরে। আদিপুরুষ মনুর পৌত্র এবং উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব, দুর্বাসা প্রমুখগণ তপস্যা করেছিলেন মথুরায়।

মথুরা নগরের পশ্চিমে আছে একটি ক্ষুদ্র পল্লী—মল্লপুরা। এই মল্লপুরাতেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। কথিত আছে, দ্বাপরে এখানে বাস করতো রাজা কংসের অসংখ্য মল্লবীর। তাদের নামানুসারেই স্থানটির নাম হয়েছে মল্লপুরা।

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে একদা গৌতমবুদ্ধ এসেছিলেন প্রাচীন নগরী মথুরাতে। ঐতিহাসিকেরা বলেন, সম্রাট অশোকের সময় বৌদ্ধধর্মের বিশেষ ভাবে প্রসারলাভ হয় মথুরায়। সম্রাট অশোক বেশ কয়েকটি বৌদ্ধস্তূপ নির্মাণ করেন মথুরায়—যা সংরক্ষণের অভাবে কালের নিয়মে ধ্বংস হয়ে গেছে।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের কথা। মৌর্য সম্রাট ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত। তখন অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে মথুরা। বৌদ্ধধর্মের প্রচারকেন্দ্র হিসাবে মথুরা প্রসিদ্ধিলাভ করে মৌর্যযুগেই। ওই শতকেই অর্থাৎ খ্রীষ্ট ৩০২ বৎসর পূর্বে গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিস্ এসেছিলেন ভারত ভ্রমণে। শূরসেন বা মথুরা নগরীর কথা তাঁর ভারত বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন তিনি।

কুষাণ বংশের রাজা ছিলেন কণিষ্ক। তাঁর সাম্রাজ্যের পূর্ব-খণ্ডের রাজধানী ছিল এই মথুরা। শিল্প সংস্কৃতি ও ব্যবসা বাণিজ্যে তখন মথুরার স্থান ছিল

অনেক উপরে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্তবংশীয় রাজাদের সময় কাশীর মতো গৌরবমণ্ডিত হয়ে ওঠে একদা পৌরাণিক কংসের রাজধানী আজকের মথুরা নগরী।

সপ্তম শতাব্দীতে হিউ-এন-সাঙ্ ভারত ভ্রমণে এসে—এসেছিলেন মথুরাতেও। সেই সময় অসংখ্য বৌদ্ধ মঠ ছিল এখানে। তখন মথুরার বিভব ঐশ্বর্য এবং মন্দিরগুলি দর্শন করে অভিভূত হয়েছিলেন বিস্ময়ে—একথা লিখেছেন ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এদেশের বিষয়ে লেখা তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত "Si-yu-ki" গ্রন্থে। 'মথুরা' গ্রন্থে গ্রাউস সাহেব বলেছেন, চীনা পরিব্রাজক হিন্দুতীর্থ মথুরাকে বৌদ্ধনগরীরূপে গণ্য করেছেন।

মথুরা প্রসঙ্গে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ক্যানিংহাম সাহেব Archaeological Survey Report, Volume X X, page 31-এ লিখেছেন—

"(i) The oldest city of the aboriginal King Madhu was at Madhupur now Maholi.

(ii) The Aryan City after the defeat of Madhu, was built on the site of the present Katra, with the Bhuteshwar Temple at its centre.

(iii) I had already arrived at his (Growse's) second conclusion as to the site of the ancient Aryan city from an examination of the ground, compared with Hiuen Tsang's statements as to the relative position of different Buddhist monuments. The people are also unanimous in their belief that the Katra was the site of the ancient city."

ক্যানিংহাম সাহেব আবার পর্যবেক্ষণ করেন, "But the Katra stands in the Kesopura Mohalla of the present day, and as there can be little doubt that the great temple of Keshava had stood on this site from a very early date, although often thrown down and as often renewed. I think that Kesopura must be the Khisobora or Kaishobora of Arrian, and the Chisobora of Pliny."

সপ্তম শতাব্দী থেকেই বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসে মথুরায়। বাড়তে থাকে হিন্দুধর্মের প্রভাব। দশম শতাব্দীতে তা আরও বেড়ে যাওয়ার ফলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব স্তিমিত হয়ে যায়। সেই সময় অনেক শ্রীবৃদ্ধিও হয় মথুরার। একাদশ শতাব্দীতে সগৌরবে ফিরে আসে হিন্দুধর্মের প্রভাব। ফলে আবার নতুন করে মথুরায় প্রতিষ্ঠিত হয় অসংখ্য হিন্দুমন্দির।

মথুরায় এসেছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ টমেসি। তিনি মথুরার ঐশ্বর্য ও

ধনে মুগ্ধ হয়ে মথুরাকে বর্ণনা করেছিলেন 'অমরাপুরী' নামে। (Medoura of the Gods.)

১০১৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। গজনীর সুলতান মামুদ মথুরার সমৃদ্ধিতে আকৃষ্ট হয়ে এলেন মথুরায়। আক্রমণ করলেন মথুরা নগর। ধ্বংস করলেন অসংখ্য প্রাচীন মন্দির এবং দেবদেবীর বিগ্রহ। লুণ্ঠন করলেন মথুরার ধনরত্ন, ঐশ্বর্য।

পরবর্তীকালে—১১১৪ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানদের সম্পূর্ণ অধিকারে আসে মথুরা। ধর্মান্ধ অধিকাংশ মুসলমান শাসকেরা সমগ্র মথুরা বৃন্দাবনের ধ্বংস কার্য চালিয়ে গেছেন নির্বিচারে—একমাত্র মোঘল সম্রাট আকবর ছাড়া। কুতুবদ্দিন এবং সেকেন্দার লোদিও এ-কাজ থেকে বিরত থাকেননি।

১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ঔরঙ্গজেবের আমল। তিনিও বাদ গেলেন না মথুরার ধ্বংস কার্য থেকে। মন্দির ভাঙলেন। মসজিদ গড়লেন। বৃন্দাবনের নতুন নামকরণ করলেন সেলিমাবাদ আর মথুরার নাম দিলেন ইসলামাবাদ।

এই প্রসঙ্গে ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পাদক সমীপেষু বিভাগে 'ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ধর্মান্ধতা' শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি ছাপা হয় এক পাঠকের। লিখেছেন—'ইতিহাস-বিকৃতি', জয়দেব কর্মকার, নিউ ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগণা থেকে—

"ইতিহাসকে বিকৃত করার অধিকার কারও নেই। হলে প্রতিবাদ ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু, প্রতিবাদের অছিলায় আনন্দবাজার অনৈতিহাসিক পথ গ্রহণ করেছে। হিন্দু-বিদ্বেষী ঔরঙ্গজেব কর্তৃক হিন্দু মন্দির ধ্বংসের ঐতিহাসিকতাকে 'কল্পকাহিনী' বলে উড়িয়ে দেবার প্রয়াসে 'মিথ্যার এই বেসাতি' (আঃ বাঃ ৩রা মার্চ) শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এই প্রতিবাদপত্র। ঔরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষ ও ধর্মান্ধতা "অতীত ইতিহাস হইতে আহরণ করা মিথ্যা" বলে অভিহিত করে ইতিহাস স্বীকৃত এ যাবৎ-কার মতামতকে একপেশে প্রচারের দ্বারা অস্বীকার ও বিকৃত করার সাধনায় লিপ্ত ক্রোধান্ধ মানসিকতার নিকট এই নিবেদন।

হিন্দুবিদ্বেষী গোঁড়া সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত ঔরঙ্গজেবের লক্ষ্য ছিল হিন্দুমন্দির ধ্বংস করা ও হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা। তিনি হিন্দুমন্দির ধ্বংস করার জন্য অধীনস্থ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিকট 'ফরমান' (Canon Law) জারি করতেন। ঐতিহাসিক ভি.ডি. মহাজনের 'ইণ্ডিয়া সিন্স ১৫২৬' বইতে পাওয়া যায়: Aurangzeb ordered the demolition of Hindu temples. In February 1659, he passed the following order…ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, হিন্দুমন্দির ধ্বংসের সংবাদ ঔরঙ্গজেবকে আনন্দ দিত। ধর্মের গোঁড়ামিতে তা স্বাভাবিক। 'দ্য অক্স-ফোর্ড হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া' বইতে ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট এ. স্মিথ লিখেছেন: "ঔরঙ্গজেব জেনে খুশি হলেন যে, মথুরার কেশবদেবের মন্দির ধূলিসাৎ করা হয়েছে। সেখানে ব্যয়বহুল একটি বৃহৎ মসজিদ বানানো হয়। ["Auran-

gzeb had the satisfaction of learning that the magnificent temple of Kesava Deva at Mathura, one of the noblest building in India, had been levelled with the ground. The foundation of a large and costly mosque was laid on the site"] এই সময়েই মথুরার নাম পরিবর্তন করে 'ইসলামাবাদ' রাখা হয়।

কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়ার চতুর্থখণ্ডে স্যার উসলে হেগ এবং স্যার রিচার্ডস বার্ন ১৯ এপ্রিল, ১৬৬৯-এর ঔরঙ্গজেবের এক আদেশনামার উল্লেখ করেছেন। তাতে আছে ঃ শুধু মন্দির বা উপাসনা গৃহই নয়, বাদশাহ বিদ্যালয় গৃহও ভেঙে দেবার নির্দেশ দেন। [On 19 April 1669 he issued a general order to the Governors of all provinces to demolish the schools and put down their teaching and religious practices strongly.] ঐতিহাসিকদ্বয় আরও লিখেছেন, এই আদেশের পর গোটা সাম্রাজ্য জুড়ে অসংখ্য ছোট ছোট হিন্দু উপাসনাগার সহ পটনার (?) বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির, বেনারসের বিশ্বনাথের মন্দির এবং মথুরার কেশব দেবের মন্দির ধূলিসাৎ করা হয়।

একমাত্র অম্বরেই ৬৬ টি এবং উদয়পুর ও চিতোরে দুই মাসে ২৩৯ টি হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয়। ["Besides numberless minor shrines throughout the empire, all the most famous Hindu places of worship now suffered destruction, the temple of Somnath at Patna, (?) Visvanath at Benares and Kesava Deva at Muttra····· sixty-six temple being demolished at Ambar······Udaypur and Chitor alone in two months 239 temple suffered ruin by his order."]

এই সময়তেই সোমনাথের দ্বিতীয় মন্দিরটিও ধূলিসাৎ করা হয়। এটি রাজা ভীম দেব (1134-74) তৈরী করেন। জাহাঙ্গীরের আমলে রাজা বীরসিংহ বুন্দেলা কর্তৃক ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মথুরার 'কেশব রাই' মন্দির স্থাপিত হয়। এ বিষয়ে উল্লেখ আছে 'মা-আসির-ই আলমগিরি' (Ma-Asir-I-Alamgiri) গ্রন্থে। এ তথ্য আছে এস. এম. এডওয়ার্ডস ও এইচ. এল. ও গ্যারেটের 'মুঘল রুল ইন ইণ্ডিয়া' পুস্তকে। ঐতিহাসিক ডি. এ. এল. শ্রীবাস্তব তাঁর 'মিডিয়েভেল হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া' বইতে ঔরঙ্গজেবের হাজার মন্দির ধ্বংসের উল্লেখ করেছেন।

আপন ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠতা ঔরঙ্গজেবকে পরধর্ম অসহিষ্ণু করে তুলেছিল। তাঁর এই মহৎ কর্মের জন্য—ঐতিহাসিক ভি. ডি. মহাজন লিখেছেন—"মক্কা শরিফ থেকে শুরু করে পারস্য, বাসক্, বোখরা, আবিসিনিয়া, কিভা—তামাম মুসলিম দুনিয়ার শাসকবর্গ 'উষ্ণ বাহবা' ('warm praise') দেয়।"

যাইহোক, এরপর জাঠ আর মারাঠাদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তবে মথুরার কপালে গুজরাটের

সোমনাথের মতো সুখ সহ্য হয়নি। নাদিরশাহ মথুরা আক্রমণ করলেন ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর ধ্বংসলীলায় অংশ গ্রহণ করলেন আহমদ শাহ আবদালী—১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে।

বয়েসের ভারে অতিবৃদ্ধা প্রাচীনা যমুনা মূলত মথুরা বৃন্দাবনকে সুখী জীবন যাপন করতে দেখছে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে। অর্থাৎ ইংরাজ অধিকার স্থাপনের পর আবার মথুরা ফিরে আসে মথুরায়।

শত শত বছর ধরে এ-সবেরই সাক্ষী হয়ে অন্তরভরা ব্যথা নিয়ে নীরবে বয়ে গেছে যমুনা—বয়ে চলেছে আজও।

অতি প্রাচীন নগরী এই মথুরা। সুন্দর ছোট্ট শহর। শহরের পূর্বদিক দিয়ে বয়ে গেছে হিমালয় থেকে বয়ে আসা পৌরাণিক নদী বিশ্বকর্মা-নন্দিনী সংজ্ঞার পূত-কন্যা পুণ্যসলিলা যমুনা। সৌরাষ্ট্রের সমুদ্রতটে যেমন সোমনাথ তেমনই কলনাদিনী যমুনাতটে মথুরাপুরী একটি প্রাচীন তীর্থ। পুরাণের মতে, সাতটি মোক্ষভূমির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি অসংখ্য মন্দির-শোভিত, রাধাকৃষ্ণের নামগানে মুখরিত মথুরা অন্যতম একটি।

মথুরা থেকে হাঁটা পথে বৃন্দাবন এলে পড়ে বৃন্দাবন-ফটক। এখানে আছে গোকর্ণ মহাদেবের মন্দির। মথুরা স্টেশন থেকে শহরের দিকে এগোলে প্রথমেই পড়বে একটি বিশাল ফটক—নাম হার্ডিঞ্জ গেট। মথুরা বাসস্ট্যান্ড থেকে কনডাকটেড ট্যুরে বাস যায়। ৫৬ কি. মি. ব্যাসার্ধের বৃন্দাবন, গোবর্ধন এবং মথুরার মূল দর্শনীয় মন্দিরগুলি ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনে। এই বাস স্ট্যান্ড থেকেই আগ্রায় বাস যায় নিয়মিত ভাবে। মথুরা থেকে দূরত্ব সামান্য—৫৪ কি. মি.। ভোরে বেরিয়ে আগ্রা ঘুরে ঘুরে দেখে সন্ধ্যায় ফিরে আসা যায় মথুরায়। আবার আগ্রা থেকে কনডাকটেড ট্যুরে বাস আসে মথুরা বৃন্দাবনে। ওখান থেকেও এসে ঘুরে দেখা যায় মথুরা বৃন্দাবন।

আমি ঘুরেছি দু-ভাবেই। তবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হলে টাঙ্গায় ঘোরাই ভালো। এখন অবশ্য অটো হয়েছে। একদিন ভোর বেলায় বৃন্দাবন থেকে টাঙ্গা নিয়ে এলাম মথুরায় পাকা পীচের রাস্তা ধরে। দূরত্ব মাত্র ১৩ কি. মি.। বৃন্দাবন থেকে মথুরা আসার পথে পড়ে গীতা মন্দির। টুক করে দেখে নিয়েছি সেটা। সুন্দর এই মন্দিরের স্তম্ভের গায়ে খোদিত রয়েছে সম্পূর্ণ গীতার প্রতিটি শ্লোক।

মথুরাপুরীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। কাশী অযোধ্যা হরিদ্বার উজ্জয়িনী দ্বারকা ইত্যাদি সাতটি ক্ষেত্র মোক্ষদায়িকা, তবুও তার মধ্যে মথুরাকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। কারণ এই ক্ষেত্রে জন্ম উপনয়ন মৃত্যু এবং দাহ—এই চারটির কোন একটি হলেই এই ধাম মুক্তি দেয় মানুষকে। কৃষ্ণপ্রেমিক ভক্তদের বিশ্বাস, শ্রীহরির নিত্য সান্নিধ্য পাওয়া যায় এই মথুরায়। বরাহ পুরাণ; হরিবংশ, বৃহৎ সংহিতা, ব্রহ্মপুরাণ,

অগ্নিপুরাণ, ভাগবত থেকে শুরু করে প্রায় সব পুরাণেই উল্লিখিত হয়েছে নগর মথুরার কথা।

আমাদের টাঙ্গা এসে দাঁড়ালো দ্বারকাধীশ মন্দিরের সামনে। শহরের ঠিক মাঝখানেই এই মন্দিরের অবস্থান। কাটরা কেশবদেব অর্থাৎ আজকের দ্বারকাধীশ মন্দিরটি যেখানে—লোক বিশ্বাস, এখানেই প্রাচীনকালে ছিল কংসের কারাগার—শ্রীকৃষ্ণ জন্ম-গ্রহণ করেন এই ক্ষেত্রটিতে। অসকুণ্ডা ঘাটের কাছে আজকের এই মন্দির প্রসঙ্গে আছে অতীত কিছু কথা। যেমন,

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর মহারাজ যুধিষ্ঠির অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে হস্তিনাপুর রাজ্য এবং মথুরামণ্ডলের রাজা হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র ব্রজনাভকে অধিষ্ঠিত করে স্বয়ং ভাইদের সঙ্গে নিয়ে চলে যান মহাপ্রস্থানের পথে। ভক্তিমতী মাতার প্রেরণায়, রাজা পরীক্ষিৎ-এর সহায়তা, মহর্ষি শাণ্ডিল্যের নির্দেশে ব্রজনাভ প্রপিতামহ কৃষ্ণের স্মৃতিরক্ষার্থে উজাড় হয়ে যাওয়া মথুরামণ্ডলকে পুনঃস্থাপিত এবং মন্দির কুণ্ড ইত্যাদি নির্মাণ করেন।

কংসের এই কারাগার যেখানে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেটিই পরিণত হয়েছে কেশবদেবের মন্দির-রূপে। কালক্রমে অনেক সুন্দর এবং বিশাল মন্দিরও নির্মাণ হয়েছে এখানে। তার মধ্যে কিছু নষ্ট হয়েছে কালের প্রভাবে আর কিছু বিনষ্ট হয়েছে বিধর্মীদের হাতে।

আজ থেকে প্রায় দুহাজার বছর আগেকার এক শিলালিপি থেকে জানা গেছে, কোন 'বসু' (Vasu) নামক এক ব্যক্তি প্রথম একটি মন্দির, তোরণদ্বার এবং বেদির নির্মাণ করিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে। পরবর্তীকালে অন্য ঐতিহাসিকের মতানুসারে দ্বিতীয় বিশাল মন্দিরটি নির্মিত হয় গুপ্তসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের শাসনকালে। সেই মন্দিরটি ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরটি ভেঙে ফেলে লুণ্ঠন করেন গজনীর সুলতান মামুদ। 'Tarikh-E-Yamini' নামক গ্রন্থে এই মন্দির প্রসঙ্গে Altubi Mir Munshi লিখেছেন, 'শহরের মধ্যে মন্দিরটি সবচেয়ে বড় এবং সুন্দরতম, ছবিতে বা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।'

সুলতান মামুদের নিজের হাতে ধ্বংস করা কেশবদেবের মন্দিরটি সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখেছেন, "যদি কেউ এই রকম একটা ইমারত বানায় তো দশকোটি দিনার (Dinars) খরচা হবে, আর অসংখ্য যোগ্য ও সংবেদনশীল কারিগরদের লাগালেও এই রকমটি বানাতে কম করেও দুশো বছর লেগে যাবে।" তারপর তিনি এও লিখেছেন, "কুড়িদিন ধরে লুটতরাজ চালিয়ে সোনার পাঁচটি বড় বড় বিগ্রহ পাওয়া গিয়েছিল, যেগুলির মাণিক্য দিয়ে তৈরী। সোনার আরও একটি বিগ্রহ পাওয়া গিয়েছিল যার ওজন ৬৮,৩০০ মিস্কল বা প্রায় ১৪ মণ সোনা। এতে প্রায় দেড় সের নীলা বসানো ছিল। রূপার ভারী ভারী একশো দেবদেবীর মূর্ত্তি একশোটি উটের উপরে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।"

লুটেরাদের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছিল এই অফুরন্ত ধনরাশি দেখে। অন্যান্য সমস্ত রত্নই তারা হস্তগত করেছিল—যেগুলি প্রায় ছয়শো বছর ধরে নির্বাধ রীতিতে মৌমাছির মতো সঞ্চয় করে এসেছিল মহাবৈভবশালী হিন্দুরাজারা এবং জনসাধারণ। অবশ্য এই বিপত্তিকালে অসংখ্য বৌদ্ধ ও হিন্দুর দেবদেবীর মূল্যবান বিগ্রহ ফেলে দেয়া হয়েছিল কুঁয়োতে। মথুরায় পড়ে থাকা অসংখ্য কুঁয়ো থেকে এগুলি পাওয়া গেছে পরবর্তীকালে।

এরপর মহারাজ বিজয়পাল দেবের শাসনকালে (1150 A. D.) জজ্জ নামক এক ব্যক্তি সুলতান মামুদের ভাঙ্গা ক্ষেত্রটিতে আবার নতুন করে স্থাপন করেছিলেন কেশবদেবের মন্দির। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভু পদার্পণ করেন এখানে।

এই বিরাট মন্দিরটি সিকন্দর লোদি ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন ১৬ শতাব্দীর প্রারম্ভে। এর ১২৫ বছর পর জাহাঙ্গীরের শাসনকালে রাজা বীরসিংহ দেব বুন্দেলা ৩.৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করে শ্রীকৃষ্ণের এই জন্মস্থানে অন্য একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন। উচ্চতা প্রায় ২৫০ ফুট। একই সঙ্গে মন্দিরের চারদিকে নির্মাণ করেছিলেন উঁচু প্রাচীর—যার কিছু অংশ আছে আজও। এই প্রাচীরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বিশাল একটি কূপ আর তার উপরে চূড়াও (বুর্জ) নির্মাণ করেছিলেন তিনি। ওই কূপের জল দিয়ে চালানো হতো মন্দির প্রাঙ্গণের ফোয়ারাগুলি। ওই কূপ আর বুর্জটি আজও মথুরায় প্রসিদ্ধ।

বিখ্যাত ফরাসী পর্যটক টাভারনিয়েঁ (Tavernier) মথুরায় এসে এই মন্দিরটি দেখেছিলেন ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে। বর্নিয়ের এসেছিলেন ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। টাভারনিয়েঁ কৃষ্ণ জন্মভূমির উপর কেশবদেবের মন্দিরটি দেখে লিখেছেন, "পুরীতে জগন্নাথ এবং বেনারসের পরে মথুরায় এই মন্দিরটিই প্রসিদ্ধ। লাল রঙের পাথরে নির্মিত এটি ভারতীয় অত্যন্ত সুন্দর মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম একটি। মন্দিরের চারদিকের দেয়ালে সারি সারি পাথরের উপর সুন্দর নকসা আছে, যেগুলিতে সুন্দর পশুর আকৃতির রূপ দেয়া আছে। এক সারি চিত্র জমি থেকে দু'ফুট উঁচুতে এবং দ্বিতীয় সারির চিত্রগুলি মন্দিরের চূড়ার উপর থেকে দু-ফুট নীচে। মন্দির চত্বরের অর্ধেকটাই মন্দির আর অর্ধেক জগমোহন (নাট মন্দির) নির্মিত হয়েছে। মধ্যে রয়েছে একটি মণ্ডপ। অনেক জানলা আর গবাক্ষ বানানো আছে মন্দিরে। এই মন্দিরটি এত বিশাল যে ১৭/১৮ কি. মি. (5/6 Kosas—One Kosa equal to three Kilometres) দূর থেকে দেখা যায়।"

বিখ্যাত ইটালীয়ান পর্যটক মানুচ্চি (Manucci) লিখেছেন, "কেশবদেবের স্বর্ণ-মণ্ডিত মন্দিরে চূড়া এতই উঁচু যে, ৫৬ কি. মি. দূরে আগ্রা থেকেই দেখা যায়। যখন দীপাবলির রাতে আলোকিত করা হয় মন্দিরের চূড়া তখন আগ্রা থেকে বাদশাহ দেখতে পেতেন।"

শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমিতে কেশবদেবের প্রাচীন এই মন্দিরটি ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ধ্বংস করার

আদেশ দেন ঔরঙ্গজেব। সেই আদেশ কার্যকরী করেন তৎকালীন মথুরার শাসনকর্তা আবে-ইন-নবীর খাঁ। তারপর মন্দিরের একটি বড় অংশে মন্দিরেরই মালমসলা দিয়ে তিনি নির্মাণ করেছিলেন একটি বিশাল ইদগাহ মসজিদ—যেটি আজও রয়েছে কৃষ্ণের জন্মভূমি মন্দিরের গায়েই।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মথুরাপ্রদেশ আসে ইংরাজ অধিকারে। স্বর্গীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়া অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন এই বন্দনীয় জন্মস্থানের দুর্দশা দেখে। উন্নতির অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জীবিতকালে তাঁর ইচ্ছা অপূরিত থেকে যায়। মন্দির ধ্বংসের পরে বিখ্যাত গুজরাটি ব্যবসায়ী গোকুলদাস পারেখ মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করান। অসকুণ্ডা ঘাটের কাছে বাজারে স্থাপিত আজকের এই বিশাল দ্বারকাধীশ মন্দিরটি নির্মিত হতে সময় লেগেছে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তারপরও এই মন্দির সংস্কার হয়েছে। বেড়েছে আয়তনে। পরিবর্তন হয়েছে বাহ্যিক রূপ সৌন্দর্যের।

অতীতে যেখানে কংসের কারাগার ছিল এবং যেখানে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন—সেই স্থানটিই শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি (কাটরা কেশবদেব) নামে প্রসিদ্ধ। পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালাম মন্দিরে। মন্দিরের দেয়ালে আঁকা রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার ছবি। মূল মন্দিরের বেদিতে স্থাপিত মূর্তিটি দ্বারকানাথজীর। সোনার ইট দিয়ে নির্মিত হয়েছে বেদিটি। আকর্ষক চতুর্ভুজ শ্যাম মূর্তি। এই বিগ্রহের বাঁ-পাশে রয়েছে সাদা স্ফটিকের রুক্মিণী দেবীর বিগ্রহ। সারা মথুরা ও ব্রজমণ্ডলে এমন মূর্তির সংখ্যা খুব কমই আছে। একের পর এক তীর্থযাত্রী, দর্শনার্থীরা আসছেন—পুজো দিচ্ছেন—চলে যাচ্ছেন।

এখানেও জয়পুরের গোবিন্দজী এবং উদয়পুরের নাথদোয়ারায় শ্রীনাথজীর মন্দিরের মতো ঝাঁকি দর্শনের ব্যবস্থা। দ্বারকানাথজীর পোষাক পরিবর্তন করা হয় দিনে আটবার। গরমকালে সকাল ৬/৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৭টা এবং শীতকালে এই মন্দিরে দেবতার দর্শনের উদ্দেশ্যে খোলা থাকে সকাল ৬/৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬/৩০ মিঃ পর্যন্ত। বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের কাঁকরোলির পুষ্টিমার্গীয় গোঁসাইরা এই মন্দিরে নিয়মিত ভোগারতি নিবেদন করে থাকেন।

১৮০ ফুট লম্বা এবং ১২০ ফুট চওড়া কাঠামোর উপর নির্মিত হয়েছে মন্দিরটি। স্থাপত্যকলার দৃষ্টিতে এই মন্দিরের আকর্ষণ কিন্তু কম নয়। কারুকার্যখচিত সৌন্দর্যময় স্তম্ভগুলির সঙ্গে রয়েছে বিরাট মণ্ড—যেখানে কাচের কাজ দেখার মতো। বিশাল এই মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে শ্বেত পাথরের ছত্রী, অসংখ্য মনিহারী দ্রব্য এবং খাবারের দোকান। দ্বারকাধীশ মন্দির এবং মন্দির-প্রাঙ্গণ সব সময় গমগম করছে পর্যটক আর তীর্থযাত্রীদের ভীড়ে।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমির উপরে নির্মিত হয়েছে ভাগবত ভবন। ধীরে ধীরে এলাম ভাগবত ভবনে। বিশাল এই ভবনটির নির্মাণ ব্যয় পড়েছে প্রায় দু-কোটি টাকা।

এই মন্দিরে স্থাপিত বিগ্রহগুলির মধ্যে রয়েছে রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ এবং জগন্নাথ-দেবের বড় বড় মনোহর বিগ্রহ। এছাড়াও আছে একটি আকর্ষণীয় শিবলিঙ্গ এবং দেবী দুর্গা আর হনুমানজীর সুদর্শন বিগ্রহ। মহামতি মদনমোহন মালবীয়ারও আবক্ষ পাথরের মূর্তি আছে এই ভাগবত ভবনে।

জন্মাষ্টমী, ঝুলনযাত্রা, হোলী উৎসব, রাসপূর্ণিমা প্রভৃতি উৎসবে লক্ষ লক্ষ নর-নারীর সমাগম হয় এই মথুরায় দ্বারকাধীশ মন্দিরে। তখন এক অনির্বচনীয় নতুন সাজে সেজে ওঠে মথুরা নগরী—আনন্দে মেতে ওঠেন পর্যটক, তীর্থযাত্রী—যারা আসেন ওই উৎসবে। দ্বারকাধীশ মন্দিরকেও সাজানো হয় রঙ-বেরঙের আলোক মালায়।

দ্বারকাধীশ মন্দির ছেড়ে এলাম মন্দিরেরই পিছনের একটি গলিতে। এখানে রয়েছে দশভুজা গণেশের মন্দির। বিশাল এবং সৌন্দর্যময় এই গণেশের বিগ্রহটি দেখার মতো।

গণেশ মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে বসলাম টাঙ্গায়। এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিল। উঠে বসতেই শুরু হলো চলা।

একটি প্রসিদ্ধ নগর রূপে মথুরা পরিচিত হয়ে আসছে প্রাচীনকাল থেকে। দীর্ঘ-কাল ব্যাপী প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সভ্যতার কেন্দ্র ছিল মথুরা। ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, কলা, সাহিত্য সৃষ্টি ও বিকাশে মথুরার অবদান ছিল সব সময়েই। সেইজন্যেই তো প্রেমিক কবি সুরদাস, সঙ্গীতাচার্য স্বামী হরিদাস, স্বামী দয়ানন্দের গুরু বিরজানন্দ, কবি রসখান প্রমুখ মহাত্মাদের সঙ্গে মথুরার নাম জুড়ে আছে আজও।

টাঙ্গা এসে দাঁড়ালো মথুরার পুরাতত্ত্ব সংগ্রহালয়ের (রাজকীয় সংগ্রহালয়) কাছে। টিকিট কেটে ঢুকে পড়লাম ভিতরে। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম অতীতের মথুরা থেকে পাওয়া অসংখ্য পুরাতত্ত্বের নিদর্শন। প্রতিটি জিনিষই সযত্নে রক্ষিত আছে এখানে। সংগৃহীত জিনিষগুলির মধ্যে রয়েছে কুষাণ, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবের সময়কার অনেক মূর্তি। এগুলির অধিকাংশই চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী সময়-কালের মধ্যের সংগ্রহ। এছাড়াও রয়েছে প্রাচীন পোড়ামাটির বিভিন্ন জিনিষপত্র, শিলালিপি, পাথর ও ধাতুর মূর্তি। কিছু প্রাচীন তামা আর রূপার মুদ্রা আছে যেগুলি গ্রীক কুষাণ এবং শক আমলের। কয়েকটি সোনার মুদ্রা—যেগুলি গুপ্ত এবং কুষাণ রাজাদের সময়কার। এগুলি সবই পাওয়া গেছে মথুরার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। এখানে দেখতে বেশী সময় লাগলো না।

মথুরার সুন্দর এই সংগ্রহশালা থেকে বেরিয়ে এসে বসলাম টাঙ্গায়। টাঙ্গা চললো গোবর্ধন রোড ধরে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে গেলাম ভূতেশ্বর মহাদেব মন্দিরের প্রবেশদ্বারের কাছে। শহর মথুরার পশ্চিমেই অবস্থিত মন্দিরটি।

মন্দির-প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম, প্রাঙ্গণের পাশ দিয়েই নেমে গেছে সিঁড়ি।

অল্প কিছু সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেলাম নীচে গর্ভমন্দিরে। প্রদীপ জ্বলছে। মন্দিরে স্থাপিত রয়েছে অষ্টভুজা পাথরের বিগ্রহ। নাম পাতালদেবী। সুপ্রাচীন এই দেবী বিগ্রহটি আছে দাঁড়ানো অবস্থায়।

ভূতেশ্বর মহাদেব মন্দিরের আশপাশে রয়েছে আরও কয়েকটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। মহাদেবের মূলমন্দিরটি প্রাচীন। আধুনিক স্থাপত্যের কোন ছোঁয়া নেই মন্দিরের গায়ে। মন্দিরের গঠন একেবারেই সাদামাটা—মাঝখানটা বিস্তৃত। এরই মাঝে রয়েছে একটি বাঁধানো কুণ্ড। এই কুণ্ডের মধ্যে স্থাপিত আছে প্রায় হাত দুয়েক উঁচু গোলাকৃতির একটি পাথরের শিবলিঙ্গ। এই শিবলিঙ্গই ভূতেশ্বর মহাদেব নামে প্রসিদ্ধ। এর গায়ে খোদাই করা রয়েছে চোখ মুখ গোঁফ প্রভৃতি।

প্রবাদ আছে, অনিরুদ্ধের পুত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র ব্রজনাভ এই শিবলিঙ্গকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আবার অনেকের মত, কুণ্ডের মধ্যে আরও একটি ছোট যে শিবলিঙ্গটি আছে—সেটিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহারাজ ব্রজনাভ। ওই শিবলিঙ্গের নাম ব্রজেশ্বর। কাশীর ক্ষেত্রপাল বা নগর-রক্ষক যেমন কালভৈরব, তেমনই মথুরা নগরের ক্ষেত্রপাল দেবতা ভূতেশ্বর মহাদেব। লোকবিশ্বাস, মথুরায় এসে এই মহাদেবের পূজা না দিলে তিনি তীর্থ-ফল দানে বিরত থাকেন।

ব্রজপরিক্রমা বা বনভ্রমণের সময় তীর্থযাত্রীরা বৃন্দাবনে গোপীশ্বর এবং মথুরায় ভূতেশ্বর মহাদেবকে দর্শন ও পূজাদি করে তবে এগিয়ে চলেন বনযাত্রায়। জনশ্রুতি আছে, বনযাত্রায় এই দুটি দেবস্থানে পূজা ও দর্শন না করলে পরিক্রমা পথে বিঘ্ন হয় পদে পদে। 'আদিবারাহে' গ্রন্থের ১৬৮ তম অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে—

> "মথুরায়াং চ দেব ত্বং ক্ষেত্রপালো ভবিষ্যসি।
> ত্বয়ি দৃষ্টে মহাদেব মম ক্ষেত্রফলং ভবেৎ॥
> দৃষ্টা ভূতপতিং দেবং বরদং পাপনাশনম্॥
> তেন দৃষ্টেন বসুধে মাথুরং ফলমাপ্নুয়াৎ॥"

অর্থাৎ, "হে মহাদেব! আপনি আমার এই মথুরাতে ক্ষেত্রপাল হবেন। আপনাকে দর্শন করলে লোক এই ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ ফল পাবে। হে বসুধে! পাপনাশকারী বরপ্রদ দেব ভূতনাথকে দর্শন করলে সেই দৃষ্ট-ফলে মানুষ মথুরা দর্শনের ফল প্রাপ্ত হবে।"

মথুরায় মুখ্য দর্শনীয় এই মন্দিরগুলি দেখে নিলাম টাঙ্গায় করে ঘুরে ঘুরে। তারপর আবার ফিরে গেলাম বৃন্দাবনে বাসন্তীবাঈ ধর্মশালায়।

যমুনাতীরে অসংখ্য ঘাট আর অজস্র মন্দিরে ছেয়ে আছে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোর লীলাক্ষেত্র মথুরা। সমস্ত মন্দিরগুলি দেখা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়, এমনকি মথুরাবাসীরাও দেখেছেন কিনা সন্দেহ! মন্দিরের স্থান এবং তালিকাটা দেখলেই বিষয়টা অবগত হওয়া যাবে সহজেই। যেমন,

ছত্তা বাজারে—অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির, বীরভদ্রেশ্বর মন্দির, গোবর্ধন নাথজীর

মন্দির, রামজী মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, কানাইয়ালাল মন্দির, বিজয়গোবিন্দ মন্দির, কংসনিকন্দন মন্দির, স্বামী বিরজানন্দ স্মারক মন্দির এবং এরই পাশে কিশোরীরমণ মন্দির।

বিশ্রাম ঘাটে—গতশ্রম নারায়ণ মন্দির, যম এবং যমুনা মন্দির, বিশ্রাম ঘাটের আগে রাজাধিরাজ বাজারে দ্বারকাধীশজী মন্দির এবং পাশে সতীবুর্জ। (রাজা বিহারী মলের রাণী সতী হয়েছিলেন।)

প্রয়াগ ঘাটে—বটুক ভৈরব এবং যোগমায়া মন্দির।

দাউজী ঘাটে—দাউজী মন্দির, মদনমোহনজীর মন্দির, গোকুলনাথজীর মন্দির।

স্বামী ঘাটে—মদনমোহন মন্দির, রাণীবালা মন্দির, বিহারীজীর মন্দির, গোবর্ধন-নাথজীর মন্দির এবং ধ্রুবতীর্থ কম্পুঘাটে স্বামী নারায়ণ মন্দির।

চুড়িয়ালী গলিতে—গোবিন্দদেবজীর মন্দির, সামনে ডোরি বাজারে মহালক্ষ্মী মন্দির এবং গোপীনাথজীর মন্দির।

অসকুণ্ডা ঘাটে—হনুমান মন্দির এবং সন্তঘাটে মহাকালেশ্বর মন্দির।

দশাবতার গলিতে—চুচিকা দেবীর মন্দির, গলির সামনে দাউজী মহারাজের মন্দির এবং গলির আগে মথুরানাথজীর মন্দির।

আগ্রা রোডে—তিলকদ্বারের বাইরে রঙ্গেশ্বর মহাদেব এবং ভিতরে দাউজী মহারাজ মন্দির।

গোলপাড়া গলিতে—বিঠ্ঠল মন্দির, সতীবুর্জের কিছু আগে পিপলেশ্বর মন্দির।

কংসকেল্লার উপরে—কংসেশ্বর মহাদেব, কালভৈরব মন্দির।

গড়ুহাই বাজারে—কিশোরীরমণ মন্দির, শ্রীনাথজী মন্দির।

চকবাজারে—দাউজী মহারাজ মন্দির, বৃন্দাবন রোডে পুলিশ চৌকির সামনে 'এক প্রাণ দুই দেহ মন্দির'।

চৌরাসীর উপর—জৈন মন্দির, মথুরা-বৃন্দাবন রোডে গীতা মন্দির।

বৃন্দাবন রোডে—আকাশবাণী ভবনের কাছে গোকর্ণ মহাদেব মন্দির, নীলকণ্ঠেশ্বর মন্দির, গায়ত্রী তপোভূমি। এরই সামনে পরিক্রমা পথের উপর চামুণ্ডাদেবীর মন্দির এবং রামলীলা ময়দানের পাশে মহাবিদ্যা মন্দির।

ভরতপুর গেটে—শ্রীজী রাজা মন্দির, চিত্রগুপ্ত মন্দির এবং পোৎরা কুণ্ডের কাছে দেবকী বসুদেব ও কেশবদেবজী মন্দির।

রামঘাটে—শ্রী দাউজী মন্দির, মদনমোহনজীর মন্দির, গোকুলনাথজীর মন্দির।

এমন আরও অসংখ্য মন্দির ছড়িয়ে আছে সারা মথুরা বৃন্দাবনে—যেমন রয়েছে কাশীতে, হরিদ্বারে—এদেশের প্রতিটি তীর্থক্ষেত্রে। থাকবেই তো—তপোভূমি ভারতবর্ষ, এ যে প্রাচীন ঋষিদের দেশ—দেবতাদের দেশ—দেবমন্দিরের দেশ।

প্রথম যে বার মথুরায় গেছিলাম সে বারের কথা। তখন বেলা আটটা হবে। যমুনা-দেবীর মন্দির থেকে বেরিয়ে সোজা এলাম বিশ্রাম ঘাটে। জমজমাট ঘাট। কেউ পুজো, কেউ তর্পণ, কেউ বা স্নান করছেন যমুনায়। আমার মতো এই সাত সকালে যারা স্নানে আগ্রহী নয়—তাদের অনেকেই দাঁড়িয়ে দেখছেন যমুনার সৌন্দর্য, লোকজন। আজ বিশ্রাম ঘাটে যেসব যাত্রীদের দেখছি, তাদের মধ্যে চেহারায় প্রায় সকলেই হিন্দী ভাষাভাষীর তীর্থযাত্রী, স্নানার্থী। এর বাইরে যে কেউ নেই—তা নয়, তবে আমার চোখে পড়লো না। কোলাহল আর কৃষ্ণনাম—এ-দুয়ে মিলে এক হয়ে বিশ্রাম ঘাটকে করে তুলেছে আনন্দমুখর। এখন এই ঘাটের পরিবেশ হয়ে রয়েছে অনেকটা কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের মতো।

মাথায় একটু যমুনার জল দেবো—এই ভাবনা রয়েছে মাথায়। একদিন আমার মা বলেছিলেন, যে কোন তীর্থে গিয়ে স্নান করতে না পারলে নদী বা কুণ্ডের জল স্পর্শ করে মাথায় দিলে তাতেই তীর্থস্নানের ফল হয়। সেইজন্যেই বিশ্রাম ঘাটের কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে নামতেই চোখ পড়লো—অতি বৃদ্ধ এক সাধুবাবা স্নান সেরে উঠে আসছেন উপরে। বয়েসের ভারে অনেকটা নুয়ে পড়েছেন। পরনের গামছাটা বেশ ছোট। হাঁটুর মালাইচাকির একটু উপরে উঠে আছে। দেহটা পরিপুষ্ট নয়। কালচে তামাটে গায়ের রঙ। মাথায় জটা নেই। কাঁধের একটু নীচে নেমে এসেছে ভিজে চুলগুলো। কারও দিকে তাঁর নজর নেই। এক ধাপ এক ধাপ করে সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসছেন উপরে। দেখামাত্রই আমার ভালো লাগলো। সাধুবাবার গতি খেয়াল রেখে একে ওকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত নেমে এলাম শেষ ধাপে। ঝট্‌পট্ একটু জল মাথায় ছিটিয়ে আবার আগের গতিতেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলাম একেবারে সাধুবাবার পিছনে—তখনও তাঁর উপরের সিঁড়ি শেষ হতে খান কয়েক বাকি। ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন শেষ ধাপে। দেখলাম, ময়লা একটা সাদা কাপড়, একটা ঝুলি আর খয়েরী রঙের একটা কম্বল রয়েছে এক জায়গায় জড়ো করা অবস্থায়। কাপড়টা পরে নিলেন গামছার উপর বেড় দিয়ে। তারপর ছাড়লেন গামছাটা। ঝুলির থেকে বের করলেন ফতুয়ার মতো একটা। গায়ে দিলেন। কাঁধে ঝুলিটা নিয়ে তার উপর ভাঁজ করা কম্বলটা রাখতেই আমি সামনে এসে দাঁড়ালাম। দু-পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললাম,

—বাবা, চলুন, একটু চা জলখাবার খাই।

একটু অবাক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালেন সাধুবাবা। তারপর হিন্দিতে বললেন,

—বেটা, তীর্থে এসেছি। তীর্থদেবতাকে দর্শন না করে কোন কিছু গ্রহণ করলে ইষ্ট অভুক্ত থাকেন। আর যে খাদ্যই গ্রহণ করি না কেন, তা বিষ্ঠারই সমান হয়। তাই একটু দাঁড়া, আগে যমুনা মাঈকে একটু দর্শন করে আসি।
কথা কটা বলে সাধুবাবা চলতে শুরু করলেন—সঙ্গে আমিও। যমুনাদেবীকে দর্শন এবং প্রণাম করলেন সাধুবাবা। তারপর মন্দির থেকে বেরিয়ে সোজা এলাম একটা কচুরী আর মিষ্টির দোকানে। দুজনে প্রায় ভরপেট খেয়ে নিলাম। তারপর সাধুবাবাকে বললাম,
—বাবা, চলুন একটু ফাঁকায় গিয়ে বসি।
সাধুবাবা মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালেন। বিশ্রাম ঘাট ছেড়ে আরও কিছুটা এগিয়ে আমরা দুজনে বসলাম যমুনার তীরে একটু উঁচু একটা বাঁধানো জায়গায়। লোক চলাচল আছে তবে বিশ্রাম ঘাটের তুলনায় কিছুটা কম। আমি বসেছি সাধুবাবার মুখোমুখি হয়ে—কথার সুবিধের জন্যে। এবার সাধুবাবার মুখের দিকে তাকাতেই জিজ্ঞাসা করলেন,
—কি জন্যে আমাকে নিয়ে এলি এখানে—তুই কি কিছু বলবি ?
কথাটা বলে কাঁধ থেকে প্রথমে কম্বল পরে ঝুলিটা পাশে নামিয়ে রাখলেন। আমি ভাবলাম, দুম করে কিছু জানতে চাইলে সাধুবাবা উত্তর না-ও দিতে পারেন। ধীরে ধীরে ঢুকতে হবে ভিতরে। তাই প্রথমেই কথা শুরু করলাম এইভাবে,
—বাবা, আমি প্রায় সব সাধুসন্ন্যাসীদের—যাঁদের সঙ্গে ভাগ্যক্রমে আমার পরিচয় হয়েছে, তাঁদের দেখেছি, প্রত্যেকেই খুব ভোরে উঠে স্নান করেন। আপনাকে দেখলাম, অনেক বেলায় স্নান করলেন। স্নানের কি বাঁধাধরা কোন নিয়ম আছে—নাকি সারাদিনে যখন খুশী স্নান করলেই হলো ?
কথাটা শুনে সাধুবাবা হেসে ফেললেন। তারপর বললেন,
—খুব ভোরে উঠে স্নান করাটাই শাস্ত্রীয় নিয়ম। আমি নিজেও শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—সব ঋতুতেই স্নান করি খুব ভোরে—আবছা অন্ধকার থাকতে। আজই আমি এখানে এলাম। বিশ্রাম ঘাটেই স্নান করবো—এই উদ্দেশ্য ছিল। আসতে দেরী হয়ে গেল তাই আর ভোরে স্নান করা হলো না।
সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, আপনি বললেন শাস্ত্রে নিয়ম আছে, নিয়ম যখন আছে—তখন তার ফলও তো কিছু আছে। দয়া করে বলবেন—কি ফল হয় ?
প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই সাধুবাবা একটু ভাবলেন, তারপর একটা হিন্দিতে শ্লোক বলে তার মানে করে বললেন,
—বেটা, কোন নারী বা পুরুষ প্রতিদিন খুব ভোরে উঠে যদি স্নান করে, তাহলে শাস্ত্রে বলেছে সে দশটা গুণের অধিকারী হবে। প্রথমেই আসবে তার দেহের

পবিত্রতা। তারপর আসে দেহের কোমলতা, লাবণ্য। প্রতিদিন স্নানে দেহে বল বাড়ে। রূপ খোলে। কণ্ঠস্বর সুন্দর হয়। দেহের সৌরভ বাড়ে, কথার উচ্চারণ সুন্দর এবং নির্দোষ হয়। নিরোগ হয় দেহ। মানসিক প্রফুল্লতা বাড়ে। যার জন্যেই তো সাধুসন্ন্যাসীদের রোগ ভোগটা খুব কমই হয়।

সংসার জীবনে নিজের কাজ হাসিল করার জন্য অনেক শয়তান মার্কা লোকগুলো যেমন অকারণ বিনয় প্রকাশ করে, কথায় কথায় 'কিছু মনে করবেন না—একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি'—এমন ধরনের কথা বলে নিজেকে শ্রোতার কাছে কৃত্রিম বিনয়ীভাবের প্রকাশ করে—এখন সেই সব শয়তানদের ভাবটা মনে পড়ে গেল এই সাধুবাবার কাছে বসে। আমিও বলে ফেললাম,

—কিছু যদি মনে না করেন, তাহলে বাবা একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ?

সাধুবাবা অভয় দিয়ে বললেন,

—বল না, কি জানতে চাস্ ?

প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবার বয়েস কত হলো এখন ?

সাধুবাবার মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন হলো না। সাধারণভাবেই উত্তর দিলেন,

—বেটা, বয়েস দিয়ে কি হবে ? এখন আমার বয়েস ধর্ আশি থেকে পঁচাশীর মধ্যে হবে। তার কম হবে না।

এবার সরাসরি আমার মনের কথাটা বললাম,

—বাবা, আপনাকে এখানে এনেছি আপনার সাধুজীবনের কিছু কথা জানার জন্যে। আপনি যদি দয়া করে বলেন তো জিজ্ঞাসা করি।

কথাটা শুনে একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠলো সাধুবাবার চোখেমুখে। কয়েক মুহূর্ত ভেবেই বললেন,

—কি জিজ্ঞাসা আছে তোর ?

আমরা যেখানে বসেছি সেখানে কেউ আসছে না। সামান্য দূরে থেকেই চলছে মানুষের যাতায়াত। তবে অনেকেই আমাদের দেখতে দেখতে যাচ্ছেন—এটা লক্ষ্য করলাম। এবার জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, সংসারের ভোগবাসনা ফেলে দিয়ে কেন এলেন এমন এক কণ্টকর অনিশ্চিত জীবনে ?

প্রশ্নটা শোনামাত্রই উত্তর দিলেন না। মিনিট খানেক চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন,

—বেটা, সংসারে কিছু ভোগ-সুখ আছে ঠিকই—তবে সংসারীদের জীবনটা কি সত্যিই নিশ্চিত ? যেমন ধর্ তুই এসেছিস্ বৃন্দাবন মথুরায় বেড়াতে। এখান থেকে তুই সত্যিই ঘরে ফিরে যেতে পারবি—এমন নিশ্চয়তা কি আছে—এমন

নিশ্চয় করে কি তুই বলতে পারবি, তোর প্রাণপ্রিয় বড় আপনজন মা তোর বেঁচে আছে ? একটা কথাও তুই নিশ্চয় করে বলতে পারবি না। পৃথিবীর কোন মানুষই বলতে পারবে না একঘণ্টা পরে কি হবে। আসলে কি জানিস্, মানুষের মনটা ভগবান এমন করে তৈরী করে দিয়েছেন—মনের ধর্ম অনুসারে মানুষ সবকিছু ভেবে নিচ্ছে নিশ্চিত বলে। যেমন তুই নিশ্চিত ভেবে নিয়েছিস্, এখান থেকে বাড়ী যাবি। মাকে দেখবি। এখানে যা যা দেখেছিস, সে সব কথা গিয়ে বেশ গল্প করে সবাইকে বলবি। এমন তরো অনেক কথা। কিন্তু একটু ভেবে বলতো—কোনটাই কি নিশ্চিত ? তা নয়। সুতরাং মানুষের জীবনটাই যখন অনিশ্চিত তখন সংসারে থাকা না থাকা দুটোই সমান।

সঙ্গে সঙ্গেই বললাম,

—তাহলে তো বাবা আপনি যে এপথে আছেন ভগবানকে লাভ করার উদ্দেশ্যে—তাঁকে যে লাভ করবেন—এমন নিশ্চয়তা কোথায় ?

মুহূর্ত দেরী না করেই সাধুবাবা বললেন,

—হাঁ বেটা, তোর কথাটা আপাত সঠিক। এই জীবনে তাঁকে লাভ করবো—এমন কোন নিশ্চয়তা এতটুকুও নেই। তবে এপথে 'নিশ্চয়তা'র কোন ভূমিকা নেই। তাঁকে লাভ করার ব্যাপারটা মানুষের নিশ্চয়তার উপর নির্ভর করছে না—সেটা দাঁড়িয়ে আছে মানুষের একান্ত এবং গভীর বিশ্বাসের উপর। নিশ্চিত শুধু এটুকুই—'তিনি আছেন'। তাঁকে পাওয়ার ব্যাপারে কাজ করবে একমাত্র বিশ্বাস।

কথাটুকু বলে থামলেন। মনে হলো, এই সাধুবাবার সঙ্গে কথা বলে মনের মজা হবে। জানা যাবে অনেক কথা। আমার মূল প্রশ্ন থেকে সরে গেছেন সাধুবাবা। তাই সরাসরি জানতে চাইলাম,

—বাবা, ঘর ছাড়লেন কেন ?

এপ্রশ্নে সাধুবাবা মিনিট খানেক চুপ করে রইলেন। ফিরে গেলেন একেবারে সুদূর অতীতে—একসময় যেখানে তিনি ছিলেন। শান্ত কণ্ঠে বললেন নির্বিকার চিত্তে,

—বেটা, যখন আমার বিয়ে হয় তখন বয়েস হবে বছর আঠারো কুড়ি। বিয়ের পর দুটো বাচ্চা হয়। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে আমি। বাড়ী ছিল আমার নাসিকে। ছেলের বয়েস যখন নয়, তখন মেয়ের বয়েস সাত।

এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন,

—বেটা, দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে! ওই বয়েসে একই সময়ে আমার ছেলে মেয়ে—দুজনেরই হলো বসন্ত। তখনকার দিনে এখনকার মতো অত ওষুধপত্র ছিলনা। গাঁয়ের ওঝা বদ্যি করলাম। কিছুই হলো না। দিন পাঁচেকের মাথায় একই দিনে মাত্র কয়েক ঘণ্টার তফাতে ছেলে মেয়ে আমার দুজনেই চলে গেল তোর কথায় 'ভোগ সুখের' পৃথিবী ছেড়ে। শোক সম্বরণ করতে পারলাম না। ওরা চলে যাওয়ার কয়েকদিন পর একদিন আমিও ছাড়লাম সংসার। গড়ে ধর্ সংসার করেছি

এঁদের মতো হবি। কোন কারণেই রেগে উঠবি না। সব সময়েই মানুষের সঙ্গে হেসে কথা বলবি। তাতে ইষ্ট প্রসন্ন হন। খাওয়া দাওয়া যা মন চায় করবি। যদি কখনও কোন কারণে আহার না জোটে—খাবি না। তবে যত সুখাদ্যই হোক না কেন—অন্যের উচ্ছিষ্ট খাবি না। এতে শরীর ও মনের যা কিছু বিরুদ্ধভাব, বিরুদ্ধ গ্রহের দোষ—তা ভোজন করা মাত্রই অতি দ্রুত ও অতি সূক্ষ্মভাবে সংক্রামিত হয়—যিনি উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন। একটু লক্ষ্য করলেই তুই দেখতে পাবি, উচ্ছিষ্ট ভোজনকারীদের মানসিক দৃঢ়তা নেই—চরিত্রও কখনও দৃঢ় হয় না।

একটু থেমে একবার এদিক ওদিক দেখে নিলেন ঘাড় ঘুরিয়ে, তারপর বললেন,

—বেটা, সংসারে তারাই হতভাগ্য—সবকিছু পেলেও দরিদ্র—যারা অল্পে সন্তুষ্ট নয়, আবার বেশীতেও নয়। 'আরও একটু হলে ভালো হতো'—এমনভাব যার একটুও আছে। সংসারে সব সময়েই যা পাবি—তাতেই সন্তুষ্ট থাকবি—শান্তি থাকবে। ততখানিই শান্তি নষ্ট হবে—পাওয়ার পর আর যতখানি তুই চাইবি। বেটা, পাপ কাজ করলে মানুষের বুদ্ধি নষ্ট হয়। পুণ্য কাজে বুদ্ধি পায় বুদ্ধি। সিদ্ধান্ত নেয়াই হলো বুদ্ধির কাজ। মানুষের প্রতিকূল চিন্তাস্রোতকে দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করে বুদ্ধি। ফলে ধীর স্থির ও শান্ত হয় মন। সুতরাং পুণ্য কাজে মন শান্ত হয়—প্রশান্তি আসে। সাধনভজনে উন্নতি হয়।

কোন কথা না বলে শুধু চুপচাপ বসে রইলাম। সাধুবাবা যতক্ষণ নিজের থেকে বলেন—ততটাই লাভ। তারপরে প্রশ্ন তো আমার আছেই। এবার একটু চোখ দুটো বুজে বললেন,

—বেটা, সুন্দর ফুল ছেড়ে, সুন্দর দেহ ছেড়ে মাছিরা যেমন বিষ্ঠা, ক্ষতের খোঁজ করে তেমনই সংসারীদের অধিকাংশই ভগবানের চিন্তা ছেড়ে অন্যের দোষ খুঁজতেই ব্যস্ত থাকে। যার মুখে অন্যের দোষত্রুটির কথা শুনবি—তাকে সব সময়েই পরিত্যাগ করবি। নইলে তুইও দোষযুক্ত হবি। বাহ্যত এদের পোশাক আশাকে ভালো বলে মনে হলেও এরা নোংরা এবং নীচমনা হয়। যে মন ভগবানের চরণে নিবেদিত হবে—সেই মনকে নীচ করবি না কখনও। বেটা, প্রস্ফুটিত পদ্ম যেমন জলাশয়ের শোভা বাড়ায়, তেমনই মন-মন্দিরের শোভা বাড়ায় ইষ্টনাম, গুরুনাম। ভগবানের নাম ছাড়বি না কখনও। যারা সামান্য কারণেই রেগে ওঠে আবার কোন কারণ নেই অথচ কারও উপর প্রসন্ন হয়—এদের সঙ্গ করবি না কখনও। এই ধরনের মানুষেরা কখনও ভালো মানুষ হয় না। বেটা, আখ আর সাধুতে কোন তফাৎ নেই। বাইরে থেকে দেখলে এদের ভিতরটা বোঝা যায় না। আখ পেষাই করলে যেমন মিষ্টি রস বেরোয়—তেমন সাধুসঙ্গ করলে, সাধুদের আঘাত করলেও ভগবদ্‌বাক্য বেরোয়। বেটা, সাধুরাও মানুষ, সংসারীরাও মানুষ। তবে মানুষ হয়েও এদের মধ্যে তফাৎ আছে অনেক।

সাধুরা মানুষের দোষ দেখে না। সংসারীরা মানুষের গুণগুলি পরিণত করে তিল থেকে তাল পরিমাণ দোষে। তাই সাধুসঙ্গ করবি। তাতে সংসারী মনোভাব কেটে সাধুর ভাব সংক্রামিত হবে মনে। আনন্দে থাকতে পারবি।
একটানা এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা একটু থামলেন। বিরক্তির লেশমাত্র নেই সাধুবাবার চোখেমুখে। এবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, সাধুসঙ্গ বা সৎসঙ্গের কথা তো আপনার মতো সকলেই বলেন। এখন কথা হলো, কে সাধু আর কে সৎ—তা তো বাইরের থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই। এই যেমন ধরুন আমার কথা। বাহ্যত আমি খারাপ নই। কিন্তু আমি কতটা সৎ বা অসৎ—আমার চেয়ে সেটা কি আর কেউ ভালো জানে? জানে না। বাইরে সাধুর ভেক দেখে তো অনেককেই সাধু বলে মনে হয়—কিন্তু কি করে বুঝবো যে সে সাধু এবং তার সঙ্গ করলে সত্যিই কল্যাণ হবে মনের—অধ্যাত্ম-পথের?
কথাটা শোনামাত্রই সাধুবাবা বললেন,
—হাঁ হাঁ বেটা, তুই ঠিকই বলেছিস্। বাইরেটা দেখে চট্ করে বোঝা যাবে না কে সাধু বা সৎ। এমন অসংখ্য বদমাস হারামজাদা বিশ্বাসঘাতক নারীপুরুষ সংসারে আছে—যাদের কথাবার্তা অত্যন্ত মিষ্ট। তবে বেটা, ভগবানের এমনই খেলা—নিজে সৎ থাকলে, সৎসঙ্গ লাভের ইচ্ছা থাকলে—তিনিই সেরূপ সঙ্গ জুটিয়ে দেন এবং কোনক্রমে অসৎ কারও সঙ্গ জুটে গেলে তার প্রকৃত রূপটা সৎসঙ্গকারীর সামনে প্রকটিত করে দেন। তবে বেটা, নীতিশাস্ত্রে একটা কথা আছে, রোগ-কষ্টে বন্ধু চেনা যায়। মানুষ কে কতটা ধীর—তা বুঝতে পারবে অর্থকষ্টে পড়লে। বিপদে পড়লে প্রকৃত শত্রু প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কে কতটা ভদ্র, সজ্জন—তা ধরা পড়ে চরিত্রে। সুন্দর কোমল নির্লোভ নির্বিকার মধুর এবং কপট বাক্যহীন ব্যবহারের দ্বারা চেনা যায় সাধু।
এবার সাধুবাবাকে বললাম,
—বাবা, শোকের আঘাতে আহত হয়ে আপনি এসেছেন সাধু-জীবনে—ঈশ্বরলাভ বা ওই ধরনের কোন বাসনা ছিল না যখন বেরিয়েছিলেন সংসার ছেড়ে। এটা তো ঠিক কথা—আপনি কি বলেন?
মাথাটা নেড়ে সাধুবাবা সম্মতি জানালেন। সঙ্গে সঙ্গেই জানতে চাইলাম,
—এটাই যখন সত্য, তখন এই জীবনে আসার পর ঈশ্বরে বিশ্বাস ভক্তি ভালোবাসা, আপনি যাই বলুন না কেন, তা আপনার ভিতরে এলো কেমন করে? একান্তভাবে ওগুলো যে কারও ভিতরে চট্ করে আসার নয়—তা আপনি নিজেও জানেন ভালো করে। তবুও এসেছে—এলো কেমন করে দয়া করে বললেন?
এমন প্রশ্নে সাধুবাবার মুখখানায় একটা অবাক হওয়ার ভাব ফুটে উঠলো—মুহূর্তমাত্র। পর মুহূর্তে সে ভাবটা কেটে গিয়ে একটা আনন্দময়ভাব ছড়িয়ে পড়লো মুখখানায়। কপালে দু-হাত জোড় করে নমস্কার জানালেন ভগবানের

উদ্দেশ্যে। তারপর বয়ে যাওয়া যমুনার দিকে একবার তাকালেন উদাস দৃষ্টিতে। এবার মুখের ভাবটা দেখে মনে হলো, নিস্তরঙ্গ যমুনাকে ধরে সাধুবাবা চলে গেলেন একেবারে অতীত অতীত—সুদূর অতীতে। তারপর শান্ত মধুর কণ্ঠে একটু ভাবতন্ময় অবস্থায় মাথাটা নীচু করে বলতে শুরু করলেন,

—হাঁ বেটা, সাধারণ গৃহীদের যেটুকু বিশ্বাস থাকে ঈশ্বরে—সেটুকুই পুঁজি ছিল আমার গৃহত্যাগের সময়, তার চাইতে এতটুকুও বেশী ছিলনা। ওইটুকু নিয়ে বা একেবারে না নিয়েও সংসারে চলা যায়, তবে এই সাধুজীবনে এক 'কদম'ও চলা যায় না। ওই সম্বলটুকু নিয়েই গৃহত্যাগের পর সাধু নই—একেবারে ভিখারীর মতোই জীবন যাপন করছি—চলছি এক তীর্থ থেকে আর এক তীর্থে। তখন আমার দীক্ষাও হয়নি—সাধুও হইনি। কিন্তু বেটা, ছেঁড়া এক টুকরো কাপড় পরে সাধুর বেশেই ঘুরছি। সন্তান বিয়োগ চিন্তা আর অশান্ত চিত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছি এখানে সেখানে। এতটুকুও শান্তি নেই মনে। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন আমার গুরু মিলে গেল—যে কথা, যাঁর কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। দীক্ষা হলো নাথ সম্প্রদায়ের এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে—জ্বালামুখীতে।

এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা একটু থেমে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন। আমি চেয়ে রইলাম মুখের দিকে। এবার একপলক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মাথাটা আগের মতোই নীচু করে বললেন,

—বেটা, দীক্ষা হলো ঠিকই তবে এ-পথের মানুষ তো আমি নই, তাই জপতপ সাধন-ভজনে কিছুতেই মন বসে না। গুরুতেও বিশ্বাস ভক্তি শ্রদ্ধা ভালোবাসা—কিছুই নেই। কারণ অনেক সংসারে এখনও গুরু দীক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো নিয়ে যেমন কারও মাথাব্যথা, এমনকি সামান্য কৌতূহলটুকুও নেই—স্বামী-স্ত্রী সন্তান আর অর্থচিন্তার মধ্যেই চোখ বুজে চলা দলের ভেড়ার মতো মাথা গুঁজেই চলছে—ঠিক তেমনই ছিলাম আমি—ছিল আমার সংসার। তাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেও আসল কাজটা বেটা কিছুতেই হচ্ছিল না। এইভাবে চলতে চলতে গুরুকৃপায় একটা ঘটনায় আমার চোখ খুলে গেল—পূর্ণ বিশ্বাস ভক্তি শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা এলো আমার গুরু-ইষ্টে—যা আজও আছে অটুট হয়ে।

এই পর্যন্ত বলে থামলেন। একটা 'ঘটনা' কথাটা শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম সাধুবাবার মুখের দিকে। কোন কথা বললাম না। এতক্ষণ মাথা নীচু করে কথা বলছিলেন সাধুবাবা। এবার আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন,

—বেটা, দীক্ষার পর আমি সে-বার প্রথম গেছিলাম যমুনোত্রীতে। এখনকার মতো তখন তো আর বাস-টাস চলতো না—যাওয়া আসা সব পায়ে হেঁটেই করতে হতো। যাইহোক, যমুনোত্রীতে যমুনা মাঈ-এর দর্শন করে ফিরছি। যেটুকু খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে গেছিলাম—তা ওখানে গিয়েই সব শেষ হয়ে গেছে। তাই আর কি

করবো ? যমুনা মাঈকে সঙ্গে নিয়েই পাহাড়ী পথ ধরে চলতে লাগলাম—যাবো গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ হয়ে বদরীনারায়ণ। পথ চলছি অভুক্ত অবস্থায়। তখন যাত্রী সংখ্যাও কম আর লোকালয়ও বেশী ছিল না। তাই আহারের চেষ্টা করাটা বৃথা ভেবেই পথ চলতে লাগলাম। একসময় পাহাড়ী পথে দেহটা একেবারে ক্লান্ত—অবসন্ন হয়ে পড়লো। পেটে একটা দানাপানিও নেই। কিছুটা পথ চলছি, বিশ্রাম নিচ্ছি, আবার চলছি। এইভাবে চলতে চলতে গলা বুক শুকিয়ে এলো। একসময় ক্লান্ত দেহটা টেনে নিয়ে গিয়ে বসলাম যমুনা মাঈ-এর তীরে। তখন জলপান না করে মনে মনে ভাবছি, 'হে যমুনা মাঈ, হে গুরুজী, কাল রাত থেকে আজ পর্যন্ত এখনও দুটো আহার জোটেনি। আমি যে আর পথ চলতে পারছি না। দয়া করে কিছু আহার জুটিয়ে দাও, নইলে যে পথ চলতে পারছি না। যদি আহার না দাও তো অন্তত চলার শক্তিটুকু দাও।' এই কথা মনে মনে বলছি আর কাঁদছি। কাঁদতে কাঁদতে বেটা কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি—কোন খেয়ালই নেই। হঠাৎ একটা হাতের স্পর্শে ঘুমটা আমার ভেঙে গেল। ক্লান্ত-দৃষ্টিতে তাকাতেই দেখলাম মাথার কাছে বসে আছেন আমার প্রাণের ধন গুরুজী। তাঁরই পাশে দেখি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা অপরূপ সুন্দরী দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্না রক্তমাংসের দেহে যমুনা মাঈ। দেখামাত্রই উঠে বসতে যেটুকু সময়—পলকে মিলিয়ে গেলেন তাঁরা। আমার এ-সব কথা তোর বিশ্বাস হবে না—কেউ বিশ্বাসও করবে না। এবার দেখলাম, একটা বড় পাহাড়ী গাছের পাতায় কিছু মিষ্টি, ফল আর গরম গরম রুটি সবজী। বেটা, তখন আমি খাবো কিরে—চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ফেললাম আমার গুরুজী—আমার যমুনা মাঈ-এর দয়ার কথা, করুণার কথা ভেবে। তারপর আনন্দ সম্বরণ করে গুরুজীর প্রসাদ গ্রহণ করলাম পরমানন্দে।

এবার সাধুবাবা জলভরা চোখে বললেন,

—বেটা, দয়াময় এই ঘটনা ঘটানোর পর থেকে আমার গুরুতে বিশ্বাস ভক্তি ভালোবাসা এসেছে—যা অটুট রয়েছে আজও। মৃত্যুর পর এই সংস্কার নিয়েই আমার আত্মা চলে যাবে পরলোকে। যদি আবার জন্ম হয়—তাহলে এই বিশ্বাসের সংস্কার নিয়েই জন্মাবো—এ-বিশ্বাস আমার দৃঢ় হয়েছে।

সাধুবাবার জীবনে তাঁর গুরু-কৃপার কাহিনী শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দু-চোখ বেয়ে নেমে এসেছে জলের ধারা। এ-ধারায় তাঁদেরই বুক ভেসে যায়—যাঁদের জীবনে তাঁর কৃপালাভ হয়েছে। দেখলাম, এই মুহূর্তে সাধুবাবার মুখখানা আরও উজ্জ্বল—আরও, আরও আনন্দময় হয়ে উঠেছে। ভাব নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে এখনই কোন প্রশ্ন করলাম না। তিনিও চুপ করে রইলেন। মিনিট পাঁচেক কাটার পর বললাম,

—বাবা, আপনি তো ভক্ত মানুষ। ভক্তিলাভ হয়েছে আপনার। ভক্তিলাভের উপায়টা দয়া করে বলবেন ?

প্রশান্ত চিত্তে হাসিভরা মুখে বিনয়ী হয়ে সাধুবাবা বললেন,
—বেটা, আমার আর ভক্তিলাভ হলো কোথায়! যদি সত্যিই কিছু হয়ে থাকে—তাহলে তা গুরুজীই করে দিয়েছেন দয়া করে। আসলে কি জানিস্ বেটা, আমরা যে চাই না—তাই তো আমাদের হয় না। কারণ, ভক্তি মুখাপেক্ষী হয়ে আছে ভক্তের—কিন্তু ভক্তের এমনই কপাল, সে ভক্তির মুখাপেক্ষী নয়। তাই তো ভক্তের ভক্তিলাভ হয় না।
একটু থেমে আবার বললেন,
—বেটা, স্বামী ছাড়া রমণীরা সুন্দরী হলেও যেমন সকলের মাঝে শোভা পায় না, তেমনই ভক্তি ছাড়া নারীপুরুষ সাধনভজন করলেও ধর্মজগতে শোভা পায় না—পায় না প্রকৃত পথের সন্ধান। বেটা, পৃথিবীর কোন স্বামীই তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে পারে না—সব দিয়েও, অথচ দেখ, ভগবান কত করুণাময়—সামান্য একটু ভক্তিতেই তিনি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ভক্তকে দু-হাতে ঢেলে দেন তাঁর করুণাবারি—যা নিয়ে ভক্ত রাখার জায়গা পায় না।
নাথ সম্প্রদায়ের এই বৃদ্ধ সাধুবাবা কথাগুলো বলে আমার মুখের দিকে তাকালেন স্নেহের দৃষ্টিতে। সাধুবাবার চোখে চোখ রাখতেই আনন্দের একটা শিহরণ খেলে গেল আমার সারাটা দেহমনে। মুখ থেকে কোন কথা সরলো না। সাধুবাবাই বললেন,
—বেটা, লজ্জা যেমন নারীর ভূষণ, ক্ষমা যেমন পুরুষের অলংকার, তেমনই ভক্তের অন্তরে ভগবানের নামগানই ভগবানের অলংকার। বেটা, যখন যেখানে যে অবস্থায়ই থাকিস্ না কেন—তাঁর নাম ছাড়বি না। সংসারীরা বাধা ছাড়া যেমন বিষয়ে সুখ উপভোগ সুখে করতে পারে না, তেমনই তিনি নাম ছাড়া অন্য কোন কিছুতেই আনন্দ পান না, ফলে নাম-সাধনহীন মানুষের উপর তাঁর করুণাধারা, কৃপা-ধারাও বর্ষিত হতে পারে না।
হঠাৎ কানে এলো খোল করতালের আওয়াজ। দু-জনেই তাকালাম পথের দিকে। দেখলাম, একদল কীর্তনকারী নারীপুরুষ চলেছেন মন্দিরের দিকে। মনে হলো, এঁরা সকলেই বোধ হয় ব্রজপরিক্রমাকারী। আবার তা না-ও হতে পারে। একনজর দেখে আমরা আবার ফিরে এলাম আমাদের কথায়। সাধুবাবা বললেন,
—বেটা, কোন ব্যাপারে কখনই অসহিষ্ণু হবি না। মানুষের কার্যসিদ্ধি, এমনকি ভগবানকে লাভ করার ক্ষেত্রেও সবচেয়ে বড় বাধা হলো অসহিষ্ণুতা। সহিষ্ণু ব্যক্তির মনের বেগ তীব্র গতিসম্পন্ন পাহাড়ী স্রোতস্বিনীর মতো। পাহাড়ী নদীবেগ যেমন বড় বড় পাথর-বৃক্ষকে ভেঙেচুরে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়, তেমনই সহিষ্ণু-মনের তীব্র শক্তি সমস্ত কার্যসিদ্ধি, তাঁকে লাভ করতে সহায়তা করে।
সাধুবাবা এবার থামলেন। আমার নিজের একটা সমস্যার কথা মাথায় এলো।

সমস্যার হাত থেকে রেহাই পেতে সাধুবাবার কাছে অকপট স্বীকারোক্তি করলাম এইভাবে,

—বাবা, এখন আমার বয়েস তেইশ শেষ করে চব্বিশে পড়েছি। পুজোপাটে তেমন মন না থাকলেও কিছু করি। সাধক মহাপুরুষদের জীবনী পড়ি। যখন পুজোপাট করি বা ধর্মগ্রন্থে মহানদের জীবনী পড়ি—তখন মনের ভাবটা একেবারেই অন্যরকম হয়ে যায়। মনে হয়, কি হবে আর এই সংসার দিয়ে—কিছুই নেই এই সংসারে। বিশ্বের যত রকম জ্ঞানের কথা—সবই ঢোকে মাথার মধ্যে। তখন অর্ধেক ভগবান হয়ে যাই। আরও মনে হয়, যদি তৈলঙ্গস্বামীর মতো কিংবা কাঠিয়াবাবা অথবা শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ মহাপুরুষদের কারও মতো হতে পারতাম—তা হলে কি পরমানন্দময় জীবনটাই না হতো। খাওয়ার চিন্তা থাকতো না—পরার চিন্তা থাকতো না—সকলে সম্মান করতো, ভালো মন্দ খেতে পেতাম—সব ব্যাপারটাই বিরাট বিরাট হতো। এই ভাবটা আসে আমার পুজোপাট আর মহাপুরুষের জীবনী পড়ার সময়। গড়ে ধরুন তখন ভাবে প্রায় ভগবানই হয়ে যাই—তাঁর সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকলেও। তারপর বাড়ীর সকলের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা শুরু করি। সাধক সাধক ভাব। এবার মাকে হয়তো খাবার দিতে বললাম। হাতের কাজটা সেরে খাবারটা দিতে হয়তো পাঁচ-সাত মিনিট দেরী করেছে—তখন এমন দাঁত খিঁচিয়ে উঠলাম যে, বাঁদরও অনেক বেশী ভদ্র। সাধকভাব 'আউট'। এবার ধরুন রাস্তায় বেরোলাম। একটা সুন্দরী মেয়ে চোখে পড়ে গেল। ব্যস, তখন পুজোপাট, সাধক মহাপুরুষ হওয়ার ভাবনা, ভগবান—কোথায় যে হাওয়া হয়ে গেল—তা ভগবানই জানেন। তখন মনে হতে থাকে, 'মাকালী, এ-রকম একটা সুন্দরী মেয়েকে যদি বিয়ে করতে পারতাম—আহ্।' তখন বেশ কিছুক্ষণের জন্য মেয়েটির চেহারা ঘুরপাক খেতে থাকে মাথার মধ্যে। সাধক ভগবান—কেউই আর ওই ভাবনাটা সরায় না মাথার থেকে। অথচ এঁদেরই নাম করে এসেছি খানিক আগে। এই নিয়মেই চলছে আমার মন। এর থেকে মুক্তির উপায় কি?

কথাটা শুনে সাধুবাবা হো হো করে হেসে উঠলেন উচ্চস্বরে। আমিও সলজ্জ হাসি হাসলাম। তারপর হাসতে হাসতেই বললেন,

—বেটা, তোর এটা বয়েসের ধর্ম, মনেরও ধর্ম। সব বয়েসের ছেলেমেয়েদের কমবেশী হয়েই থাকে। এমন ভাবনাটা কোন অপরাধ নয়। এটা প্রকৃতির খেলা। কাম থেকেই এই ভাবনার সৃষ্টি করে থাকেন প্রকৃতি—সেখানে কুৎসিত পুরুষ বা রূপসী নারী, এমনকি জাতধর্মের কোন প্রভেদ রাখেন না তিনি। এই ভাবনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় নেই। প্রকৃতির নিয়মে আসে, আবার তাঁরই নিয়মে তা কালে কালে সরে যায় মন থেকে।

এমন একটা মামুলী উত্তরে আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। তবে তা মুখে এবং

ভাবে প্রকাশ করলাম না। হাসি মুখেই প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম,
—বাবা, স্থায়ীভাবে কোথাও বাস করেন ?
উত্তরে সাধুবাবা বললেন,
—স্থায়ীভাবে ডেরা কোথাও নেই। যখন যেখানে ভালো লাগে তখন সেখানে থাকি কিছুদিন। তারপর আবার মনটা যেখানে যেতে চায়—সেখানেই চলে যাই। এইভাবেই তো কেটে যাচ্ছে—যাবেও জীবনের শেষের দিনগুলো।
এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা হঠাৎ বললেন,
—বেটা, এবার আমি উঠবো। আজ এক জায়গায় পংগত আছে—সেখানে যেতে হবে। এখান থেকে অনেকটা পথ। এখন না উঠলে সময় মতো সেই আশ্রমে পৌঁছাতে পারবো না।
সঙ্গে সঙ্গেই অনুরোধের সুরে বললাম,
—আর একটু বসুন বাবা। এটাই প্রথম আর এটাই আপনার সঙ্গে শেষ দেখা। আর একটু বসুন।
কথাটুকু শেষ করেই জানতে চাইলাম,
—বাবা, পংগতে যাবেন বললেন। পংগত্‌টা কি ?
সাধুবাবা বললেন,
—বহু সাধু মিলে এক জায়গায় ভোজন করাকে বলে পংত্। বেটা, পংগতে যোগদান করলে সাধুদের অনেক লাভ হয়।
বলে থামলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, লাভ তো হয়ই, কারণ পংগতে খাওয়া হয় বিনা পয়সায় আর ক্ষেত্রবিশেষে দান দক্ষিণা লাভ তো আছেই। মুহূর্তের এই ভাবনাটুকুকে ভিত্তি করে সাধুবাবা বললেন,
—বেটা, সাধুদের কখনও খাওয়ার অভাব হয় না। তাঁর কৃপাতে রোজ কিছু না কিছু জুটবেই। পংগতে কোন সাধুই খাওয়ার ভাবনা আর দক্ষিণা লাভের আশা নিয়ে যায় না। পংগতে সাধুরা যায় নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে—সাধন তাপে নিজেকে তাপিত করতে—বুঝলি ?
কথাটা বুঝলাম না। হাঁ করে চেয়ে রইলাম সাধুবাবার মুখের দিকে। তিনি বললেন,
—পংগতে বহু সাধুর সমাগম হয়। অনেক সময় অনেক মহাত্মারও আগমন ঘটে পংগতে। সেই সময় অনেক বিষয় নিয়ে অনেক কথাও আলোচনা হয় একের সঙ্গে অপরের। সাধন জীবনের সুবিধা অসুবিধা, দ্বিধা দ্বন্দ্ব, মানসিক কোন অস্বস্তির সৃষ্টি হলে এই সাধুপংগতে আলোচনার মাধ্যমে সাধন পথের যে সব সমস্যা আছে তা প্রায় সময়েই সমাধান হয়ে যায়। সব সময় তো আর একসংগে তুই অনেক সাধুকে এক জায়গায় পাবি না। পংগতে আসা সাধুদের নানা কথা, নানা আলোচনার মাধ্যমে যেমন সাধন জীবনের সমস্যা কাটে, তেমন জ্ঞানও বাড়ে। আরও

একটা লাভ আছে বেটা, পঙ্গতে সাধুরা আসনে বসে পাশাপাশি সারি দিয়ে। এতে একের সাধন তাপ অপরের দেহমনের উপর আনন্দময় ক্রিয়া করে—সাধনশক্তি সঞ্চারিত করে, ফলে সাধন জীবনের অনেক কল্যাণ হয়—যা পঙ্গত বা জমাৎ ছাড়া অন্য কোন সময়ে সেটা সম্ভব হয় না। এই সময়ে অনেক সময় কোন মহাত্মার কৃপালাভও হয়ে যায় কোন কোন সাধুর ভাগ্যে। তাই ছোট হোক আর বড় হোক—সাধুরা পঙ্গতে এই কারণেই অংশ গ্রহণ করে—দুটো খাওয়া আর দক্ষিণা হিসাবে একটা লোটা-কম্বলের জন্য নয়, বুঝলি।

সাধুবাবার কথায় বিষয়টা আমার বোধে এলো। এবার জানতে চাইলাম,

—বাবা, জমাৎ কথাটা বললেন, জমাৎ মানে কি ?

উত্তরে সাধুবাবা বললেন,

—এক সঙ্গে বহু সাধুসন্ন্যাসীদের দলবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন স্থানে অবস্থানকেই বেটা জমাৎ বলে। অনেক সময় সংঘবদ্ধ এই দল তীর্থভ্রমণও করে থাকেন।

কথাটুকু শেষ করে এবার সাধুবাবাই আমাকে অনুরোধের সুরে বললেন,

—কিছু মনে করিস্ না বেটা, আমাকে আর আটকাস না। হেঁটে অনেকটা পথই আমাকে যেতে হবে। এবার আমি উঠি।

এমন সুরে কথাটা সাধুবাবা বললেন, আমার আর কিছু বলার রইলো না। সাধুবাবা উঠে দাঁড়ালেন। তিনি যে এতক্ষণ আমাকে সঙ্গ দিলেন—তার ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না। আজ থেকে কত বছর আগের কথা—অথচ তিনি আজও মুছে যাননি আমার মন থেকে—একেবারে স্মৃতিভ্রষ্ট না হলে তিনি মুছেও যাবেন না কখনও। সাধুবাবাকে প্রণাম করলাম। মাথাটা পায়ে ঠেকিয়েই প্রণাম করলাম। মাথায় হাত দিয়ে সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, তোর ব্যবহারে আমি প্রীত হয়েছি। অন্তর থেকে আশীর্বাদ করি, তুই আমার মতো একজন ভিখারীকে সম্মান দিয়েছিস—ভবিষ্যতে সম্মানী ও যশস্বী হবি। সকালে তুই পেট ভরে খাবার খাইয়েছিস্—এখন তুই সত্যিই অভাবে আছিস্, দুঃখ কষ্টে আছিস্—সব কেটে যাবে—অর্থ অন্ন আর বস্ত্র কষ্ট তুই আর পাবি না কখনও। ঈশ্বরে, গুরুতে তোর শরণাগতি লাভ হবে।

এমন আশীর্বাদের কথা শুনে সারাটা দেহ আমার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। কাঁপতে লাগলাম। আনন্দে আবেগে দুচোখ বেয়ে ঝরঝর করে নেমে এলো জলের ধারা। হাত দুটো জোড় করে কেমন যেন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আর কোন কথা না বলে ডানহাতটা অভয়সূচক করে সাধুবাবা মন্দিরের পথেই মিলিয়ে গেলেন ভিড়ের মধ্যে। সাধুবাবা মিলিয়ে গেলেন তবে হারিয়ে যায়নি সেই সময় আমার দৈন্যময় জীবনে তাঁর বলা কথাগুলো—আজও।

আকবরের অমর স্মৃতি ফতেপুর সিক্রি

দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ আর কলির মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আধ্যাত্মিক ও পৌরাণিক ঘটনার স্মৃতিবিজড়িত মথুরা বৃন্দাবন দেখলাম। এবার চললাম আগ্রায়—নিকট অতীত ইতিহাসের স্মৃতিকে সাক্ষাৎ দেখতে—যার খ্যাতি সারা পৃথিবী জুড়ে—তাজের শহর নামে। মথুরা বাস ডিপো থেকে বাস ছাড়লো—চললো আগ্রার পথে।

মথুরা থেকে আগ্রার দূরত্ব মোটেই বেশী নয়—মাত্র ৫৪ কি. মি.। সরাসরি কলকাতা থেকে ট্রেনে আসা যায় আগ্রায়—দূরত্ব ১২৬৪ কি. মি.। তুফান এক্সপ্রেসে আসলে পথে ট্রেন বদলের কোন ঝামেলা নেই। আগ্রা ক্যাণ্টনমেণ্ট স্টেশনে নামলেই হলো। এখান থেকে ঘুরে দেখা, থাকার সুবিধেটা বেশী। কারণ এখানে পর পর রয়েছে আরও কয়েকটি স্টেশন—আগ্রাকে কেন্দ্র করে। যেমন, আগ্রা ক্যাণ্টনমেণ্ট ছাড়াও আগ্রাফোর্ট, আগ্রা সিটি, রাজা-কি-মাণ্ডি আর ইদগাহ রেল স্টেশন।

এর আগে দিল্লী থেকে আগ্রায় এসেছি বাসে—২০৪ কি. মি.। কলকাতা থেকে অনেক ট্রেন আছে দিল্লী যাওয়ার। সরাসরি দিল্লী হয়েও দেখে নেয়া যায় আগ্রা। সারা ভারতের যে কোন প্রান্ত থেকে রেল, বিমান এবং সড়ক পথে পাকাপাকি যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে দিল্লী আগ্রার সঙ্গে। সুতরাং যারা বেড়াতে চায় তাদের আর চিন্তা কি! টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে বসলেই হলো।

সুন্দর পাকা পীচের রাস্তা ধরে বাস হৈ হৈ করে আগ্রায় এসে থামলো ইদগাহ বাস ডিপোয়। সময় লাগলো মাত্র ঘণ্টা দেড়েক। এখান থেকে রিক্সায় এলাম আগ্রা ক্যাণ্টনমেণ্ট স্টেশনের কাছে। অসংখ্য হোটেল রয়েছে এখানে। কম ভাড়ায় থাকা যায়, আবার বেশী ভাড়ার হোটেলও আছে। থাকার অসুবিধে নেই এতটুকুও। উঠলাম ছোটখাটো একটা হোটেলে।

আজ আর কোথাও যাওয়ার নেই। রাত কাটলে সকালে বেরিয়ে পড়বো দর্শনীয় স্থানগুলি দেখতে। এখন হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম আগ্রা শহরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যে।

হাঁটতে হাঁটতে এগোলাম ইদ্‌গাহ বাস ডিপোর বাজারের দিকে। আগ্রা পুরনো শহর। তাই রাস্তাঘাট একটু অপরিসর। জনসংখ্যাও যথেষ্ট। পথের দু-ধারে সারি সারি সাজানো অসংখ্য দোকানপাট। স্টেশন এলাকার তুলনায় শহরতলীর অঞ্চল অনেক বেশী খোলামেলা—পরিচ্ছন্নও বটে। মূল শহরের পরিধি এখন বেড়েছে ফলে শহর হয়েছে অনেক সমৃদ্ধশালী। একই সঙ্গে সেজে উঠেছে আধুনিক সাজে।

আজকের আগ্রা যমুনা নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত। ভারতে যতগুলি ঐতিহাসিক এবং প্রাচীন শহর আছে, তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ট শহর হলো এই আগ্রা। বর্তমান আগ্রা স্থাপন করেন সম্রাট আকবর। এটি পৌরাণিক ব্রজভূমির অন্তর্গত। আগ্রার দুর্গ নির্মাণ, শহর এবং ফতেপুর সিক্রিতে রাজধানী স্থাপন—এ সবই আকবর বাদশার মহান কীর্ত্তি—দুর্লভ অবদান।

পুরনো আগ্রা অবস্থিত ছিল যমুনার বামতীরে। গজনীর সুলতান মামুদ—ধ্বংস ও লুণ্ঠনলীলায় এ এক অবিস্মরণীয় নাম। পুরনো আগ্রাকে তিনি ধ্বংস করেছিলেন, যেমন করেছিলেন গুজরাটের সোমনাথের মতো আরও এমন অনেক শহর। নানা পরিবর্তন আর ঝড় ঝাপটার পর সম্রাট বাবর অধিকার করলেন আগ্রা। তবে সুন্দর সুষ্ঠুভাবে নয়—১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিম লোদীকে যুদ্ধে পরাজিত করে। তারপর আর তেমন কোন বড় দুর্যোগ নেমে আসেনি আগ্রার বুকে। পরবর্তীকালে আকবর পুত্র জাহাঙ্গীর এবং পরে শাজাহানের অবদানও আগ্রা কখনও অস্বীকার করতে পারবে না। একই সঙ্গে পারবে না জাহাঙ্গীর পত্নী সম্রাজ্ঞী অপরূপা নুরজাহানের অপরূপ শিল্প ভাবনা ও অবদানের কথা।

এখানে ছোট বড় নানা দোকান সাজানো রয়েছে নানা সাজে। এখানকার চটি জুতো আর নাগরার দাম বেশ সস্তা। এগুলির চেহারা মডেলদের মতো সুন্দর তবে ব্যবহার করলে ক-দিন টিকবে তা হাতে নিয়ে দেখলেই বোঝা যায়। এখান থেকে চটি জুতো কিনে রামের পাদুকার মতো সিংহাসনে নয়, আলমারিতে তুলে রাখলে টিকবে অনেকদিন। সারা ভারতবাসীর আগ্রা, সারা পৃথিবীর পর্যটকদের আগ্রা—তাই আর সব জিনিষের দাম তাজমহলের চূড়া ছাড়ানো।

আজকের আগ্রা শহরের আছে আরও একটু অতীত প্রসঙ্গ। মহাভারতীয় যুগ—আনুমানিক ৪৪৩৮ বছর আগের কথা। অনেকের ধারণা, সে যুগে এই জায়গাটি পরিচিত ছিল অগ্রবান নামে। শ্রীমদ্ভাগবত এবং মহাভারতে উল্লিখিত যদুবংশীয় রাজা আহুকের পুত্র ও কংসের পিতা উগ্রসেন এই নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে অগ্রবান নামটি লুপ্ত হয়ে তা পরিণত হয় আগ্রা নামে। এ অনুমান সত্য হলে আগ্রার বয়েস সাড়ে চার হাজার বছরেরও বেশী।

আগ্রা বাবরের হাতে আসার আগে ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বাদল সিংহ নামে এক ক্ষত্রিয় বীর এখানে নির্মাণ করেছিলেন একটি দুর্গ। নাম বাদলগড়। উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করা। বাবরের পর আকবর বাদলগড়কে ভেঙে সেখানেই নির্মাণ করেন আজকের এই বিশাল দুর্গ। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে লোদী বংশের সিকান্দার লোদী একটি নগরীর পত্তন করেন—সিকান্দ্রা, শহর আগ্রা থেকে ১০ কি. মি. দূরে। তবে উত্তরোত্তর যা কিছু শ্রীবৃদ্ধি তা ঘটতে থাকে আকবরের সময়কাল ১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রা শহর পত্তনের পর থেকে। নতুন করে শহরটি প্রথম সাজিয়েছিলেন তিনি।

আজকের আগ্রা স্মৃতিসৌধ আর ফতেপুর সিক্রি নগরীর জন্য শুধু সারা দেশ—বিশ্ববাসীর কাছে গর্বের নয়, এখানকার শিল্প ও কারুকার্য, পাথরে ভাস্কর্য, রেশম ও চর্মশিল্প, উৎকৃষ্ট কাপড় ও কার্পেট শিল্পের খ্যাতি এর সারা বিশ্বব্যাপী। যারজন্যেই তো বছরের পর বছর ধরে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অগণিত ভ্রমণপিয়াসী আসেন আগ্রা পরিদর্শনে। তাঁরা আসেন মোঘল আমলের অবর্ণনীয় কীর্তির সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করতে—ফিরে গিয়ে কীর্তি সুধারস পান করান অপরকেও। মধ্যযুগীয় শিল্পের সুদক্ষতা, গঠনশৈলী আর অতীত ঐতিহ্যের পরিচায়ক যে এই ভারতবর্ষ—এটা কখনও উপযাচক হয়ে প্রমাণ করতে হয়নি পৃথিবীর কোন প্রান্তের কোন শিল্পী, পর্যটক, ভ্রমণ ও শিল্প রসিকদের। এখানেই সার্থক এদেশীয় শিল্প—এখানেই সার্থক হয়েছে মোঘল আমলের তৎকালীন বাদশাদের আন্তরিক প্রয়াস ও প্রচেষ্টা।

দেখেছি, সারা ভারতের পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র শিল্পকর্ম। কলকাতার রাস্তায় দেখেছি পেটের দায়ে রঙিন চক দিয়ে ছবি আঁকতে। পুরী ত্রিবান্দ্রাম গোয়ার সমুদ্রতটে দেখেছি বালি দিয়ে কি সুন্দর মূর্তি সৃষ্টি করতে। কোথাও আদৃত, কোথাও বা অবহেলিত।

শিল্প কি? যে সৃষ্টকর্ম আমার মনকে রমণসুখ দেয়—দেখামাত্রই তার অন্তর্নিহিত রস ও ভাব মনকে সহজেই আপ্লুত করে—তাই-ই আমার কাছে শিল্প। সে শিল্প সঙ্গীত, সাহিত্য, আঁকা ছবি, হাতে গড়া কোন মূর্তি, পাথর কিংবা কাঠে খোদাই করা কোন কিছু অথবা প্রকৃতির আপন খেয়ালে সৃষ্ট কোন বস্তু অথবা কোন দৃশ্য।

শিল্প কি? মানুষের আনন্দ ও অনুভূতি প্রকাশের সুন্দর প্রতিফলন যেটি—সেটিই শিল্প। সে মাধ্যম এই বিশ্বসংসারে যে কোন ভাষায়, ভাবে, করায়—যা অপরের বোধ ও রুচিকে দেয় অনাবিল আনন্দ—তাই-ই শিল্প।

শিল্পী কে? মনে যার চোখ আছে—তিনিই শিল্পী। শিল্পীকে স্বীকৃতি দেয় কে? দৃষ্টি ও মন।

আমার মনে হয় না সেই শিল্পীর শিল্পকর্ম সার্থক—যা দেখে মানে বোঝা যায় না—লিখে বা বুঝিয়ে না দিলে।

শিল্পের উৎসই তো প্রকৃতি। তাই প্রকৃতির শিল্পকর্মে প্রয়োজন হয় না তুলি-রঙের। অথচ কি বিচিত্র শিল্পের প্রকাশ দেখেছি প্রকৃতির বুকে—যেখানে প্রকাশ করতে হয় না শিল্পকলার ভাষা। অনেক সময় আকাশে এক টুকরো মেঘ—একটা বাঘ যেন থাবা দিয়ে বসে আছে। অসাবধানতায় হাত থেকে পড়ে গেছে একটু জল—দেখেছি, জলের রেখায় হরিণ যেন ছুটে চলেছে। মানুষ অথবা প্রকৃতির সৃষ্ট কোন কিছু যখন আমাকে আনন্দ দেয়, তখনই তো বুঝি—শিল্পী মন আমার, আমি শিল্প বুঝি এবং জানি, নইলে আনন্দ পাই কেন?

চলার পথে দেখেছি, সারা ভারতটাই একটা শিল্পের দেশ—শিল্পীরও। এখানে প্রকৃতি, পাহাড় ও মরুভূমিতে রয়েছে শিল্প আর মানুষ তার অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে প্রতিটা ইট পাথর আর বালুকণায় ভরিয়ে তুলেছে এক এক গুচ্ছ শিল্পকলা। রাজস্থানের বিভিন্ন দুর্গ আর প্রাসাদে নিখুঁত হাতের কাজে শিল্পী যেমন প্রাণ সঞ্চার করেছেন পাথরে—তেমনই নেপালের পুরনো রাজধানী পাটান ও ভকতপুরে শুকনো কাঠে সূক্ষ্ম কাজ করে জীবন্ত, প্রাণবন্ত করেছেন কয়েকশো বছর আগের শিল্পীরা। আজ এসব জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালে পাথর ও কাঠের শিল্পগুলি যেন পর্যটকদের ডেকে পরিচয় করিয়ে দিতে চায় শিল্পীর সঙ্গে—বেঁধে দিতে চায় শিল্পমিত্রতার বন্ধনে।

আজ থেকে দেড়হাজার বছর আগে পাহাড় আর জঙ্গলে ভরা ইলোরার ভাস্কর্য, অজন্তার দেয়ালচিত্রে রঙের খেলায় মুক্তোর মালা দেখলে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। কি অসাধারণ শিল্পের ঢল নেমেছে এখানে। যাঁরা চিত্রশিল্পী হয়ে, ভাস্কর হয়েও দেখেনি সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের তৎকালীন শিল্প ও শিল্পীদের নিরলস শিল্পকর্মের অবদান, দেখেনি উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যের দেব-দেউলের শিল্পকলা—তাদের দুর্ভাগ্য।

আমার বিশ্বাস, সারা ভারতে যত শিল্পী আছে—যত শিল্প সৃষ্টি হয়ে আছে—সারা পৃথিবীতে তার একভাগও আছে কিনা সন্দেহ। ভারতের মানুষকে কোথাও যেতে হবে না শিল্পকলা ও শিল্পীর সন্ধানে। এখানেই সে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখানে যে পূর্ণ নয়—সে কোথাও গিয়ে পূর্ণ হতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না।

এ-দেশের পথে প্রান্তরে কুকুরের মৈথুন দৃশ্যে যেমন রয়েছে প্রকৃতি-মনের আনন্দময় নির্যাস, কামকলাশিল্পের এক প্রকট প্রকাশ—তেমনই মানুষের শিল্পীমনের অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে শুধু ছেনি হাতুড়ির স্পর্শে উদয়পুরের প্রাসাদে রাখা আকবর বাদশার দেয়া উপহার তাঞ্জাম।

জগতের সব কিছুই শিল্প, সুন্দর—এই নির্বিচার বোধ যার আছে তিনিই শিল্পী। এই বোধে যিনি প্রতিষ্ঠিত তিনিই প্রকৃত শিল্পরসিক ভ্রমণপিয়াসী—ভ্রমণ আর দেখা তার সার্থক।

সকাল হলো। আমার সঙ্গীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আগ্রার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখতে। হোটেল থেকে একটুখানি পথ—এলাম আগ্রা ক্যান্টনমেণ্ট স্টেশনে। এখান থেকে সরকারী ও বেসরকারী কণ্ডাকটেড ট্যুরের বাস ছাড়ে। টিকিট কেটে উঠে পড়লাম বাসে। বাস ছাড়লো সকাল ৯টায়। প্রথমে চললো ফতেপুর সিক্রি।

পৌরাণিক আগ্রার কথা ছেড়ে দিলেও যীশুখ্রীষ্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী আগেই নির্মিত হয়েছিল আগ্রা। তখনও এই নগরী ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। খ্রীষ্টপূর্ব ৭৫০ অব্দের কথা। তখন আজকের শহর এই আগ্রা শাসন করতেন গোহিলোট

বংশের রাজপুত রাজারা। একদা আগ্রায় খনন কার্যের সময় পাওয়া যায় প্রায় ২০০০ রৌপ্য মুদ্রা। সেগুলি সব গোহিলোট রাজপুত রাজাদের আমলের। এ-সব কথা জানা গেছে পুরাতত্ত্ববিদ কার্লাইলের লেখা থেকে।

বাস চলছে মধ্যম গতিতে। পরিষ্কার রাস্তা ধরে, দু-পাশের দোকানপাট হাট-বাজার আর একের পর এক মোড় পেরিয়ে, আগ্রার পুরনো শহর ছেড়ে বাস ধরলো শহরতলীর পথ। আমরা দুজন ছাড়া বাসের আর সব যাত্রী যারা—তারা সকলেই ভ্রমণকারী, নানা ভাষাভাষীর। এরা সকলেই বিভিন্ন প্রদেশের। তবে আমার ভ্রমণ জীবনে কখনও কোথাও উড়িষ্যাবাসী ভ্রমণকারীর সঙ্গে আলাপ হয়নি—এদের কারও চেহারা আমার চোখে পড়েছে বলেও মনে পড়ে না। ভারতীয় ছাড়াও বিদেশী পর্যটক রয়েছেন কয়েকজন। এদের সব জায়গাতেই দেখেছি, সহসা বেসরকারী বাসের সওয়ারী হন না। প্রায়ই দলবদ্ধভাবে ভ্রমণ করেন সরকারী বাসে। তবে দলছুট বিদেশী পর্যটকেরা আবার সরকারী বা বেসরকারী বাসের তোয়াক্কা করে না। ভ্রমণ নিয়ে কথা—পৌঁছে যায় যে কোন বাসে—গন্তব্যস্থানে। অনেকে আবার স্থানীয় দোকান থেকে সাইকেল ভাড়া করে ঘুরে দেখে নেয় শহরের দর্শনীয় স্থানগুলি। আগ্রায় বিদেশী পর্যটকের সংখ্যা অসংখ্য। কারণ এখানকার দর্শনীয় স্থানগুলিতে তাদের অবাধ প্রবেশ। হিন্দুমন্দির বা তীর্থক্ষেত্রে এদের যাতায়াত খুব কম। হিন্দুর কোন মন্দিরেই বিদেশী পর্যটকদের ঢুকতে দেয়া হয় না। যাইহোক, বাসের গতি বাড়লো। সুন্দর চওড়া রাস্তা। কখনও বেশ জনবসতি, আবার কখনও দু-পাশে ধানক্ষেত।

হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হলো এই আগ্রা। একদা আগ্রা ছিল ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত তাই হিন্দুর সংস্কৃতি এবং লোদী আর মোঘলদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি—এ-দুয়ের সংমিশ্রণেই গড়ে উঠেছে শহর আগ্রার মিশ্রসংস্কৃতি। আকবর বাদশার সাহিত্য ও ভাষাচর্চার পীঠস্থানও ছিল এই আগ্রা। সেইজন্যেই তো এখানকার বিভিন্ন প্রথা, উৎসব ও অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় মিশ্র-সংস্কৃতি।

ভারতের অতীত ঐতিহ্য, স্থাপত্য ও শিল্পকলা এবং সঙ্গীত চর্চায় আগ্রার অবদান অনস্বীকার্য। আগ্রার মার্বেল পাথরের উপর কারুকার্যের প্রশংসা সারা পৃথিবী জুড়ে। আর সঙ্গীতে হরিদাস স্বামীর শিষ্য তানসেন এবং বৈজুবাওরা—এঁদের নাম অবিস্মরণীয়। এঁদের নাম ভারত জোড়া। এঁরা দুজনেই ছিলেন আকবর বাদশার রাজসভার দুটি রত্ন। সঙ্গীত সম্রাট তানসেনের এক আত্মীয় ছিলেন হাজি সুজন খান। তিনিই প্রথম সঙ্গীতে প্রচলন করেন আগ্রার ঘরানা—যা আজও ভারতীয় সঙ্গীত শিল্পের অন্যান্য ঘরানার সঙ্গে একইভাবে সমাদৃত। খেয়াল আর চম্বলা—ভারতীয় এই চিত্তাকর্ষক সঙ্গীত দুটির উৎপত্তি এই আগ্রাতেই। মোঘলযুগের আগ্রা ছিল তৎকালীন লণ্ডনের চেয়েও অনেক বেশী

সম্বৃদ্ধি ও ঐতিহ্যশালী—এ মত পোষণ করেছেন খ্যাতনামা ইউরোপীয় পর্যটক র‍্যালফিঞ্চ।

আগ্রা-বিকানীর রোড ধরে টানা এক ঘণ্টা চললো বাস। পথে কোথাও দাঁড়ালো না। এলাম ফতেপুর সিক্রিতে। শহর আগ্রা থেকে দূরত্ব মাত্র ৩৭ কি.মি.। যাত্রীরা সকলেই একে একে নেমে এলেন বাস থেকে—সঙ্গে আমরাও। ইতিহাসের পটভূমিতেই ফতেপুর সিক্রি তাই গাইডের প্রয়োজন। পাথরে গড়া ইমারত। গাইড না হলে কিছুই বোঝা যাবে না—শুধু পাথর দেখা ছাড়া। যাত্রীরা সকলে মিলে ঠিক করলাম একজন গাইড। দলবদ্ধভাবে চলতে শুরু করলাম গাইডের পিছনে পিছনে আর তিনি বলতে লাগলেন, 'বিন্ধ্য পর্বতমালার পাহাড়ী উপত্যকার উপরেই অবস্থিত এই ফতেপুর সিক্রি—শহর আগ্রার দক্ষিণ-পশ্চিমেই একদা আনুষ্ঠানিক রাজধানী স্থাপন করেছিলেন মোঘল সম্রাট আকবর—যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মোঘল আমলের এক ঐতিহ্যপূর্ণ গৌরবময় ইতিহাস। যদিও রাজধানী স্থাপনের পর ১৪ বছরের মধ্যেই পরিত্যক্ত হয়েছিল এই ফতেপুর সিক্রি। কারণ লাল বেলে পাথরে নির্মিত আড়ম্বরপূর্ণ এই রাজধানী আকবর পরিত্যাগ করেছিলেন শুধুমাত্র জলাভাবের জন্য।'

গাইড থামলেন। ইতিমধ্যেই ফতেপুর সিক্রির প্রধান তোরণদ্বার পেরিয়ে এসেছি। বিশাল এই দ্বারটির উচ্চতা ৫৪ মিটার। এ দ্বারটি যেন কারিগরী সাফল্যের এক নতুন অধ্যায়। দক্ষিণ-ভারত অভিযানের সাফল্যের স্মারক হিসাবেই এই তোরণ-দ্বারটি নির্মাণ করেছিলেন বাদশা আকবর।

একটু ফাঁকা জায়গা—মাঠের মতো সবুজ বিছানো ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে পড়লেন গাইড। আমরাও গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়ালাম গাইডকে। তিনি বলতে শুরু করলেন, 'আকবর যখন সিংহাসনে বসেছিলেন তখন কোন জনবসতিই ছিল না এই ফতেপুরে। সেই সময় সেলিম চিশ্তি নামে একজন ফকির এখানকারই এক গুহায় বসবাস এবং সাধনা করতেন। তখন উত্তরপ্রদেশের একাংশ জুড়ে তাঁর প্রবল খ্যাতি। আগ্রায় বসে আকবর অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনার কথা প্রায়ই শুনতেন স্থানীয় লোক এবং পার্ষদদের মুখে। আকবরের অম্বরের রাজকুমারী স্ত্রী যোধবাঈ ছাড়াও অন্যান্য স্ত্রী ছিল তবে কারও সন্তান ছিল না একটিও। একসময় ফকিরের বিভিন্ন কেরামতির কথা শুনে সম্রাট মনে মনে আকাঙ্খিত হলেন তাঁর আশীর্বাদলাভের জন্য। যথাসময়ে ফতেপুরে সম্রাট নিজেই যোগাযোগ করলেন ফকির সেলিম চিশ্তির সঙ্গে। সন্তানহীন বাদশা জানালেন সন্তানলাভের বাসনার কথা। ফকির জানালেন, সন্তানলাভ হবে তিনটি। একই সঙ্গে বাদশার ইচ্ছায় প্রথম সন্তানের নাম ফকিরের নামের অনুকরণে রাখার অনুমতি দিলেন। যথাসময়ে স্ত্রী যোধবাঈ-এর গর্ভে এলো সন্তান। ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে আগস্ট ভূমিষ্ট হলো একটি পুত্র সন্তান। বাদশা নাম দিলেন মহম্মদ সেলিম। পরবর্তীকালে যিনি পরিচিত

হলেন জাহাঙ্গীর নামে—সম্রাট জাহাঙ্গীর।

সেলিমের জন্মের, কিছুদিন পর আকবর ভাবলেন রাজধানী স্থানান্তরিত করবেন ফতেপুরে। তৎকালীন বাদশাদের কোন বিষয়ে কোন কিছু ভাবনা মানেই বলতে গেলে কাজ শুরু হয়ে যাওয়া। শুরু করলেন বিরাট কর্মযজ্ঞ। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই নির্মাণ করলেন এই প্রাসাদনগরী ফতেপুর সিক্রি—১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই নগর নির্মাণকালে বেশীরভাগ কাজের দেখাশুনা এবং পরিচালনা করেছিলেন আকবর নিজেই। কথিত আছে, টানা প্রায় বারোটা বছর ধরে এক অদৃষ্টপূর্ব সুন্দর নগরী গড়ে তোলা এবং মোঘল সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে ফতেপুরকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য দৃষ্টি ও মনকে একান্তভাবে নিবদ্ধ করেছিলেন আকবর—এই ফতেপুরে।'

এই পর্যন্ত বলে গাইড আবার হাঁটতে শুরু করলেন ধীরে ধীরে। সামান্য একটু এগিয়ে পুরনো একটা বারান্দার উপর গাইড দাঁড়ালেন। আমরা জোট বেঁধে দাঁড়ালাম নীচে। গাইড বললেন, 'এরপর ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। সম্রাট আকবরকে যেতে হলো উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে। উদ্দেশ্য—পাঠান উপজাতিদের হাত থেকে মোঘল সাম্রাজ্য অক্ষত ও সুরক্ষা করা। এই সময় বাদশা লাহোরে ছিলেন প্রায় তেরো বছর—১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর অনুপস্থিতিতে এবং নজরদারীর অভাবে ফতেপুর অবহেলিত হলো—হলো না সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ। ফলে যা হবার তাই-ই হলো। বহু সুন্দর সুন্দর ইমারত নষ্ট হয়ে গেল এই সময়ের মধ্যে। সেই সময় আকবরের কোন উপায়ও ছিল না। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বরে তাঁকে আবার যেতে হলো দাক্ষিণাত্য অভিমুখে। সেখান থেকে ফেরার পথে তিনি কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়েছিলেন ফতেপুর সিক্রিতে। এ-সব কথা জানা গেছে বুলন্দ দরওয়াজায় ফার্সী ভাষায় খোদাই করা লিপি থেকে।

আকবর যখন ফতেপুর সিক্রিতে বিশ্রামরত ছিলেন—সেই সময় বাদশা-পুত্র জাহাঙ্গীর বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন এলাহাবাদে। অনন্যোপায় আকবরকে এলাহাবাদে যেতে হলো বিদ্রোহ দমনের জন্য। সেখানেই আকবর থেকে গেলেন এবং দেহরক্ষা করলেন এলাহাবাদে—১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর।

আকবরের মৃত্যুর পর ফতেপুর সিক্রি আর কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। ঔরঙ্গজেবের আমলে জাঠদের মাধ্যমে ফতেপুর সিক্রিতে লুণ্ঠন এবং ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ শাহ রঙ্গিলার কিছুদিনের জন্য বাদশা হয়ে ময়ূর সিংহাসন দখল ইত্যাদির মাধ্যমে ফতেপুর সিক্রির ভাগ্যের পরিবর্তন হলো তবে সুখজনক নয়। এরপর মারাঠা শাসক মাধোরাও সিন্ধিয়ার সময় ফতেপুর সিক্রির গৌরব কিছুটা অক্ষুণ্ণ ছিল। তারপর ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রা এবং ফতেপুর সিক্রি এলো ইংরাজ অধীনে। এই সময় লর্ড কার্জন একগুচ্ছ প্রকল্প হাতে নিলেন ফতেপুর সিক্রির নষ্ট হওয়া ইমারতগুলির রক্ষণা-বেক্ষণের। তাঁরই মাধ্যমে ঐতিহাসিক সৌধগুলি রক্ষিত হলো সুন্দর ও যথাযথভাবে—যা আজও দর্শনীয় হয়ে আছে সারা বিশ্বের

পর্যটকের কাছে।'

অত্যন্ত ধীর পায়ে চলতে চলতে গাইড বললেন, 'লম্বায় ফতেপুর সিক্রি মাইল দুয়েক আর চওড়ায় এক মাইল। এই শৈলশিখর প্রাসাদের তিন দিকে বিশাল বিশাল তোরণদ্বার আছে মোট নয়টি। দিল্লী দরওয়াজা, লাল দ্বার, আগ্রা দ্বার, সুরজ দ্বার, চন্দ্র দ্বার, গোয়ালিয়র দ্বার, তারহা দ্বার, আজমীর দ্বার ইত্যাদি। সিক্রি গ্রাম থেকে প্রথমে পড়ে দিল্লী দ্বার—তারপর ক্রমান্বয়ে লাল, আগ্রা, চন্দ্র এবং গোয়ালিয়র দ্বার। পশ্চিমে তারহা এবং আজমীর দ্বার। কি সুন্দর পরিকল্পনা করে এই দ্বারগুলির নির্মাণ এবং নামকরণ করেছিলেন আকবর। কেমন জানেন? বিভিন্ন শহরের নামের দ্বারগুলির সঙ্গে রাস্তা যুক্ত হয়েছে সেই শহরের সঙ্গে—যে রাস্তা ধরে পৌঁছানো যায় সেই শহরে। দিল্লীতে শেরশাহ একটি কেল্লা নির্মাণ করেছিলেন—যেটি পুরনো কেল্লা হিসাবে প্রসিদ্ধ। এই তোরণ দ্বারগুলির স্থাপত্যকলার সঙ্গে অদ্ভুত একটা সাদৃশ্য আছে দিল্লির ওই পুরনো কেল্লার সঙ্গে।'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে মুখ করে গাইড বললেন, 'আপনারা যে দ্বারটি দিয়ে প্রবেশ করেছেন ওটির নাম আগ্রা দ্বার। অধিকাংশ পর্যটক এবং পরিবহন প্রবেশ করে ওই দ্বার দিয়েই। ঢুকেই যে বড় প্রাঙ্গণটি পেলেন—সেটি কারাবনসরাই। উইলিয়াম ফিঞ্চ ছিলেন ব্রিটিশ পর্যটক। ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এসেছিলেন ফতেপুর সিক্রিতে। তিনি বলেছেন, এটি ছিল বাদশার সরাইখানা।'

এবার গাইডের কথা বলি আমার দেখা এবং সুবিধে মতো। এই সরাইখানার পিছনেই দেখলাম লাল বেলে পাথরের একটি প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণের নাম তানসেন বারাদরি। একসময় এটি নষ্ট হয়ে যায় এবং পরে আবার সংস্কার করা হয় খুব সুন্দরভাবে।

তানসেন বারাদরি থেকে একটু এগোতেই পড়লো নহবতখানা। মোঘল আমলে আকবর বাদশা যখন দিওয়ান-ই-আমে যেতেন, তখন এই নহবতখানা থেকে বাজনা বাজিয়ে জানানো হতো বাদশার উপস্থিতি।

নহবতখানার একটু আগেই পেরিয়ে এসেছি একটি বিশাল উঁচু বাড়ী। একসময় এই বাড়ীতে তৈরী করা হতো নানা ধরনের বিলাস এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র—যেগুলি শুধুমাত্র ব্যবহৃত হতো রাজপরিবার ও দরবারে।

এই কারখানার পিছনেই রয়েছে একটি ধ্বংসাবশেষ। এককালে এটিই ছিল রাজ-পরিবারের পাকশালা। এরই কাছে রয়েছে একটি জলাশয়। সিঁড়ি নেমে গেছে ধাপে ধাপে। গঙ্গাজলের প্রতি আকবরের শ্রদ্ধা ছিল অসীম। এই জলাশয়ে সঞ্চিত বৃষ্টির জলে গঙ্গাজল মিশিয়ে সেই জল দিয়েই রান্না করা হতো বাদশাহের। এ-সব কথা জানা গেছে আকবরের রাজসভার অন্যতম সভাসদ আবুল ফজলের লেখা 'আইন-ই-আকবরী' থেকে। এই জলাশয়ের মোঘল আমলে নাম ছিল হোজ-ই-শ্রিন বা মিষ্টি জলাশয়।

এই জলাশয়ের বাঁ-দিকটায় দিওয়ান-ই-আম এবং ডানদিকে কারখানাকে রেখে মাঝামাঝি জায়গায় এলাম একটি প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের কাছে। দেখার মতো কিছু নেই। শুধু রয়েছে লাল পাথরের ভাঙা একটি বাড়ী। আকবরের আমলে এই অট্টালিকাটি ছিল স্থায়ীভাবে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য—যাদের যে কোন সময়ে ও প্রয়োজনে পাওয়া যেত। রাজপ্রাসাদের চৌহদ্দির মধ্যে এই অট্টালিকার নাম ছিল রক্ষীশালা।

মোঘল বাদশা এবং রাজপুত রাজাদের আমলে নির্মিত প্রত্যেকটি দুর্গ-প্রাসাদেই রয়েছে দিওয়ান-ই-আম এবং দিওয়ান-ই-খাস। এবার একটু হেঁটে এসেই দাঁড়ালাম একটি বিরাট হল ঘরের মধ্যে। এটি আকবর বাদশার দিওয়ান-ই-আম। সুন্দর কারুকার্যে ভরা মাঝখানের লনের পাথরগুলি। এই মহলটির ঠিক মাঝখানেই ছিল সিংহাসন—যেখানে বসে বিচার করতেন বাদশা। দিওয়ান-ই-আমের তিন-দিকেই রয়েছে বারান্দা। এর পশ্চিমদিকে রয়েছে ঝুলন্ত বারান্দা—যেখানে রাজমহিষীরা বসে দেখতেন বাদশার বিচার। ঝুলন্ত বারান্দা কারুকার্যে ভরা কাচের জানালা দিয়ে ঘেরা—যার পিছনে বসতেন অন্তঃপুরের মহিলারা। তবে বাইরের থেকে তাঁদের পরিষ্কারভাবে কাউকেই দেখা যেতো না—এমনভাবেই এটি নির্মিত। দিওয়ান-ই-আম লম্বায় প্রায় ৩৬৬ ফুট এবং চওড়ায় ১৮ ফুট।

ফতেপুর সিক্রির সমস্ত দর্শনীয় বিষয়গুলি সব পাশাপাশি। পায়ে হেঁটে দেখা যায় ঘুরে ফিরে। এর সমগ্র চত্বরটিই পাথরে বাঁধানো। দেশী বিদেশী পর্যটক আর ভ্রমণকারীতে গমগম করছে ফতেপুর সিক্রি। এই বিশাল চত্বরের মধ্যে খাবারের দোকান নেই একটাও। যা কিছু আছে সব চত্বরের বাইরে—ঢোকার মুখে।

এবার গাইড আমাদের নিয়ে এলেন দিওয়ান-ই-খাসে। বাইরে দেখলে এই প্রাসাদটি মনে হবে দোতলা। আসলে এটি একতলাই তবে বেশ উঁচু—দোতলার সমান। দিওয়ান-ই-খাস নির্মিত হয়েছে লাল বেলে পাথর দিয়ে। হিন্দু স্থাপত্য রীতিতে তৈরী এই মহলের মাঝখানের আটকোণা স্তম্ভটি দেখলে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। এই স্তম্ভের একেবারে উপরে রয়েছে চওড়া পাটা—যেখানে বাদশা এসে বসতেন। বাদশার অত্যন্ত অনুরাগী বহু প্রজা ও কর্মচারী ছিল—যারা বাদশাকে দর্শন না করে অন্নজল গ্রহণ করতেন না—তারা কেউ এলে এখানে বসেই বাদশা আকবর তাদের দর্শন দিতেন। গাইড জানালেন, বাদশার দর্শন দেয়ার এই পদ্ধতির নাম ছিল 'ঝরোখা দর্শন'।

আকবর বাদশার আন্তরিক প্রয়াস এই রাজধানী ফতেপুর সিক্রির একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে তিনি কি করেননি? একজন রাজা বাদশার দৈনন্দিন জীবনে যা যা প্রয়োজন—তা সবই করেছিলেন এখানে, তবে ভোগ করেছেন মাত্র কয়েকটা বছর। তাঁরই নির্মিত পারস্যদেশীয় শিল্পকলায় মনোরম কারুকার্য খচিত শয়ন গৃহে

এসে দাঁড়ালাম। অপূর্ব সুন্দর—দেখার মতো এই একতলা কক্ষটি। পাথরের দেয়ালে খোদিত রয়েছে নানা ধরনের ফুলে। একেবারে নিখুঁত সুন্দর কাজ। শয়ন গৃহের এই দেয়ালে রয়েছে একটি বিশাল চিত্র—একটি সুন্দর শিশুকে কোলে নিয়ে আছেন একজন দেবদূত। চিত্রটির বয়েস তো আর কম হলো না—তাই এটি প্রায় নষ্ট হয়ে গেছিল। লর্ড কার্জনের প্রচেষ্টায় এই চিত্রটির অনেকটাই পুনরুদ্ধার হয়। ঐতিহাসিকদের ধারণা, প্রথম পুত্র সেলিমের জন্মকে ভিত্তি করেই এটি করেছিলেন পিতা আকবর। এই কক্ষটি ছিল আকবরের একান্তই ব্যক্তিগত। তাই বাদশার অনুমতি পেলে তবেই এই কক্ষে প্রবেশ করতে পারতেন অন্তঃপুরবাসিনী মহিলারা।

এবার পায়ে পায়ে এলাম দিওয়ান-ই-খাস সংলগ্ন আকবরের জ্যোতিষ মহলে। যেমন সুন্দর এর গঠন প্রণালী তেমনই সুন্দর এই মহলের কারুকার্য খচিত দেয়ালগুলি। এই মহলটির গঠনশৈলীর সঙ্গে আবু পাহাড়ে নির্মিত দিলওয়ারা জৈনমন্দিরের সঙ্গে বহু সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন প্রত্নতত্ত্ববিদেরা।

জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী এবং অত্যন্ত জ্যোতিষীভক্ত ছিলেন সম্রাট আকবর। এর বহু প্রমাণ আছে তৎকালীন ইতিহাসে। বাদশা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র এবং প্রয়োজনে এই কক্ষে ডেকে পাঠাতেন হিন্দু ও মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ের জ্যোতিষীদের। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতেন কোন জায়গায় বিজয় অভিযানে যাওয়ার আগে এবং অন্যান্য নানা প্রয়োজনে।

জ্যোতিষ গৃহের পিছনে এবার আমাদের সকলকে নিয়ে এলেন গাইড। দেওয়ান-ই-খাসের কাছেই রয়েছে সিঁড়িযুক্ত তিনটি অট্টালিকা। এর মধ্যে উত্তর-পশ্চিম দিকের ঘরটি দেখিয়ে গাইড বললেন, অনেকের মত, সম্রাট আকবর নাকি অন্তঃপুরের মহিলাদের সঙ্গে ওই অট্টালিকায় খেলতেন লুকোচুরি। তবে মত আছে আরও একটা। অসম্ভব এবং অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন আকবর বাদশা। ঘুমাতেন খুব সামান্য সময়। আহার করতেন ২৪ ঘণ্টায় একবার। কাজের মধ্যেই ডুবে থাকতেন তিনি। সুতরাং লুকোচুরি খেলা করবেন—এমন সময়টা ছিল কোথায় ?

ফতেপুর সিক্রির প্রতিটা মহল, স্তম্ভ এবং দেয়াল কারুকার্যে ভরা। প্রতিটি কাজ যেমন নিখুঁত, তেমনই সূক্ষ্ম। অবাক হয়ে যেতে হয় মোঘল আমলের শিল্পীদের শিল্পভাবনা আর হাতের কাজ দেখলে। আধুনিক ভারত অনেক উন্নত এবং শিল্পী বা ভাস্করদের শিল্পভাবনার অনেক প্রসারও ঘটেছে নিঃসন্দেহে। তবে এ বিশ্বাস আমার কিছুতেই হয় না—আধুনিক কোন ভাস্কর এমন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন। কারণ ভারতের পথে প্রান্তরে ঘুরে দেখেছি—নতুন যা কিছু হয়েছে তা পুরনো আমলের শিল্প ও স্থাপত্যকলাকে নকল করে এবং সবই মোটা দানার কাজ। ভাবতে ভালো লাগে, এখনকার ভাস্কর বা শিল্পীদের সব আঙুলগুলো বোধ হয় বেশ

মোটা মোটা।

চারদিকে চোখ বোলাতে বোলাতে এসে গেলাম দিওয়ান-ই-আমের পিছনে একটি বড় প্রাসাদে। এটির নাম খাসমহল বা দৌলতখানা। শিল্পকর্মে ভরে রয়েছে প্রাসাদটি। পর্যটকমাত্রই মুগ্ধ হয়ে যাওয়ার মতো শিল্পকলা। তবে এই প্রাসাদে পারসীয় শিল্পকে একেবারেই টেনে আনেননি আকবর। ভারতীয় শিল্পকলা ছড়িয়ে দিয়েছেন সারা প্রাসাদে। এই খাসমহলের তিনটি অংশ আছে—খোয়াব ঘর, বেগমের ঘর আর বালিকা বিদ্যালয়।

এখান থেকে এসে দাঁড়ালাম এমন একটি অট্টালিকায়—যেটি আকারে খুব বড় নয় কিন্তু শিল্পকর্মে এই সৌধটি বোধ হয় ফতেপুর সিক্রির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই অট্টালিকাতে কক্ষ আছে মাত্র একটি—বারান্দা রয়েছে এর চারদিকে। সম্পূর্ণ অট্টালিকাটি নির্মিত হয়েছে লাল বেলে পাথর দিয়ে। এই সৌধটির ভিতরে এবং বাইরে মনোরম কারুকার্যে ভরা। এমন এক ইঞ্চি জায়গা নেই—যেখানে পাথরে খোদিত কাজ নেই। চোখ জুড়িয়ে যায়। আকবরের সুরুচির প্রশংসা না করে উপায় নেই এই ছোট প্রাসাদে এসে দাঁড়ালে। শুধু ভালো বললে খুব খারাপ বলা হয়—এক কথায় অপূর্ব, অতুলনীয় এর শিল্পকলা নৈপুণ্য। বাদশা আকবর এটি নির্মাণ করেন তুর্কীয় বেগম ইস্তামবলী বেগমের জন্য। সুন্দর একটি স্নানাগার রয়েছে বেগমের এই কক্ষের সঙ্গে—একই সঙ্গে ব্যবস্থা রয়েছে ঠাণ্ডা আর গরম জলের। আজ আকবর আর দেহে নেই সত্য। কোন মানুষ চিরকাল দেহে থাকে না—এ কথাও অনন্তকালের সত্য। কিন্তু মানুষ যে যুগ যুগান্তর বেঁচে থাকে মানুষের মধ্যে—তার প্রমাণ আকবর নিজে। সাহেব ফার্গুসন ছিলেন শুধু ভারতীয় নয়, সারা পৃথিবীর শিল্পকলার সমালোচক। একসময় ফতেপুর সিক্রিতে এসে এই প্রাসাদটির শিল্পকলা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলেছিলেন, 'ভাষায় এটি অবর্ণনীয়। কোন খুঁত নেই এর শিল্পকলা ও কর্মে।'

গাইড ছাড়া ঐতিহাসিক জায়গাগুলি দেখে মোটেই মজা পাওয়া যায় না—একথা সর্বত্রই সত্য। ওরাই নিয়ম মাফিক ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেন যেখানে দেখার যা কিছু আছে। কোন পর্যটক বা ভ্রমণকারীর পক্ষেই জানা সম্ভব নয়—কোথায় কি আছে আর তার পশ্চাদপটই বা কি? সেইজন্যই তো সমস্ত বিষয়ে মানুষের জীবনে প্রয়োজন হয় পথপ্রদর্শকের। এবার গাইড আমাদের নিয়ে এলেন আকবরের শয়নকক্ষ বা খোয়াবঘরের কাছেই অবস্থিত দফতর খানায়। এটি নির্মিত হয় ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। আকবর সাম্রাজ্যের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল এবং সরকারী কাগজপত্র সযত্নে রক্ষিত হতো এখানে। এর ঠিক পিছনেই বিদ্বান ও গুণীজনদের সম্মানকারী বাদশা আকবর নির্মাণ করেন আরও একটি অট্টালিকা—যেটি আমার ভাষায় বলতে পারি 'অনুবাদ মহল।' এখানে সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করা হতো ফার্সী ভাষায়। মোগলীয় নাম এর মক্তবখানা।

দফ্তরখানা দেখে এসে দাঁড়ালাম একটি অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের সামনে—যেটি নির্মিত হয়েছিল ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। গাইড জানালেন, অত্যন্ত ধার্মিক এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন আকবর। এখানে তিনি নির্মাণ করেছিলেন ইবাদতখানা বা পূজাগৃহ। কালের নিয়মে এবং সংরক্ষণের অভাবে এটির এখন শেষ অবস্থা।
এখান থেকে গাইডের সঙ্গে এলাম পাঁচমহল বা হাওয়া মিনার। পাঁচতলা বিশিষ্ট এই সৌধটি নির্মিত হয়েছে হিন্দুস্থাপত্যের কারিগরী কৌশলে। একনজরে দূরে থেকে দেখলে অনেকটা নেপালের বৃদ্ধবিহারের মতো লাগে। এই মহলটির একেবারে নীচের তলায় স্তম্ভ আছে মোট ৮৪টি। পাঁচমহলের প্রতিটি তলা তার নীচের তলা থেকে ক্রমশ ছোট হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিকদের অনেকে ৮৪টি স্তম্ভের ব্যাপারে এই মত পোষণ করেছেন যে, এই মহলটি আকবর নির্মাণ করেছিলেন হিন্দু ধর্মমতকে প্রাধান্য দিয়ে। প্রতিটি তলাই সামিয়ানা দিয়ে আবৃত—যার উপরে রয়েছে কারুকার্যখচিত।
ফতেপুর সিক্রির বিশাল চত্বরের মধ্যেই দর্শনীয় জায়গাগুলি রয়েছে একের পর এক। একটি সৌধ থেকে অপর সৌধের দূরত্ব মোটেই বেশী নয়। টুকটুক করে এগিয়ে গেলাম। বেশ ভিড় হয়েছে এই ফতেপুর সিক্রিতে। এসেছে নানা প্রদেশের, নানা-দেশের মানুষ। কি সুন্দর বাহারী পোশাক অনেকের। তবে দেখছি, দলবদ্ধভাবে যারা ঘুরছেন—তাদের সকলের সঙ্গেই রয়েছে একজন করে গাইড। বিদেশী পর্যটকেরা গাইড ছাড়া কেউই নেই। আবার অনেক ভ্রমণকারীদের লক্ষ্য করলাম, গাইড ছাড়াই ঘুরছেন এখানে ওখানে।
এবার এলাম আকবরের হিন্দুপত্নী যোধবাঈ-এর প্রাসাদে। এটি অবস্থিত ঠিক মরিয়াম অট্টালিকার দক্ষিণ-পশ্চিমে। দোতলা এই প্রাসাদের প্রতিটি দেয়ালের পাথরে খোদাই করা রয়েছে নয়নাভিরাম কারুকার্য। এখানে ব্যবহৃত টালিগুলি আনা হয়েছিল মুলতান থেকে। এই প্রাসাদের উত্তরদিকে একটি স্থানকে আকবর ভোজনালয় হিসাবে ব্যবহার করতেন বলে অনেক ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। সূক্ষ্ম সুন্দর হাতের কাজ আর কাজ—সারাটা প্রাসাদ ভরে রয়েছে বিচিত্র কারুকার্যে। মোঘল আমলের এই সব পাথরগুলো যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে পর্যটকদের—কথা বলতে চায়—সৌন্দর্য ও শিল্পকথা। আজকের এই প্রাসাদটির 'যোধবাঈ প্রাসাদ' নামকরণ হয় জাহাঙ্গীরের বিবাহের পর থেকে।
যোধবাঈ প্রাসাদের পাশেই এবার এলাম হাওয়া মহলে। দোতলা এই অট্টালিকাটি নির্মিত হয়েছে দু-সারি থামের উপর। সুন্দর ও বিশাল এই অট্টালিকা-কক্ষের কাচের সার্সিগুলি সবই ছিদ্র করা—হাওয়া প্রবেশ করার জন্য। আকবরের একাধিক পত্নীদের মধ্যে একজন ছিলেন যোধপুরের রাজকুমারী। কথিত আছে, এই অট্টালিকাটি সম্রাট নির্মাণ করেছিলেন তাঁরই উদ্দেশ্যে। অবসর সময়ে আকবর এই মহলে বসে একটু বিশ্রাম নিতেন। এটি নির্মিত হয় পারস্য শহরে নির্মিত

অট্টালিকাগুলির অনুকরণে। হাওয়া মহলের দোতলা থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি দেখায় ছবির মতো সুন্দর।

ধীরে ধীরে নেমে এলাম হাওয়া মহলের দোতলা থেকে। এখান থেকে সোজা এলাম একেবারে যোধবাঈ প্রাসাদের উত্তর-পশ্চিম কোণে। এখানে রয়েছে প্রাসাদের মতো সুন্দর একটি অট্টালিকা। এটি নির্মাণ করেন আকবর বাদশার সভাসদ হাস্যরসিক বীরবল। তাঁর প্রিয় কন্যার উদ্দেশ্যে এই অট্টালিকাটি নির্মাণ করেছিলেন ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে। হিন্দু ও মুসলিম—উভয় শিল্পরীতির সংমিশ্রণেই এটি গড়ে তুলেছিলেন বীরবল—একটি বিশাল কংক্রিটের প্ল্যাটফরমের উপর। পর্যটক বা ভ্রমণকারীরা এই অট্টালিকা থেকে সহজেই দেখতে পান কারাবনসরাই, হিরণমিনার, হাতিপোল ইত্যাদি। একই সঙ্গে দেখা যায় ফতেপুর সিক্রির আরও বিস্তৃর্ণ এলাকা।

কথিত আছে, বীরবল নয়, সম্রাট আকবরই এই অট্টালিকাটি নির্মাণ করেন ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে—বিকানীরের রাজা কল্যাণ মলের কন্যার জন্য—পরে তিনি যাঁকে বিবাহ করেন।

এবার এলাম কবুতরখানা বা পায়রাঘরে। মোঘল আমলে একটি বিশেষ আনন্দদায়ক খেলা ছিল পায়রা ওড়ানো। আকবর নিজেও এই খেলা ভালোবাসতেন—অংশগ্রহণও করতেন। ফতেপুর সিক্রিতে তিনি একটি ঘর নির্মাণ করেছিলেন পায়রা প্রতিপালনের জন্য।

পায়রাঘর থেকে এলাম বাদশার অম্বর মহিষীর বাসগৃহ মরিয়ম গৃহে। মাঝারী আকারে মোঘলীয় এই সৌধটির শিল্পকলা-বিন্যাস দেখার মতো। উদারধর্মী বাদশা আকবরের ধর্মীয় উদারতার এক মহান নিদর্শন এই মরিয়ম গৃহ। এই গৃহের সারা বারান্দার দেয়ালে পাথরে খোদিত রয়েছে হিন্দু-দেবদেবীর মূর্তি। একই সঙ্গে খোদাই করা আছে বিখ্যাত কবি ফৈজীর কবিতা।

মরিয়মের গৃহ ছেড়ে এবার আমাদের গাইড নিয়ে এলেন হাতিপোলের সামনে। এই দ্বারটি উচ্চতায় ৪৯ মিটার। গাইড জানালেন, 'এক সময় এই দ্বারটির দু-পাশে দুটি পাথরের হাতি ছিল—যে দুটির উচ্চতা ছিল ১৩ ফুট করে। এখন হাতি দুটির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। ঘরের শোভাবর্ধনকারী হাতি দুটিকে ভেঙে ফেলা হয় সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে। কোন সেবাযত্ন, মাহুত এমনকি খেতে দেয়ারও কখনও প্রয়োজন ছিল না যে পাথরের হাতি দুটিকে—সে দুটি যে কেন ভাঙলেন ঔরঙ্গজেব—তার কারণ আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই হাতিপোল দিয়েই সার্কাস বা পোলো খেলার মাঠে যেতেন সম্রাট আকবর। তাই এই দ্বারটির আরও একটি নাম—সার্কাস দরওয়াজা।

হাতিপোলের ঠিক পিছনেই এলাম ফতেপুর সিক্রির প্রধান ও প্রাচীন নহবতখানায়। এটির নাম সঙ্গিন বুর্জ। বিভিন্ন ধরনের বাজনা বাজিয়ে এখান থেকেই জানানো

হতো আকবর বাদশার আগমন এবং প্রত্যাগমন সংবাদ। একই সঙ্গে সঙ্গিন বুর্জ থেকে ঘণ্টা বাজিয়ে জানিয়ে দেয়া হতো অতিবাহিত হয়ে যাওয়া সময়ের কথা। এই বুর্জের কাছেই রয়েছে একটি সংরক্ষিত জলাশয়—যেখানে সঞ্চিত জল মোঘল আমলে ব্যবহার করা হতো ফতেপুর সিক্রির জন্যে।

এখান থেকে গাইড দলবলসহ নিয়ে এলেন হাতিপোল এবং সঙ্গিন বুর্জের কাছে বীরবল যে বাড়ীতে থাকতেন তার উত্তরদিকের দেয়াল ঘেষা একটি মসজিদে। সম্রাট আকবর এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন ফতেপুর সিক্রির অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের উপাসনার জন্য। নাম এর নাগিনা মসজিদ। এই মসজিদের ছোট প্রবেশদ্বারটি রয়েছে দক্ষিণদিকে।

সঙ্গিন বুর্জের কাছে রয়েছে আকবর বাদশার আস্তাবল—যেখানে উট এবং ঘোড়া রাখা হতো। গাইড বললেন, আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ থেকে জানা গেছে আবুল-ফজলের কথায়—'বাদশার আস্তাবলে ঘোড়া ছিল ১২ হাজার।' এবার আস্তাবলের ক্ষেত্রটি দেখিয়ে বললেন, ঐতিহাসিকরা হিসাব করে দেখেছেন, এই আস্তাবলে খুব বেশী হলে ঘোড়া রাখা যেতে পারে মোট ১১০টি।

এখান থেকে একেবারে সোজা সকলে এসে দাঁড়ালাম ফতেপুর সিক্রির বিখ্যাত স্তম্ভ হিরণ মিনারের সামনে। উচ্চতায় এই মিনারটি ৮০ ফুট। অপূর্ব সুন্দর এর গঠনশৈলী। পাথরে নির্মিত এই মিনারের নীচের অংশটি আটকোণা। মাঝের অংশটি গোলাকার এবং তারপর থেকে ক্রমশ ছোট হয়ে একেবারে শেষের অংশটি গম্বুজের আকারে নির্মিত হয়েছে। এই মিনারের বাইরের দেয়ালে খোদাই করা আছে হাতির মূর্তি। ভিতরে রয়েছে ঘোরানো সিঁড়ি—যেটি একেবারে শেষ হয়েছে স্তম্ভের চূড়ায় গিয়ে।

এবার জনশ্রুতির কথা। আকবর বাদশার অত্যন্ত প্রিয় একটি হাতি ছিল। নাম হিরণ। হিরণের মৃত্যুর পর আকবর স্মৃতিরক্ষার্থে তারই কবরের উপর নির্মাণ করেন এই বিশাল মিনারটি। আবার অনেকে বলেন কথাটি ঠিক নয়। এটি নির্মাণ করেছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। তবে নির্মাণ যিনিই করে থাকুন না কেন—এই মিনার এবং আকবর বাদশার একটি হাতির উপর প্রীতি ও ভালোবাসার যে জনশ্রুতি তা আজও পর্যটকদের মনকে নাড়া দিয়ে যায় এখানে এসে দাঁড়ালে।

ফতেপুর সিক্রির অতীত ইতিহাসের সৌধগুলি ঘুরে ঘুরে দেখতে অনেকটা সময় লাগে—যদিও এগুলি সব রয়েছে পাশাপাশি। ফাঁকি মেরে দেখলে তাড়াতাড়িই হয়ে যাবে। তন্ন তন্ন করে দেখে এবং তার অতীত ইতিহাস জানতে গেলে সময় তো লাগবেই। আমার তাড়াহুড়ো নেই ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম।

গাইড এবার আমার মতো আর সব বাসযাত্রীদের দলবন্ধ-ভাবে এনে দাঁড় করালেন ফতেপুর সিক্রির সবচেয়ে বড় যে অট্টালিকা—সেটির সামনে। এটির নাম জামা মসজিদ। ভারতের সমস্ত শহরে এই নামের মসজিদ আছে একটি করে। গাইড

বললেন, যে কোন শহরে মসজিদ থাকতে পারে অসংখ্য এবং তাতে কিছু যায় আসে না। তবে মুসলিম ধর্মের নিয়মানুয়ায়ী শহরের সবচেয়ে বড় মসজিদের নাম সব সময়েই দেয়া হয় জামা মসজিদ। মোঘল আমলে এই শহরে এই মসজিদটি সবচেয়ে বড় ছিল বলে এর নাম জামা মসজিদ।

গাইডের কথা শেষ হতেই মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম গাইডকে। এই বিষয়টা আমার জানা ছিল না এতদিন। আজ জানতে পারলাম। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম মসজিদটি। এত বড়, এত বিশাল আয়তনের মসজিদ ভারতে আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। সুন্দর কারুকার্যখচিত এই মসজিদটি তাকিয়ে দেখার মতো। সম্রাট আকবর এটি নির্মাণ করেন ১৫৭১-৭২ খ্রীষ্টাব্দে। তৎকালীন এই মসজিদ নির্মাণে ব্যয় হয় প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা। এই মসজিদের ভিতরে রয়েছে উন্মুক্ত একটি মহল। এই মহলটি সকলের সমবেত হয়ে নমাজ পড়ার জন্য। মক্কার মসজিদের আদলে নির্মিত এবং কারুকার্যখচিত হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকে এই মত পোষণ করেছেন বলে জানালেন গাইড—দিল্লীর জামা মসজিদের তুলনায় ফতেপুর সিক্রির জামা মসজিদের কলা ও শৈলী অনেকটা নিম্নমানের।

মসজিদের বড় একটা দরজা দেখিয়ে গাইড বললেন, এই দরজাটির নাম রাজফটক। সম্রাট আকবর মসজিদে প্রবেশ করতেন এই দরজা দিয়ে। এখন প্রবেশ করছে পর্যটক। এছাড়াও এখানে আছে আরও একটি প্রবেশ দ্বার—নাম বিজয়ফটক ওরফে বুলন্দ দরওয়াজা।

জামা মসজিদে দেখার মতো তেমন আর কিছু নেই শুধুমাত্র অবাক করে দেয়ার মতো বিশালায়তন ইমারত ছাড়া। এবার এখান থেকে একটু হেঁটেই এসে দাঁড়ালাম আকবরের গুরু বলে কথিত সেখ সেলিম চিস্তির সমাধিক্ষেত্রের বারান্দায়। লাল পাথরে নির্মিত ফতেপুর সিক্রির মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম এই সমাধিক্ষেত্র—যেটি আকবর নির্মাণ করেন ধবধবে সাদা পাথর দিয়ে। চিস্তির সমাধিসৌধের পাথরের দেয়ালগুলিতে জালির কাজ করা। আকবর বা তাঁর আগের মোঘলদের তৈরী সব স্থাপত্য কীর্তিগুলিই লাল পাথরের। মোঘল স্থাপত্যে সাদা মার্বেল প্রথম স্থান পেল এই সেলিম চিস্তির মাজারে। এখানকার আশ্চর্য জাফরির কাজ আকবর শুরু করলেও শেষ হয় তাঁর নাতি শাজাহানের আমলে। সেলিম চিস্তির জন্ম হয় ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন পারস্যের পাঠান সেখ ফরিদ সাকারগঞ্জের উত্তরসূরী। সেলিম চিস্তির সমাধি স্থাপত্য কীর্তিটি মোঘল যুগের প্রথম দিকের এক উল্লেখযোগ্য অবিস্মরণীয় অবদান। এই সমাধিক্ষেত্রের প্রবেশদ্বারে লেখা আছে, সেলিম চিস্তি দেহরক্ষা করেন ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে। এই সমাধিসৌধ নির্মাণের কোন সাল তারিখ জানা যায়নি। তবে ঐতিহাসিকদের ধারণা যে, সম্রাট এটি নির্মাণ করেন চিস্তি সাহেবের মৃত্যুর পর কয়েক বছরের মধ্যে। সেলিম চিস্তির শেষ ইচ্ছানুযায়ী

তাঁকে সমাহিত করা হয় ফতেপুর সিক্রিতে।

সমস্ত ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের অবাধ প্রবেশ এই সমাধিক্ষেত্রে। তবে প্রবেশের সময় মুসলমান ধর্মের নিয়ম ও আচার অনুসারে মাথায় রুমাল বেঁধে ঢুকতে হয় ভিতরে। ধীরে ধীরে ভিতরে ঢুকলাম মাথায় রুমাল বেঁধে। পাথরের বাঁধানো সমাধিবেদির উপর বিছানো রয়েছে মূল্যবান চাদর। তার উপরে ছড়ানো রয়েছে অসংখ্য গোলাপ। আতর আর ধূপের গন্ধে ভরপুর হয়ে রয়েছে সমাধিক্ষেত্রটি। সমাধিবেদির ডানপাশ দিয়ে বৃত্তাকারে মন্দির পরিক্রমা করার মতো বাঁ-দিক বেরিয়ে এলাম বাইরে। কথিত আছে, এই সমাধিক্ষেত্রে কেউ কোন মানসিক করলে সেলিম চিস্তির দোয়ায় তা পূরণ হয়।

সেলিম চিস্তির সমাধিক্ষেত্র ছেড়ে এবার এলাম কাছেই জানানা রোজা বা মহিলা সমাধিক্ষেত্রে। আকবরের আমলে রাজপরিবার বা অন্তঃপুরের কোন মহিলার মৃত্যু হলে তাকে সমাহিত করা হতো এখানে।

চিস্তি সাহেবের সমাধির ঠিক বিপরীত দিকে একটু দূরেই এলাম জামাতখানায়। অনেকগুলি সমাধিবেদি রয়েছে পর পর সারি দিয়ে। জাহাঙ্গীরের স্মৃতিকথা থেকে জানা গেছে, এগুলি সেলিম চিস্তির নিকট আত্মীয়ের সমাধি। আর জামাতখানায় সমাধিটি হলো চিস্তি সাহেবের পুত্র ইসলাম খানের।

এবার এলাম জামা মসজিদের দক্ষিণে—বিশাল একটি দরজা পেরিয়ে খানিকটা চত্বর। এরপর ধাপে ধাপে নেমে গেছে অসংখ্য সিঁড়ি। বেশ কিছু সিঁড়ি ভেঙে নেমে, ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘাড়টা উঁচু করে যে স্মৃতিস্তম্ভটি দেখলাম, সেটি হলো আকবর বাদশার অভূতপূর্ব কীর্তি এবং ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে উঁচু—বুলন্দ্ দরওয়াজা। উচ্চতায় এটি ১৭৬ ফুট। ফতেপুর সিক্রির অনন্য আকর্ষণ এই বিশাল দ্বারটি আকবর নির্মাণ করেছিলেন ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে—দাক্ষিণাত্যের খান্দেশ আর আহমদনগর বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে। এটি জয়ের স্মৃতি তাই নাম এর বুলন্দ্ দরওয়াজা বা বিজয় ফটক। মোঘল আমলের শিল্পীরা শুধুমাত্র মার্বেল আর লাল পাথরেই গড়ে তুলেছিলেন এই বিশাল স্মৃতিস্তম্ভটি—যার দিকে তাকালে পর্যটক মাত্রেরই বিস্ময়ে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই।

এবার দেখে নিলাম বুলন্দ্ দরওয়াজার কাছাকাছি নবাব ইসলাম খান নির্মিত হামাম, আকবরের রাজসভার অন্যতম সভাসদ এবং ঐতিহাসিক আবুল ফজল আর সভাকবি ফৈজীর বাসগৃহ। এছাড়া তত বেশী আকর্ষণীয় না হলেও রয়েছে নব ইসলাম খানের চক এবং শেখ ইব্রাহিমের মসজিদ।

আকবর বাদশার অমর কীর্তি ফতেপুর সিক্রি দেখা শেষ হলো। অনেকটা সময় কেটে গেল এখানে। যাত্রীরা আবার সমবেত হয়ে একে একে এসে বসলেন বাসে—যে যার জায়গায়। কনডাকটেড ট্যুরে বাস ছাড়লো ফতেপুর সিক্রি থেকে। চওড়া রাস্তা ধরে চললো হৈ-হৈ করে।

বাস এসে থামলো যমুনার অপর পারে সিকান্দ্রায়—যেখানে চিরতরে সমাহিত রয়েছেন মোঘল বাদশাহ আকবর। তাজমহলকে ভিত্তি করে সিকান্দ্রার দূরত্ব মাত্র ১০ কি. মি.।

একে একে বাস থেকে নেমে এলাম সকলে। সামনেই লাল পাথরে নির্মিত প্রবেশ-তোরণ দক্ষিণমুখী। তারপর অনেকটা জায়গা জুড়ে সুন্দর সাজানো বাগান—তারই মধ্যে দিয়ে বাঁধানো সুন্দর রাস্তা। বাগান পেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম পাঁচতলা সৌধের একেবারে সামনে—যেখানে আকবরের মরদেহের সমাধির উপর গড়ে উঠেছে এই সৌধ—যার উচ্চতা ৭৪ ফুট। এর চারকোণে রয়েছে ধবধবে সাদা পাথরের ৯৩টি ধাপওয়ালা সুন্দর সুউচ্চ চারটি মিনার। এই স্মৃতিসৌধের এলাকাটি ঘেরা রয়েছে ২৫ ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে তবে এর চারদিকে রয়েছে চারটি প্রবেশদ্বার। তার মধ্যে দক্ষিণের দ্বারটিই মূল প্রবেশদ্বার। পাঁচতলা সৌধ কিন্তু প্রত্যেকটি তলা ক্রমশ ছোট হয়ে এসেছে আকারে। নির্মাণশৈলীর গুণে এখানেই বেড়ে গেছে মোঘল স্থাপত্যের আকর্ষণ। এসব কথা ঠিক লিখে বোঝানো যায় না—চোখে না দেখলে।

ধীরে ধীরে ঢুকে পড়লাম ভিতরে। বিশাল চত্বর। মূল সমাধিটি স্থাপিত রয়েছে ৩০ ফুট উঁচু বেদির উপরে। এই স্মৃতিসৌধের প্রতিটি তলায় রয়েছে শ্বেত পাথরে নির্মিত বারান্দা। তবে মাঝের তিনটি তলার পাথরগুলি লাল পাথরের। সমাধি সৌধের প্রধান ফটকটি তৈরী চন্দন কাঠ দিয়ে। একসময় উপরের ছাদ ছিল রুপোর চাদরে মোড়া এবং সেটি ছিল সুন্দর সোনার কাজে ভরা। এখন আর নেই। সবই গেছে নষ্ট হয়ে—১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহে এবং জাঠদের আক্রমণের ফলে।

সিকান্দার লোদি ছিলেন সুলতানি বংশের সর্বশেষ সুলতান। একদা তিনিই পত্তন করেন এই শহর—নিজের নামানুসারেই নাম রাখেন সিকান্দ্রাবাদ। মৃত্যুর পর নিজের সমাধির জন্য জীবিতকালেই স্বয়ং আকবর সিকান্দ্রা স্মৃতিসৌধের নির্মাণ কাজ শুরু করলেও শেষ করে যেতে পারেননি। দিল্লী-আগ্রা রোডের এই সমাধিসৌধটি সম্পূর্ণ করেন পুত্র জাহাঙ্গীর। হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যরীতির সমন্বয়ে এই সমাধিসৌধের মিনার নির্মিত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। অভূতপূর্ব ও চিত্তাকর্ষক সিকান্দ্রার প্রবেশদ্বারটি নির্মাণ করেন জাহাঙ্গীরই।

আকবরের চারকোণা এই সমাধিসৌধটি উচ্চতায় ১০০ ফুট। চারটি তলায় অট্টালিকাটি বিভক্ত। এর প্রথম তিনটি তলা নির্মিত হয়েছে লাল বেলে পাথর দিয়ে। শেষ তলাটি সাদা মার্বেল পাথরের। ঐতিহাসিকেরা বলেন, ফতেপুর সিক্রির পাঁচ মহলের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য আছে সেকেন্দ্রার এই স্মৃতিসৌধের।

আকবরের সমাধি সৌধটির চারপাশ উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। লাল পাথরের প্রবেশদ্বার

থেকে সৌধ পর্যন্ত চওড়া বাঁধানো রাস্তা। দু-পাশে সুন্দর সাজানো বাগান। ১৫০ একর জমি নিয়েই বাগান এবং সমাধিসৌধ। চারটি বিশাল প্রবেশদ্বার রয়েছে সিকান্দ্রায়। গাইড বললেন, 'মোঘল আমলের স্থাপত্যকলার একটা বিষয় বা বৈশিষ্ট্য অনেকেই লক্ষ্য করে না। যেটি হলো, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চারটি চূড়া দেখা যায় না কোথাও—যার ব্যতিক্রম হয়নি আকবরের সমাধিসৌধ এই সিকান্দ্রায়।'
আকবরের সমাধিসৌধ দেখে আবার এসে বসলাম বাসে। যথারীতি বাস ছাড়লো। পথে কোথাও থামলো না। একটানা মিনিট পনেরো চলে বাস এসে থামলো স্বামীবাগ বা দয়ালবাগে। সিকান্দ্রা থেকে দূরত্ব এর মাত্র ১০ কি. মি.। বাস থেকে নেমে এলাম সকলে।
প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকলাম ভিতরে। চারদিক প্রাচীরে ঘেরা। ভিতরে রয়েছে অসমাপ্ত একটি শ্বেত পাথরের মন্দির। এর অলঙ্করণই একমাত্র আকর্ষণ। দেয়ালে সাদা পাথরে খোদাই করা আছে কোথাও ফল, কোথাও ফুল, কোথাও বা বৃক্ষলতা। বহু বছর ধরে চলছে এর নির্মাণ কাজ। কবে শেষ হবে—কেউই তা জানে না। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী শিবদয়াল সৃষ্টি করেছিলেন রাধাস্বামী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের পরিচালনায় নির্মিত হচ্ছে অসামান্য শৈল্পিক কুশলতায় তাঁরই স্মৃতি-মন্দির। এখনও পর্যন্ত যে অংশটুকু শেষ হয়েছে—সেটুকু ভাস্কর্যের এক অনবদ্য নিদর্শন।
দয়ালবাগের এই মন্দিরটি দেখতে বেশী সময় লাগে না। সকলে এসে বসলাম বাসে। আবার শুরু হলো চলা। সামান্য সময়ের মধ্যে এলাম রামবাগে। তাজমহল দেখে সরাসরি এলে রামবাগের দূরত্ব ১০ কি. মি.। ইতমদ্-উদ-দৌলার কবরের কাছেই।
বর্তমানের রামবাগ বা আরামবাগ তথা বিশ্রাম উদ্যানের আসল নাম ছিল বাগ-ই-আফগান। অপূর্ব সুন্দর সাজানো উদ্যান। উদ্যান-মধ্যে স্থাপিত রয়েছে একটি বিরাট অট্টালিকা। মোঘলদের তৈরী উচ্চমানের স্থাপত্য কীর্তিগুলির মধ্যে রামবাগের এই অট্টালিকাটি সর্বপ্রথম বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন, সম্রাট বাবর। এখন এই অট্টালিকাটির রয়েছে ধ্বংসাবশেষ। তবুও যেটুকু আজ রয়েছে—সেটুকু সুদূর অতীত ঐতিহ্যকে তুলে ধরার পক্ষে যথেষ্ট। বাবর এটি নির্মাণ করেছিলেন আফগানিস্থানের অন্তর্গত কাবুলের বিখ্যাত বাগ-ই-নূরআফসানার অনুকরণে। তবে অনেকের মতে বাবর নয়, সম্রাট জাহাঙ্গীর এটি নির্মাণ করেছিলেন প্রিয়তমা বেগম নূরজাহানের জন্যে।
রামবাগের আরামদায়ক পরিবেশ উপভোগ আর প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখতে সময় লাগলো সামান্য। সকাল থেকে একের পর এক মোঘল কীর্তি দেখতে দেখতে এখন বেলা বেশ বেড়ে গেছে। বাস ছাড়লো রামবাগ থেকে। সোজা চলে

এলো রামবাগ আর ইতমদ্-উদ-দৌলার মাঝামাঝি একটি সমাধিক্ষেত্রে—চিনি কা রওয়াজা। সিরাজের বিখ্যাত কবি আফজল খানের সমাধিসৌধ। ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যোগদান করেছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজসভায়। পরবর্তীকালে নিজের যোগ্যতা-বলে প্রধান মন্ত্রীত্বের পদমর্যাদা লাভ করেন সম্রাট শাজাহানের শাসনকালে।

এখানে রয়েছে সুন্দর মোজায়েক করা কবির সমাধি অট্টালিকা—যেটি সুন্দর শিল্প-নৈপুণ্যে ভরপুর। কবি আফজল খান ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কাবুলে দেহরক্ষা করলেও তাঁর মরদেহ এই আগ্রা শহরের এখানেই এনে সমাহিত করা হয়।

চিনি কা রওয়াজা ছেড়ে বাস এলো দয়ালবাগ আর তাজ-এর মাঝামাঝি একটি শান্ত নির্জন শান্ত পরিবেশে—যেটি ভারতের প্রথম খ্রীষ্টান সমাধিক্ষেত্র—যার বয়স আনুমানিক তিনশো বছর। আমাদের বাস রাস্তার উপরে দাঁড়ালো। যাত্রীরা কেউই নামলেন না। দূর থেকে এই ইউরোপীয় সমাধিক্ষেত্র দেখলাম সকলে। মিনিট তিনেক দাঁড়িয়ে বাস আবার চলতে শুরু করলো। ফিরে এলো স্টেশনের কাছাকাছি একটা হোটেলে। এখন ভরা দুপুর। বাসের গাইড বললেন, 'আপনারা সকলে নেমে আসুন, এখন একঘণ্টা বিশ্রাম। চলুন, সকলে দুপুরের খাওয়াটা সেরে আসি। তারপর আমাদের আবার শুরু হবে চলা।'

আকবর বাদশার আর এক কীর্তি আগ্রা ফোর্ট

দুপুরের খাওয়া সারলাম হোটেলে। গড়ে প্রায় আধঘণ্টা সময় কেটে গেল। যাত্রীরা আবার সকলে এসে বসলেন বাসে। শুরু হলো চলা। অল্প সময়ের মধ্যেই বাস এসে দাঁড়ালো আগ্রা ফোর্টের সামনে। এখান থেকে আগ্রা ফোর্ট স্টেশন একেবারেই কাছে।

সমগ্র আগ্রায় তাজমহলই প্রথম আকর্ষণ—তার পরের আকর্ষণ হলো এই আগ্রা ফোর্ট বা দুর্গ। হাঁটতে হাঁটতে এগোলাম। পথের দু-ধারে মুখরোচক খাবার আর রকমারি জিনিষের অস্থায়ী দোকান। দুর্গে ঢোকার মুখে টিকিট কেটে গাইড ঠিক করে নিলাম। তিনি বলতে বলতে চললেন,

—বিশাল এই দুর্গটি নির্মাণ করেন সম্রাট আকবর—১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই কেল্লার কাজ তিনি প্রথম শুরু করলেও পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরসূরীদের হাতের স্পর্শে এই দুর্গের গৌরব আরও অনেকে বেড়েছে। দুর্গের ভিতরে তাঁর বংশধরেরা বেশ কয়েকটি অট্টালিকা এবং প্রাসাদও গড়েছিলেন। তাই সম্রাট আকবর থেকে শুরু করে ঔরঙ্গজেব—মোঘল আমলের প্রত্যেকেরই প্রাসাদ দেখা যায় এখানে।

আকবরই প্রথম বাদশা—যিনি প্রথম আগ্রাকে তাঁর রাজধানী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত এবং ঘোষণা করেন। পরে নামকরণও করা হয়েছিল—আকবরাবাদ।

এরপর বাদশা এলেন তৎকালীন বিখ্যাত ফকির সেলিম চিস্তির সান্নিধ্যে। রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন ফতেপুর সিক্রিতে। টানা দশ বছর রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করলেন ফতেপুর সিক্রি থেকে। ওখানে ক্রমশ দেখা দিল পানীয় জলের অভাব। কথিত আছে, এই সময় নাকি ফকির সেলিম চিস্তি আকবরকে বলেছিলেন, বাদশা এবং ফকিরের বাস আর ঠিকানা কখনও এক জায়গায় হতে পারে না। আকবর আবার রাজধানী ফিরিয়ে আনলেন আগ্রায়। মোঘল সাম্রাজ্য বিশাল—তারই রাজধানীর রূপ দিলেন আগ্রায় এই বিশালায়তন কেল্লা বা দুর্গ গড়ে। তৎকালীন রাজনীতি এবং জীবনযাপন প্রণালীর অনেক ছাপই বাদশা পরম্পরা রেখে গেছেন দুর্গের মধ্যে—অভাবনীয় গঠনশৈলীতে।

গাইড কিছুটা এগিয়ে গিয়ে থামলেন। প্রধান ফটকের দিকে মুখ করে বললেন,

—ইতিহাসের কথা অনেক। ওসব পড়ে নেবেন ইতিহাসে। আমি আপনাদের বলবো এই ফোর্ট সম্পর্কে সামান্য কিছু কথা—যেটুকু জানা আপনাদের প্রয়োজন। যমুনার উপত্যকা বলে তৎকালীন এই জায়গাটি ছিল যোগাযোগের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। তাই রাজপুতেরা এসে আগ্রাতে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। নাম দেন বাদলগড় কেল্লা। জাহাঙ্গীর তাঁর 'তুজাকি জাহাঙ্গীরী' (**Tuzaki Jahangiri By Rogers**) নামক আত্মজীবনীতে লিখেছেন, পিতা আকবর এখানে একটি দুর্গ ভেঙে নির্মাণ করেছিলেন এই কেল্লা। আবার অনেক ঐতিহাসিক ভিন্ন মত পোষণ করেছেন এ-ব্যাপারে। তাঁরা বলেন, ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে একবার মারাত্মক ভূমিকম্প হয়। তাতে সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় বাদলগড় কেল্লা। পরবর্তীকালে আকবর এখানেই নির্মাণ করেছিলেন এই দুর্গ।

গাইড একটু থামলেন। আমরা যাত্রী যারা—তারা সকলেই গাইডকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি বললেন,

—বিশাল এই দুর্গটি নির্মাণ করতে সময় লেগেছিল আট বছর। নির্মাণ কার্য শেষ হয় ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। সম্রাট আকবর এই দুর্গ নির্মাণের সমস্ত দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁর প্রধান সেনাপতি মহম্মদ কাশিম খানকে—যিনি সুন্দরভাবে পালন করেছিলেন তাঁর দায়িত্ব। মোঘল আমলেই এই দুর্গ নির্মাণে ব্যয় হয় প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা।

কখন হিন্দি আবার কখনও ইংরাজীতে গাইড আমাদের বুঝিয়ে বলছেন আগ্রা আর এই দুর্গের অতীত ইতিহাসের কথা। এবার বললেন,

—এই দুর্গটি ত্রিকোণাকৃতি। এক সময় উত্তাল যমুনা এই কেল্লার গা ঘেঁষেই বয়ে যেতো। এখন যমুনা বুড়ি হয়ে দেহে শুকিয়ে গেছে—দেয়াল থেকে সরে গেছে অনেকটা। যমুনা বুড়ি হলেও তাঁর নাম-গৌরব আজও হারিয়ে যায়নি। প্রায় দেড়মাইল জায়গা জুড়ে এই কেল্লা। লাল পাথরে নির্মিত। বাইরেই বিশাল উঁচু

প্রাচীর—যার উচ্চতা ৭০ ফুট। কেল্লার একদিকে যমুনা আর তিনদিকে রয়েছে পরিখা—যেখান দিয়ে একসময় বয়ে যেতো স্রোতবতী যমুনার জল। ৪০ ফুট গভীর পরিখা। শত্রুদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যেই এই ব্যবস্থা। চট্ করে অতিক্রম করা সহজসাধ্য নয়। পরিখার পাশের উঁচু দেয়ালগুলিতে রয়েছে অজস্র ছিদ্র—যেগুলি শত্রুর উদ্দেশ্যে গুলি ছোঁড়ার জন্য।

এই পর্যন্ত বলে গাইড থামলেন। এবার আঙুল দিয়ে আমাদের পিছনের দ্বারটি দেখিয়ে তিনি যে কথাগুলি বললেন—সেটা বলি আমার ভাষায়। আগে এই কেল্লায় প্রবেশদ্বার ছিল মোট চারটি। আজও আছে। যেমন, অমর সিং গেট, দিল্লী গেট, ওয়াটার গেট আর জাল বা দর্শনী দরওয়াজা। এখন দর্শকদের জন্য খোলা থাকে শুধুমাত্র অমর সিং গেট। যেটি দিয়ে প্রবেশ করেছি কেল্লায়—যার ঠিক পিছনেই রয়েছে কেল্লার প্রধান অট্টালিকা।

অমর সিং গেটের নামকরণের পিছনে রয়েছে একটি সুন্দর কাহিনী। ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রা দুর্গ থেকে রাজপুত বীর অমর সিং রাঠোর সম্রাট শাজাহানের দরবারের কোষাধ্যক্ষ সালাবাত খাঁনকে হত্যা করে পালানোর সময় এখানকার সুউচ্চ প্রাচীর থেকে ঝাঁপ দেন ঘোড়া সমেত। যেটা কল্পনাও করা যায় না কখনও। এটা সম্ভব হয়েছিল তাঁর ঘোড়ার অসামান্য দক্ষতা নৈপুণ্য আর প্রভুর প্রতি অসাধারণ ভক্তির জন্য। দুটো পরিখা লাফিয়ে পার হয়ে মোঘল শত্রুর নজরের বাইরে চলে যায় ঘোড়া। তারপর এখান থেকে সিকান্দ্রায় গিয়ে ঘোড়াটি মারা যায়। এমন ঘটনার জন্য সেখানেও রয়েছে একটি স্মারক। লাল পাথরে নির্মিত হয়েছে অমর সিং-এর ঘোড়ার প্রতিমূর্তি। ঘোড়ার এই দুঃসাহসিকতার জন্য অমর সিং আগ্রা ফোর্টের দ্বারে রইলেন নামে অমর হয়ে।

এই দ্বারের পাশেই রয়েছে একটি পাথরের ঘোড়া—যার পাশে রয়েছে পরিখা। অমর সিং-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যেই একসময় এটি নির্মাণ করা হয়। এই ফটকের শিল্পকার্যের সঙ্গে শাজাহানের আমলের শিল্পকলার সঙ্গে অনেক মিল খুঁজে পেয়েছেন ঐতিহাসিকেরা। তাই তাঁদের অনেকের ধারণা, এটি নির্মিত হয় শাজাহানের আমলে। আবার কেউ কেউ বলেন, অমর সিং গেটটি নির্মাণ করেন সম্রাট আকবরই। এই গেটের পিছনে বর্তমানে রয়েছে সামরিক ছাউনি—যেখানে জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

আগ্রা দুর্গ যেমন সুরক্ষিত তেমনই মোঘল আমলের ঐশ্বর্যের পরিচায়ক। দিল্লী গেটের দুপাশে রয়েছে আট কোণা বিশিষ্ট মিনার। মোঘল আমলে এর সবচেয়ে উপরের তলায় ছিল নহবতখানা। সম্রাট যখন আসতেন এবং চলে যেতেন, তখন রাজকীয় বাজনা বাজানো হতো এই নহবতখানা থেকে। এই দ্বারের দুপাশে রয়েছে দুটি পাথরের হাতি—যার উপরে বসানো ছিল দুজন রাজপুত যোদ্ধার মূর্তি। জয়মল এবং ফাত্তা—যাঁদের নাম রাজস্থানের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে

আছে। অনেকে এই দ্বারটির নামকরণ করেন—হাতি দ্বার। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মূর্তি দুটি নষ্ট করে দেন ঔরঙ্গজেব।

মোঘল আমলে সম্রাট আকবর যে দ্বারে প্রতিদিন এসে দাঁড়িয়ে উদীয়মান সূর্যকে প্রণাম করতেন—অভিবাদন গ্রহণ করতেন প্রজাদের—আগ্রা দুর্গে সেটি দর্শনী দরওয়াজা নামে প্রসিদ্ধ। এই দ্বার দিয়েই বাদশা এবং তাঁর পরিবারের মহিষী আর অন্যান্য মহিলারা দেখতেন হাতি এবং অন্যান্য বন্য জন্তুদের লড়াই।

অমর সিং গেট পেরিয়ে একটু এগোতেই প্রথমে পড়লো ২৫০×৩০০ ফুট আকারের সুন্দর কারুকার্য খচিত জাহাঙ্গীর মহল। লাল পাথরে নির্মিত এই মহলটি দোতলা। মহলের ছাদ উজ্জ্বল সোনা রঙে রাঙানো এবং কাজগুলি জয়পুরিয়া শিল্পকলার অনুকরণে। একসময় আকবর তাঁর হিন্দুপত্নী যোধবাঈ-এর জন্য এখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। সেই প্রাসাদেরই একটা অংশ ভেঙে জাহাঙ্গীর মহলটি নির্মাণ করেন সম্রাট জাহাঙ্গীর—যার দেয়ালে রয়েছে সুন্দর পাতা, ফুল আর পাখীর কারুকার্য।

বিশাল এই প্রাসাদের পূর্ব অংশ যোধবাঈ ব্যবহার করতেন পাঠাগার হিসাবে। পশ্চিমদিক মন্দির, উত্তরদিক পরামর্শ করার জন্য আর দক্ষিণ দিকটি ব্যবহার করতেন বৈঠকখানা হিসেবে।

জাহাঙ্গীর মহলের বাইরে আসতেই সামনে পড়লো ২৫ ফুট লম্বা এবং উচ্চতায় ৫ ফুট একটি জলাধার। কথিত আছে, মহাভারতীয় যুগে নাকি ভীম এতে ভাঙ তৈরী করতেন। এটির দুপাশে রয়েছে ধাপে ধাপে সিঁড়ি। এই জলাধারটি ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে সারিয়ে ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর এবং ওই বছরেই বিবাহ করে পত্নী নুরজাহানকে উপহার হিসাবে দেন। কথিত আছে, গোলাপের আতর আবিষ্কার করেন নুরজাহানের মা। সেই পদ্ধতিটি শিখেছিলেন নুরজাহান। এই জলাধারে গোলাপ ফুল দিয়ে তিনি আতর তৈরী করতেন। একটা অদ্ভুত ব্যাপার, যার কোন কারণ জানা যায়নি—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এক পাথরে নির্মিত এই জলাধারটিকে নিয়ে রাখা হয়েছিল আগ্রা ক্যান্টনমেন্টের বাগানে। তারপর এটি আবার নিয়ে এসে রাখা হয় কেল্লার দিওয়ান-ই-আমের কাছে। তারপর আবার জলাধারটি তুলে এনে রাখা হয় এই জাহাঙ্গীর মহলের সামনে।

এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম জাহাঙ্গীর মহলের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। এসে দাঁড়ালাম আকবরী মহলে। ভাবতেই অবাক লাগে, এক সময় সম্রাট আকবর যেখানে বাস করতেন, অনুমতি ছাড়া তাঁর দাসীবাঁদী এমনকি একটা পোকা-মাকড়ের যেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না—সেখানে আজ আমরা এসেছি, দেখছি সামান্য প্রবেশ মূল্যের বিনিময়ে। সুন্দর এই মহলটি বাদশা আকবর ব্যবহার করতেন হারেম হিসাবে। আকবরের এই প্রাসাদ তিনটি কক্ষ বিশিষ্ট। এক-একটি কক্ষের নাম সপ্তাহের বার অনুসারে। ওই দিনগুলিতে আকবর ওই কক্ষে যেতেন।

এটি তিনি নির্মাণ করেন অন্তঃপুরের মহিলাদের জন্য। এই প্রাসাদের পাশেই নির্মাণ করেন আরও একটি মহল—বিদেশী মহিলা অতিথিদের জন্য—যেটি বাঙালী মহল নামে এই দুর্গে পরিচিত।

এই আকবরী মহলের কাছেই রয়েছে একটি ১০ ফুট চওড়া এবং ১০৫ ফুট গভীর একটি কূপ। মোঘল আমল থেকে এটির নাম আজও বাওলী। গরমকালে এই কূপের জল ব্যবহার করতেন সম্রাট এবং রাজপরিবারের মহিলারা—সেই উদ্দেশ্যেই এটি নির্মিত হয়। অনেকের মতে, এই কূপটি নির্মাণ করেন বাবর। আবার অনেকে বলেন, বাবর নয় আকবর।

এবার গাইডের সঙ্গে এলাম জাহাঙ্গীর মহলের ঠিক উত্তরদিকে, সামান্য একটু হেঁটে—শাজাহানী মহলে। অপূর্ব সুন্দর ফুলের কারুকার্য খোদিত রয়েছে এই প্রাসাদের দেয়াল আর ছাদে। স্বয়ং শাজাহানই এই প্রাসাদের নির্মাণকর্তা। এই মহলের ঠিক মাঝখানের কক্ষটিই শাজাহানের শোবার ঘর। এছাড়া গরমকালের উত্তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে যমুনার দিকে সুন্দর একটি মহল নির্মাণ করেছিলেন—যেখানে সব সময়েই হাওয়া খেলে বেড়াবে—মহলটির নাম হাওয়া মহল। এটির কারুকার্য ও আকর্ষণও কিন্তু কম নয়।

এক প্রাসাদ থেকে আর এক প্রাসাদ—প্রত্যেকটিই প্রায় গায়ে গায়ে—পাশাপাশি। এ-মহল থেকে সে মহল—এই ভাবেই ঘুরে ঘুরে দেখছি। সারা বছরই আগ্রা পর্যটকের আকর্ষণ, তাই আগ্রা ফোর্টে দেশীবিদেশী পর্যটক আর ভ্রমণকারীতে ভরে রয়েছে। এবার পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালাম সম্রাট শাজাহান নির্মিত খাসমহলে। আগে এখানে আকবরের তৈরী একটি অট্টালিকা ছিল। পরবর্তীকালে শাজাহান সেটি ভেঙে নির্মাণ করেন এই খাসমহল—অন্তঃপুরের রাজমহিষী এবং মহিলাদের বিশ্রামের জন্য। তাই এর আরও একটি নাম আরাম ঘর।

খাসমহলের তিনটি মহলের সঙ্গে তিনদিকে রয়েছে প্রাঙ্গণ। মাঝখানের মহলটির স্তম্ভগুলি প্রত্যেকটিই আকর্ষণীয় কারুকার্যে ভরা। দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাওয়ার মতো। সারা দেয়াল রঙিন চিত্রে পরিপূর্ণ—যেগুলিতে এক সময় ছিল সোনার জলের প্রলেপ। কালের প্রভাবে এগুলির বেশীরভাগই আজ নষ্ট হয়ে গেছে। তবুও যেটুকু আছে তার তুলনা হয় না। মোঘল আমলের উন্নত শিল্পকলার কথা ভেবে আজ অবাক হতে হয়। এই মহলের মাঝখানে রয়েছে একটি পাঁচ ফোয়ারাযুক্ত জলাশয়—যেখানে ৩২টি গোলাপ জলের ধারা দিনরাত খেলা করতো বাদশাহী আমলে। এই মহলটি সম্রাট শাজাহান কখনও বিশ্রামের জন্য, কখনও বা ব্যবহার করতেন শয়ন কক্ষ হিসাবে। গাইড জানালেন, এখন নেই, তবে একসময় এই মহলে বাবর থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের মোঘল বাদশাদের প্রতিকৃতি বাঁধানো ছিল। এখানকার প্রাঙ্গণে বসে যমুনার আকর্ষণীয় দৃশ্য দেখতেন শাজাহান—এখন দেখেন ভারতের তথা সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পর্যটক।

খাসমহলের দক্ষিণদিকের প্রাঙ্গণসহ শ্বেত পাথরের সুন্দর মহলটিতে বাস করতেন জাহানারা বেগম। শাজাহান তাঁর প্রিয়কন্যার জন্যেই নির্মাণ করেছিলেন এটি। একসময় এই মহলের ছাদটি ছিল উজ্জ্বল মণিমুক্তাখচিত।

খাসমহলের উত্তরদিকে প্রাঙ্গণ সমেত মহলটি সম্রাটের দ্বিতীয় কন্যা রোশেনারা বেগমের। রাজকীয় এই প্রাসাদগুলির সৌন্দর্য ও কারুকার্য চমকপ্রদ। ভাষায় এর বর্ণনা করা যায় না।

খাসমহলের সামনেই রয়েছে যে বাগানটি—নাম তার অঙ্গুরী বাগ। এই বাগিচার তিনদিকের দোতলা অট্টালিকাগুলি আকবর নির্মাণ করলেও পরবর্তীকালে নিজের ইচ্ছা মতো সংস্কার করেছিলেন শাজাহান। আকবর এই বাগানটি নির্মাণ করেছিলেন নিজের স্ত্রী এবং অন্তঃপুরের মহিলাদের জন্য। সুন্দর একটি জলাশয় রয়েছে এই বাগানে—যেখানে স্নান করতেন সম্রাজ্ঞী এবং অন্তঃপুরের মহিলারা। ঐতিহাসিকেরা বলেন, বাদশা এই বাগানের জন্য মাটি এনেছিলেন কাশ্মীর থেকে—সাজিয়ে ছিলেন মনোহারী ফুল, আঙুর আর আপেলের গাছ দিয়ে।

খাসমহলের নীচেই ভূগর্ভে রয়েছে তাজখানা। মোঘল আমলে এর একটি অংশে রাজপরিবারের মহিলারা বিশ্রাম নিতেন। এরই পাশের একটি অংশে রয়েছে অন্ধকার একটি ঘর যেখানে অন্তঃপুরের কোন মহিলা বা পুরুষ কোন অপরাধ করলে তাকে এই ঘরে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। তারপর মারা গেলে তার দেহটা ফেলে দেয়া হতো যমুনায়। শাস্তির ক্ষেত্রে নারীপুরুষের কোন ভেদাভেদ ছিল না। আর এ-ব্যাপারে সম্রাটের আদেশই ছিল যথেষ্ট, তারজন্য নির্দিষ্ট কোন নিয়মেরও বালাই ছিল না।

খাসমহলের উত্তরদিকে—একেবারে কাছেই এলাম শীশমহলে। সারা মহলে বিভিন্ন ধরনের কাচের টুকরো আর সোনালী রঙের সুন্দর কাজে ভরা। তুরস্কের স্নানাগারের অনুকরণেই নির্মিত হয়েছে স্নানাগার এই শীশমহলটি। সম্রাট শাজাহান এটি নির্মাণ করেন ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে—রাজ পরিবারের ব্যবহারের জন্য। একটি আলো জ্বাললে শত শত আলোর প্রতিফলন হয় এই শীশমহলে। এর দুটি অংশ আছে—রয়েছে দুটি চৌবাচ্চা। একটিতে ঠাণ্ডা জল, আর একটিতে গরম জল। মার্বেল পাথরে নির্মিত এই চৌবাচ্চাটির গায়ে খোদিত রয়েছে সুন্দর মাছের নক্সা। একসময় শীশমহলের সুগন্ধী ঝরণাগুলি খুলে দিয়ে সম্রাট তাঁর পত্নীদের নিয়ে এখানে আনন্দ উপভোগ করতেন।

আগ্রা দুর্গের মধ্যে বিশেষভাবে খ্যাত যে সৌধটি—সেটি সম্মন বুর্জ। পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালাম সুন্দর কারুকার্যখচিত এই বুর্জে। আটকোণা বিশিষ্ট এই মিনারটি মার্বেল পাথরের সঙ্গে আরও বিভিন্ন মূল্যবান পাথরের সংযোগে নির্মাণ করেছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। তবে তিনি এটি নির্মাণ করেছিলেন সম্রাজ্ঞী স্ত্রী নূরজাহানের পছন্দ ও ইচ্ছায়।

সম্মন বুর্জের পাথরের সুক্ষ্ম কাজের মধ্যে জুঁই ফুলের সমারোহের জন্য এটির নাম হয়েছে জেসমিন টাওয়ার। এই বুর্জটি সম্রাট জাহাঙ্গীর নির্মাণ করলেও পরবর্তীকালে এর কিছু পরিবর্তন করেছিলেন সম্রাট শাজাহান। এই বুর্জের মধ্যেই শাজাহান-পুত্র ঔরঙ্গজেব বন্দী করেছিলেন পিতা শাজাহানকে। এখানে বসে তিনি দেখতেন যমুনার অপর তীরে তাঁরই নির্মিত প্রিয়তমা মমতাজের স্মৃতিসৌধ তাজমহল। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী সম্রাট শাজাহান বন্দীদশায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সম্মন বুর্জের অন্তরালে।

মোঘল আমলে পচ্চিশি নামক একটি জনপ্রিয় খেলা ছিল। সম্রাট এখানে রাজ-পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এই খেলা খেলতেন—যে খেলায় ব্যবহার করা হতো অন্তঃপুরের সুসজ্জিত সুন্দরী মেয়েদের।

সম্মন বুর্জের পশ্চিমদিকের বারান্দার কিছু অংশ ভেঙে দেন লর্ড হেস্টিংস্ এবং ভাঙা টুকরো কিছু অংশ তিনি পাঠিয়ে দেন ইংল্যান্ডে। বুর্জের উত্তরদিকের মার্বেল পাথরের একটি জালি পর্দা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে কামানের গোলায়। তবে পরে সেই ক্ষত সারিয়ে তোলা হলেও ক্ষতের দাগটা রয়েছে আজও।

এবার এখান থেকে এলাম দিওয়ান-ই-খাসে। মোঘল আমলের সমস্ত দুর্গেই এটি বর্তমান। এই অট্টালিকাটি সাদা পাথরে নির্মিত। সম্রাট শাজাহান এটি নির্মাণ করে যমুনার পাশে—১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। দিওয়ান-ই-খাসের স্তম্ভগুলির প্রত্যেকটি রঙিন ফুলের কাজে ভরপুর। একসময় মূল্যবান পাথর বসানো ছিল এর প্রতিটি স্তম্ভে। দিওয়ান-ই-খাসের পাথরে খোদিত সুন্দর কারুকার্য দেখে বর্তমানের ঐতিহাসিকদের ধারণা—যে সব শিল্পীরা তাজমহল নির্মাণ করেছিলেন—তাদেরই কারও হাতের স্পর্শে নির্মিত হয়েছে এই দিওয়ান-ই-খাস।

এই মহলটি সম্রাটের একান্ত ব্যক্তিগত কক্ষ। এখানে সম্রাট প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় গোপন আলোচনা ও পরামর্শ করতেন তাঁর মন্ত্রী আর আমলাদের সঙ্গে। বাইরের কোন লোকের সঙ্গে দেখা করা বা কথা বলতেন না এখানে বসে। কিছু ফার্সী ভাষায় কবিতা লেখা আছে এই মহল বা অট্টালিকার দেয়ালে।

এবার এসে দাঁড়ালাম মোঘল আমলের একটি বিশেষ স্মৃতি কৃষ্ণ সিংহাসনের (Black Throne) সামনে। উচ্চতায় এটি ৬ ফুট, চওড়া ৯ ফুট ১০ ইঞ্চি এবং লম্বায় ১০ ফুট ৭ ইঞ্চি। একটি বড় গোটা পাথর কেটে চারটি পায়া বের করে তৈরী করা হয়েছে এই সিংহাসনটি। এটি বসানো রয়েছে ধবধবে সাদা মার্বেল পাথরের উপর। এখানে একটি খোদাই করা শিলালিপি থেকে জানা গেছে, এই সিংহাসনটি নির্মাণ করেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর ছিলেন এলাহাবাদে। সেই সময় তিনি তাঁর পিতা আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে একটি রাজসভা বসান এবং নিজেও বসেন এই কৃষ্ণ সিংহাসনটিতে। এই বিদ্রোহ ঘোষণার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আগ্রায় এসে তিনি পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা

করেন। আকবর ক্ষমাও করেছিলেন আন্তরিকতার সঙ্গে। আকবরের মৃত্যুর পর এই সিংহাসনটি জাহাঙ্গীর এলাহাবাদ থেকে নিয়ে এসেছিলেন এই আগ্রা দুর্গে। কথিত আছে, সম্রাট প্রতিদিন সন্ধ্যায় এই সিংহাসনে বসে প্রার্থনা করতেন।

এই কৃষ্ণ সিংহাসনের সামনেই রয়েছে আরও একটি সিংহাসন—যেটি নির্মিত সাদা মার্বেল পাথর দিয়ে। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে এটিতে বসতেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী।

দিওয়ান-ই-খাসের সামনেই এলাম রাজকীয় স্নানাগার বা হামামে। এটি সম্রাট আকবর নির্মাণ করেছিলেন রাজন্যবর্গের জন্যে। মোঘল আমলে স্নানাগারের প্রত্যেকটি ঘরে জলাধার, ঝরণা এবং পাইপের সাহায্যে ইচ্ছা মতো ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা ছিল ঠাণ্ডা আর গরম জলের। আকবরের পর এই স্নানাগারটি আরও সুন্দর ভাবে সংস্কার ও পরিবর্তন করেন সম্রাট শাজাহান।

এবার হামাম থেকে একটু এগিয়ে গেলাম দিওয়ান-ই-আম এবং দিওয়ান-ই-খাসের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত মাচ্ছি ভবনে। লাল বেলে পাথরে নির্মিত এই ভবনের উঠোনে রয়েছে কয়েকটি সাদা পাথরে বাঁধানো জলাধার আর সুন্দর ঝরণা। শাজাহানের সময় এই জলাধারে থাকতো সুন্দর সুন্দর অসংখ্য সোনালী আর রূপালী রঙের মাছ। সম্রাট এটি নির্মাণ করেছিলেন আনন্দ উপভোগের জন্যে। জলাধারের তিন দিকেই একসময় দোতলা বাড়ীতে ঘেরা ছিল। গাইড জানালেন, লর্ড হেস্টিংস এবং উইলিয়াম বেণ্টিং বাড়ীগুলি ভেঙে কারুকার্যখচিত পাথর আর মূল্যবান সমস্ত জিনিসগুলিই পাঠিয়ে দেন ইংল্যাণ্ডে।

মাচ্ছি ভবনের দক্ষিণে একটু এগোতেই পড়লো সাদা মার্বেল পাথরে তৈরী মীনা-মসজিদ। এটি শাজাহানের জন্য নির্মাণ করেছিলেন ঔরঙ্গজেব—যখন শাজাহান ছিলেন বন্দীদশায় এই দুর্গের ভিতরে।

মীনা মসজিদের কাছে মাচ্ছি ভবনের উত্তর-পশ্চিম কোণে এলাম নাগিনা মসজিদে। দূর থেকে মনে হয় যেন মূল্যবান পাথরের বড় একটা টুকরো। দুধসাদা পাথরের এই মসজিদটি ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব নির্মাণ করেছিলেন অন্তঃপুরের মহিলাদের উপাসনার জন্য। আকারে মসজিদটি ছোট কিন্তু দারুণ সুন্দর দেখতে।

এবার গাইডের সঙ্গে আমরা সদলবলে এলাম অনেকটা জায়গা জুড়ে নির্মিত একটি অট্টালিকার সামনে। সম্পূর্ণ অট্টালিকাটি তৈরী হয়েছে লাল বেলে পাথর দিয়ে। অন্তঃপুরের মহিলা এবং রাণীদের জন্য এটি নির্মাণ করেন সম্রাট আকবর। নাম এর মীনা বাজার। মোঘল আমলে এখানে বাজার বসতো মাসে একবার। বিক্রেতারা ছিলেন পুরুষ। অন্তঃপুরের মহিলারা এখানে নানা ধরনের মূল্যবান বিলাস দ্রব্য এবং সৌখিন অলংকার কিনতেন নিজের পছন্দ মতো। এই কেনাকাটায় হারেমের মহিলাদের ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা। কোন পুরুষের এই মীনা বাজারে কেনাকাটার জন্যে প্রবেশাধিকার ছিল না শুধুমাত্র সম্রাট ছাড়া। এই বাজারে রাজপরিবারের মহিলারা প্রাণখুলে কথা বলতেন, স্বচ্ছন্দে চলাফেরা এমনকি নিজেদের মধ্যে করতেন

হাসিঠাট্টাও। নববর্ষের দিন এই মীনা বাজারে বসতো প্রায় সারা পৃথিবীর বাজার। দেশ বিদেশ থেকে পসরা সাজিয়ে আসতেন বিক্রেতারা। বাজার বসার দিনগুলিতে অন্তঃপুরের রত্ন অলংকারে সজ্জিত রাজপরিবারের মহিলারা যখন ঘোরাফেরা করতেন তখন মনে হতো যেন পরীদের মেলা বসেছে।
কথিত আছে, রসিক বাদশা আকবর বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে মীনা বাজারে মহিলার পোশাক পরে স্বচ্ছন্দে মিশে যেতেন অন্তঃপুরের মহিলাদের সঙ্গে—আনন্দের সঙ্গে কেনাকাটা করতেন তাঁদেরই সঙ্গে।
মাচ্ছি ভবনের পশ্চিমদিকে এলাম সম্রাট আকবর নির্মিত অপূর্ব সুন্দর কারুকার্য-খচিত রাজদরবার দিওয়ান-ই-আমে। সম্পূর্ণ দরবারটি নির্মিত হয়েছে লাল বেলে পাথরে। এর স্তম্ভ, ছাদ এবং দরজার উপরে ধনুকের আকৃতিতে নির্মিত অংশগুলি সাদা রঙের মোজায়েক ফুল আর দেওয়ালগুলি মূল্যবান পাথরে সজ্জিত। যদিও আজ সে পাথরগুলি নেই—বর্তমানে সেখানে ভরাট করা হয়েছে রঙিন পাথর দিয়ে। এটি সম্রাটের সঙ্গে সাধারণ মানুষের—'মিটিং হল'। মোঘল আমলে প্রতিদিন এখানে রাজদরবার বসতো সম্রাটের উপস্থিতিতে অত্যন্ত জাঁকজমক আর সমারোহের সঙ্গে।
দিওয়ান-ই-আম হল-ঘরের একটু পিছন দিকে মেঝে থেকে সামান্য উঁচুতে সাদা মার্বেল পাথরে নির্মাণ করা হয়েছিল সম্রাটের বসার জায়গা। এখানেই মোঘল আমলে রাখা ছিল মণিমুক্তাখচিত সোনার সিংহাসন—যেখানে এসে বসতেন স্বয়ং বাদশা। এই জায়গাটি দিওয়ান-ই-আমের একটি অংশ। এই অংশটি মার্বেল পাথরের রেলিং এবং তিনটি গম্বুজাকৃতি খোলা দরজার মতো দেখতে। তবে খোলা হলেও ছিল সুরক্ষিত।
এর ঠিক নীচেই সাদা মার্বেল পাথরের একটি মঞ্চ ছিল—যেখানে বসতেন সম্রাটের প্রধানমন্ত্রী—যিনি বাদশাকে দেখাতেন দেশের প্রজাদের বিভিন্ন আবেদন সম্বলিত লেখা এবং একই সঙ্গে দিতেন দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংবাদ।
সাদা মার্বেল পাথরের মঞ্চের সামনের অংশটিতে বসতেন রাজা মহারাজা ওমরাহ ও রাজদূতেরা। এর বাইরের অংশটি নির্দিষ্ট ছিল অন্যান্য কর্মচারী এবং জনসাধারণের বসবার জন্য। বাদশা এখানে বসে অভিযোগ শুনতেন—তার বিচারও করতেন। মানুষের অভাব অভিযোগের নিরসন যখন একঘেয়ে লাগতো তখন বাদশা এবং রাজন্যবর্গ ওই অংশটিতে দেখতেন হাতি ঘোড়ার বিভিন্ন খেলা ও কসরত—একঘেয়েমি কাটানোর জন্যে। প্রতিদিন বাদশা মসজিদে যেতেন দরবারের কাজকর্ম শেষ হলে।
দিওয়ান-ই-আমের এই অংশটি কুর্সি নামে পরিচিত। এর দুপাশে রয়েছে দুটি সাদা মার্বেল পাথরের সছিদ্র জানলা। এর পিছনে বসে এগুলির মধ্যে দিয়েই অন্তঃপুরের (হারেম) মহিলারা দেখতেন রাজসভার কার্য পরিচালনা।

দিওয়ান-ই-আমের পশ্চিমে রয়েছে দোতলা অট্টালিকা—যেখানে সম্রাটের বিনোদনের জন্য গান বাজনা করা হতো। এটি নির্মাণ করেন জাহাঙ্গীর—যেটির মনোরম ভাস্কর্য মোঘল আমল থেকে আজও উল্লেখযোগ্য।

দিওয়ান-ই-আমের উত্তরে রয়েছে—কাছেই রয়েছে মতি মসজিদ। সাদা মার্বেল পাথরের এই মসজিদটিও নয়নাভিরাম। সৌন্দর্যে ভরা এই মসজিদটি নির্মাণ করেন সম্রাট শাজাহান—যেটি সারা ভারতে আজও প্রসিদ্ধ। তৎকালীন এটির নির্মাণে ব্যয় হয় তিনলক্ষ টাকা। এই মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং শেষ হয় ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। সময় লাগে প্রায় ৭ বছরের কিছু বেশী। এই মসজিদটির প্রবেশদ্বার আছে তিনটি। বাইরে সাদা পাথরের নির্মিত হলেও দেয়াল এর লাল বেলে পাথরের। ভিতরে দুটি মার্বেল পাথরের জালির কাজ করা পর্দা দিয়ে আড়াল করা কক্ষ আছে—যেখানে অন্তঃপুরের মহিলারা প্রার্থনা করতেন।

আগ্রা দুর্গে দেখার বিষয়গুলির মধ্যে এ-গুলিই প্রধান। কনডাক্টেড ট্যুরের বাসে একদিনের ভ্রমণসূচী। তাই দর্শনীয় জায়গাগুলি দেখতে হয় বেশ পা চালিয়ে। একটু ভালোভাবে দেখতে হলে দিন তিনেক থেকে নিজেরা ভ্রমণসূচী তৈরী করে নিয়ে দেখলে রিটায়ার্ড বাপের অবিবাহিতা মেয়ের বিয়ে দেয়ার মতো তাড়াহুড়ো করতে হয় না। সদলবলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম দুর্গ থেকে। আমরা মুক্তি পেলাম। ইতিহাসে শাজাহান আগ্রা দুর্গে বন্দী হয়ে রইলেন আজও—বন্দীদশা তাঁকে ভোগ করতে হবে ততদিন পর্যন্ত—যতদিন ইতিহাসে মোঘল বাদশাদের কথা লেখা হবে—লেখা হবে মোঘল আমলের স্থাপত্যকলা শিল্পের গৌরবময় ইতিহাস।

রাস্তার ধারে যেখানে সমস্ত ভ্রমণকারী বাস দাঁড়িয়ে থাকে—সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের বাস—আমাদেরই অপেক্ষায়। একে একে সকলে উঠে বসতেই শুরু হলো চলা। দেখতে দেখতে বাস এসে থামলো ইতমদ্-উদ-দৌলার সমাধিসৌধের প্রবেশ-দ্বার থেকে একটু দূরে। আগ্রা সিটি স্টেশন থেকে দূরত্ব মাত্র ১'৫ কি.মি.। আর তাজমহল থেকেও খুব বেশী দূরে নয় এই সমাধিসৌধ। তাজমহলের বিপরীতে যমুনানদীর তীরে।

ধীরে ধীরে নেমে এলাম বাস থেকে। চিত্তাকর্ষক প্রবেশদ্বার পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই বিশাল বাঁধানো প্রাঙ্গণে মনোরম সাজানো বাগান। পরিষ্কার ঝক্‌ঝক্ করছে। বাগানের চারদিক উঁচু প্রাচীরে ঘেরা—এরই মাঝে রয়েছে সমাধি সৌধ।

এবার একেবারে এসে দাঁড়ালাম সমাধিসৌধের সামনে। বাপরে কি কাজ! ভাবাই যায় না। কারুকার্যখচিত মনোরম এই চারকোণা ইমারতটি সত্যিই অবাক করে দেয়ার মতো। এর চারকোণে রয়েছে চারটি অষ্টকোণাকৃতি সুউচ্চ মিনার। প্রত্যেকটি মিনারই দো-তলা বিশিষ্ট—আছে উপরে ওঠার সিঁড়ি। এগুলির গঠন প্রণালী এবং কারুকার্য যেন সগর্বে পরিচয় করিয়ে দিতে চায় পর্যটকের সঙ্গে মোঘল স্থাপত্যের।

তাজমহলের পূর্বসূরী এই ইতমদ্-উদ-দৌলার সমাধিসৌধটি মোঘল বাদশাদের হাতে নির্মিত প্রথম শ্বেত পাথরের স্মৃতি সৌধ। এর প্রধান প্রবেশদ্বারটি দোতলা। ভিতরে ঢুকেও অবাক হয়ে গেলাম এর কাজ দেখে। ভিতরে বাইরে এমন সূক্ষ্মভাবে শিল্পিত যে, স্তম্ভিত না হয়ে পর্যটকদের উপায় নেই। ১৫০ ফুট উঁচু বেদিতে স্থাপিত রয়েছে মূল সমাধি। ভিতরে সবটাই সাদা পাথরে সূক্ষ্ম জালির কাজে ভরা। মার্বেলের উপর খচিত আছে গাছ লতাপাতা কুঁড়ি কলসী এবং অন্যান্য সমস্ত কারুকার্যগুলির সবই জাহাঙ্গীরের আমলে মোঘল স্থাপত্যশিল্পের পরিচায়ক। অনন্যসাধারণ অবদানও বটে। মোঘল ইতিহাস বলে, এই সমাধিসৌধে মার্বেলের উপর কিছু কিছু শিল্পকলার কাজ নিজের রুচি ও পছন্দমতো করেছিলেন সম্রাজ্ঞী নুরজাহান। কাচের জানলায় ফুলের মতো জ্যামিতিক আকারের ছিদ্রগুলি যেমন সমাধিসৌধের ভিতরে আলো বাতাসের উৎস, তেমনই কাচের উপরে কাজ করা কারুশিল্পগুলি বহন করছে পারসীয় শিল্পকলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী দক্ষতা। একটা লক্ষ্য করার বিষয় হলো এবং যার তুলনা হয় না—সেটি হলো, কাচের কারুকার্যে কোথাও এতটুকুও ছেদ নেই। সত্যিই দেখার মতো।

এবার একটু অতীত ইতিহাস না বললে এই সমাধিসৌধের কোন কথাই বলা হবে না—জানা যাবে না কেন এটি নির্মিত হয়েছে। এই স্মৃতিসৌধটি জাহাঙ্গীর পত্নী সম্রাজ্ঞী নুরজাহান নির্মাণ করান তাঁর পিতা গিয়াসুদ্দিন বেগ ও মায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে। নুরজাহান এই বিশাল ইমারতের কাজ শুরু করান ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে—শেষ হয় ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে। তাজমহল নির্মাণের আগেই এটি নির্মিত হয়। ঐতিহাসিকদের অনেকের ধারণা, মার্বেল পাথরের অনন্যসাধারণ কারুকার্যের এই সমাধিসৌধটি মোহিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল শাজাহানকে তাজমহল নির্মাণ করতে—কারণ ইতমদ্-উদ-দৌলার শিল্পকলাই মোঘল আমলের প্রথম এবং নজীর-বিহীন শিল্পকলা।

গিয়াসুদ্দিন বেগ ছিলেন পারস্যদেশের অধিবাসী। তিনি ভারতে এসে একজন অন্যতম সভাসদ হন আকবর বাদশার রাজদরবারের। তাঁর কন্যা ছিলেন মেহেরু-উন-নিশা। অপরূপ লাবণ্যবতীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হলেন জাহাঙ্গীর। পিতা আকবর বুঝতে পারলেন পুত্রের ইচ্ছা। তখন মেহেরু-উন-নিশার সঙ্গে আকবর বিয়ে দিয়ে দেন আফগান-বীর শের আফগানের সঙ্গে।

কালের নিয়মে আকবর মারা গেলেন। সেলিম তখন জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করে বসলেন সম্রাটের সিংহাসনে। সমস্ত ক্ষমতা এলো তাঁর হাতে। চক্রান্ত করে হত্যা করলেন শের আফগানকে। মেহেরু-উন-নিশাকে নিয়ে এলেন আগ্রায়—দিলেন বিয়ের প্রস্তাব। রাজী হলেন না গিয়াসুদ্দিনের বিক্রমী কন্যা। দেখতে দেখতে কেটে গেল ছ-টা বছর। তারপর মেহেরু-উন-নিশাকে বিয়েতে রাজী করাতে পারলেন জাহাঙ্গীর।

বিয়ে হলো। এবার মেহের-উন-নিশার নাম পরিবর্তন করে নাম রাখলেন নূর মহল। যার অর্থ হলো প্রাসাদের আলো। এতেও খুশী হলেন না জাহাঙ্গীর বাদশা। পত্নীর রূপে মোহিত হয়ে আরও একটি নাম দিলেন—নূরজাহান। এরও অর্থ বড় সুন্দর—পৃথিবীর আলো। মেহের-উন-নিশা অন্ধকার কাটিয়ে হলেন পৃথিবীর আলো—নূরজাহান।

মমতাজ প্রেমে প্রেমাতুর শাজাহান নির্মাণ করেছিলেন তাজমহল, আর পত্নী প্রেমে ডগমগ সম্রাট জাহাঙ্গীর নূরজাহানকে সন্তুষ্ট করতে ছবি সম্বলিত মুদ্রা চালু করেছিলেন তাঁর জীবিত অবস্থাতেই। এখানেই জাহাঙ্গীর থেমে থাকেননি। শ্বশুরবাড়ী ঘেঁষা অনেক জামাই-এর মতো জাহাঙ্গীর তাঁর স্ত্রীকে আরও খুশী করার জন্য শ্বশুর গিয়াসুদ্দিন বেগকে একটি ভালো পদ দিয়েছিলেন নিজের রাজদরবারে এবং একই সঙ্গে তিনি তাঁর নতুন নামকরণ করেন ইতমদ্-উদ-দোলা—যার অর্থ হলো বিশ্বস্ত।

গিয়াসুদ্দিন বেগ ওরফে ইতমদ্-উদ-দোলা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অত্যন্ত অনুগত-ভাবে কাজ করেন মোঘলদের হয়ে। মৃত্যুর পর পিতার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার প্রতীক হিসাবে নূরজাহান এখানে নির্মাণ করেন তাঁর সমাধি-স্মৃতিসোধ।

ইতমদ্-উদ-দোলার সমাধি সোধ দেখে সকলেই এসে বসলাম বাসে। শহরের রাস্তা ধরে চলতে শুরু করলো। এখান থেকে তাজমহলের দূরত্ব মাত্র ৬.২ কি.মি.।

আগ্রায় মোঘল আমলের যতগুলি ঐতিহাহিক স্মৃতিসোধ আছে—তার মধ্যে তাজমহলই প্রথম এবং প্রধান—যার নাম সারা পৃথিবীর অগণিত মানুষের কাছে পরিচিত। বিশেষ করে তাদের কাছে আরও পরিচিত—যারা সত্যিই ভালোবাসে শিল্প ও সুন্দরকে। এর আগেও দেখেছি—আবার দেখতে যাচ্ছি তাজমহল। বাহ্যত বিশাল অর্থ ব্যয় করে নির্মিত হতে দেখলেও সম্রাট শাজাহান মূলত তাঁর পত্নী মমতাজকে আন্তরিক প্রেমের স্বপ্ন, শিল্প ও সৌন্দর্যবোধ, সুরুচি আর ভাবাবেগ দিয়ে নির্মাণ করেছিলেন এই তাজমহল।

তাজমহল—এ-এমনই এক সমাধিসোধ, যেখানে মৃত্যুর পরেও উৎসর্গীকৃত হয়েছে মোঘল বাদশার অবিস্মরণীয় প্রেম—তাজমহল, এ-এমনই এক অসাধারণ স্মৃতিসোধ—যেখানে শায়িত রয়েছে মমতাজ মহলের মরদেহ—তাজমহল, এ-এমনই এক দুর্লভ কীর্তি—যার শিল্পকলা আর রূপ বর্ণনার কোন ভাষা খুঁজে পায়নি পৃথিবীর কোনও মানুষ—তাজমহল-এ এমনই এক স্মৃতিসোধ, শাজাহান—যিনি নির্মাণ করেছিলেন এটি—তাঁরও নশ্বর দেহ স্থান পেয়েছে প্রাণ প্রিয়তমা মমতাজ বেগমেরই পাশে।

আর্জুমান বানো বেগম—নূরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্রীর এই নাম পরিবর্তন করে শাজাহান প্রেয়সীর নাম রেখেছিলেন মমতাজ মহল। তাজমহল তাঁরই সমাধিসোধ। শাজাহান

১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে যখন আর্জুমানকে বিয়ে করেন তখন তাঁর বয়েস ছিল উনিশ। শাজাহান ছিলেন মমতাজের চেয়ে মাত্র দুবছরের বড়। মমতাজের দরিদ্রের প্রতি দয়া, সুকোমল কমনীয়তা, সৌন্দর্য, অপরূপ লাবণ্য আর বাদশার প্রতি আন্তরিকতা —অত্যন্ত প্রিয়, একান্ত অন্তরের করে তুলেছিল শাজাহানকে। সেইজন্যেই তো কথিত আছে, মমতাজের মৃত্যুর পর দুঃখে শোকে মুহ্যমান বাদশার সমস্ত চুলদাড়ি নাকি পেকে গেছিল মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে শাজাহান বসেন সিংহাসনে। মমতাজের সংসার জীবন মাত্র ১৮ বছরের। এরই মধ্যে তিনি ১৪টি সন্তানের জননী হন। শেষ সন্তান প্রসবের সময়েই তিনি অসুস্থ হয়ে মারা যান। মমতাজের মৃত্যুতে শাজাহান যেমন এত ব্যথিত হয়ে সাময়িকভাবে রাজপোশাক এবং রাজদরবারে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন—তেমনই শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল গোটা মোঘল সাম্রাজ্যের প্রজারা।

মমতাজ দেহরক্ষা করেন দক্ষিণ ভারতের বারহানপুরে। সেই কারণে তাঁকে সাময়িক ভাবে সমাহিত করা হয় তাপ্তী নদীর তীরে জেনাবাদ-এ। এর ছ-মাস পরে যুবরাজ সুজার তত্ত্বাবধানে মরদেহ তুলে এনে আবার সমাহিত করা হয় আগ্রায়—জয়পুরের রাজা মানসিংহের বাগানে।

এবার সম্রাট ধীরে ধীরে সমাধিসৌধ নির্মাণের কাজে হাত দিলেন। ভারতবর্ষ ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্থপতি ও শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর উদ্দেশ্যর কথা জানিয়ে—যে উদ্দেশ্যটি ছিল, তাঁর প্রিয়তমার স্মৃতিতে এমন একটি স্মৃতি-সৌধ গড়ে তোলা হবে—যা সারা বিশ্বের কাছে হয়ে থাকবে চিরস্মরণীয়। বহু প্রথিতযশা স্থপতিদের কাছ থেকে নানা ধরনের—নানারূপের পরিকল্পনা (plan) এলো। সবশেষে আজকের এই তাজমহলের প্রতিকৃতি স্বীকৃত হলো তুরস্কের পরিকল্পনাকার উস্তাদ ইসা খান ইফেন্দি-র।

ইসা খানের (Draftsman) পরিচালনায় তুরস্কের Sattar Khan (Caligrapher), Ismile Afaudi (Dome Maker), সিরাজের Amanat Khan (Thughra), লাহোরের Manoo Lal (Inlayer), Qasim Khan (Turret Maker), বাগদাদের Mohammad Khan (Caligrapher), সিরিয়ার Roshan Khan (Caligrapher), পারস্যের Whab Khan (Caligrapher) প্রমুখরা ছাড়াও দিল্লী, মুলতান, আগ্রাসহ বিভিন্ন দেশবিদেশের অসংখ্য শিল্পী ও কারিগর আত্মনিয়োগ করেছিলেন মমতাজের সমাধিসৌধ নির্মাণে।

তাজমহল নির্মাণের জন্য ভারতের নানা প্রদেশ ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজা এবং দেশ-প্রধানদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল সোনা, রুপা এবং বিভিন্ন মূল্যবান পাথর, কাঠ এবং অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী। যেমন, মাকরানা ও জয়পুরের মার্বেল পাথর, গোয়ালিয়রের Nakhad, Bloodstone (Arbi), Godar, Red

Stone (Surkh), তিব্বতের Turquoise (Firoza), রাশিয়ার Melachile, শ্রীলঙ্কার (Dahuet, Farang), বাগদাদের Cornelian (Aqiq), Labis-lazuli (Lajward), আরবের Sumag, নীলনদের উপত্যকার Chrysolite (Lahsunia), মধ্যপ্রদেশের পান্না অঞ্চলের হীরা এবং অন্যান্য অনেক স্থান থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছিল নীলা, পান্না, মুক্তা প্রভৃতি অত্যন্ত মূল্যবান নানা ধরনের রত্ন।
এইসব উপাদান নিয়ে ২০ হাজার শিল্পী ও শ্রমিকের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে ১২ বছর ৬ মাসের মধ্যে গড়ে উঠেছিল সম্রাট শাজাহানের মহান কীর্তি আজকের তাজমহল। ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে মমতাজের মৃত্যুর এক বছর পরে শুরু হয় তাজমহল নির্মাণের কাজ—তাজমহলকে ঘিরে আর সমস্ত কাজ শেষ হতে ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দ গড়িয়ে যায়।
ঐতিহাসিকেরা বলেন, অত্যন্ত দয়ালু হৃদয় ছিল শাজাহানের। এই তাজমহল নির্মাণের ক্ষেত্রে জোর করে কাউকে এ-কাজে নিয়োগ করেননি। কোন শ্রমিককে তার প্রাপ্য পারিশ্রমিকের একটি পয়সাও তিনি কম দেননি। সম্রাটের রাজকোষ পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও ত্রিশটি গ্রাম থেকে বাৎসরিক আদায় করা রাজস্ব ৩০ লক্ষ টাকা তিনি শুধু ব্যয় করতেন এই তাজমহল নির্মাণের জন্যে। নির্মাণ ব্যয় নিয়ে মতভেদ আছে। কারও মতে ১,৮৪, ৬৫, ১৩৬ টাকা। পাদিশাহ নামাতে উল্লিখিত হয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা। আবার কারও মতে ৪,১১,৪৮,৮২৬ টাকা ৭ আনা ৬ পাই।
টাকা যাই লেগে থাকুক—কাজ শেষ হলো। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শাজাহান এবার প্রাণপ্রিয়ার সমাধিসৌধ দেখার জন্যে উদগ্রীব হয়ে পড়লেন। এখানেই একটি জনশ্রুতি আছে। বাদশা জানতে পারলেন, তাজমহল এলাকাতে নির্মাণের জন্য এত বাঁশ, কাঠের মঞ্চ এবং অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় সামগ্রীতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে যে, ওই বিশাল পরিমাণ জিনিষগুলি সরিয়ে ফেলতে যেমন প্রচুর অর্থ ব্যয় হবে, তেমনই লেগে যাবে বেশ কয়েক মাস সময়। চিন্তায় উদ্বিগ্ন হলেন সম্রাট। পরামর্শ করলেন সভাসদদের সঙ্গে। সমস্যা সমাধানের পথ বাতলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। বাদশা ঘোষণা করলেন, সমস্ত নগরবাসী একত্রিত হয়ে ওইগুলি নিজেদের জন্য নিয়ে যেতে পারে। বিনা পয়সায় কিছু পাওয়া যাবে—এর নাম ভারতবর্ষ। একদিনেই পরিষ্কার হয়ে গেল তাজমহলের পার্শ্ববর্তী সমস্ত এলাকা। সম্রাট খুশী হলেন। চলে গেলেন তাজমহল দেখতে। ট্যুরিস্ট বাস আমাদেরও দেখাতে নিয়ে এলো তাজমহল। থামলো আর সব বাস যেখানে দাঁড়ায়—তাজ গেট থেকে বেশ কিছুটা দূরে।
সুন্দর বাঁধানো চওড়া রাস্তা ধরে এগিয়ে দাঁড়ালাম প্রধান দ্বারের সামনে। এটি পশ্চিম দ্বার—আগ্রা শহর এবং ক্যান্টনমেন্ট মুখী। বিশাল এই দ্বারের বাইরে লাল বেলে পাথরে নির্মিত হয়েছে ফতেপুরী মসজিদ। ফতেপুরী বেগম ছিলেন শাজাহানের আর সব স্ত্রীদের মধ্যে অন্যতমা। তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশ্যে বাদশা এটি নির্মাণ করেন। মূল প্রবেশদ্বারের বাঁ-দিকে রয়েছে সতুন্নিসা খাদানের কবর—যেটি

নির্মিত হয়েছে সাদা মার্বেল পাথরে। নিঃসন্তান খাদান ছিলেন মমতাজ বেগমের অত্যন্ত প্রিয়সঙ্গিনী—রাজকুমারী জাহান-আরা বেগমেরও। ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সতুন্নিসা মারা যান লাহোরে। সেখানে তাঁকে সমাধি দেয়া হয়। ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শাজাহান তাঁর মরদেহ আগ্রায় এনে আবার তাঁকে সমাহিত করেন এখানে। এই পশ্চিম দ্বারটিই সর্বসাধারণের প্রবেশদ্বার।

এই প্রধান প্রবেশদ্বারটি ছাড়াও রয়েছে আর দুটি দ্বার—পূর্ব ও দক্ষিণে। পূর্ব দ্বারের কাছে রয়েছে শাজাহানের স্ত্রীদের মধ্যে আরও একজন—শিরহিন্দি বেগমের স্মৃতিতে নির্মিত সমাধি, আর দক্ষিণদিকের দ্বারের ডানপাশে লাল বেলে পাথরে নির্মিত মমতাজ বেগমের আরও এক প্রিয়সঙ্গিনীর স্মৃতি—সমাধি। তিনটি দ্বারই মোঘল স্থাপত্যের এক অনবদ্য উদাহরণ।

মূল প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করার পরেই পড়লো বিশাল একটি চাতাল। মোঘল আমলে এখানে ছিল রাজকীয় সরাইখানা—বাজারও বসতো। একটু হেঁটে এলাম তাজগেটের সামনে। প্রবেশমুখের বাঁ-পাশে একটি পাথরে খোদাই করা আছে—

"The Tajmahal was built between 1631 and 1653 by Emperor Shah Jahan (1627—1658) as the Tomb for his wife Arjumand better known as Mumtaz Mahal, "Ornament of the palace" born in 1592, the daughter of Asaf Khan, She married Shah Jahan in 1612 and died in 1631. After his death the Emperor was buried by her side."

তিনতলা বিশিষ্ট তাজগেট অর্থাৎ মূল ফটকটি একটু জায়গার উপরে নির্মিত হয়েছে লাল বেলে পাথরে। উচ্চতায় এটি ২১১ ফুট এবং চওড়া ৩৬ ফুট। এই তোরণের গায়ে লেখা রয়েছে কোরানের বাণী। মোঘল আমলে তোরণের দরজাটি সম্পূর্ণ নির্মিত হয়েছিল রুপো দিয়ে—যার আনুমাণিক মূল্য ছিল ১, ২৭, ০০০ টাকা। এর গায়ে বসানো রুপোর ১১০০ পেরেকের মাথায় ছিল রুপোর পয়সা। মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর জাঠেরা তাদের রাজত্বকালে দরজাগুলি খুলে নেয়। পরে দরজাটি নির্মিত হয় পিতলে। তাজের এই প্রবেশদ্বারটি একটি আট কোণা বিশিষ্ট ঘর। প্রত্যেকটি কোণে রয়েছে ছোট ছোট বিশ্রামাগার। উপরে যাওয়ার সিঁড়িও আছে। একেবারে উপরে রয়েছে ২২টি মিনার এবং চারটি স্তম্ভ। মোট ২২ বছরে তাজমহল সহ অন্যান্য সমস্ত কিছু নির্মিত হয় বলে ২২টি মিনার এখানে বছরের নির্দেশ করে। মিনার বছরের হিসাব বলে দেয়। প্রবেশদ্বারের কালো রঙ করা ছাদের মাঝখানে রয়েছে একটি পিতলের লণ্ঠন। এটি পারসীয় শিল্পের অনুকরণে তৈরী। লর্ড কার্জন ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে পারস্য থেকে আনেন এবং দান করেন এখানে। তৎকালীন এটির মূল্য ছিল ৩৫০ পাউণ্ড।

তাজগেট পেরিয়ে ভিতরে আসতেই বাঁ-দিকে পড়লো তাজ মিউজিয়াম। তাজের বিভিন্ন ছবি, আগ্রা শহরের নানা দ্রষ্টব্য স্থানের ছবি ছাড়াও তাজমহল তৈরীর এবং

মোঘল আমলের তথ্য সম্বলিত অনেক ইতিহাসের কথা জানা যাবে এখানে।
এবার তাজগেটের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম। সামনেই চারকোণা বিস্তৃত সাজানো বাগান। মোঘল বাদশাদের রুচিই ছিল আলাদা। তাঁরা যেখানেই কোন সৌধ নির্মাণ করেছিলেন—সেখানেই সামনে করেছিলেন সুন্দর বাগান। তাজমহলও এর ব্যতিক্রম নয়। নিশ্চিন্তে বিশ্রাম আর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যই বাদশারা বাগান করতেন। শুধু তাই নয়, বাগানের মধ্যে ঝরণা আর অবিরাম জলেরও ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁরা। তাজগেট থেকে তাজমহলের দিকে সোজা চলে গেছে সাড়ে দশফুট চওড়া একটি বাঁধানো খালের মতো—এর দু-পাশে হাঁটা পথ রয়েছে তাজের দিকে। এ-পথের দুপাশে লাইন দিয়ে লাগানো আছে দেবদারু আর সাইপ্রাস গাছ। তাজগেট আর তাজমহলের মাঝামাঝি রয়েছে জলে পূর্ণ ৫ ফুট গভীর একটি জলাধার। তাজগেটের সামনেও রয়েছে একটি।
ধীর পায়ে এসে দাঁড়ালাম জলাধারের পাশে। এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছে আমার মতো আরও অসংখ্য ভ্রমণকারী—দেশীবিদেশী। এমন সুন্দর নিখুঁত দূরত্বে এই জলাধারটি নির্মিত হয়েছে—যেখানে জলের মধ্যে সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে তাজমহলের প্রতিবিম্ব। তাজগেট থেকে স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত রয়েছে অসংখ্য ঝরণা—যেগুলি মোঘলযুগে সব সময়েই চালু থাকতো এবং ঝরণার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল যমুনার। সমগ্র এই তাজ-উদ্যানের পরিকল্পনা করেছিলেন শাজাহানের মোঘল দরবারের বিদগ্ধ গুণী ব্যক্তি আলী মর্দান খান।
জানি না, হয়তো এই জলাধারে তাজমহলের প্রতিবিম্ব দেখে অভিভূত হয়ে বিয়ার্ড টেলার (Beyard Taylor) বলেছিলেন,
"ভারতে আর যদি কিছু দেখার না থাকে তাহলে এই তাজ একাই যাতায়াত খরচ পুষিয়ে দেবে। দূর থেকে দেখা তাজমহলের রূপ আমাকে এতই মোহিত করেছিল যে, এর বিশ্বজোড়া খ্যাতি সত্যিই যুক্তিযুক্ত। এটা এতই পবিত্র এবং এত অপরূপ যে, আমি কাছে যেতেই ভয় পেতাম। যদি কাছে গেলে আমার স্মৃতিকোঠায় জমে থাকা অনুভূতি চিড় খায়।"
দেখছি, এই জলাধারে তাজমহলের প্রতিবিম্বকে নিয়ে পর্যটক আর ভ্রমণপিয়াসীদের ছবি তোলার অন্ত নেই। পর্যটকদের বসারও ব্যবস্থা রয়েছে এই জলাধারের পাশে।
জলাধারের উপর থেকে নেমে ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছি তাজমহলের দিকে চোখ রেখে। ভাবছি মোঘল আমলের কথা। এখনকার মতো তখন তো স্থাপত্য-বিজ্ঞান এতো উন্নত ছিল না, তা সত্ত্বেও তাজমহলের মতো এমন সুন্দর স্থাপত্য কেমন করে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল—তা ভেবে আজ বিস্মিত হতে হয়। বিগত প্রায় সাড়ে তিনশো বছর পরে তাজমহলের গঠনশৈলী বহন করে আসছে তৎকালীন ভারতবর্ষের ঐতিহ্য আর শিল্প-সুদক্ষতা—যা দেখে একদা বিস্মিত মেজর জেনারেল স্লিম্যান

(Sleeman) স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাজমহল দেখার অনুভূতি নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,

"—কেমন দেখলে তাজমহল ?

উত্তরে তাঁর স্ত্রী বলেছিলেন,

—জানি না, কারণ এই সৌধ দেখে এর সম্বন্ধে কোন সমালোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে আমার অনুভূতি প্রকাশ করতে পারি এইভাবে, আমি যদি আগামীকাল এরকম একটা সৌধ দেখি তাহলে মারা যাবো।"

বাঁধানো রাস্তার দু-পাশে সবুজে ভরা বাগান। যত এগিয়ে যাচ্ছি ততই অবাক হচ্ছি ধবধবে সাদা মার্বেল পাথরে গড়া তাজমহলের রূপ দেখে। একসময় এই রূপেই মুগ্ধ হয়ে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টের সদস্য স্যামুয়েল স্মিথ (Samual Smith) তাঁর 'My life work' গ্রন্থে লিখেছেন,

"এটির সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। এটি যেন আগের তৈরী সমস্ত প্রাচীন স্থাপত্যকে মলিন করে দিয়েছে রূপে। সেণ্টপিটার্স মিলান বা কোলন ক্যাথিড্রাল দেখামাত্র এরকম অনুভূতি আসে না। এগুলির সৌন্দর্যও যদিও উল্লেখযোগ্য তথাপি তাজের আকর্ষণের কাছে যেন খুবই সাধারণ। এটি দেখে মনে হয়, হাতির শুভ্র দাঁত দিয়ে তৈরী করা একটি সাদা মন্দির। এর দেয়ালের গায়ে নিখুঁত কারুকার্য ও অঙ্গসজ্জা দেখে স্থাপত্য বলে মনে হয় না। মনে হয় যেন ফিতের উপর সুতোর সূক্ষ্ম কাজ। এটিকে মোটেই পৃথিবীতে অবস্থিত কোনকিছু বলে মনে হয় না—দেখে যেন স্বর্গের কোন অপরূপ বস্তু মনে হয়। তাজমহলের বর্ণনা কোন কিছুতেই করা সম্ভব নয়।"

এবার একেবারে এসে দাঁড়ালাম তাজমহলের দোর গোড়ায়। উপরে ওঠার সিঁড়ি রয়েছে দু-পাশে। ধীরে ধীরে উঠে এলাম বিশাল সৌধ-চত্বরে—যার চারটি কোণে রয়েছে ১৪০ ফুট উঁচু চারটি গোলাকৃতি মিনার। প্রত্যেকটি মিনারে আছে তিনটি করে গ্যালারী এবং ১৬৮টি করে সিঁড়ি। একেবারে উপরের গ্যালারীতে রয়েছে ৮টি করে জানলা।

তাজমহলের চারপাশ দেখছি ঘুরে ঘুরে। প্রবেশদ্বারে খোদাই করা আছে কোরানের ৮৯টি অধ্যায়। এই অংশটির নাম আলফারজ। গাইড বলেছিলেন এর সুন্দর অর্থ—'রাতের অন্ধকার ভেঙে সকালের শুরু।' সম্পূর্ণ কোরানটাই উৎকীর্ণ হয়েছে তাজের দেয়ালে। দেশবিদেশের রঙ বেরঙের ৩৫ রকমের মূল্যবান পাথর ব্যবহৃত হয়েছে তাজের কারুকার্যে—যা দেখে একদা বিমুগ্ধ স্বর্গীয় ফরাসী বিশপ হয়তো অনুভব করেই বলেছিলেন,

"কোন বর্ণনা সেটা বিস্তারিতই হোক বা পুঙখনাপুঙখই হোক, কোন রঙ সেটা যত উজ্জ্বলই হোক বা মহান শিল্পীর তুলিতে আঁকা হোক, কোন মতেই তাজের অসাধারণত্ব প্রকাশ করতে পারে না। এটি পূর্ব-বিশ্বের স্থাপত্যশিল্পের এক

অভূতপূর্ব, অবিস্মরণীয়, অকল্পনীয়, অবর্ণনীয়, অতুলনীয় এক সৃষ্টি।"

তাজমহল তৈরীর পর আরও কয়েকটি অট্টালিকা এবং তৈরী করা হয়েছিল এই তাজউদ্যান। তাজমহলের পশ্চিমে একটি সুন্দর মসজিদ—পূর্বদিকের একটি অট্টালিকা স্থাপত্যশিল্পের এক অনবদ্য উদাহরণ। তাজের পিছনে যমুনা আর সামনে সুন্দর সাজানো বাগান সৃষ্টি করেছে এক নয়নাভিরাম দৃশ্য। তাজের প্রশংসা করতে গিয়ে G. W. Forrest তাঁর 'Cities of India' গ্রন্থে লিখেছেন,

"কোন ছবি বা চিত্র তাজমহলের অবর্ণনীয় স্থাপত্য এবং এর কারুকার্য বর্ণনায় অক্ষম। কোন বর্ণনাই মার্বেল পাথরের চূড়া, চারকোণায় চারটি মিনার এবং এর সামনের নয়নাভিরাম উদ্যানকে বুঝিয়ে বলতে পারবে না। এর দেয়াল গাত্রের অলঙ্কার কোন শব্দের দ্বারাই প্রকাশ করা যায় না—এটাই হলো তাজের অভিনবত্ব। এই তাজমহল সেই সমস্ত দেবকন্যার মতো যাদের রূপ শুধু স্বর্গীয়ই নয়, দুর্লভও বটে।"

এবার ধীরে ধীরে এলাম তাজমহলের ভিতরে—ঠিক মাঝখানে—মমতাজের সমাধি ক্ষেত্রে। এখানেই মমতাজকে সর্বশেষ সমাহিত করা হয়। সমাধিক্ষেত্রের শান্তি রক্ষার জন্য নীচের মূল সমাধিক্ষেত্রর উপরের তলায় রয়েছে অনুরূপ একটি কবর। মূল কবরটি লম্বায় সাড়ে দশ ফুট, চওড়ায় সাড়ে ছয় ফুট আর উচ্চতা দেড় ফুট। এটি রয়েছে একটু উঁচু সমতল বাঁধানো স্থানের উপরে। সমাধির গায়ে লেখা রয়েছে, এই সমাধিটি 'আর্জুমান বানো বেগম' ওরফে মমতাজ মহলের। ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। একজন বিখ্যাত পর্যটক তাজমহলের রূপে অভিভূত হয়ে লিখেছেন,

"নীলনদের উপত্যকার স্থাপত্য অসামান্য কৃতিত্ব ও গঠনশৈলীর বৈচিত্র্যের দাবিদার হলেও আগ্রা এবং এই শহরের তাজমহল সারা বিশ্বের মানুষের কাছে স্থাপত্য-শিল্পের এক অনবদ্য সৃষ্টি এবং মানব জীবনের ভালোবাসার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসাবে চিরদিন আকর্ষণীয় হয়ে থাকবে।"

মমতাজকে আন্তরিকভাবে ভালোবেসেছিলেন শাজাহান। তাই মৃত্যুর পরও কেউ কাউকে ছেড়ে থাকেননি। একেবারে পাশেই রয়েছে সম্রাট শাজাহানের সমাধি। লম্বায় সাড়ে এগারো ফুট, চওড়ায় সাড়ে সাত ফুট আর উচ্চতায় দু ফুট এই সমাধির গায়ে লেখা রয়েছে—"এখানে স্বর্গের বাসিন্দা সম্রাট শাজাহান শুয়ে আছেন যিনি জন্মগ্রহণ করেন সেই মুহূর্তে, যখন স্বর্গে বৃহস্পতি ও শুক্রের সমন্বয় ঘটেছিল। শাজাহান মারা যান ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে।" সম্রাট ঔরঙ্গজেবই পিতা শাজাহানের সমাধি দেন এখানে।

সমাধিক্ষেত্রের চারপাশে সুন্দরভাবে নির্মিত রয়েছে পাথরের জাফরী—জালি কাজ। এমনভাবে নির্মিত শ্বেত পাথরের জালির পর্দা—যার ভিতর দিয়ে আলো এসে পড়ে পাশাপাশি শুয়ে থাকা সম্রাট শাজাহান ও তাঁর বেগম মমতাজের কবরে। শাজাহান

প্রথমে এটি নির্মাণ করেছিলেন রূপোর উপর মণিমুক্তা বসিয়ে। তৎকালীন ব্যয় হয় ৬ লক্ষ টাকা। পরে ডাকাতির ভয়ে ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে অতুলনীয় এই জাফরী বসান সম্রাট ঔরঙ্গজেব। এটি নির্মাণ করতে সময় লাগে সাত মতান্তরে দশ বছর এবং সেই সময় ব্যয় হয় পঞ্চাশ হাজার টাকা।

লর্ড রবার্ট (Lord Robert) তাজমহল সম্বন্ধে তাঁর 'Forty one years in India' গ্রন্থে এইভাবে অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন,

"যেটা অবর্ণনীয় সেটা আমি বর্ণনা করতে যাবো না। কোন শব্দ, কোন লেখনীই কোনমতেই পাঠকের কল্পনাপ্রবণ মনকে তাজমহলের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য এবং তার স্রষ্টার পবিত্র কল্পনার সম্বন্ধে সঠিক রূপ দিতে পারবে না।"

বিখ্যাত বিদেশী পর্যটক অস্কার ব্রাউনিং-এর (Oscar Browning) তাজমহল সম্পর্কে স্মরণীয় মন্তব্য,

"তাজমহল ভারত তথা বিশ্বের এক অতুলনীয় সৌধ···তাজ দেখুন···এটি আপনাকে এত মোহিত করবে যে আপনি আপনার অনুভূতি প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাবেন না। এবং এই অপ্রকাশিত অনুভূতি মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সজীব থাকবে আপনার অন্তরে।"

তাজমহলের মূল গম্বুজের মাঝখানে রয়েছে একটি আংটা—এখানে শাজাহান লাগিয়েছিলেন কারুকার্যে ভরা মূল্যবান একটি ঝাড়লণ্ঠন। পরবর্তীকালে এটি লুট করে নিয়ে যায় জাঠেরা। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রোঞ্জের নির্মিত একটি লণ্ঠন এখানে ঝুলিয়ে দেন লর্ড কার্জন।

ভারতীয় এবং পারসীয় স্থাপত্যের এক যৌথ শিল্পকলার প্রকাশ হলো তাজমহল। সারা পৃথিবীর পর্যটকদের কাছে সৌন্দর্য সূক্ষ্ম শিল্পকলা আর অসাধারণত্বের এক বিস্ময় হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছে তাজমহল। মমতাজ নেই—সমগ্র মোঘল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েও শাজাহান তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি ঠিকই—তবে তাঁর প্রেমকে স্মরণীয় করে রাখতে পেরেছেন—এখানেই বাদশা শাজাহান সার্থক—সার্থক তাঁর অবর্ণনীয় শিল্প ভাবনার ব্যাপক প্রকাশ। সেইজন্যেই তো মিশরের পিরামিড দুবার দেখার পর তাজমহল তৈরীর ৫০ বছরের মধ্যে ফরাসী পর্যটক বার্ণিয়ার (Bernier) এটি দেখে বলেছিলেন,

"আমি মনে করি এটি পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্যের একটি হওয়া উচিত। এই তাজমহল, কিছু উল্টো-পাল্টা আকৃতির পাথরে তৈরী মিশরের পিরামিড যে পৃথিবীর মানচিত্রে আশ্চর্যের তালিকায় স্থান পেয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী শিল্প প্রতিভায় বিকশিত এবং আমার মতে মিশরের পিরামিডের শিল্পের ছোঁয়া এবং নতুন আবিষ্কারের গন্ধ খুবই কম পাওয়া যায়।"

শিল্পবোদ্ধা প্রবাদ পুরুষ সাহেব ফার্গুসন 'History of Indian and Eastern Architecture' গ্রন্থে তাজ-প্রসঙ্গে নিজের অভিব্যক্তির বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন,

"তাজমহল তার নিজের পবিত্রতায় পৃথিবীর যে কোন গঠনশৈলীর সঙ্গে নিজেকে তুলনা করতে পারে।"
তাজপ্রসংগে আরও মন্তব্যে কম যাননি বারনিয়ার,
"বিশ্বের আশ্চর্যতম মিশরের পিরামিড-এর চেয়েও তাজমহল বেশী করে মনে রাখার মতো।"
জে. টলবয় হুইলার (J. Talboys wheeler) তাঁর 'History of India' গ্রন্থে বলেছেন, "তাজমহলের সৌন্দর্য অবর্ণনীয়।"
পরিশেষে বলি, কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে তাজমহল কি এবং দেখতে কেমন —আমি বলবো, এ এমনই এক প্রেমের স্মৃতিসৌধ—যার নাম তাজমহল—যেটির বিস্ময় চোখে না দেখে, ছবিতে দেখে, বই পড়ে কিছু অনুভব করতে গেলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে ঠিক অন্যের মুখে ঝাল খাওয়ার সমান।

পৌরাণিক ইন্দ্রপ্রস্থই আজকের দিল্লী

"...ধৃতরাষ্ট্রের আদেশক্রমে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ও পুত্রগণের সহিত বাহ্লীক—ইঁহারা পাণ্ডবগণের শয়ন-ভোজন প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে থাকিলেন॥ ৩৪॥
(হস্তিনাপুরে)
এইভাবে পাণ্ডবগণ অবস্থান করিতে লাগিলেন ; তখন ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ অনুসারে বিদুর তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যেরই নেতা হইলেন॥
এইভাবে পাণ্ডবগণ কিছুকাল অবস্থান করিলে, একদিন ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন॥
পরে ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—"যুধিষ্ঠির! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত আমার কথা শোন। আমাদের মধ্যে আবার বিবাদ না হয়, এইজন্য তোমরা যাইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে বাস কর॥ ৩৭॥
তোমরা সেখানে যাইয়া বাস করিতে থাকিলে, দেবরাজ যেমন দেবগণকে রক্ষা করেন, তেমন অর্জুন তোমাদিগকে রক্ষা করিবে ; সুতরাং কেহই উৎপীড়ন করিতে পারিবে না॥ ৩৫-৩৮॥
তোমরা রাজ্যের অর্দ্ধাংশ লাভ করিয়াই ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া প্রবেশ কর।"
বৈশম্পায়ণ বলিলেন, মনুষ্যশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের সেই কথা স্বীকার করিয়া এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, ভয়ঙ্কর বনপথ দিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন এবং অর্দ্ধ রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াই তথায় যাইয়া প্রবেশ করিলেন॥ ৩৯-৪০॥
তদনন্তর, ধার্ম্মিক পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের সহিত সেখানে যাইয়া স্বর্গপুরীর ন্যায় সেই পুরীটীকে অলঙ্কৃত করিলেন॥

তাহার পর, তাঁহারা পবিত্র ও মঙ্গলজনক স্থানে স্বস্ত্যয়ন করিয়া, বেদব্যাসের সহিত মিলিত হইয়া, সেই নগরটীকে মাপিলেন ॥

তৎপরে, তাঁহারা সমুদ্রের ন্যায় বিশাল পরিখা দ্বারা এবং জলশূন্য মেঘ ও চন্দ্রের তুল্য শুভ্রবর্ণ অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা সেই নগরটীকে অলঙ্কৃত করিলেন ; তখন বিশাল সর্পগণ ও ভোগবতী নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত পাতালপুরের ন্যায় সেই নগরটী শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪১-৪৪ ॥

সে নগরটী বহুসংখ্যক অট্টালিকা দ্বারা শোভিত হইল এবং মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় বিশাল দ্বার, আর গরুড়ের পক্ষদ্বয়ের ন্যায় বিশাল কপাট দ্বারা রক্ষিত হইল ॥

নানাবিধ গৃহে নানাবিধ অস্ত্র রক্ষিত হইল এবং জিহ্বাদ্বয়যুক্ত সর্পের ন্যায় শক্তি (অস্ত্রবিশেষ) সংগৃহীত করা হইল ॥ ৪৫-৪৬ ॥

অসংখ্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল, বহুতর রাজমিস্ত্রি বাস করিতে লাগিল, যোদ্ধারা রক্ষা করিতে থাকিল, প্রাচীরের উপরে কামান সাজাইয়া রাখা হইল, তাহার মধ্যে মধ্যে তীক্ষ্ন তীক্ষ্ন অঙ্কুশ থাকিল এবং ভিতরে নানাবিধ যন্ত্র নির্ম্মিত হইল ॥

সেই নগরটী লৌহময় বৃহৎ চক্র দ্বারা শোভা পাইতে লাগিল, ভিতরে পৃথক পৃথক ভাবে বড় বড় রাস্তা তৈয়ারি হইল, কিন্তু কোথাও দৈব উৎপাতের সম্ভাবনা রহিল না ॥ ৪৭-৪৮ ॥

শুভ্রবর্ণ নানাবিধ গৃহে পরিপূর্ণ সেই ইন্দ্রপ্রস্থনগরী স্বর্গনগরীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥

সেই নগরীর ভিতরে মনোহর ও মঙ্গলময় স্থানে কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের ভবন নির্ম্মিত হইল ; তাহার চূড়াগুলি যাইয়া বিদ্যুদ্বিভূষিত মেঘসমূহের ন্যায় আকাশে লগ্ন হইল ॥ ৪৯-৫০ ॥

ক্রমে সেই ইন্দ্রপ্রস্থপুরী ধনে পরিপূর্ণ হইয়া কুবেরের অলকাপুরীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ; তখন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সেখানে আসিতে থাকিলেন ॥

সর্ব্বপ্রকার ভাষাভিজ্ঞ লোকেরা তথায় বাস করিবার ইচ্ছা করিল এবং বণিকেরা ধন লাভের ইচ্ছায় নানাদিক হইতে আসিতে লাগিল ॥

সর্ব্বপ্রকার শিল্পীরা বাস করিবার জন্য সেখানে আগমন করিল এবং নগরের সকল দিকেই মনোহর উপবন সমূহ নির্ম্মিত হইল ॥ ৫১-৫৩ ॥

সেই নগরে যথাসম্ভব সুন্দর পুষ্প ও ফলের ভারে অবনত মনোহর আম, আমড়া, কদম্ব, অশোক, চম্পক, পুন্নাগ, নাগকেসর, ডহুয়া, কাঁঠাল, শাল, তাল, তমাল, বকুল, কেতক, পানী আমলা, লোধ, আকোড়, জাম, পাটলা, কুব্জা, তিনিশ, করবীর, পারিজাত এবং অন্যান্য নানাপ্রকার বৃক্ষ ছিল ; তাহাতে সর্ব্বদাই ফুল ও ফল থাকিত এবং নানাবিধ পক্ষী অবস্থান করিত। মত্ত ময়ূরগণ ও কোকিলগণ রব করিয়া বেড়াইত। দর্পনের ন্যায় নির্ম্মল নানাবিধ গৃহ ও লতাগৃহ ছিল এবং মনোহর চিত্রশালা ও কেলিপর্ব্বত ছিল ; আর, উৎকৃষ্ট জলে পরিপূর্ণ বহুবিধ

দিঘী এবং পদ্ম ও উৎপলের সৌরভে আমোদিত হংস, কারণ্ডব ও চক্রবাকগণে পরিশোভিত মনোহর বহুতর সরোবর ছিল ॥ ৫৪-৬০ ॥

আর, সেই ইন্দ্রপ্রস্থে উপবনে পরিবেষ্টিত নানাবিধ মনোহর পুষ্করিণী এবং সুন্দর সুন্দর বহুতর বৃহৎ জলাশয় ছিল ॥

মহারাজ! ধাৰ্ম্মিক লোকে পরিপূর্ণ সেই বিশাল রাজ্যে প্রবেশ করিবার পর পাণ্ডবগণের দিন দিনই আনন্দ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র ধৰ্ম্ম অনুসারে রাজ্য দান করিলে, পাণ্ডবগণ তখন ইন্দ্রপ্রস্থবাসী হইয়া গেলেন ॥

ইন্দ্রতুল্য মহাধনুর্ধর পঞ্চ পাণ্ডব অবস্থান করিতে লাগিলেন, সেই ইন্দ্রপ্রস্থপুরী নাগরক্ষিত পাতালপুরীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

মহারাজ! পাণ্ডবগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে সংস্থাপিত করিয়া মহাবীর কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের অনুমতিক্রমে বলরামের সহিত দ্বারকায় চলিয়া গেলেন ॥ ৬১-৬৫ ॥

মহাভারতের আদিপর্বে, দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ, ১৯৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ইন্দ্রপ্রস্থই যে আজকের দিল্লী—এ বিষয়ে গবেষকগণ এক মত। ভারতের মধ্যে দিল্লী এমনই এক নগরী, এর এমনই ভাগ্য—মহাভারতীয় যুগ, আনুমানিক ৪৪৩৮ বছর আগের থেকে আজও অবিচ্ছিন্নভাবে রাজধানী হয়ে এসেছে। দীর্ঘকালীন রাজধানী হওয়ার এই গৌরব, এই ইতিহাস—ভারত তথা পৃথিবীর অন্য কোন দেশের কোন শহরই দাবী করতে পারে না। আজকের আধুনিক শহর দিল্লী অনেক উন্নত সবদিক থেকেই—তবে পৌরাণিক ইন্দ্রপ্রস্থ ওরফে দিল্লী যে কত উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল, তা মহাভারতের বর্ণনা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। সুতরাং ভারতের শিল্প সংস্কৃতি সভ্যতা ও ঐতিহ্যময় ইতিহাসের গৌরব সুদূর অতীতে যেমন ছিল—শত শত বছর ধরে যেমন চলে আসছে—আজও তা সমানে চলেছে অবিচ্ছিন্নভাবে, অপ্রতিহত গতিতে।

পুরাতত্ত্ব বিভাগের গ্রন্থ থেকে জানা গেছে, অতীত ঐতিহাসিক কাল ১৬শ শতাব্দীতে তৈরী দিল্লীর পুরনো কেল্লার জায়গায় অবস্থিত ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী। এটি বিভিন্ন কালে প্রসিদ্ধ ছিল বিভিন্ন নামে। পুরাতত্ত্ব বিভাগের অনুসন্ধান ও খনন কার্যের ফলে আরও জানা গেছে, খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে নিরন্তর বসতি চালু ছিল ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত।

যাই হোক, দিল্লীর ইতিহাস অনেক বড়—প্রাচীনও বটে। শত শত বছর ধরে দিল্লী বহুবার বহু রাজা বাদশাদের আঘাতে আহত হয়েছে, কখনও কারও শোকে ব্যথিত হয়েছে, কখনও কারও সুখে সুখী হয়েছে, তবে দিল্লী কখনও হারিয়ে, ফুরিয়ে যায়নি আজও। তাই তো সারা পৃথিবীর অগণিত পর্যটক ছুটে আসে দিল্লীতে—জানতে, দেখতে। আর ভারতের একশ্রেণীর মানুষ—যাদের দুঃখ দুর্দশার অন্ত নেই, তারা দিল্লীকে দেখতে চায় না—জানাতে চায় অভিযোগ—

চলো দিল্লী চলো। কারণ মহাভারতীয় যুগে রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে বসে সাধারণ প্রজাদের অভাব অভিযোগের কথা শুনেছিলেন রাজা যুধিষ্ঠির—যে ট্রাডিশানের পরিবর্তন হয়নি এতটুকুও—এখনও।

দিল্লীতে দেখার জায়গার অভাব নেই তবে সবগুলি দেখা যেমন সম্ভব হয় না—সবগুলি তেমন আকর্ষণীয়ও নয়। পুরাতত্ত্ব বিভাগের মতে এক হাজার তিনশোর বেশী স্মারক পাওয়া গেছে দিল্লীতে। অধিকাংশ স্মারকই রাস্তার উপরে। এগুলি ঘুরে দেখার জন্য অটো আর বাস রয়েছে অঢেল। কণ্ডাকটেড ট্যুরে বাসে করে ঘুরলে তো কোন অসুবিধেই নেই। তবে তারা বিশেষ দর্শনীয় জায়গাগুলি ছাড়া সব ঘুরিয়ে দেখায় না। কণ্ডাকটেড ট্যুরে বাসে ঘুরেছি। আর যে সব জায়গায় বাস যায়নি—সেখানে আলাদাভাবে দেখে এসেছি অটোতে, কখনও ট্যাক্সীতে। তবে ওরা ঘুরিয়েছে ওদের মর্জিমতো, তাই দর্শনীয় স্থানগুলি দেখা হয়েছে এলোমেলোভাবে। সেই কারণে দর্শনীয় জায়গাগুলির বর্ণনা দিচ্ছি এইভাবে। প্রথমেই শুরু করছি কুতুব মিনার দিয়ে—

কুতুব মিনার : ভারতের ইসলামি স্থাপত্যকলার এক অপূর্ব নিদর্শন হলো কুতুব-মিনার। তৎকালীন ইতিহাসের এক গৌরবময় সাক্ষী। ভারত বিজয়ের স্মৃতি হিসাবে এই বিজয়স্তম্ভটি নির্মাণ করেন কুতব-উদ-দিন আইবক। এ বিষয়ে মতভেদ আছে; পুরাতত্ত্ব বিভাগের অনুসন্ধানে একটি শিলালিপিতে একে আলাউদ্দিনের বিজয়স্তম্ভ হিসাবে বলা হয়েছে। আবার প্রচলিত আছে, দিল্লীর শেষ চৌহান রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান এটি নির্মাণ করেছিলেন এই ভেবে, যাতে তাঁর কন্যা প্রতিদিন পূজার্চ্চনার অঙ্গ হিসাবে এই মিনারের উপর থেকে যমুনা নদী দর্শন করতে পারে।

এটা অনুমান, কুতব-উদ-দিন আইবক কুতুব মিনারের প্রথম তলা নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। পরের দুটিতলা নির্মাণ করেন তাঁর জামাই ইলতুৎমিস্—১২১০ থেকে ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। এর পরের অংশটি নির্মিত হয় ফিরোজশাহ তুঘলকের হাতে—১৩৫৭ থেকে ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। এই মিনারের গায়ে ফার্সী এবং দেবনাগরী ভাষায় লেখা আছে, ১৩২৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দে—দু-বার বাজ পড়ায় এটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথম ক্ষতি হয়েছিল মহম্মদ তুঘলকের শাসনকালে (১৩২৫-৫১) এবং তুঘলকই মেরামত করিয়েছিলেন ১৩৩২ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয় ক্ষতি ফিরোজশাহ তুঘলক (১৩৫১-৮৮) মেরামত করেছিলেন যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে। ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে উপরের তলাটি মেরামত করিয়েছিলেন সিকন্দর লোদি (১৪৮৯-১৫১৭)।

প্রথমে মিনারটি ছিল চারতলা—লাল এবং ধূসর বেলে পাথরের। ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসনকালে উপরের তলাটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে ওখানে আরও

দুটিতলা নির্মাণ করা হয়। তিনতলাটি নির্মিত হয়েছে শ্বেত পাথরে। চারতলার নীচের অংশটি বেলে পাথরে তৈরী ছিল এবং সেটিকে রেখে দেওয়া হয়েছে ওইভাবে। প্রথম তিনতলা পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে স্বতন্ত্রভাবে—যার উপরে খোদাই করা আছে কোরানের বাণী। এই মিনারের নীচের অংশ চক্রাকারে ১৪ মিটার ব্যাস থেকে ক্রমশ সরু হয়ে একেবারে উপরে গিয়ে শেষ হয়েছে ৩ মিটার ব্যাসে। প্রথমে এটির উপরে ছাদে আচ্ছাদিত ছিল ১৩ ফুট উঁচু গম্বুজ দিয়ে। কিন্তু সেটি ভেঙে পরে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের এক ভূমিকম্পে। পরে গম্বুজাকৃতি ছাদটি পুনঃস্থাপন করেন ইংরাজ স্থপতি মেজর রোবর্ট স্মিথ। এটি করেছিলেন মোঘল শৈলীর ধারা বজায় রেখে। তবে এটি এমনই বেমানান লাগতো যে, ১৮২৯ মতান্তরে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সেটি সরিয়ে ফেলা হয় তৎকালীন গভর্ণর জেনারেলের আদেশে। বর্তমানে গম্বুজটি রাখা আছে পাশে কুতুব উদ্যানের দক্ষিণ-পশ্চিমে সবুজ মাঠের মধ্যে। পাঁচতলার এই মিনারের প্রত্যেকটি অলিন্দ ধরা আছে ব্রাকেট দিয়ে। ভিতরে চক্রাকারে সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে মোট ৩৭৯টি। মিনারের উচ্চতা ২৩৭ ফুট। নতুন দিল্লী স্টেশন থেকে কুতুবের দূরত্ব ১৭ কি. মি.।

অধিকাংশ মুসলমান রাজারাই নির্মাণ করেছিলেন কুতুব মিনার। তবে এর স্থাপত্য শিল্প-কৌশল ছিল হিন্দু শিল্পীদের। এখানকার শিলালিপি থেকে জানা গেছে, হিন্দু শিল্পীরাই এটির নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ছিল। মুসলমান স্থাপত্যের এই বিশাল ঐতিহাসিক ইমারত, এর সুন্দর শিল্পরূপ এক অবর্ণনীয় বিস্ময়ের সৃষ্টি করে পর্যটক মনে—যারা আসে এখানে, পর্যটনে।

কুতুব মিনারের কাছেই পূর্বদিকে রয়েছে একটি সুন্দর দরজা। লাল পাথরে নির্মিত এই দরজাটির নাম 'আলাই দরওয়াজা'। ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন আলাউদ্দিন খিলজী। দরজার উপর সুন্দর খোদাইয়ের কাজ দেখার মতো।

আলাই দরওয়াজার পূর্বদিকে রয়েছে সম্রাট হুমায়ুনের সময়ে তৈরী ইমাম জামিনের সমাধিক্ষেত্র। পয়গম্বর হাসান-হোসেনের বংশধর ছিলেন তিনি। সিকন্দর লোদির শাসনকালে উল-ইসলাম মসজিদের ইমাম হয়ে এসেছিলেন তুর্কিস্থান থেকে। লাল পাথরে নির্মিত এই সমাধিক্ষেত্রের গম্বুজটি অষ্টকোণাকৃতি।

কুতুব-উদ্যানে রয়েছে একটি সূর্যঘড়ি। এটি মিঃ গার্ডন সেডরসন-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে—যিনি একসময় ছিলেন আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সুপারিনটেনডেন্ট। গার্ডন সাহেব দর্শকদের সুবিধার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে তৈরী করেছিলেন এই কুতুব-উদ্যান—১৯১০ থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের যুদ্ধে প্রথমে আহত হয়ে পরে তিনি মারা যান। এর উপরে ইংরাজীতে লেখা আছে—যার অর্থ হলো, 'ছায়া চলে যায় কিন্তু প্রকাশ থেকে যায়।'

ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলেও একসময় এর ভিতরে ছিল সুন্দর রাজপ্রাসাদ, ৭টি পাথরে বাঁধানো গভীর জলাশয়, জামা মসজিদ, যুদ্ধের উপযোগী বিরাট প্রাচীর ইত্যাদি। সম্পূর্ণ দুর্গটি নির্মিত হয়েছিল মার্বেল এবং বেলে পাথর দিয়ে। সময় লেগেছিল দু-বছর। তবে এই দুর্গটি নির্মাণের পর থেকে বছর সাতেকের মধ্যেই ক্রমশ ধ্বংসের পথে চলে যায়। এমনটি হওয়ার পিছনে রয়েছে একটি প্রবাদ। তৎকালীন বিখ্যাত পীর ছিলেন নিজামউদ্দিন চিস্তি। সম্রাটের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ পীরের অভিশাপেই নাকি দ্রুত ধ্বংস হয়ে যায় এই দুর্গটি।

তুঘলকাবাদ দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রয়েছে আদিলাবাদ দুর্গ। ১৩২১-৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এটিও নির্মাণ করেছিলেন মহম্মদ তুঘলক। তুঘলকাবাদের বিপরীতে রয়েছে গিয়াসুদ্দিনের সুরম্য সমাধিস্থল—যেটি মধ্যযুগের সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে ভ্রমণপিয়াসীদের কাছে।

হুমায়ুনের সমাধি : দিল্লী শহর থেকে প্রায় ৫ কি.মি. দূরেই রয়েছে হুমায়ুনের সমাধিসৌধ। তাজমহলের পূর্বসূরী সুন্দর এই সমাধিক্ষেত্রটি একটি বড় উদ্যানের মাঝখানেই অবস্থান করছে। উঁচু পাঁচিলে ঘেরা এর চারপাশ। নিজের কবরের জন্য মৃত্যুর পূর্বেই হুমায়ুন বেছে নিয়েছিলেন এই স্থানটি। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই সমাধিসৌধটি নির্মাণ করেন হুমায়ুনের বিধবা পত্নী হামিদা বেগম ওরফে হাজী বেগম। পরবর্তীকালে এখানেই সমাধিস্থ করা হয় বেগমকেও।

হুমায়ুনের কবরটি মূল সমাধিভবনের মাঝখানে, গম্বুজের নীচে। চারদিকে রয়েছে সুন্দর ও রমণীয় শ্বেত পাথরের গম্বুজ। পারসীয় আদলে লাল বেলে পাথর আর মার্বেল পাথরের সমন্বয়েই গড়ে তোলা হয়েছে এই সমাধিক্ষেত্র। এখানেই সমাধি দেয়া হয়েছে দারা, সুজা, মুরাদ, ফারুক শায়র, আলমগীর (দ্বিতীয়) এবং জহাদার শাহকে। মোঘল স্থাপত্যের এক অনবদ্য অবদান কিন্তু এই হুমায়ুনের সমাধিসৌধ।

সুরম্য এই সমাধিসৌধের কাছে রয়েছে ঈশা খান এবং শেখ নিজামুদ্দিন চিস্তির সমাধি মন্দির—যিনি ছিলেন চিস্তি সম্প্রদায়ের চতুর্থ গুরু। এছাড়াও রয়েছে আলাউদ্দিন খিলজি নির্মিত মসজিদ, শাজাহান কন্যা জাহানারা এবং প্রসিদ্ধ উর্দু কবি মির্জা গালিবের সমাধিসৌধ।

সফদর জং-এর সমাধি : কুতুব মিনার এবং বিমান বন্দরের মাঝখানে অরবিন্দ মার্গে প্রধান সড়কের পাশেই সুন্দর একটি বাগানের মধ্যে রয়েছে আহমদ্ শাহ-এর প্রধান মন্ত্রী সফদরজং-এর সমাধিসৌধ। দিল্লী শহর থেকে দূরত্ব এর প্রায় ৯ কি. মি.। হুমায়ুনের সমাধিসৌধের অনুকরণে পিতা সফদরজং-এর স্মৃতিতে এটি নির্মাণ করেন পুত্র নবাব সুজা-উ-দোলা—১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। মুসলিম সমাধিগুলির মধ্যে এটিই একেবারে শেষ সমাধিসৌধ। এই স্মারকটির বারান্দা

বাগান থেকে ১০ ফুট উঁচুতে। সমাধি ভবনের ভিতরে কবরটির উচ্চতা ৪০ ফুট। মার্বেল-খচিত চারটি আজান মিনার রয়েছে ভবনের চারকোণে। মোঘল স্থাপত্যের মূর্ত প্রতীক এই সফদরজং সমাধিসৌধ—যেটি দিল্লীর দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম আকর্ষণ।

এর কাছেই রয়েছে পুত্র ইব্রাহিম লোদি নির্মিত পিতা সিকন্দর শাহ্ লোদীর সমাধিক্ষেত্র—যেটি লোদী স্থাপত্যের এক অনবদ্য উদাহরণ। এই সমাধিসৌধটি অষ্টকোণাকৃতি। এর গম্বুজটি ৫৪ ফুট উঁচু। ইব্রাহিম এটি নির্মাণ করেন ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে। মার্বেল টালির বৈচিত্র্যই এই সমাধিসৌধের মূল আকর্ষণ।

সুরজকুণ্ড ঃ দিল্লী শহর থেকে ১৭ কি. মি. দূরে সুরজকুণ্ড। কুতুব ছাড়িয়ে—তুঘলকাবাদ থেকে বেশী দূরে নয়। সুরজকুণ্ড রাজপুত রাজা সুরজপালের কীর্তি। ৬ একর জায়গা জুড়ে এই কুণ্ডটি তৈরী করা হয়েছিল ৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। পাশেই রয়েছে সূর্যদেবের মন্দির। কুণ্ডে এখন জল নেই। এখানে প্রতি বছর মে-জুন মাসে মেলা বসে।

বিড়লা মন্দির ঃ দিল্লীর মন্দির মার্গের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরটি সারাদেশে বিড়লা মন্দির নামেই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনটি ভাগে বিভক্ত মন্দির। মাঝের মণ্ডপটি স্থাপিত হয়েছে একটি উঁচু বেদির উপরে—যেখানে রয়েছে দুধ সাদা পাথরের লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ। বাঁয়ে সিংহবাহিনী অম্বিকা দেবী। ডানদিকে শিব মূর্তি। এসবই নির্মিত হয়েছে পাথর দিয়ে। মূল লক্ষ্মীনারায়ণ মণ্ডপের ডানদিকের মণ্ডপটি গীতাভবন এবং বাঁদিকে রয়েছে সুন্দর একটি বুদ্ধ-মন্দির। গীতাভবনে স্থাপিত আছে ভগবান কৃষ্ণের মনোহর মর্মর মূর্তি। কাচের আয়না লাগানো রয়েছে দেয়ালে—একেবারে শীশমহল। এখানে সুন্দর একটি কথা লেখা আছে—'ঈশ্বর একজনই, শুধু পূজাপদ্ধতিগুলি আলাদা।' উড়িষ্যা স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত এই মন্দিরের দেয়ালের কারুকার্যগুলিও বড় সুন্দর। দেয়ালে এবং উপর তলার গ্যালারিতে চিত্রিত হয়েছে অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনী।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ এই মন্দিরের শিলান্যাস করেন ধোলপুরের রাজা উদয়ভান সিংহ। মন্দির নির্মাণ করেন বলদেব দাস বিড়লা। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ এই লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের দ্বার উদঘাটন করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। ভারতের প্রায় সমস্ত হিন্দু মন্দিরেই বিদেশীদের প্রবেশ নিষেধ, কিন্তু এখানে তা নয়। দেশী বিদেশী সমস্ত পর্যটকদের অবাধ প্রবেশ, তবে এখন সকলকেই যেতে হবে মেটাল ডিডেকটার অতিক্রম করে।

দিল্লীর কালী বাড়ি ঃ বিড়লা মন্দিরের পাশেই মন্দির মার্গে দিল্লী কালী বাড়ি। বাঙালীদের কাছে এই কালী বাড়ির আকর্ষণ কম নয়। অপূর্ব সুন্দর নাট মন্দির যুক্ত এই মন্দিরে স্থাপিত রয়েছে মাঝারী আকারের দেবী কালিকার কালো পাথরের সুসজ্জিত বিগ্রহ। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল এই মন্দিরের ভিত্তি

স্থাপন করেন স্যার নৃপেন্দ্র নাথ সরকার। এখানকার যাত্রী নিবাসে ভ্রমণার্থীদের স্বল্প খরচে থাকা খাওয়ার ভালো ব্যবস্থা আগেও ছিল—এখনও আছে।

ফিরোজ শাহ কোটলা : পুরনো দিল্লীর উপকণ্ঠে দক্ষিণ গেটের কাছে এই নগরী। এখন এখানে খেলার মাঠ। এককালে এর নাম ছিল ফিরোজাবাদ। ১৩৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ফিরোজ শাহ তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন এখানে। ফিরোজাবাদ নাম বদল করে জায়গার নাম রেখেছিলেন নিজের নামে। ঐতিহাসিক এই নগরীর সবই এখন পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে। অথচ এককালে এখানে ছিল মসজিদ, পুকুর, দিওয়ান-ই-খাস, জানানা মহল, রাজপ্রাসাদ—সবই। এখানকার অশোক স্তম্ভটিও দেখার মতো। হালকা কমলা বেলে পাথরে নির্মিত স্তম্ভটির ওজন ২৭ মণ। উচ্চতায় ৪২ ফুট ৭ ইঞ্চি। বহু পূর্বে এটি ছিল আম্বালা জেলার টোপরা গ্রামে। ফিরোজ শাহ স্তম্ভটিকে আম্বালা থেকে নিয়ে আসেন এই ফিরোজাবাদে—১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় স্তম্ভটিকে ভেঙে দেয়া হয়—টুকরো হয়ে যায় পাঁচটি। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে আবার জোড়া দেয়া হয়। এটি রয়েছে বিশাল ভবনের বৃত্তাকার বারান্দায়।

একটি বিরাট সরোবর খনন করিয়েছিলেন ফিরোজ শাহ। বর্তমানে এই সরোবরের পাড়েই রয়েছে কলেজ—যেখানে চিরশয্যায় শায়িত রয়েছে ফিরোজের মরদেহ। দিল্লী শহর থেকে এর দূরত্ব প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার।

ইণ্ডিয়া গেট : দিল্লীর কিংস রোডের পূর্ব প্রান্তে রয়েছে ভারতের গর্ব ইণ্ডিয়া গেট। শহর থেকে দূরত্ব এর প্রায় আড়াই কিলোমিটার। ১৩০ ফুট উঁচু এই তোরণটি নির্মিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত প্রায় ৯০,০০০ ভারতীয় যোদ্ধাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। এই তোরণটির পাশেই রয়েছে চারটি অনির্বাণ শিখা—যা অবিরত শ্রদ্ধা জানিয়ে চলেছে সেই মহান সৈনিকদের উদ্দেশ্যে। তোরণের দু-পাশে কাটা খাল চলে গেছে একেবারে মহাকরণ পর্যন্ত। নৌকা বাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে এই খালে।

যন্তর মন্তর : নতুন দিল্লীর পার্লামেণ্ট স্ট্রীটের উপর রয়েছে মানমন্দির। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন জয়পুরের মহারাজা জয়সিংহ। উজ্জয়িনী এবং জয়পুরেও রয়েছে মানমন্দির। চন্দ্র সূর্য এবং বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করা এবং সময় পরিমাপক যন্ত্র—মানমন্দির।

রাজঘাট : দিল্লী গেটের বাইরে ফিরোজ শাহ কোটলার মাঠ আর লালকেল্লার মধ্যে যমুনানদীর তীরে রিং রোডে মহাত্মা গান্ধীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী। মহাত্মার স্মৃতির উদ্দেশ্যেই এখানে নির্মিত হয়েছে তাঁর সমাধিবেদি। চারদিক পাঁচিলে ঘেরা মনোরম বাগান—শান্ত নির্জন পরিবেশ। সমাধিবেদির উপরে লেখা রয়েছে—'হায় রাম'। দেশী-বিদেশী পর্যটকরা এখানে আসেন মহাত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে। রাজঘাটের কাছেই রয়েছে গান্ধী স্মারক

সংগ্রহশালা। দিল্লী ভ্রমণে এলে পর্যটকমাত্রই এসে থাকেন এখানে। এই সংগ্রহশালায় রয়েছে মহাত্মা গান্ধীর ব্যবহার করা চটি, চরকা, জেলে ব্যবহৃত বাসনপত্র, রাজকোটে থাকাকালীন তিনি অনশন করেছিলেন ২১ দিন—তারপর অনশন ভেঙে যে গেলাসে ফলের রস পান করেছিলেন—সেই গেলাস, যে লাঠি নিয়ে তিনি চলতেন—সেই লাঠি, মাথার টুপি, বিভিন্ন বইপত্র, তাঁর জীবনের নানা সময়ের নানা ঘটনার স্মৃতি-চিত্র, মৃত্যুর সময় যে জামাটি তাঁর পরা ছিল—সেই রক্তমাখা জামা, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল গান্ধীজীকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি ইত্যাদি সযত্নে রক্ষিত আছে এই স্মারক সংগ্রহশালায়। গান্ধী সাহিত্যের উপর রয়েছে একটি পুস্তকালয়। শহর কেন্দ্র থেকে দূরত্ব এর ৪ কি.মি.।

বাহাই মন্দির : কালকাজী মন্দিরের পাশে বাহাই সম্প্রদায় কর্তৃক নির্মিত হয়েছে একটি পদ্মফুলের মতো মন্দির—লোটাস টেম্পল। এখানে একটি হলঘরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ সমবেত হয়ে প্রার্থনা করে। সমগ্র দিল্লী শহরে ইদানিংকালে এমন সুন্দর মন্দির আর নির্মিত হয়নি।

ডলস্ মিউজিয়াম : আন্তর্জাতিক এই পুতুল সংগ্রহশালাটি দেখার মতো। বাচ্চাদের তো ভালো লাগবেই—বুড়োদেরও। সংগ্রহশালাটি বাহাদুর শাহ জাফর মার্গে অবস্থিত। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করে আনা হয়েছে প্রায় ৫০০০ বিভিন্ন ধরনের পুতুল। তার মধ্যে জাপানী পুতুলগুলি দর্শকদের চমক লাগিয়ে দেয়ার মতো।

শান্তিবন : রাজঘাটের কাছেই রিং রোডে রয়েছে শান্তিবন। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় এখানে। একটি সমাধিবেদিও গড়ে তোলা হয়েছে সুন্দরভাবে। এর চারপাশে রয়েছে সুন্দর প্রাঙ্গণ। শহর থেকে দূরত্ব এর প্রায় সাড়ে ৪ কি.মি.।

বিজয় ঘাট : ভারতের দ্বিতীয় প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মরদেহ ভস্মীভূত হয় এই বিজয় ঘাটে—১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁরই উদ্দেশ্যে এখানে নির্মিত হয়েছে সমাধিবেদি। শান্তিবনের কাছেই বিজয় ঘাট।

শক্তিস্থল : কনডাক্টেড ট্যুরের বাসওয়ালারা পর্যটকদের এমনভাবে বলে, মনে হয় যেন শান্তিবন, রাজঘাট, শক্তিস্থল ইত্যাদি দর্শনীয় স্থানগুলি একটার থেকে আর একটা অনেক দূরে—বিভিন্ন জায়গায়। আসলে এগুলি সব শান্তিবনে পাশাপাশি। যেমন শান্তিবনেই রাজঘাট, শান্তিবনেই ইন্দিরা গান্ধীর স্মৃতিতে গড়ে তোলা হয়েছে শক্তিস্থল। ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর গুলিবিদ্ধ ইন্দিরার দেহ তিনদিন পরে এখানেই ভস্মীভূত হয়। এখান থেকে একটু দূরেই কিষাণ ঘাটে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় একদা প্রধান মন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিংহের।

ইন্দিরা স্মৃতি : ১নং, সফদরজং রোড—প্রধান মন্ত্রী থাকাকালীন ইন্দিরা বাস করতেন এই বাড়ীতেই। পাঁচিলে ঘেরা বাগান বাড়ী। এই বাড়ীতেই দেহরক্ষীর

গ্বলিতে নিহত হয়েছিলেন তিনি। এখন এটি ইন্দিরা স্মৃতি স্থল। এখানে রয়েছে গ্বলিতে বিদ্ধ হওয়ার সময় যে কাপড়টি তাঁর পরা ছিল—সেই রক্তমাখা কাপড়, পায়ের চটি, বিভিন্ন দেশ থেকে পাওয়া নানা ম্বল্যবান উপহার, তাঁর ব্যবহৃত নানা দ্রব্য, মৃত্যুর পরদিন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নানা ভাষায় প্রকাশিত মৃত্যু সংবাদের সংবাদপত্রের প্রতিলিপি। এই সংরক্ষণশালায় ঢ্বকলে পর্যটকমাত্রেরই মনটা যেন কেমন হয়ে যায়।

তিনম্বর্তি ভবন : ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহের্বর বাসভবন। সামনেই স্বন্দর বাগান। বর্তমানে এটি হয়েছে নেহের্ব স্মারক সংগ্রহশালা। এই সংগ্রহশালায় রয়েছে তাঁর ব্যবহৃত নানা জিনিষপত্র এবং জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণের অসংখ্য আলোক স্মৃতিচিত্র।

গান্ধী সদন : নতুন দিল্লীতে ৫নং তিরিশে জান্বয়ারী মার্গে রয়েছে গান্ধী সদন। বর্তমানে এটি পর্যটকদের একটি দর্শনীয় স্থান। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জান্বয়ারী এখানে গান্ধীজীকে গ্বলি করে হত্যা করেন নাথ্বরাম গডসে। মৃত্যুর তারিখকে ভিত্তি করেই রাস্তার নাম হয়েছে তিরিশে জান্বয়ারী মার্গ।

প্বরনো কেল্লা : উঁচু প্রাচীরে ঘেরা দ্বর্গ। হ্বমায়্বনের সমাধিসৌধ থেকে দ্বরত্ব এর মাত্র মাইল খানেক। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট হ্বমায়্বন এই দ্বর্গের নির্মাণ শ্বর্ব করেছিলেন বটে, তবে শেষ করতে পারেননি। পরবর্তীকালে শেরশাহের হাতেই শেষ হয় এর নির্মাণ কার্য—১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। এই দ্বর্গের প্রধান প্রবেশদ্বার রয়েছে তিনটি। এক মাইলেরও কিছ্ব বেশী এলাকা জ্বড়েই এককালের ইন্দ্রপ্রস্থের উপরেই গড়ে তোলা হয়েছে এই দ্বর্গ। বর্তমানে দ্বর্গটি ধ্বংসের পথে। ভিতরে রয়েছে ইন্দো-আফগান স্থাপত্যরীতির অন্বকরণে নির্মিত শের মসজিদ এবং শের মঞ্জিল বা শের মণ্ডপ। অতীতে হ্বমায়্বনের পাঠগৃহ ছিল এই শের মঞ্জিল। একদা শের মসজিদের মোয়াজ্জেমের আজান কানে আসতেই উপাসনার জন্য শের মঞ্জিলের সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকেন সম্রাট হ্বমায়্বন। হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে এই প্বরনো কেল্লায়।

আরও একটি স্বন্দর নগর নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন সম্রাট শেরশাহ—এই প্বরনো কেল্লারই কাছে। বাস্তবে তা র্বপ পায়নি। শ্বধ্বমাত্র তৈরী হয়েছিল 'লাল দরওয়াজা' আর প্রাচীর—১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে। অসমাপ্ত এগ্বলি পড়ে আছে আজও।

এই প্বরনো কেল্লার তিনটি প্রবেশ পথের মধ্যে ফিরোজ শাহ কোটলার দিকে যে প্রবেশ দ্বারটি—তার নাম খ্বনী দরওয়াজা। এই দরওয়াজাটি হয়ে আছে ইতিহাস খ্যাত। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় তৎকালীন ইংরাজ সেনাপতি লেফ্‌টেন্যান্ট হাডসন ক্ষিপ্ত হয়ে শেষ মোঘলবাদশা বাহাদ্বর শাহ ইংরাজদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেও তাঁর প্বত্র ও অন্যান্য বংশধরদের নির্মমভাবে হত্যা

করে তাদের দেহগুলিকে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন এই প্রবেশদ্বারে। হুমায়ুনের সমাধির কাছেই এই পুরনো কেল্লা অথচ কোন ভ্রমণকারী প্রতিষ্ঠান এবং কনডাকটেড ট্যুরের বাস এই কেল্লায় নিয়ে যায় না—সময় বাঁচানোর তাগিদে।

জামা মসজিদ : লালকেল্লা থেকে সামান্য দূরে সম্রাট শাজাহানের শেষ কীর্তি জামা মসজিদ। ভারতে অবস্থিত অন্যান্য মসজিদগুলির মধ্যে এটিই সর্বাপেক্ষা বড় এবং প্রসিদ্ধ। ফতেপুর সিক্রির মসজিদের সঙ্গেই এর তুলনা করা চলে। শাজাহান এটির নির্মাণ শেষ করেন ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। তৎকালীন এর নির্মাণ ব্যয় হয় প্রায় ১০ কোটি টাকা। আগ্রা দুর্গের মোতি মসজিদের সঙ্গে এই জামা মসজিদের গঠন ও শিল্পশৈলীর অনেক মিল আছে। এই মসজিদের কিছু কাজ অসম্পূর্ণ ছিল—যে কাজ ঔরঙ্গজেব সম্পূর্ণ করেছিলেন ৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। এই মসজিদ নির্মাণ করতে সময় লেগেছিল টানা পাঁচ বছর এবং প্রতিদিন কাজ করেছিল পাঁচ হাজার কারিগর। এটি নির্মিত হয়েছে শ্বেত এবং লাল বেলে পাথরে। ১৮১৭ এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কিছু মেরামতির কাজ হয়েছিল। তারপর ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে আরও একবার মেরামত করা হয়—করেছিলেন রামপুর জায়গীরের নবাব শাহিব। তখন খরচ হয়েছিল লক্ষাধিক টাকা।

মসজিদটি লম্বায় ২০১ ফুট, চওড়ায় ১২০ ফুট। গম্বুজের মাঝের অংশের উচ্চতা ২০১ ফুট। তিনটি প্রবেশদ্বার রয়েছে মসজিদে। পূর্বদ্বারটি সবচেয়ে বড়—নাম বাদশাহি দরওয়াজা। এটি দিয়েই সম্রাট প্রবেশ করতেন নমাজ পড়ার জন্যে। ৩৯টি সিঁড়ি ভেঙে ঢুকতে হয় মসজিদে। ১৩০ ফুট করে উঁচু আজান মিনার আছে দুটি। এক সঙ্গে কমপক্ষে পঁচিশ হাজার লোকের উপাসনার মতো জায়গা রয়েছে এই মসজিদে। এখানে সযত্নে সংরক্ষিত আছে হজরত মহম্মদের দাড়ির একটা কেশ, পায়ের চটি, কোরানের একটি অধ্যায়, অতীতে তাঁর সমাধিক্ষেত্রের উপরে ঢাকা দেয়া থাকতো যে সবুজ চাঁদোয়া—সেটি, এবং পাথরের উপর তাঁর পায়ের চিহ্ন।

দিল্লী ভ্রমণে গিয়ে জামা মসজিদ না দেখলে মোঘল স্থাপত্যের একটা বড় নিদর্শন বাদ পরে যাবে পর্যটকদের।

দিগম্বর জৈন মন্দির : মোঘল বাদশাদের সাজানো দিল্লীকে আরও সুন্দর পবিত্র করে তুলেছে লালকেল্লার সামনে চাঁদনীচকের প্রবেশপথে ধরমপুরায় এই জৈন মন্দির। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন ধর্মপ্রাণ হরবংশরাই সুগনচাঁদ ভগবান পার্শ্বনাথের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে মন্দিরে। তৎকালীন এটির নির্মাণে ব্যয় হয় প্রায় ৮ লক্ষ টাকা। মোঘল স্থাপত্য শিল্পের পাশে হিন্দু শিল্প-রীতিতে গড়ে তোলা এই জৈন মন্দির যেন আরও সুশোভিত করেছে দিল্লীকে। এই মন্দিরের পাঁচটি গম্বুজ, সুঅলংকৃত ছাদ এবং দেয়াল, কারুকার্যখচিত মার্বেল স্তম্ভগুলির শিল্পকলা হিন্দুশিল্পীদের হাতে একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

এগুলি ছাড়াও সমগ্র দিল্লীতে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র দর্শনীয় স্থান। যেমন, দিল্লী-

মথুরা রোডে পুরনো কেল্লার পাশে প্রগতি ময়দান, ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রগতি ময়দানের আপ্পুঘর, পুরনো কেল্লার কাছে মথুরা রোডে চিড়িয়াখানা, ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত গুরগাঁও রোডে বুদ্ধ জয়ন্তী পার্ক, দিল্লীর জনপথ এবং রাজপথ চৌরাস্তার পাশে রাষ্ট্রীয় সংগ্রহশালা—যেখানে প্রাচীন ভারতের কলা এবং পুরাতত্ত্ব সম্পর্কীয় বিষয়গুলি সংরক্ষিত আছে, এর কাছেই জনপথের দক্ষিণ পাশে মধ্য এশিয়া পুরাতন সংগ্রহশালা, রাজঘাটের উত্তরদিকে যুব প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সমাধিস্থল, গুরুদ্বার শীশ গঞ্জ—এর কাছেই সুনহরি মসজিদ, দিল্লীর নগর নিগমের কার্যালয় ও দিল্লী জনপদের প্রশাসন কেন্দ্র টাউন হল, গৌরীশংকর মন্দির, কুতুবের পাশে ছত্তরপুরের রাস্তায় অহিংস স্থল—যেখানে প্রতিষ্ঠিত আছে ভগবান মহাবীর স্বামীর বিগ্রহ, লালকেল্লার সামনেই পুরনো দিল্লীর বিখ্যাত বাজার জাহানারা বেগমের চাঁদনী চক, নতুন দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভবনের কাছে কেন্দ্রিয় সচিবালয়ের বিশাল ভবন—যেটির শিলান্যাস করেছিলেন পঞ্চম জর্জ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ইমারতগুলির মধ্যে অন্যতম একটি ভারতের গৌরবপূর্ণ রাষ্ট্রপতি ভবন, নতুন দিল্লীতে আধুনিক ঢঙে নির্মিত কেন্দ্রিয় ব্যবসা স্থল কনট প্লেস—এর অদূরেই সংসদ ভবন, আধুনিক স্থাপত্যের আদলে গড়ে ওঠা চাণক্যপুরী, ওখলা স্টেশনের কাছে প্রাচীন এবং ঐতিহ্যময় কালীমন্দির—কালকাজী মন্দির, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মথুরা রোডে তিলক ব্রীজের কাছে নির্মিত প্রধান বিচারালয় —সুপ্রীম কোর্টভবন, ইন্ডিয়া গেটের কাছে জয়পুর ভবনে ন্যাশনাল গ্যালারি অব মর্ডান আর্ট, হুমায়ুনের সমাধিস্থল থেকে সামান্য দূরে যমুনাতীরে পান্ডবদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত মিউটিনি মেমোরিয়াল—যেটি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের স্মারক, ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের পালিত ভ্রাতা আজিজ কোকলতাস নির্মিত মথুরা রোডে চিশ্তি নিজামুদ্দিনের দরগার কাছে ৬৪টি হলযুক্ত বৌসনাথ খাম্বা, সফদরজং বিমান বন্দরের কাছে আলাউদ্দিন খিলজী নির্মিত বিশাল জলাশয়—হৌজখাস, তুর্কম্যান গেটে ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে ফিরোজ শাহ নির্মিত কাল্লান মসজিদ, সবুজমণ্ডির ক্লক টাওয়ারের সামনে রোশেনারার বাগান ছাড়াও দিল্লীতে দর্শনীয় জায়গার যেন আর শেষ নেই। কনডাক্টেড ট্যুরের বাস এবং ভারতের ছোট বড় কোন ভ্রমণকারী প্রতিষ্ঠানই দিল্লীর সমস্ত দর্শনীয় জায়গাগুলি ঘুরিয়ে দেখায় না। এদের সঙ্গে ঘুরলে কিছু জায়গা বাদ থেকেই যাবে। আলাদাভাবে গাঁটের কড়ি খরচা করে ঘুরলে দেখা হবে সবই।

শাজাহানের অমর কীর্তি লালকেল্লা

আমাদের বাস এসে দাঁড়ালো লালকেল্লার সামনে—যেখানে অসংখ্য ট্যুরিস্ট বাস এসে দাঁড়ায়। অটোতেও আসা যায় এখানে। পুরনো দিল্লীতেই লালকেল্লা। নতুন দিল্লী থেকে দূরত্ব এর প্রায় সাড়ে ছয় কিলোমিটার। এই কেল্লার সামনেটা একেবারে জমজমাট হয়ে রয়েছে বাস মোটর অটো ঝালমুড়ি ভেলপুরী ফুচকা আর বিভিন্ন মুখরোচক খাবারের দোকানে।

বাস থেকে নেমে এসে দাঁড়ালাম লালকেল্লার প্রবেশদ্বারের সামনে। এই কেল্লায় প্রবেশদ্বার রয়েছে দুটি। চাঁদনী চকের দিকে প্রধান তোরণ লাহোর গেট। সামান্য একটু এগোলেই আরও একটি প্রবেশদ্বার—যেটি দেখে একদা সম্রাট শাজাহান লিখেছিলেন ঔরঙ্গজেবকে, "তুমি লালকেল্লাকে স্ত্রীর মতো বানিয়ে তার উপরে টেনে দিয়েছো ঘোমটা।" লাহোর গেটের পরের দ্বারটি নির্মাণ করেছিলেন ঔরঙ্গজেব। লালকেল্লার দরজার উপর রয়েছে মীনা করা সুন্দর কাজ—যা পর্যটকদের আকর্ষণ করে। এক সময় এই লাহোর দ্বার দিয়েই বাহাদুর শাহ জাফর যাতায়াত করতেন তাঁর প্রিয় হাতি 'জংবাহাদুর'-এর পিঠে চড়ে।

লালকেল্লার আরও একটি বিশাল সুন্দর তোরণ দ্বার রয়েছে—যেটি দিল্লী দ্বার নামে প্রসিদ্ধ। পুরনো দিল্লীর দিক থেকে খোলা। এই তোরণ দ্বারের আরও একটি নাম শাহী দ্বার। মোগল আমলে সম্রাট শাজাহান এই দ্বার হয়ে জামা মসজিদের শাহাজাহানী দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতেন নামাজ পড়ার জন্য। লাহোর দ্বারের মতোই দেখতে দিল্লী দ্বার। দুটি দ্বারই যেমন বিশাল—তেমনই সুন্দর লাল পাথরে নির্মিত। দিল্লী দ্বার দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে দুটি বড় বড় কালো রঙের হাতি—যেগুলি একসময় ভেঙে দিয়েছিলেন সম্রাট ঔরঙ্গজেব। পরবর্তীকালে, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে পুরনো দিনের ঐতিহ্য বজায় রাখতে আবার নতুন করে নির্মাণ করেন লর্ড কার্জন। দিল্লী দ্বারের অনেক সৌন্দর্য বেড়েছে এই হাতি দুটির জন্যে। তবে ভ্রমণকারী বা পর্যটকেরা সকলেই লালকেল্লায় প্রবেশ করেন লাহোর দ্বার দিয়ে। দুটি দ্বারেই রয়েছে অর্ধগোলাকৃতি খিলান আর মার্বেল পাথরের গম্বুজ।

এই লাহোর দ্বার দিয়ে প্রবেশ করার আগেই রয়েছে টিকিট ঘর। লালকেল্লা দেখতে হলে টিকিট কাটতে হবে। টিকিট কেটেই ঢুকেছি। দুটি সংগ্রহশালা আছে এই কেল্লায়—বন্ধ থাকে প্রতি শুক্রবার।

শাজাহানের রাজত্বকাল ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। সম্রাট শাজাহান আগ্রার সিংহাসনে বসার প্রায় এগারো বছর পর ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে

আগ্রা থেকে রাজধানী নিয়ে আসেন দিল্লীতে। অনেকের মতে, প্রাণপ্রিয়া মমতাজের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ বাদশা তাজমহল নির্মাণ করলেও তাঁর আগ্রাতে মন বসেনি বলেই তিনি রাজধানী নিয়ে আসেন দিল্লীতে। আবার অনেকের মত, নিজের পছন্দ মতো নতুন নতুন ইমারত গড়ার ইচ্ছা ছিল শাজাহানের কিন্তু আগ্রায় অত জায়গা ছিল না বলেই তিনি চলে আসেন দিল্লীতে। পার্ষদদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি এমন এক কেল্লা নির্মাণে হাত দিলেন, যেটি আগ্রা এবং লাহোরের দুর্গের তুলনায় অনেক বেশী উন্নত ও ঐতিহ্যপূর্ণ। লালকেল্লার পর সারা ভারতে আর এমন দুর্গ কেউ কোথাও নির্মাণ করতে সক্ষম হননি।

যমুনা নদীর ডানতীরে, পুরনো দিল্লীর পূর্বদিকে চাঁদনী চকের সামনে, লাল বেলে পাথরে মোঘলী স্থাপত্যের এক অনবদ্য নিদর্শনের এই লালকেল্লার নির্মাণ কাজ শাজাহান শুরু করেন ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল। রণকৌশল পদ্ধতিতেই এই কেল্লাটি তিনি গড়ে ছিলেন। পিছনে যমুনা পেরিয়ে শত্রুসেনার পক্ষে দুর্গ আক্রমণ করা যেমন কোনভাবেই সম্ভব ছিলনা—তেমনই সামনে থেকে আক্রমণ করা ছিল অসম্ভব, কারণ এই কেল্লার চারপাশ ঘেরা রয়েছে ৯০ ফুট উঁচু লাল পাথরের প্রাচীর দিয়ে—একই সঙ্গে রয়েছে কেল্লার পাশে ৩০ ফুট গভীর পরিখা যেগুলি যুদ্ধের সময় ভরে দেয়া হতো জলে। তৎকালীন এক কোটি টাকার উপরে ব্যয় হয়েছিল এই কেল্লা নির্মাণে। সিংহাসনে বসার একুশতম বৎসরে সম্রাট শাজাহানের দিল্লীর বুকে প্রথম কীর্তি লালকেল্লা উন্মোচিত হয় ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল। মতান্তরে ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে।

অতীতে অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে লালকেল্লা, তাই আজ নিজেই একটা ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতবাসী তথা সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটকদের কাছে। ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দের এক বড় ভূমিকম্পে কিছু ক্ষতি হলেও অতীত ইতিহাসের সাক্ষী লালকেল্লাকে লুটিয়ে দিতে পারেনি প্রাকৃতিক বিপর্যয়।

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহ আক্রমণ করলেন লালকেল্লা। নিজের জোরে ৫৭ দিন এই কেল্লায় অবস্থান ও বিশ্রাম করেন। এই নাদির শাহ-ই চাঁদনী চকের নামী সুনহরী মসজিদের উপর তিনদিন বসেছিলেন খোলা তলওয়ার নিয়ে। হত্যা করেছিলেন অসংখ্য নির্দোষ মানুষকে। এই লালকেল্লাতেই তৎকালীন মোঘল বাদশা মুহম্মদ শাহ রংগীলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন মহামূল্যবান ময়ূর সিংহাসন—(যেটির তৎকালীন মূল্য প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউন্ড) জহরত, মূল্যবান পাথর এবং অজস্র সোনার মোহর। একই সঙ্গে সম্রাট কন্যাকে বন্দী করেন। এই কেল্লাতেই কাদির রুহেলা তাঁর অসহায় আপন কাকা বাদশা শাহ আলমের চোখ দুটো উপড়ে নিয়েছিলেন। এক সময় মোঘল রাজকুমারের মাথা কেটে পেশ করা হয়েছিল বাদশা বাহাদুর শাহ জাফরের সামনে। এরপর ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠী, ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে রোহিলাদের আক্রমণ এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী

বিদ্রোহের বিট্রিশ সৈন্যের এই লালকেল্লায় আশ্রয় অনেক কিছু ক্ষতি করেছে। তবুও এই কেল্লা দাঁড়িয়ে আছে অতীত ইতিহাসকে অস্বীকার না করে—নিজের পায়ে। এখনও ভেঙে পড়েনি কারণ এর ইতিহাসের ভিত বড় শক্ত যে!

মোঘল ইতিহাসের এই সব কথা ভাবতে ভাবতেই লাহোর দ্বার পেরিয়ে এলাম সুন্দর একটি বাজার 'ছত্তা চক'-এ। এই বাজারের আরও একটি নাম—মীনা বাজার। এই বাজারের দুপাশে রয়েছে অসংখ্য দোকান। দোকানের উপর তলায় বাস করে ভারতীয় সেনাবাহিনী। এই কেল্লায় শাজাহান প্রথমেই স্থাপন করেছিলেন এই মীনা বাজার। লাহোর দ্বার থেকে বাজার শুরু হয়ে শেষ হয়েছে কেল্লার প্রাঙ্গণে। তৎকালীন বাদশার বেগমেরা বাইরে বেরোতেন না। তাঁদের জন্যেই এটি করেছিলেন সম্রাট। বেগমেরা দাসীদের নিয়ে তাঁদের পছন্দ মতো জিনিষ কেনাকাটা করতেন এই মীনা বাজার থেকে। মোঘল আমলে এই বাজারে বিখ্যাত কারিগরের আখরোটের কাঠের উপর সূক্ষ্ম কাশ্মীরি কাজ, হীরা জহর দিয়ে তৈরী নানা অলংকার ও সাজ-সজ্জার দ্রব্য, উৎকৃষ্টমানের পোশাক পরিচ্ছদ, হাতির দাঁতের তৈরী নানা বিলাসদ্রব্য বিক্রি করতেন মহিলা দোকানীরা। মোঘল আমলের সে ঐতিহ্য আজ আর এই বাজারে না থাকলেও আধুনিক পর্যটকদের জন্য দোকানীরা বসে রয়েছেন নানা বিলাসী পসরা সাজিয়ে। তবে প্রত্যেকটা জিনিষের দামই লালকেল্লার চূড়ার সমান।

মীনা বাজারের সাজানো দোকানগুলি দেখতে দেখতে পার হয়ে এলাম একটি সুন্দর বাগানে। বাগানটি গোলাকার। এখন নানা বাহারী ফুল গাছে সাজানো রয়েছে। এরই সামনে দাঁড়িয়ে আছে তিনতলা একটি বাড়ী—নাম নহবতখানা। এই নহবত-খানার আরও একটি নাম নক্করখানা। মোঘল আমলে লালকেল্লার দর্শকদের অনেকে হাতিতে চড়ে এসে এখানে নামতেন—তাই একে হাতি পোলও বলা হয়ে থাকে। এই নহবতখানা থেকে বিভিন্ন বিষয়ে ঘোষণা আর নানা ধরনের বাদ্যবাজনা করা হতো। প্রতিদিন এই নহবতখানায় পাঁচবার বাজানো হতো নহবত। তবে মোঘল বাদশাহের জন্মদিনে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মিষ্টি সুরে টানা বেজে চলতো নহবত। এখানেই মোঘল আমলে হত্যা করা হয়েছিল বাদশা জহাংদার শাহ (১৭১২-১৩) এবং ফারুকসিয়রকে (১৭১৩-১৯)।

নহবতখানার তিনতলায় রয়েছে একটি যুদ্ধ স্মারক সংগ্রহশালা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এবং মোঘল আমলে ব্যবহৃত বহু অস্ত্রশস্ত্র সুন্দরভাবে সংরক্ষিত আছে এখানে। একদা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর রেংগুনে ব্যবহৃত চেয়ারটি সযত্নে রয়েছে এই যুদ্ধ স্মারক সংগ্রহশালায়।

নহবতখানা থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম একটু চওড়া রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায়। এর দুপাশেই সুন্দর মাঝারি ঘাসে ভরা প্রাঙ্গণ। নহবতখানা থেকেও দেখা যায় আবার এই প্রাঙ্গণটুকু পার হলেই সাধারণের জন্য লালকেল্লার ঐতিহাসিক 'মিটিং

হল'—দিওয়ান-ই-আম। প্রাঙ্গণ পেরিয়ে চার পাঁচটা সিঁড়ি ভেঙে এসে দাঁড়ালাম দিওয়ান-ই-আমে। সম্পূর্ণ লাল পাথরে নির্মিত এই ভবনটি ছবির মতো সুন্দর। লাল দশটি করে মোট তিনটি লাইনে ত্রিশটি স্তম্ভের উপর নির্মিত হয়েছে। এই ভবনের ভিতরে—ঠিক মাঝখানেই রয়েছে শাহী তখ্‌ত। মোঘল আমলেএটি সজ্জিত ছিল হীরা জহরত দিয়ে। শাহী তখ্‌তে'লম্বায় ২'১৩ মি. এবং চওড়ায় ০'৯৯ মি. চৌকি রয়েছে পাথরের। যেমন সুন্দর দেখতে তেমনই এর গায়ে আকর্ষণীয় কারুকার্য। এটির উপর দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রজাদের সামনে প্রার্থনা করতেন বাদশাহের সেবায়। মোঘল আমলে এই দিওয়ান-ই-আমে বাদশা শাজাহানের দরবার বসতো। শাহী তখ্‌তের সামনে বসতেন প্রজারা আর সম্রাট বসতেন শাহী তখ্‌তে। সম্রাট প্রজাদের সুখ দুঃখের কথা শুনতেন, বিচার করতেন—প্রয়োজনে শাস্তি দিতেন অপরাধীকে। শাহী তখ্‌তের পিছনের দেয়ালে বিভিন্ন রঙের পাথরের ফুল আর পাতাগুলি নয়নাভিরাম। দিওয়ান-ই-আম লম্বায় ৫০০ ফুট এবং চওড়ায় ৩০০ ফুট। এর সাদা মার্বেল পাথরের বেদিটি ৯০ ফুট। মধ্যযুগের স্থাপত্যকলার এক অপূর্ব নিদর্শন বাদশা শাজাহানের লালকেল্লার দিওয়ান-ই-আম। ঘুরে ঘুরে দেখতে বেশী সময় লাগেনা—সময় লাগে শিল্পরস উপভোগ করে মনের সঙ্গে একাত্ম করে নিতে।

মোঘল আমলে এই দিওয়ান-ই-আম ভবনের বাঁ-দিকেই ছিল একটি দরজা। গাইড জানালেন, এই দরজায় লাগানো থাকতো একটি লাল রঙের মূল্যবান পরদা। তাই এটি প্রসিদ্ধ ছিল লাল পরদা নামে। বাদশা শাজাহানের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছাড়া ওই দরজা দিয়ে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের অধিকার ছিল না। যারা যাওয়া আসা করতেন—তাদের বলা হতো লাল পরদাওয়ালা। এখন শাজাহান নেই—সেই লালপরদাও নেই।

দিওয়ান-ই-আমের উত্তরে—পিছনেই রয়েছে দিওয়ান-ই-খাস। লম্বায় প্রায় ২৮ মি. এবং চওড়ায় প্রায় ২১ মিটার এই অন্দরমহলের দরবারটি নির্মিত হয়েছে শ্বেত পাথর দিয়ে। একটু ঘুরে এসে দাঁড়ালাম কারুকার্য খচিত, এককালে রত্নখচিত ৩২টি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে থাকা মহলটির চত্বরে। মোঘল বাদশা শাজাহানের ঐতিহাসিক ময়ূর সিংহাসনটি ছিল এখানেই। এই মহলটি নির্মাণ করতে সেই আমলে ব্যয় হয় প্রায় ২১ লক্ষ টাকা। এটি দেখলে সহজেই বোঝা যায়, কি অমানুষিক পরিশ্রম করে নির্মাণ করেছিলেন তৎকালীন সুদক্ষ শিল্পীরা। দরবারে সকালের পরিশ্রমের পর দুপুরে এখানে একটু বিশ্রাম নিতেন শাজাহান। দিওয়ান-ই-খাসে শ্বেত পাথরের জালির কাজ, অনুপম ভাস্কর্য আর কারুকার্য পর্যটকদের মোহিত করে দেয়ার মতো। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে এর ছাদটি একবার রঙ করা হয়েছিল।

অনেকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল এই দিওয়ান-ই-খাসে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যাপারে সমস্ত দোষটাই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল বাদশা বাহাদুর শাহ জাফরের উপর। এখানেই পঞ্চম জর্জ দরবার ডেকে তাঁর উপর মামলা চালিয়েছিলেন। লালকেল্লার দিওয়ান-ই-খাস হলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের 'মিটিং হল'। একসময় এই ভবনটিতে বসে লর্ড লেক-এর কথোপকথন হয় বাদশা আলমের।

একদা অসুস্থ হয়েছিলেন সম্রাট শাজাহান। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফ থেকে ডাক্তার আনা হয়েছিল বাদশার চিকিৎসার জন্যে। সুস্থ হয়ে বাদশা ৩৬টি বড় বড় গ্রাম উপহার দিয়েছিলেন ডাক্তারদের। একই সঙ্গে শাজাহান দিয়েছিলেন কোম্পানীর জিনিষপত্রের উপর থেকে ট্যাক্স মকুবের আদেশ।

যতদিন এই দিওয়ান-ই-খাস থাকবে, ততদিন ঔরঙ্গজেবের দেওয়া একটি আদেশের কথা মনে রাখবে ভারতবাসী। এখানে বসেই তিনি হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন নিজের দুইভাই দারা ও সুজাকে। এই দিওয়ান-ই-খাস ভবনেই একদা গুলাম কাদির চোখ তুলে নিয়েছিলেন বাদশা শাহ আলমের। একই সঙ্গে হত্যা করেছিলেন তাঁর পুত্রকে। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এখান থেকেই নাদিরশাহ লুট করে নিয়ে যান ময়ূর সিংহাসন।

দিওয়ান-ই-খাসের সুন্দরতা মানুষকে মুগ্ধ করে দেয়ার মতো। তাই তো এর দেয়ালে ফার্সী ভাষায় লেখা রয়েছে সোনালী হরফে—'পৃথিবীতে কোথাও যদি স্বর্গ থাকে, তা এখানেই আছে, তা এখানেই আছে, তা এখানেই আছে।'

পায়ে পায়ে দিওয়ান-ই-খাস পার হতেই এসে পড়লাম হস্তকলাশিল্পের এক অনবদ্য অবদান—রঙমহলে। মনোমুগ্ধকর এই রঙমহলের সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এই মহলের চারটি দেয়াল আর ছাদ ভরা রয়েছে সুন্দর ফুলের কাজে। একসময় এই ফুলের কারুকার্যের মধ্যেই বসানো ছিল মণি মুক্তা হীরা জহরত আর নানা ধরনের বহু মূল্যবান পাথর। আজ তার একটিও নেই। তবুও তৎকালীন শিল্পের উৎকর্ষতার প্রমাণ আজও ছড়িয়ে রয়েছে রঙমহলের দেয়ালে।

এই মহলটি লম্বায় প্রায় ৪৭ মিটার, চওড়ায় ৩০ মিটারের কাছাকাছি। বিশাল শ্বেত পাথরের এই মহলের মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে ছোট্ট একটি জলাশয়। তাতে আছে একটি সুন্দর পাথরের পদ্ম। গাইড বললেন, একসময় এই ফুলের ভিতর থেকে জল বেরোতো, তখন ফুলের পাপড়িগুলি দেখাতো অপূর্ব।

রঙমহলের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে রয়েছে দুটি চেয়ার। দুটিই শ্বেত পাথরের। এখানকার মহলটির ছাদ আর দেয়ালে লাগানো রয়েছে টুকরো টুকরো অসংখ্য কাচ। নাম এর শীশমহল। একটা দেশলাই কাঠি জ্বাললে সারাটা মহল ঝলমল করে ওঠে। প্রত্যেকটা কাচের টুকরোর উপরে আঁকা রয়েছে সুন্দর সুন্দর ছবি—যা আরও আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলেছে এই শীশমহলের।

এই মহলটি ছিল মমতাজের। এর একটি অংশ রয়েছে যমুনার দিকে। ওই অংশে

পাঁচটি জানলা রয়েছে সূক্ষ্ম জালির কাজের। এই জানলা দিয়ে বেগমরা যমুনার দিকের মাঠে বন্য পশু আর হাতিদের লড়াই এবং তাদের নানা ধরনের খেলা দেখে আনন্দ উপভোগ করতেন।

লালকেল্লায় দর্শনীয় যা কিছু—তা সবই একটা নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে। তাই ঘুরে ফিরে দেখতে অসুবিধে হয় না। আর দেখার বিষয় বস্তুগুলির দূরত্ব একটা থেকে আর একটা মোটেই বেশী দূরে নয়। একেবারেই পাশাপাশি।

এবার টুকটুক করে এসে দাঁড়ালাম খাসমহলে। এখানে যতগুলি মহল আছে তার মধ্যে অন্যতম হলো এই খাসমহল। বাদশা শাজাহান এই মহলে বাস করতেন। এটি ছিল তাঁর একান্তই নিজস্ব। দিওয়ান-ই খাসের পশ্চিমদিকেই নির্মিত হয়েছে মহলটি। এর সৌন্দর্য ও কারুকার্য মুগ্ধ হয়ে দেখার মতো।

দিওয়ান-ই-খাসের উত্তরদিকে দেয়াল ঘেঁষে শ্বেত পাথরের জালি দিয়ে নির্মিত মহলটি হামাম বা স্নানাগার। এখানেই সম্রাটের বেগমরা স্নান করতেন। এই স্নানাগারের দরজা রয়েছে দুটি। সুবাসিত জলের ঝরণায় স্নান করতেন তাঁরা। স্নানাগারের একটি অংশ গরম জলের, অপরটি ঠাণ্ডা জলের। মোতি মসজিদের দিকের অংশটি গরম এবং যমুনার দিকের অংশটি ঠাণ্ডা জলের। স্নানাগারের পশ্চিমদিকের দেয়ালের পাশে রয়েছে একটি বড় উনুন—যেখানে মোঘল আমলে প্রতিদিন গরম জলের জন্য জ্বালানো হতো ১২০ মণ কাঠ।

এখান থেকে একটু এগোতেই পড়লো অষ্টভুজাকার একটি গম্বুজ। মোঘল আমলে এটি নির্মিত হয় তামা দিয়ে। তার উপরে ছিল সোনার জল ধরানো। সম্রাট শাজাহান প্রতিদিন এই স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখতেন। বাদশাকে সৈনিকেরা অভিবাদন দিতেন এখানে। এটির নাম মুসম্মন বুর্জ। দ্বিতীয় আকবর ১৮০৮ থেকে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই বুর্জের সামনে একটি চালা নির্মাণ করেন—যেখান থেকে পঞ্চম জর্জ এবং রাণী মেরী জনতাকে দর্শন দিয়েছিলেন ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে।

লালকেল্লার অন্যতম আকর্ষণ মোতি মসজিদ। ঠিক বেগমদের স্নানাগারের বিপরীত দিকে। এটি নিজের এবং রাজপরিবারের উপাসনার জন্য নির্মাণ করেন ঔরঙ্গজেব। ধবধবে সাদা পাথরে নির্মিত এই মসজিদটি স্থাপিত হয়েছে তিন ফুট বেদির উপর। লম্বায় এটি ৪০ ফুট এবং চওড়ায় ৩০ ফুট। লাল বেলে পাথর দিয়ে ঘেরা রয়েছে মসজিদের সমগ্র চত্বরটি। অপূর্ব কারুকার্যে ভরা এই মসজিদটি যেন রূপকথার এক স্বপ্ন-প্রাসাদ। একমাত্র সম্রাট পরিবার এবং তাদের বংশধরেরা নমাজ পড়তেন এই মসজিদে। এটি নির্মাণে তৎকালীন ব্যয় হয় এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা। মোতি মসজিদের উঠোনে রয়েছে চারকোণা একটি চৌবাচ্চা—উপাসনার আগে উজু (হাত মুখ ধোয়ার) করার জন্য। মসজিদের ছাদে রয়েছে তিনটি গম্বুজ। এছাড়াও আছে সুন্দর কারুকার্যখচিত ছোট ছোট চূড়াযুক্ত মিনার। মোতি মসজিদের সারা

দেয়ালই ভরা রয়েছে নানা রঙের নকসায়। মূল প্রবেশদ্বারটি পিতলের আর মসজিদের স্তম্ভগুলি ছিল সব তামার। যেগুলি পরবর্তীকালে লুণ্ঠিত হয় এবং পরে সেখানে আবার নির্মাণ করে দেয়া হয় পাথর দিয়ে। সম্পূর্ণ মসজিদেই রয়েছে মোঘল আমলের সুরুচিপূর্ণ আভিজাত্যের ছাপ—যা দেখলে আজও চোখ ফেরানো যায় না।

মোতি মসজিদকে রেখে একটু এগিয়ে যেতেই পড়লো বাগ-ই-হায়াত। একসময় মোগল বাদশাদের পছন্দ মতো আমের বাগান আর সুস্বাদু ফলের বাগান ছিল এখানে। একটা পুকুর ছিল—যার চারপাশে ছিল ৩০টি করে ফোয়ারা। এখন এর কিছুটা অংশ রয়েছে আর বাকি অংশটা পরিণত হয়েছে পার্কে। কথিত আছে, মোঘল আমলে এই বাগের ভিতরে সকাল সন্ধ্যায় বাদশা আর বেগম বসে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতেন—গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে করতেন শলাপরামর্শ।

এই বাগের ভিতর দিয়েই বাঁ-দিকে শাওন এবং ডানদিকে দেখা যায় ভাঁদো নামের দুটি মহল। এই মহল দুটির মাঝখানেই রয়েছে একটি সরোবর। এই সরোবরের কাছে দেয়ালের ভিতর থেকে আসা নলের মাধ্যমে জল বেশ জোরে এসে পড়ে। তখন এমন শব্দ হয়, মনে হয় যেন শ্রাবণ ভাদ্র মাসের বৃষ্টি হচ্ছে। তাই বাদশা শাজাহান এর নাম রেখেছেন শাওন ভাঁদো। এই সরোবরের তাকগুলিতে মোঘল আমলে দিনের বেলায় ফুলদানিতে ফুল এবং রাত্রে জ্বালিয়ে দেয়া হতো প্রদীপ—যার স্নিগ্ধ আলোয় গড়ে উঠতো এক সুন্দর মনোরম স্বর্গীয় পরিবেশ।

শাওন ভাঁদো মহল দুটির মাঝামাঝি সরোবরে রয়েছে একটি লাল পাথরে নির্মিত একটি ভবন—জাফর মহল। আগে এই মহলে যাওয়া যেতো একটি পুলের উপর দিয়ে। পরে এটিকে ভেঙে ফেলা হয়েছে। সুন্দর এই মহলটি নির্মাণ করেন শেষ মোঘল বাদশা বাহাদুর শাহ জাফর—১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে।

জাফর মহলের বিপরীত দিকেই রয়েছে হীরামহল বা বড়-দবি। একদা এখানে বসেই সম্রাট শাজাহান দেখতেন বয়ে যাওয়া যমুনাকে।

হীরামহলের পরেই শাহ বুর্জ। এই ভবনের ছাদে রয়েছে ছাতার মতো একটি গম্বুজ। এই গম্বুজ গৃহে বসেই সম্রাট গোপন পরমর্শাদি করতেন তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে।

এবার গাইডের সঙ্গে এলাম লালকেল্লার দুটি সংগ্রহশালায়। প্রথমটি নহবতখানার দ্বিতীয় তলায়। এই ভবনের ভিতরে সুন্দরভাবে সারি সারি সাজানো রয়েছে ভারতীয় যুদ্ধের বিভিন্ন অস্ত্র শস্ত্র—যার মধ্যে রয়েছে মেসিনগান, রাইফেল, তীর বর্শা, বন্ধুক বারুদ, যুদ্ধের পোশাক ইত্যাদি। পানিপথের যুদ্ধের সুন্দর একটি মডেল দৃশ্য দেখানো হয়েছে এই সংগ্রহশালায়। এই সংগ্রহশালাটির নাম ভারতীয় যুদ্ধ স্মারক সংগ্রহশালা। এখানে বেশীরভাগ রয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) সময় ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র।

এখান থেকে এবার এলাম রঙমহলের ডানদিকের আরও একটি সংগ্রহশালায়। মোঘল আমলের মমতাজ মহল এখন দিল্লী মিউজিয়াম। এখানে সুন্দরভাবে সংরক্ষিত রয়েছে সূর্য ঘড়ি, পাথরের উপর খোদাই করা ফার্সী ভাষায় শের, বহু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, মোঘল আমলের পোশাক পরিচ্ছদ, মোঘল সম্রাটদের ছবি, হাতে লেখা বই, কোরান, শাহনামা, ছোটবড় চীনামাটির সুন্দর সুন্দর বাসন, তরবারি, মিনিয়েচার পেন্টিং, বিভিন্ন রাজা বাদশাদের আমলের মুদ্রা—এমন অসংখ্য পুরনো দিনের সংগ্রহ সমৃদ্ধ করেছে এই সংগ্রহশালাকে।

অতীতের একটা সময়ে এই লালকেল্লায় বিচার করা হয়েছে—মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসের, বাদশাহ বাহাদুর শাহের এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের। আজকের লালকেল্লা মানেই ইতিহাসের অতীত স্মৃতি—বাদশা শাজাহান থেকে শুরু করে বাদশা বাহাদুর শাহ জাফর পর্যন্ত।

লালকেল্লার পশ্চিমে যমুনার মধ্যে রয়েছে মোঘল আমলের জেলখানা। এটি নির্মাণ করেন শের শাহ সুরীর পুত্র সেলিম শাহ—১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। সংযোগ স্থাপনকারী সেতুটির নাম নিজের নামানুসারেই হয় সেলিমগড়। সম্রাট হুমায়ুন দ্বিতীয়বার দিল্লী এসে তিনি পুলটির নাম পাল্টে রাখেন কাদেরগড়। পরে কাদেরগড় আবার প্রসিদ্ধিলাভ করে সেলিমগড় নামে।

পরবর্তীকালে ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর একটি পুল নির্মাণ করে সরাসরি যুক্ত করে দেন লালকেল্লার সঙ্গে—যা আগে ছিল না। একদা এখানকার জেলখানায় বন্দী করে রাখা হয়েছিল কয়েকজন রাজপুত রাজা মহারাজাকে। লালকেল্লার মধ্যে জেলখানা এবং ফাঁসী ঘর থাকলেও অন্ধ বাদশা আলমকে এখানে বন্দী করে রেখেছিলেন গুলাম কাদির।

লালকেল্লার শেষ আকর্ষণ 'লাইট এণ্ড সাউণ্ড'। ব্যাপারটা হলো, লালকেল্লার ভিতরে বিভিন্ন মহলগুলি তো রয়েছেই—তার উপরে রঙ-বেরঙের আলো ফেলা হয় রাতে। আর পিছন থেকে পুরনো দিনের স্মৃতি জাগিয়ে তোলার জন্য অতীত ইতিহাস-কথার সঙ্গে চলতে থাকে কাহিনী ও ঘটনা অনুসারে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র-সঙ্গীত ও শব্দ। সিনেমার পর্দার মতো কোন ছবি দেখা যায় না এখানে। এটা দেখতে হলে পর্যটকদের থাকতে হবে সন্ধ্যা পর্যন্ত। আমি দিল্লী পাঁচ বার গিয়ে একবার মাত্র দেখেছি এই লাইট এণ্ড সাউণ্ড। অনেক বিদেশী পর্যটক এবং ভ্রমণবিলাসীরাও অপেক্ষা করে থাকেন এটি দেখার জন্য। লাইট এণ্ড সাউণ্ড—কথাটার মধ্যে দেখার একটা আকর্ষণ রয়েছে ঠিকই তবে দেখার পর বিষয়টা আমার মোটেই ভালোলাগেনি। লালকেল্লার অবারিত দ্বার খোলা থাকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম কেল্লা থেকে। মোঘল বাদশাদের অমর কীর্তির কথা ভাবতে ভাবতেই ফিরে এলাম স্টেশনে। আর কখনও আসা হবে কিনা জানি না, তবে স্মৃতি রয়ে যাবে চিরকালই।

যাঁদের কাছে ঋণী রইলাম

ইংরাজীতে একটা কথা আছে, 'To read is to know.'—'পড়লেই জানা যায়।' নিজের চোখে দেখা ছাড়াও আমি পড়েছি এবং জেনেছি। যে সব লেখকের গ্রন্থ পড়ে সাহায্য নিয়েছি এবং দৈহিক ও মানসিক শ্রম দিয়ে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন যাঁরা—তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যে আব্রাহাম লিঙ্কনের সেই বিখ্যাত উক্তিকে স্মরণ করে আমিও বলি—'আমি চাই না যে, কৃতজ্ঞতায় কারও কাছে ঋণী থাকি।'

সর্বশ্রী অমিত কুমার লাহা (ইলামবাজার), পার্থ সরকার, বরুণ কুমার হাজরা, ডাঃ প্রদীপ দাস, চন্দ্রশেখর রায়চৌধুরী, রুণা রায়চৌধুরী (উখড়া), ঈশিতা মিত্র, উদয়ন আচার্য, সুজিত সরকার, গোবিন্দ রায়মৌলিক, কালীপদ দাস।

মহাভারতম্—হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য (অনুবাদক)
শ্রীমদ্ভাগবত—হরফ প্রকাশনী
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম কথিত
শ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়াবাবার জীবনচরিত—সন্তদাস বাবাজী ব্রজবিদেহী
শ্রীশ্রী সদগুরু সঙ্গ (২য় খণ্ড)—শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী
শ্রীশ্রী গিরিরাজ পরিক্রমা মার্গ—শ্রীস্বরূপ দাস
পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য—শান্তিকুমার দাশগুপ্ত, নির্মল নারায়ণ গুপ্ত
সচিত্র ব্রজগাইড, ব্রজদর্শন—রাকেশ গুপ্ত, প্রমথেশ গুপ্ত
সতীপীঠ পরিক্রমা (১ম)—অমিয় কুমার মজুমদার
ভারত দর্শন—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
ভারত ভ্রমণ—বারিদবরণ ঘোষ
রঘুবংশম্—বসুমতী প্রকাশন
লালকেল্লা গাইড—মান পাবলিকেশন
দিল্লী অউর উসকা অঞ্চল—ওয়াই. ডি. শর্মা, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ
আগ্রা গাইড, দিল্লী গাইড—লালচাঁদ এণ্ড সন্স (প্রকাশক)
আগ্রা এবং ফতেপুর সিক্রি—মহাবীর খাঁ
Birth place of Lord Srikrisha—Srikrishna Janmasthan Seva Sansthan, Mathura
Photo Hobby Centre—Gariahat Road (South) Cal-31

পরিশেষে বলি, এই গ্রন্থে আলোচিত প্রায় সব মহাপুরুষদের কাহিনীগুলি সংগৃহীত হয়েছে শ্রী শঙ্করনাথ রায়ের লেখা অমর গ্রন্থ—ভারতের সাধক, ১৩টি খণ্ড এবং ভারতের সাধিকা, ২টি খণ্ড থেকে। লেখক এবং এই দুর্লভ গ্রন্থের প্রকাশকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও ঋণের বোঝা আমার এতটুকুও কমে যাওয়ার নয়। একই সঙ্গে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে রইলাম তাঁদের কাছে—অসাবধানতায় কোন গ্রন্থ বা লেখকের নাম যদি বাদ পড়ে গিয়ে থাকে।